ধর্ম্মপ্রচারক।

দ্বিতীয় বর্ষ ১৩২৭ সাল।

প্রবন্ধ সূচী।

——:০:——

-প্রচারক—

বর্ণাশ্রম বাঁধ ।

অকুণ্ঠং সর্ব্বকার্য্যেষু ধর্ম্ম-কার্য্যার্থমুদ্যতম্।
বৈকুণ্ঠস্য হি যদ্রূপং তস্মৈ কার্য্যাত্মনে নমঃ॥

২য় ভাগ { বৈশাখ, ১৩২৭। ইং এপ্রিল, ১৯২০ } ১ম সংখ্যা।

ধর্ম্মই সকল উন্নতির মূলভিত্তি।

[শ্রীবিজয় লাল দত্ত।]

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা।

যস্য স্মরণমাত্রেণ ন মোহো ন চ দুর্গতিঃ।
ন রোগো ন চ দুঃখানি তমনন্তং নমাম্যহম্॥

একদিন আর্য্য-ঋষিগণ এবং ভারতের চতুর্ব্বর্ণের শীর্ষস্থানীয় মহাজ্ঞানী ব্রাহ্মণ মণ্ডলী কঠোর সাধনা-প্রভাবে প্রকৃতির বিশাল ভাণ্ডারের দ্বার উদ্ঘাটনে উহার সমস্ত স্তর ভেদ করিয়া সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম নিগূঢ় তত্ত্ব ও গভীর রহস্য নিচয় আলোচনা পূর্ব্বক ধ্রুবজ্ঞানে বুঝিয়াছিলেন এবং সমস্ত জগতকে বুঝাইয়াছিলেন যে, ধর্ম্মই মানবের প্রাণ, ধর্ম্মই মানবের জীবনীশক্তি, ধর্ম্মই মানবের বল-বিক্রম ও শোভা-সম্পদ, ধর্ম্মই মানবের সকল সুখ-শান্তি এবং ধর্ম্মই মানবের সর্ব্বস্ব। ধর্ম্মানুরাগ ও ধর্ম্মানুষ্ঠান ভিন্ন নর-নারী কখনই প্রকৃত সুখ-শান্তি ও উন্নতিলাভে সক্ষম হইতে পারে না। ধর্ম্মই বিশ্ব-মানবতার একমাত্র দ্যোতক ও সম্প্রসারক। একমাত্র ধর্ম্মকেই আশ্রয় করিয়া নরনারী জীবিত থাকিতে পারে এবং দুর্ভাগ্য

বশতঃ কুগ্রহের প্রভাবে ঘোর দুরবস্থায় নিপতিত ও ভীষণ দুর্ব্বিপাকে প্রপীড়িত হইলেও ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত এবং ধর্ম্ম-জ্ঞানে উদ্ভাসিত হইয়া পার্থিব সমস্ত আপদ-বিপদ, ঝড়-তুফান, ও বিঘ্ন-বিপত্তি হইতে অনায়াসে মুক্তিলাভ করিতে সক্ষম হয়। ধর্ম্মহীন হইয়া নর-নারীর কোন স্থায়ী উন্নতিলাভের আশা বিড়ম্বনা মাত্র। যে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ এক সময় তাঁহার ধর্ম্ম-প্রাণ সুসন্তান-গণের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা ও সুকৃতি-প্রভাবে সকল বিষয়ে উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, শত শত বর্ষকাল বিস্তর বহিঃশত্রুর প্রচণ্ড আক্রমণ ও নির্য্যাতনে নিষ্পেষিত হইয়াও সকল অনর্থের অপসারক ধর্ম্মধনকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করিয়া সেই ভারতভূমি অকাতরে সকল আক্রমণ ও আপদ-বিপদকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়াছিলেন। ধর্ম্ম-বিহীন হইলে ভারতভূমি কখনই এত দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া আর্য্য-জ্ঞান, আর্য্য-সভ্যতা ও আর্য্য-প্রতিভার মহিমা প্রচারে গৌরবান্বিত হইতে পারিতেন না। আর্য্য-ঋষিগণ এবং তাঁহাদের সুযোগ্য বংশধর ব্রহ্মবিৎ সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ সর্ব্বত্যাগী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণগণের সাধনায় পরিপুষ্ট ও সমুন্নত ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থা কিরূপ ঘোর বিষাদময় ও কিরূপ অরুন্তুদ মর্ম্ম-বেদনা-ব্যঞ্জক তাহার পরিচয় দান অনাবশ্যক। স্বধর্ম্মা-নুরাগী সহৃদয় চিন্তাশীল ভারতবাসী মাত্রই প্রতি মুহূর্ত্তে তাহা সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিতেছেন।

বিধাতার বিশেষ বিধানে আজি ভারতভূমি ভিন্ন দেশীয় ও ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী রাজ-শক্তির শাসনে পরিচালিত; বিজাতীয় বিধি-ব্যবস্থায় আজি ভারত-ভাগ্য নিয়মিত হইতেছে। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রখর স্রোত তরতর প্রবাহে ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানে প্রবাহিত হইতেছে। ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক, বিস্তর ভারতসন্তান এই অভিনব শিক্ষা ও সভ্যতাকে সসম্ভ্রমে বরণ করিয়া দিন দিন আর্য্য-জাতির বিপুল সাধনা ও ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে আস্থাহীন, বীতশ্রদ্ধ অথবা একান্ত উদাসীন হইয়া পড়িতেছেন। যুগ-ধর্ম্ম প্রভাবে তাঁহারা পাশ্চাত্য জাতির অনুকরণ-পরায়ণ হইয়া জাতীয় বিশেষত্ব ও জাতীয় গৌরব ভুলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ভারতের বিশেষতঃ বঙ্গদেশের বর্ত্তমান ধর্ম্মনীতিক অবস্থা এবং ভারতভূমির প্রাচীন ধর্ম্মভাব, তুলনায় সমালোচনা করিবার জন্য অতি প্রাচীনকালে

উপনীত হইবার আবশ্যক হইবে না। গত ৭০ বৎসরের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে এ দেশের সামাজিক ও ধর্ম্মনীতিক অবস্থার যে ঘোরতর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহা চিন্তা করিলে বিপুল বিস্ময় ও গভীর বিষাদে হৃদয় পরিপূর্ণ হয়। ধর্ম্মহীন শিক্ষার (Godless Education) প্রভাবে ভারতসন্তানগণ নূতন ভাবে বিভোর হইয়া নূতন পথে চলিতে শিখিয়াছেন। প্রাচীন ভারতের সে বিশ্ব-বিশ্রুত ব্রহ্মচর্য্য, সে সংযম ও সদাচার, সে তীব্র ধর্ম্ম-জ্ঞান-পিপাসা, সে স্বজাতি-প্রীতি, সে পরার্থপরতা এবং জাতীয় জীবনের উৎকর্ষ সাধন ও ধর্ম্মশিক্ষা প্রভাবে জাতীয় কল্যাণ কামনায় সে কঠোর সাধনা ও আত্মোৎসর্গ আর নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী এবং পাশ্চাত্য সভ্যতানুরাগী ভারতসন্তানগণের মধ্যে অধিক সংখ্যক লোক এক্ষণে পরমারাধ্য ধর্ম্মানুরাগী পিতৃপিতামহগণের অবলম্বিত সনাতন ধর্ম্মভাব এবং তৎ-সাধন-প্রণালী ভুলিয়া দিন দিন পাশ্চাত্য জড়বাদের অনুরাগী ও পরিপোষক হইতেছেন। যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম এক সময়ে ভারতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছিল তাহার প্রতি তাহারা নিতান্ত অশ্রদ্ধা এবং উপেক্ষা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহাকে চূর্ণ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। বলিতে নিতান্ত দুঃখ ও ক্ষোভ জন্মে যে, যে ব্রাহ্মণ বর্ণ এক সময়ে জ্ঞানের সুবিমল জ্যোতিতে দেশ দেশান্তর উদ্ভাসিত ও উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন, যাঁহাদের গভীর ত্যাগ স্বীকার, বিপুল নিষ্ঠা ও তিতিক্ষা, এবং গভীর জ্ঞান-পিপাসা ও সমাজের পরম মঙ্গল চিন্তা এক সময় সমগ্র ভারতে আদর্শস্থল ও গৌরবের ধন ছিল, যাঁহারা ভারতের সমগ্র নরনারীর ধর্ম্ম-শিক্ষকরূপে বিপুল সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য ধর্ম্ম-হীন শিক্ষার প্রভাবে এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহময় অমোঘ আকর্ষণে তাঁহারা দিন দিন কি শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন! আচারে, ব্যবহারে, শিক্ষায়, দীক্ষায় এবং কার্য্য-কলাপে যেন তাঁহারা একটী স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হইতে অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই জাতীয় বিশেষত্বের পরিচায়ক যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ পূর্ব্বক, গায়ত্রী মাতার নিকট হইতে চিরবিদায় লইয়া পরম দেবতার উপাসনার মূল সূত্র ত্রিসন্ধ্যা-বন্দনায় জলাঞ্জলি দান করিয়া জড়বাদের উপাসক হইয়াছেন। অনেকে সাকার উপাসনায় বীতশ্রদ্ধ হইয়া নিরাকার উপাসনায়ও সন্দিহান হইতেছেন। অর্থই ইঁহাদের মধ্যে অনেকের প্রধান লক্ষ্য—ধন, মান, যশঃ

ও প্রভুত্বই ইঁহাদের চরম সাধনা। ইঁহারা ইয়ুরোপের অনুকরণে সনাতন Spiritualism অর্থাৎ বিশুদ্ধ ধর্ম্মভাবের উপর জঘন্য ক্ষণভঙ্গুর Materialism জড়বাদের প্রতিষ্ঠা, আরাধনা ও প্রচারে জীবন-সংগ্রাম কঠোর হইতে কঠোরতর করিয়া তুলিতেছেন। "Survival of the fittest" এই নীতির পরিপোষক এবং উহার পথ প্রদর্শক হইয়া অনেকে সাম্য নীতিকে পদদলিত করিয়া ঘৃণিত বৈষম্য ও আত্ম-বিচ্ছেদ-নীতি প্রবর্ত্তন করিতেছেন। যখন সর্ব্বোচ্চ বর্ণ ব্রাহ্মণগণের এইরূপ অবস্থা তখন অন্য বর্ণে কা কথা। অন্যান্য বর্ণ পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণ বর্ণের পদ-চিহ্ন অনুসরণে তাঁহাদের সাধনা ও সুকৃতির অনুকরণে স্ব স্ব উন্নতি সাধন এবং সমাজ সংগঠন করিয়াছেন। কালবশে যুগধর্ম্মের প্রভাবে তাঁহারাও উক্ত ব্রাহ্মণগণের ন্যায় স্বেচ্ছাচারী ও স্বধর্ম্ম-বিমুখ হইয়া জড়বাদের উপাসনায় সামাজিক শৃঙ্খলা চূর্ণ করিয়া নানা অশান্তিকে বরণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। আমাদের অধঃপতন অতি শীঘ্র শীঘ্রই সংঘটিত হইতেছে। ধর্ম্ম-শিক্ষার অভাবে দেশের পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী সঙ্গতিশালী লোকদিগের মধ্যে অনৈক্য ও দলাদলির প্রভাব দিন দিন বাড়িতেছে এবং তাঁহাদের দৃষ্টান্ত অনুসারে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র ব্যক্তিগণের মধ্যেও অনৈক্য ও উপেক্ষার ভাব পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। মাতর্ভারতভূমি! কতদিনে তোমার বিপথগামী ভ্রান্ত সন্তানগণের মোহান্ধকার দূর হইবে? কতদিনে মা তোমার তথাকথিত সুশিক্ষিত সন্তানগণের জ্ঞান-চক্ষু প্রস্ফুটিত হইবে? কতদিনে তাঁহারা বিষম জড়বাদের উপাসক ইয়ুরোপের বর্ত্তমান শোচনীয় দুর্দ্দশা দেখিয়া চৈতন্য লাভ করিবেন? যে ঘৃণিত জড়বাদ ও প্রভুশক্তিপরায়ণতা বিশ্বগ্রাসী সর্ব্ববিধ্বংসী ইয়ুরোপীয় মহাসমরানলের প্রবর্ত্তক, যে জড়বাদ ফরাসিস-প্রুসিয় সমরে ইন্ধন যোগাইয়াছিল এবং যাহা আলসেস্-লোরেন্-বিজয়ে পূর্ণাহুতি প্রাপ্ত হইয়াছিল সেই ঘৃণিত জড়বাদ গত ৪০ বৎসরের উপর বিপুল শক্তিশালী জর্ম্মণিকে অপর এক ভীষণতর বিশ্বব্যাপী মহাসমরে পৃথিবীর মহা পরাক্রমশালী শক্তিপুঞ্জের প্রতিকূলে রুদ্রতালে নৃত্য করিবার জন্য প্রস্তুত করিয়াছিল! এই মহাভীষণ অনল-ক্রীড়ায় কত নরনারী ও কত জনপদ বিধ্বংস হইয়াছে, পৃথিবীর কতস্থানের কত লোক দরিদ্র ও অভাবে নিষ্পেষিত হইয়া দুর্দ্দশা ও দুর্গতির চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছে, কে তাহার হিসাব প্রদান করিবে? খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী

ইয়ুরোপ যদি প্রকৃত ধর্ম্মভাব বিসর্জ্জন দিয়া প্রকাশ্য ভাবে জড়বাদের উপাসক না হইত তাহা হইলে সমগ্র ইয়ুরোপের বর্ত্তমান শোচনীয় দুরবস্থা উপস্থিত হইত না এবং ইয়ুরোপের অনুগ্রহ ও সাহায্য-পরিপুষ্ট অন্যান্য অধীন, দুর্ব্বল ও পরমুখাপেক্ষী হতভাগ্য দেশের লক্ষ লক্ষ নরনারীর জীবন-সংগ্রাম কঠোরতম হইত না। পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী জড়বাদানুচিকীর্ষু- ভারত-সন্তানগণ, কতদিনে আপনাদের চৈতন্য হইবে? ইয়ুরোপের দুর্দ্দশা দেখিয়া ও ভাবিয়া কতদিনে আপনারা প্রাতঃস্মরণীয় জগত-পূজ্য আর্য্য-ঋষিগণের প্রদর্শিত পথ অবলম্বনে স্বধর্ম্মানুরাগী ও কর্ত্তব্যপরায়ণ হইবেন?

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সভ্যতা বঙ্গদেশে যেরূপ দ্রুতগতি ঘোর অকল্যাণ সাধন করিয়াছে, ভারতবর্ষের আর কোন দেশে সেরূপ পারে নাই। উহার প্রভাবে বাঙ্গালী-সমাজ নিতান্ত বিকৃত-ভাবাপন্ন ও অবনত হইয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষের অন্য যে কোন দেশে গমন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় তত্রত্য জনসঙ্ঘ, কি হিন্দু, কি মুসলমান, স্ব স্ব জাতীয় বিশেষত্ব ও ধর্ম্মের প্রাধান্য রক্ষার জন্য এখনও প্রাণপণে যত্নবান। কিন্তু সুশিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত অধিকাংশ বাঙ্গালীর মধ্যে সে নিষ্ঠা ও সে একাগ্র সাধনা কোথায়?

(ক্রমশঃ)

চিত্র পরিচয়।

বর্ণাশ্রম বাঁধ—এই চিত্রে জীবের চিন্ময়ী ধারাকে প্রবহমান নদীর সহিত উপমিত করিয়া জীবের উৎপত্তি, গতি এবং ব্রহ্মসমুদ্রে লীন হইয়া নির্ব্বাণ মুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। নদীর উৎপত্তি সাধারণতঃ পর্ব্বত হইতে, গতি সমতল ক্ষেত্রে এবং লয় সমুদ্রে। জীবের উৎপত্তি প্রকৃতির তমোগুণের রাজ্যে বা জড়তম প্রদেশে। গত মাঘ সংখ্যায় জন্মান্তর তত্ত্বে 'জীবের জন্ম' নামক অধ্যায়ে

এ বিষয়টী বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। পৃথিবীর জড়ত্ব পর্ব্বতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দৃষ্ট হয়, এই নিমিত্ত জীব-নদীর উৎপত্তি প্রকৃতিশৈল হইতে দেখান হইয়াছে। যতদিন নদী পর্ব্বতের ভিতরে ভিতরে প্রবাহিত হয় ততদিন তাহার পতনের আশঙ্কা থাকে না। কারণ পর্ব্বতে নদীপ্রবাহের রক্ষার জন্য স্বাভাবিক পার্ব্বত্য বাঁধ থাকে। জীবও যতকাল উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ, এবং জরায়ুজ পশ্বাদি যোনির ভিতরে থাকিয়া ক্রমশঃ মনুষ্য যোনির দিকে অগ্রসর হয় ততকাল তাহার পতনের আশঙ্কা থাকে না। যদি নদীর ধারা অধিত্যকা পথে সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হইবার সময় সরল না থাকে তাহা হইলে উহার জল অধিত্যকার উন্নততর ভূমি হইতে উপত্যকার নিম্নভূমিতে পতিত ও বিকীর্ণ হইয়া নষ্ট হইয়া যায়। সেই জন্য বাঁধ দিয়া নদীর সেই পতনোন্মুখ গতি রুদ্ধ করিয়া তাহার প্রবাহকে আপন মার্গে রক্ষা করিবার প্রয়োজন হয়। এই দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রতিপাদিত করা হইয়াছে যে জীবও মনুষ্য যোনিতে আসিয়া নিজের স্বাধীন পুরুষকারের বলে উচ্ছৃঙ্খল ভাবে প্রাকৃতিক নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া মার্গচ্যুত হইয়া পতিত হইতে পারে সেই জন্য মহর্ষিগণ জীবের এই মুক্তি-অভিমুখী গতিকে সুরক্ষিত রাখিবার জন্য চতুর্ব্বর্ণ ও চতুরাশ্রমরূপ বাঁধ বাঁধিয়া দিয়াছেন। চিত্রে এই বাঁধ স্পষ্ট করিয়া দেখান হইয়াছে। কোন কোন সমাজের উচ্ছৃঙ্খল নরনারীগণ এই বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিয়া অধোগতি প্রাপ্ত হয়। সতী স্ত্রী, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ এবং সদ্‌গৃহস্থগণ সেই ভগ্ন স্থলের পুনঃসংস্কার কার্য্যে অহর্নিশি নিযুক্ত। পিতৃগণ তাঁহাদের কার্য্যের সুসিদ্ধির জন্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। ঋষিগণ এই বাঁধ বাঁধিয়া দিয়া চিন্ময়ী জীবধারারূপিণী নদীর উভয়তটে বসিয়া ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন আছেন। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মরূপী এই বাঁধের দ্বারা সুরক্ষিত হইলে জীব-নদী ব্রহ্মসমুদ্রে লীন হইয়া নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়। জীবের চিন্ময়ী ধারার এই মুক্তি-অভিমুখী পবিত্র প্রবাহে অবগাহন করিয়া দেবতাগণ কৃতার্থ হইতেছেন। জীব ব্রহ্মসমুদ্রের সমীপবর্ত্তী হইলেই সৌভাগ্য সূর্য্যের উদয় দেখিতে পাইবেন। প্রকৃত পক্ষে পরব্রহ্মে লীন হইয়া মুক্তিলাভ করাই জীবের পরম সৌভাগ্য। শম্ভুগীতা অনুসারে বর্ণিত এ ঔপনিষদিক দৃশ্যের তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মপ্রকৃতি দুইভাগে বিভক্ত। এক জড়া, দ্বিতীয় জীবভূতা। জড়া-প্রকৃতিরূপী পর্ব্বত হইতে চিন্ময়ী ধারারূপী নদী স্বতই প্রবাহিত হইতেছে। ঐ জীবভূতা ধারা

প্রকৃতিমাতার কৃপায় মনুষ্যেতর যোনিতে স্বতই সুরক্ষিত। মনুষ্য যোনিতে ঐ জীবভূতা ধারার সারল্য নষ্ট হইতে পারে। তাই বর্ণাশ্রমের দ্বারা উহা সরল ও সুরক্ষিত করা হইয়াছে। অধিত্যকায় বাঁধ না দিলে যেরূপ জল নানাদিকে বিকীর্ণ হইয়া নদী শুষ্ক হইতে পারে সেইরূপ যে মনুষ্যজাতির মধ্যে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা নাই সে মনুষ্যজাতি অবশ্যই কালপ্রভাবে নষ্ট হইয়া যায়। ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। আর্য্যজাতি ব্যতীত এই সংসার-রঙ্গমঞ্চে গ্রীক, রোমান, মিশ্র আদি কত জাতিই নিজ নিজ অভিনয় প্রদর্শন করিয়া অনন্তকালের জন্য কালসমুদ্রে বিলীন হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? অর্য্যমাদি নিত্যপিতৃগণ একপ্রকার নিত্য পদধারী দেবতা। তাঁহারা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মাবলম্বিদিগেরই সাহায্য করিয়া থাকেন, ইহা শাস্ত্রসিদ্ধ। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের দ্বারা মনুষ্যজাতি সুরক্ষিত হইলে দেবাসুর সংগ্রামে দেবতাগণের সদাই জয় হইবার সম্ভবনা। তাই অন্তর্জ্জগদ্বাসী দেবতাগণ বর্ণাশ্রমধর্ম্মের দ্বারা আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন। বর্ণাশ্রমের দ্বারা আধ্যাত্মিক লক্ষ্য সুরক্ষিত হয় তাই ঋষিগণ নিশ্চিন্ত হইয়া ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন হইয়া আছেন। বর্ণাশ্রম যে সভ্যতা, আধ্যাত্মিক লক্ষ্য এবং দৈবজগতের উন্নতি করিয়া সভ্য মনুষ্য-সমাজকে এই নাশবান সংসারে সুরক্ষিত করে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

শ্রীগোপালচন্দ্র বেদান্তশাস্ত্রী।

সাময়িকী।

মহামণ্ডলসংবাদ—কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীমৎস্বামী দয়ানন্দজী মহারাজ পশ্চিম প্রদেশে ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে নানা স্থান ঘুরিয়া কানপুরে উপনীত হন। এই উপলক্ষে তথায় একটী বিরাট সভার অধিবেশন হয়। সভায় এত অধিক লোক সমাগম হইয়াছিল যে অনেকে সেই বিশাল সভামণ্ডপে স্থান না পাইয়া বাহিরে থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। স্বামীজীর বক্তৃতার সময়ে সভাস্থল সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ ছিল। স্বামীজী তাঁহার বক্তৃতায় স্কুল-কলেজের ছাত্রগণকে সনাতন ধর্ম্মের শিক্ষা দেওয়ার আবশ্যকতা অতি বিশদরূপে বুঝাইয়া দিলেন। ধার্ম্মিক শিক্ষার প্রভাবে ছাত্রগণের চরিত্র সুসংযত হয়, নৈতিক জীবন উন্নত হয় এবং ধর্ম্মভাবে

জীবন যাপন করিবার প্রবৃত্তি বৰ্দ্ধিত হয়। বাল্যকালে ধর্ম্মশিক্ষা না পাইলে মানুষ জীবনে কোন দিকেই উন্নতি লাভ করিতে পারে না এবং স্বীয় জন্মভূমির উন্নতিজনক কোন কার্য্যও সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় না। জন্মভূমির প্রকৃত হিত সাধন এবং স্বকীয় সর্ব্ববিধ উন্নতি লাভের নিমিত্ত প্রত্যেক ব্যক্তির বাল্যকালেই ধার্ম্মিক শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া আবশ্যক। এই উদ্দেশ্যে স্বামীজী বিশেষ ভাবে সনাতন ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার নিমিত্ত কানপুরে একটী আদর্শ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করেন। সভাস্থ সকলেই এই প্রস্তাবের অনুমোদন করেন। এই মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত ধর্ম্মভূষণ রায় শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথজী বাহাদুর সহর্ষে ১ লক্ষ টাকা প্রদান করেন। সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি মাত্রেই শুনিয়া সুখী হইবেন যে সেই স্কুল সেখানে অচিরেই স্থাপিত হইয়াছে। সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী ছাত্রগণ সেখানে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ধার্ম্মিক শিক্ষা এবং শিল্প ও বাণিজ্য সম্বন্ধীয় শিক্ষা পাইতেছে। কিছু দিন পরে স্বামীজী আবার কানপুরে যান এবং একটী সভা আহুত হয়। কানপুরের প্রায় যাবতীয় শিক্ষিত ও ধনী ব্যবসায়ী সভায় উপস্থিত ছিলেন। বিপুল জনতার সম্মুখে স্বামীজী উক্ত সনাতন ধর্ম্ম স্কুলকে এম, এ, ক্লাস পর্য্যন্ত উন্নীত করিয়া তাহাতে বিশেষভাবে ধার্ম্মিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার প্রস্তাব করিলেন। নির্ব্বিরোধে এই প্রস্তাব পরিগৃহীত হইল। অতঃপর এই সনাতন ধর্ম্মকলেজ স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে নানা স্থানে ঘুরিয়া আবশ্যকীয় অর্থ সংগ্রহ করিতে স্বামীজী যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন। অবশেষে তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে। তিনি এই কার্য্যের জন্য ৪ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। গঙ্গার ধারে ১৮০ বিঘা জমি ক্রয় করা হইয়াছে এবং এই ভূমির নিকটবর্ত্তী স্থানে আরও ৮০ বিঘা দান পাওয়া গিয়াছে। গত চৈত্র মাসের শেষভাগে যুক্ত প্রদেশের ছোট লাট সাহেব স্বয়ং আসিয়া এই কলেজের ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এই স্কুল এবং কলেজ শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের প্রস্তাবিত হিন্দু ধার্ম্মিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যে বিশেষ সহায়ক হইবে।

শ্রীগোপালচন্দ্র বেদান্তশাস্ত্রী।

নারীধর্ম্ম।

[স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী।]

বিবাহকাল।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে যদি রজোধর্ম্মের পরেও কিছু দিন পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যধারণ করা উচিত হয় তবে অবিবাহিতা অবস্থাতেই রজোধর্ম্ম হইবার পর দুই তিন বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচারিণী রাখিয়া পরে কন্যার বিবাহ দিতে ক্ষতি কি? ইহার উত্তর এই যে, জাতি ও বংশের পবিত্রতা রক্ষা এবং শুদ্ধ সৃষ্টি বিস্তারের সহিত যাহার যত অধিক সম্বন্ধ আছে সেই বিষয়ে ততই সাবধানতা অবলম্বন করা যুক্তিযুক্ত হওয়ায় মহর্ষিগণ এইরূপ আজ্ঞা দিয়াছেন। যদি পুরুষের ব্যভিচার দোষ ঘটে তবে তাহার কুপরিণামে পুরুষের নিজেরই শরীর, মন ও আত্মা কলঙ্কিত হয়। কিন্তু স্ত্রীজাতির ব্যভিচার-দোষের প্রভাব নিজ শরীর, কুল, সমাজ এবং সমস্ত জাতির উপর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া থাকে। যদি কোন উচ্চবংশীয়া স্ত্রী ব্যভিচারের দ্বারা কোন নীচবংশীয় পুরুষের শুক্র নিজের গর্ভে আনে অথবা এইরূপে আর্য্যনারীর গর্ভে অনার্য্য বীর্য্য আসিয়া পড়ে তাহা হইলে সমস্ত কুল, সমাজ ও জাতি নষ্ট হইয়া থাকে। এজন্য পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর রক্ষার অধিক প্রয়োজন। রজস্বলাবস্থায় প্রকৃতির স্বাভাবিক প্রেরণা হওয়ায় এ সময়ে স্ত্রীজাতির পক্ষে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। এঅবস্থায় ব্রহ্মচর্য্যের রক্ষা হয় ত ভালই, কিন্তু রক্ষা হওয়া অপেক্ষা না হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক। শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

যততোহ্যপি কৌন্তেয়! পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥

প্রমত্ত ইন্দ্রিয়গণ বিচারবান্, ইন্দ্রিয়নিগ্রহে যত্নশীল বিদ্বান্ পুরুষেরও বলপূর্ব্বক মনোহরণ করিয়া থাকে। যখন সাধারণ অবস্থাতে বিচারবান্ পুরুষের পক্ষেও ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করা কঠিন, তখন সৃষ্টি বিস্তারার্থ প্রাকৃতিক প্রেরণা-যুক্ত অসাধারণ রজস্বলাবস্থায় ইন্দ্রিয় সংযম করা স্ত্রীজাতির পক্ষে যে অতীব

দুষ্কর এবং প্রায় অসম্ভব তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। উহাতে চাঞ্চল্য, পুংশ্চলীবৃত্তি, নানা পুরুষে চিত্তের আসক্তি এবং ব্যভিচার দোষের খুবই সম্ভাবনা থাকে। এবং ইহা হইতেই সংসারে ঘোর অনর্থ, পাপাচার, বর্ণ সঙ্করতা এবং অনার্য্য প্রজা উৎপন্ন হইয়া আর্য্যজাতিকে রসাতলে পাঠাইতে পারে। এই সকল নৈসর্গিক বাধা প্রযুক্ত অনর্থোৎপত্তির সম্ভাবনা সমূহকে দূর হইতেই পরিহার করিবার জন্য দূরদর্শী মহর্ষিগণ রজোধর্ম্মের পূর্ব্বেই বিবাহের আজ্ঞাপ্রদান করিয়া তদনন্তর কিছুদিন পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য ধারণের উপকারিতার বর্ণন করিয়াছেন। ইহাতে এই সুফল হইবে যে, যদি পতি ধার্ম্মিক ও বিচারবান হয় তবে বিবাহের পর কিছুদিন পর্য্যন্ত সাধারণ প্রেমপূর্ণ ব্যবহারের দ্বারা স্ত্রীর ব্রহ্মচর্য্যধারণ বিষয়ে সহায়তা করিতে পারিবে, আর যদি ব্রহ্মচর্য্যধারণ করা অসম্ভবই হইয়া উঠে তাহাহইলে নিজপতি বিদ্যমান থাকায় অন্য পুরুষে মন যাইবে না। এজন্য স্ত্রীজাতির পক্ষে বিবাহের পূর্ব্বে ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করা অপেক্ষা বিবাহানন্তরই ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করা শ্রেয়স্কর। ইহা ব্যতীত আর একটি বিবেচ্য বিষয় এই যে নিজপতি ভিন্ন অন্য সব পুরুষকে পুরুষই মনে না করা রূপ যে আদর্শ সতীর ধর্ম্ম আর্য্যশাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে, রজো-ধর্ম্মের পরে বিবাহ হইলে স্ত্রী কদাপি এই সতীধর্ম্মের পরিপালন করিতে পারিবেন না। কারণ রজস্বলা হইবার পরই নৈসর্গিকরূপে স্ত্রী পুরুষদর্শনের ইচ্ছা করিবে। সেই সময় যদি নিজপতিরূপ দুর্গের দ্বারা তাহার অন্তঃকরণকে সুরক্ষিত না করা হয় তাহাহইলে নিশ্চয়ই তাহার অন্তঃকরণের উপর অনেক পুরুষের ছায়া পড়িবে এবং এরূপ স্ত্রীর পক্ষে আদর্শ সতীধর্ম্ম পালন করা অসম্ভব হইয়া উঠিবে। এই সকল কারণেই আর্য্যশাস্ত্রে মহর্ষিগণ সর্ব্বত্রই একবাক্যে রজোধর্ম্মের পূর্ব্বে পরিণয় বিধানের আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন।

এক্ষণে বাল্যাবস্থায় বিবাহ দিলে স্ত্রী ও পুরুষের কি হানি বা লাভ হয় তদ্বিষয়ে বিচার করা যাইতেছে। বিবাহ সংস্কারের প্রয়োজন বর্ণন প্রসঙ্গে ইতিপূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে আর্য্যশাস্ত্রের সিদ্ধান্তানুসারে সকল কার্য্যই আধ্যাত্মিক লক্ষ্য রাখিয়া করা হয়। এজন্য বিবাহ-বিজ্ঞানের মধ্যেও দম্পতির আধ্যাত্মিক পূর্ণতা অর্থাৎ মুক্তিপদ প্রাপ্তির গভীর তত্ত্ব নিহিত আছে। স্ত্রীর মুক্তি পাতিব্রত্যের পূর্ণানুষ্ঠানের

বাল্য বিবাহের দোষ গুণ দর্শন।

শুভ পরিণামে পতিদেবতায় আত্যন্তিক তন্ময়তা দ্বারা লব্ধ হইয়া থাকে এবং পুরুষের মুক্তি প্রকৃতির লীলা-বিলাস দর্শন করতঃ উহা হইতে পৃথক হইয়া নিজের জ্ঞানময় স্বরূপে পরমপ্রতিষ্ঠার দ্বারা লব্ধ হইয়া থাকে। বিবাহ সংস্কারের দ্বারা এই দুই লক্ষ্যই সিদ্ধ হয় বলিয়া বিবাহ সংস্কার পবিত্র। কিন্তু এই পবিত্রতা এবং লক্ষ্যসিদ্ধি বয়ঃক্রম বিচার পূর্ব্বক বিবাহ না দিলে কিছুতেই সম্পাদিত হইতে পারে না। যখন নিজের সত্তাকে পতিতে লয় করিয়াই স্ত্রীজাতি নিজযোনি হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে তখন ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে বেশি বয়সে কন্যার বিবাহ দিলে এরূপ তন্ময়তা-সিদ্ধি কদাপি হইতে পারিবে না। মায়াময় সংসারে সমস্ত মায়িক সম্বন্ধ অভ্যাসের দ্বারাই বদ্ধমূল হইয়া থাকে। সতীর চিত্তে পতিপ্রেম, রস এবং উত্তাপের সংযোগে কমল-বিকাশের মত রূপাসক্তি গুণাসক্তি প্রভৃতি দ্বারা ক্রমশঃ বিকাশ লাভ করে। এইরূপ বিকাশের সম্ভাবনা বালিকাবস্থার প্রেমে যতটুকু আছে, যুবতী অবস্থার কামমূলক প্রেমে ততটুকু নাই বা হইতেও পারে না। 'ভাল দেখিব' এরূপ মনে করিলেই ভাল দেখা যায়। সংসারে মহামায়ার লীলাই এই প্রকার। নব দম্পতিকে পরস্পর প্রেমসূত্রে আবদ্ধ করিবার জন্য পিতামাতা পুত্রের নিকটে বধূর প্রশংসা করিবেন এবং শ্বশুর শ্বশ্রী কন্যার নিকটে জামাতার প্রশংসা করিবেন। এইরূপে দম্পতির অন্তঃকরণে পরস্পরের প্রতি অনুরাগ উৎপন্ন হইবে। বধূ নিজের জীবনকে পতিদেবতার পবিত্র পূজার সোপকরণ নৈবেদ্যরূপে তাঁহাতে সমর্পণ করিবার শিক্ষালাভ করিবেন। অনুরাগ কল্পতরুর মত শাখা পল্লবে সুশোভিত হইয়া শান্তিরূপী অমৃতফল প্রসব করিবে। এইরূপে দাম্পত্যপ্রেমের বিকাশ বাল্যবিবাহের দ্বারা সেরূপভাবে হইতে পারে, যুবাবস্থার বিবাহে সেরূপ কদাচ হইতে পারে না। কারণ যুবাবস্থায় কলুষিত কামভাবের অধিক বিকাশ হইয়া পড়ায় পবিত্র সাত্ত্বিক প্রেমের ভাব চিত্ত হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায়। সে সময়ে চিত্তের কোমলতা নষ্ট হইয়া যায়, অভ্যাস পূর্ব্ব হইতেই পরিপক্ক হইয়া যায়, প্রকৃতি নানা পুরুষের ভাবে ভাবিত হওয়ায় এক পুরুষে আর সহজে স্থিরতা অবলম্বন করিতে পারে না, পিতার গৃহে স্বতন্ত্রতা এবং লজ্জাহীনতার সম্ভাবনা অধিক থাকায় বেশি বয়সে পতিগৃহে আসিয়া পরতন্ত্রতা এবং লজ্জাশীলতা আদৌ ভাল লাগে না ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কারণে অধিক বয়সের বিবাহে পাতিব্রত্য

ধর্ম্মের অবশ্যই হানি হইয়া থাকে এবং ইহারই অশুভ পরিণামে গৃহস্থাশ্রমে সর্ব্বদা অশান্তি, দম্পতিকলহ, অনাচার আদি দুর্দৈব উৎপন্ন হয় এবং স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই আধ্যাত্মিক অবনতি হইয়া বিবাহের পবিত্র লক্ষ্যই পণ্ড হইয়া যায়। এই সকল কারণেই জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্ন মহর্ষিগণ স্ত্রীজাতির পক্ষে বাল্যবিবাহেরই পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। আমরা প্রত্যক্ষই দেখিয়া থাকি যে, যে সকল জাতির মধ্যে অধিক বয়সে কন্যার বিবাহের রীতি প্রচলিত, বিবাহোচ্ছেদের (divorce) নিয়মও সেই সকল জাতির মধ্যেই আছে। যদি অধিক বয়সের বিবাহে শান্তি থাকিত তাহা হইলে ওরূপ নিয়ম কদাপি ঐ সকল দেশে প্রচলিত হইত না। অতএব সকল দিক বিচার করিয়া দেখিলে আর্য্যমহর্ষিগণের প্রদর্শিত পন্থাই কল্যাণদায়ক ও নিরাপদ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু স্ত্রীজাতির মত পুরুষদিগের বিবাহ অল্পবয়সে হওয়া কদাপি উচিত নহে। স্ত্রীপুরুষের ধর্ম্মবৈচিত্র্যই এরূপ বয়োবিভিন্নতার কারণ। পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে যে পুরুষের মুক্তি প্রকৃতিতে লয় হইয়া হইতে পারে না, কিন্তু প্রকৃতির লীলা বিলাস দর্শন করত উহা হইতে পৃথক্ হইয়াই হইতে পারে। পুরুষ মায়াজাল হইতে পৃথক্ হইয়া যোগের দ্বারা নিজের ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি করত মুক্ত হইয়া থাকে। এইজন্যই মহর্ষিগণ পুরুষের জন্য চার আশ্রমের বিধান করিয়াছেন। পুরুষ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে গুরুগৃহে থাকিয়া এই শিক্ষালাভ করে যে, কিপ্রকারে গৃহস্থাশ্রমে ধর্ম্মানুকুল প্রবৃত্তির অনুষ্ঠান হইতে পারে। তাহার পর গৃহস্থাশ্রমে এই ধর্ম্মানুকুল প্রবৃত্তির চরিতার্থতা দ্বারা নিবৃত্তির পথ নিষ্কণ্টক হইয়া থাকে। এজন্য গৃহস্থাশ্রমের পরেই নিবৃত্তি ধর্ম্মের অভ্যাসমূলক বানপ্রস্থাশ্রমের অধিকার পুরুষ প্রাপ্ত হয়। তাহার পর সন্ন্যাসাশ্রমে নিবৃত্তির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলে পুরুষ ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান লাভ করিতে পারে। এই ভাবে আত্মার ক্রমোন্নতি সাধনের জন্য চার আশ্রম ক্রমশঃ বিহিত হইয়াছে। অতএব পুরুষের পক্ষে বিবাহের বয়ঃক্রম নির্দ্দেশ তখনই হওয়া উচিত যখন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে বা দেশকালানুসার অন্যভাবে পুরুষ এতটুকু শিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ হয় যাহার দ্বারা প্রকৃতির দাস না হইয়া ধর্ম্মানুকুল প্রবৃত্তির আশ্রয়ে প্রকৃতির লীলা দর্শন করত উহা হইতে তাহার ক্রমমুক্তির সম্ভাবনা হইতে পারে। ইহা অবশ্যই সংযম ও জ্ঞান সাপেক্ষ। অতএব ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে বীর্য্যস্তম্ভন, সংযম এবং যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করিবার পর মহর্ষি মনু

কথিত চতুর্ব্বিংশতি বা ত্রিংশৎ বর্ষ বয়ঃক্রমকালেই পুরুষের বিবাহ হওয়া উচিত। পুরুষের পক্ষে বাল্যবিবাহ বড়ই অনিষ্টকর। উহাতে পুরুষ স্ত্রীর বশীভূত হইয়া বন্ধনকারক স্ত্রৈণভাব ত প্রাপ্ত হইবেই, তাহা ছাড়া যথেষ্ট সংযম ও বীর্য্য স্তম্ভনের পূর্ব্বেই বীর্য্যনাশের ফলে সে অবশ্যই নির্বীর্য্যতা, শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা এবং নানাপ্রকার কঠিন রোগে আক্রান্ত হইবে। ধাতুদৌর্ব্বল্য, বীর্য্যতারল্য, স্নায়বিক তেজোহীনতা, ক্ষয়রোগ, পক্ষাঘাত, অজীর্ণতা, উন্মাদ আদি সকল ব্যাধিই বাল্যবিবাহের ফলে পুরুষ প্রাপ্ত হইতে পারে। এরূপ পুরুষের সন্তান-সন্ততিও অল্পায়ু, রুগ্ন এবং বলহীন হইয়া থাকে। বীর্য্যের শক্তি কম হওয়ায় পুত্র না হইয়া এরূপ লোকের প্রায় কন্যাই হইয়া থাকে এবং নপুংসকতা আদি দোষও কিছুদিন পরে ইহাদের মধ্যেই দেখা যায়। মন, বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি নষ্ট হওয়ায় এরূপ নির্বীর্য্য ব্যক্তি সাংসারিক জীবনে কোনরূপ উন্নতি করিতে পারে না। গভীর পঙ্কনিমগ্ন বৃদ্ধহস্তীর মত নিস্তেজমনা, শক্তিহীন, কান্তিহীন, তেজোহীন, বুদ্ধিহীন এরূপ হতভাগ্য ব্যক্তি স্ত্রীর দাস হইয়া বিষয় পঙ্কেই সমস্ত জীবন অতিবাহিত করে। ত্যাগ, সংযম, বৈরাগ্য, আত্মানুরাগ, জ্ঞানস্পৃহা, আদি সদ্‌বৃত্তির বিকাশ এরূপ পুরুষের মধ্যে কদাপি হইতে পারে না। নিবৃত্তিমূলক বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাসাশ্রমে যোগ্যতা এরূপ দুর্ব্বলমনা ব্যক্তির ত কখনও হইতেই পারে না, তাহা ছাড়া সংসারশ্রমও তাহার পক্ষে নিদারুণ দুঃখকর হইয়া থাকে। সে ইচ্ছা থাকিলেও সংযমের অভাবে ভোগ্যবস্তুকে যথেষ্ট ভোগ করিতে পারে না। জীব কত তপস্যার ফলে মুক্তির সেতু স্বরূপ মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হয়, কিন্তু এরূপ হতভাগ্য ব্যক্তি দুর্লভ মনুষ্যজন্ম পাইয়াও বৃথা পশুর মত নিজের জীবনকে অতিবাহিত করে। সে জীবন্মুক্ত না হইয়া জীবন্মৃতই হইয়া থাকে। এই সকল কারণে পুরুষের পক্ষে বাল্য বিবাহ কদাচ উচিত নহে। আজকাল ভারতবর্ষের অনেক স্থানে বাল্যবিবাহের ত কথাই নাই, অধিকন্তু এরূপ কুরীতি প্রচলিত হইয়াছে যে বর অপেক্ষা কন্যার বয়সই অধিক হইয়া থাকে। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর মধ্যে ভোগশক্তি অধিক থাকায় এবং ভোগের দ্বারা স্ত্রীর অপেক্ষা পুরুষের অধিক হানি হওয়ায় মহর্ষিগণ বিবাহ বিষয়ে পুরুষের বয়ঃক্রম অধিক হওয়া উচিত এইরূপ আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। এ কারণ পুরুষ অপেক্ষা অধিক বয়স্কা স্ত্রী পতির প্রাণ-ঘাতিনী হইয়া থাকে।

অতএব এরূপ অবিচার পূর্ব্বক বিবাহ কদাপি হওয়া কর্ত্তব্য নহে। এজন্যই মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য লিখিয়াছেন "অনন্য-পূর্ব্বিকাং যবীয়সীম্।" অর্থাৎ যাহার পূর্ব্বে বিবাহ হয় নাই এবং বর অপেক্ষা বয়স কম এরূপ কন্যার সহিতই পরিণয় হওয়া উচিত। মহর্ষি মনুর প্রমাণে পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে যে কন্যা অপেক্ষা বরের বযস আড়াই গুণ অথবা তিনগুণ অধিক হওয়া উচিত। স্মৃতিশাস্ত্রে সাধারণতঃ এই আজ্ঞাই পাওয়া যায় যথা—

"বর্ষৈরেকগুণাং ভার্য্যামুদ্বহেত্রিগুণঃ স্বয়ম্।"

বরের বয়স কন্যার তিন গুণ অধিক হওয়া উচিত। অপারগপক্ষে মনু আরও বলিয়াছেন যে—"ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ" অর্থাৎ ধর্ম্মহানির আশঙ্কা হইলে আরও শীঘ্র হইতে পারে। কিন্তু যত শীঘ্রই হউক না কেন সুশ্রুতের সিদ্ধান্তানুসারে ষোড়শ ও পঞ্চবিংশতির অনুপাত অবশ্যই থাকা উচিত, যাহাতে গর্ভাধানের ব্যতিক্রম ঘটিয়া অধার্ম্মিক ও নিস্তেজ, রুগ্নকায় সন্তান-সন্ততি উৎপন্ন না হইতে পারে। এইরূপে মহর্ষিগণের বিচার ও দূরদর্শিতার সহায়তা গ্রহণ করত শ্রুতিস্মৃতি প্রমাণ পরিপুষ্ট বিবাহ বিধির অনুবর্ত্তন করিলে গৃহস্থাশ্রম পরমসুখনিদান এবং নিঃশ্রেয়স লাভের সহায়ক হইবে ইহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

——:•:

গৃহিণী কাল।

বিবাহের পরেই নারীজীবনের দ্বিতীয় অর্থাৎ গৃহিণী অবস্থা আরম্ভ হয়। কন্যাবস্থায় তন্ময়তামূলক পরম পবিত্র যে পাতিব্রত্য ধর্ম্মের শিক্ষালাভ হইয়াছিল, গৃহিণী জীবনে তাহারই চরিতার্থতা হইয়া থাকে। শ্রীভগবচ্চরণ কমলে ভৃঙ্গায়মান মুমুক্ষু ভক্তের মত পতিদেবতার পবিত্র চরণ-কমলে শরীর, মন, প্রাণ সমর্পণ করত তাঁহাতেই তন্ময় হইয়া সতী স্ত্রী নিজ যোনি হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। বেদ মধুর নিনাদে—

অনবদ্যা পতিজুষ্টেব নারী।
পতিরিব জায়ামভিনোন্যেতু।
পতিদেবা ভব।

ইত্যাদি উপদেশের দ্বারা সতীধর্ম্মেরই মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। স্মৃতি

শাস্ত্রেও পাতিব্রত্য ধর্ম্মের ভূরি ভূরি প্রশংসা-বর্ণন দেখিতে পাওয়া যায়। স্কন্দপুরাণে লেখা আছে—

তপনস্তপ্যতেঽত্যন্তং দহনোঽপি চ দহ্যতে।
কম্পন্তে সর্ব্বতেজাংসি দৃষ্ট্বা পাতিব্রতং মহঃ॥
যাবৎ স্বলোমসংখ্যাস্তি তাবৎ কোটিযুগানি চ।
ভর্ত্রা স্বর্গসুখং ভুঙ্‌ক্তে রমমাণা পতিব্রতা॥
ধন্যা সা জননী লোকে ধন্যোঽসৌ জনকঃ পুনঃ।
ধন্যঃ স চ পতিঃ শ্রীমান্ যেষাং গেহে পতিব্রতা॥
পিতৃবংশ্যা মাতৃবংশ্যাঃ পতিবংশ্যাস্ত্রয়ঃ স্ত্রিয়ঃ।
পতিব্রতায়াঃ পুণ্যেন স্বর্গসৌখ্যানি ভুঞ্জতে॥

সতীর তেজেই তপন তাপদান করেন, অগ্নি দাহণ ক্রিয়া সম্পাদন করেন এবং সংসারে যাবতীয় তেজের বিকাশ হইয়া থাকে। পতিব্রতা সতী নিজ তপোবলে বহুকাল পর্য্যন্ত সতীলোকে নিজ পতির সহিত দিব্যসুখলাভ করিয়া থাকেন। যে গৃহে সতী বিরাজমান, তথায় মাতা, পিতা, পতি সকলেই ধন্য হইয়া থাকেন। পতিব্রতার পুণ্যে পিতৃকুল, মাতৃকুল, শ্বশুরকুল তিনই স্বর্গসুখলাভ করিয়া থাকে। এইরূপে আর্য্যশাস্ত্রে সতীর মহিমা নানাভাবে উদ্‌ঘোষিত হইয়াছে।

সতীত্ব কল্পতরু।

ভারতীয় মনীষিগণ অতি গভীর বিচারের দ্বারা সতীত্বকে কল্পতরুরূপে বর্ণন করিয়াছেন। এবং এই কল্পতরুর মূল কোথায়, কাণ্ড কোথায় এবং শাখা প্রশাখাই বা কি এ সকল বিষয়ের অতি মনোহর সারগর্ভিত সিদ্ধান্ত নির্ণয় করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে সতীত্ব-রূপী কল্পতরুর মূল—"পতির অনিষ্টাশঙ্কা"। "আমি কি উপায়ে উঁহার পূর্ব্বেই ইহ সংসার ত্যাগ করিতে সমর্থ হইব, আমাকে কি উঁহার পরেও দুঃখময় সংসারে নিবাস করিতে হইবে" ইত্যাদিরূপ আশঙ্কা সতীর চিত্তে সর্ব্বদাই থাকে। এই আশঙ্কাই সতীত্ব কল্পতরুর মূলস্বরূপ। শাস্ত্রে লেখা আছে—

"স্নেহঃ সদা পাপমাশঙ্কতে।"

যেখানে স্নেহানুবন্ধ আছে তথায় স্নেহাস্পদের অনিষ্টাশঙ্কা হওয়া স্বাভাবিক। "পতি প্রসন্ন থাকিবেন, আনন্দে থাকিবেন, নীরোগ ও দীর্ঘায়ুঃ হইবেন," এরূপ বিশ্বাস সতীর চিত্তকে প্রফুল্লিত রাখে। "তাঁহার কোনরূপ

অপ্রসন্নতা বা কষ্ট হইল না ত" এরূপ চিন্তা সতীর চিত্তে সদাই জাগরূক থাকে। পতি চিন্তা ভিন্ন আর কোন চিন্তাই সতীর হৃদয়ে স্থানলাভ করিতে পারে না। সতীধর্ম্মের মূলে এইরূপ একটি প্রগাঢ় চিন্তা থাকে। এবং ইহা হইতেই সতীত্বের সহিত একপ্রকার প্রগাঢ় গাম্ভীর্য্যের মধুর মিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। সতীর আনন্দে তরলতা থাকে না, উল্লাসে লঘুতা প্রকট হয় না, তাঁহার আনন্দে দিব্য-লোকসুলভ মাধুর্য্য ও গাম্ভীর্য্যের মণিকাঞ্চন যোগ থাকে। অতএব এরূপ অলৌকিক গাম্ভীর্য্যও সতীধর্ম্মের অন্যতম লক্ষণ। সতীত্বরূপী কল্পতরুর উপর-বর্ণিত মূল হইতে একটি অপূর্ব্ব কাণ্ড নির্গত হইয়া থাকে। উহার নাম "পতিদর্শন লালসা"। "তিনি যেরূপ আনন্দ ও আরামে ছিলেন, সেইরূপই আছেন ত, অথবা তাঁহার কোনরূপ কষ্ট হইতেছে?" এইপ্রকার আশঙ্কা হইতেই পতিদর্শন লালসারূপ কাণ্ডের উৎপত্তি হয়। পতি দূরে থাকিলে, এমন কি চক্ষের পলকের বাহিরে থাকিলে সতীর যেন সমস্ত জগৎ অন্ধকারময় বোধ হয়। সতীধর্ম্ম যথার্থই নিষ্কাম ধর্ম্ম। কারণ মুক্তি কামনা কামনাপদবাচ্য নহে। যে কামনায় কামনার বৃদ্ধি হয় তাহাকেই কামনা বলে। যে কামনায় সকল কামনার লয় হইয়া যায় তাহাকে কামনা বলে না। সতীর চিত্তে পতিদেবতার চরণকমলে বিলীন হইয়া কেবলমাত্র মুক্তিলাভের কামনাই বিদ্যমান থাকে। এই পবিত্র কামনায় নিখিল বৈষয়িক কামনার পরিসমাপ্তি হয় বলিয়া সতীধর্ম্ম বাস্তবিকই নিষ্কাম ধর্ম্ম ইহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। সতী পতিদেবতার সুখের জন্যই জীবনধারণ করিয়া থাকেন, নিজের সুখের জন্য নহে। ইহাই নিষ্কাম ধর্ম্মের সারতত্ত্ব। সতীত্বরূপী কল্পবৃক্ষের মূল সকল বৃক্ষের মূলের ন্যায় সতীর হৃদয়ভূমিতে প্রচ্ছন্ন থাকে। ঐ মূলে একটু আঘাত লাগিলেই সমস্ত বৃক্ষ থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠে: কিন্তু প্রচ্ছন্ন থাকায় উহাকে সাধারণতঃ কেহই দেখিতে পায় না। এমন কি বিশেষ সূক্ষ্মদর্শী এবং অনুসন্ধিৎসু না হইলে স্বয়ং পতিও ঐ মূলটি দেখিতে পান না। তিনি কেবল পতিদর্শনলালসারূপী কাণ্ডটিই দেখিয়া থাকেন। এবং ইহাও সত্য যে ঐ কাণ্ডের যথার্থ স্বরূপ ও নিদান কেবল পতির চক্ষেই প্রতিভাত হইয়া থাকে। সাধারণ লোকে উহার যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় না। সতীত্বরূপী কল্পতরুর বহু শাখা প্রশাখা আছে। যথা—পতির মানহানির ভয়, অর্থহানির ভয়, যশোহানির ভয় ইত্যাদি।

আর্য্যজাতি।

[স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী]

আদি নিবাস নির্ণয়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অমুষ্য যজ্ঞদত্তস্য পৌত্রং চানমিত্রায় শক্ররাহিত্যার্থং সুবধ্বং অনুজানীধ্বং কিঞ্চ মহতে ক্ষত্রায়ানুত্তম-ক্ষত্রিয়কুলায় মহতে আধিপত্যায় অপ্রতিহতনিয়মন-সামর্থ্যায় মহতে জানরাজ্যায় জনসম্বন্ধি যদ্রাজ্যং তচ্চ সাগরপর্য্যন্ত-ভূমিবিষয়ত্বান্মহৎ—তস্মৈ সার্ব্বভৌমত্বায় সুবতাং অভ্যনুজানীতাম্। হে ভরতা রাজন্যবৈশ্যাদয়ো ধনিকা এষ যজমানো যুষ্মাকং রাজা, এনং স্বামিনং যথোচিতং সেবধ্বমিত্যভিপ্রায়ঃ। সোম উত্তমো দেবোঽস্মাকং ব্রাহ্মণানাং রাজা ন ত্বধমঃ ইতি।

রাজসূয় যজ্ঞের অঙ্গীভূত অভিষেচনীয় যজ্ঞের ঋত্বিক্, আর্য্য ক্ষত্রিয়েরা ভারতখণ্ডে জন্মপরিগ্রহ করিয়া, সমস্ত ভূমণ্ডলে নিজাধিপত্য বিস্তার করিবার জন্য, অগ্ন্যাদি দেবতাদিগের নিকট বিনীতভাবে অনুজ্ঞাভিক্ষা করিতেছেন। এই বেদবাক্য দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আর্য্যগণ ভারতখণ্ডেই জন্মগ্রহণ করিয়া, শক্তিবলে সমস্ত পৃথিবীর সম্রাট হইয়া, পৃথিবী শাসন করিয়াছিলেন। মার্কণ্ডেয়াদি পুরাণেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়,—

সুরথো নাম রাজাঽভূৎ সমস্তে ক্ষিতিমণ্ডলে।

রাজা সুরথ নামে সমগ্র ক্ষিতিমণ্ডলের একজন অধীশ্বর ছিলেন। কেবল সুরথ রাজা বলিয়া নহে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রাজন্যগণ ঐরূপ সমগ্র পৃথিবীর শাসন-কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের জন্মভূমি যে একমাত্র ভারতবর্ষ, তাহাতে কোনরূপ সন্দেহ নাই। অতএব বেদাদি শাস্ত্রীয় বহু প্রমাণ এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তিমূলক বিচারের দ্বারা স্থির হইল যে, আর্য্যজাতি ভিন্নদেশ হইতে সমাগত নহে; ঐরূপ সিদ্ধান্ত কেবল নবীন ঐতিহাসিক মহোদয়গণের কপোল-কল্পনামাত্র।

আধুনিক ঐতিহাসিকগণ স্বপক্ষে যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন এক্ষণে তৎসম্বন্ধে বিচার করা যাইতেছে। তাহাদের প্রথম কথা, ঋগ্বেদে মধ্য এশিয়ার তদানীন্তন অনেক নদ, নদী, নগর ও গ্রামের নাম পাওয়া যায়, তথাকার লোক বেদ-বর্ণিত আর্য্যগণের ন্যায় শ্বেতবর্ণ এবং সেখানকার প্রাচীন দেবদেবীগণের নামের সহিত আর্য্যশাস্ত্রোক্ত দেবদেবীগণের নামের সাদৃশ্য দেখা যায় সুতরাং প্রাচীন কালে আর্য্যজাতি মধ্য এশিয়ার কাস্পিয়ান হ্রদের সমীপবর্ত্তী কোন স্থানে থাকিতেন তথা হইতে পরে এদেশে আসিয়াছেন। সাধারণ বিচারেই প্রতিপন্ন হইবে যে এইরূপ সিদ্ধান্ত নিতান্তই সারহীন এবং অকিঞ্চিৎকর। যদি বেদে মধ্য এশিয়ার নদ নদীর নাম দেখিয়া আর্য্যজাতির নিবাস-স্থান মধ্য এসিয়া নিরূপণ করিতে হয় তবে ঐ বেদেই গঙ্গা, যমুনা সরস্বতী, শতদ্রু, বিতস্তা প্রভৃতি নদ নদীর নাম দেখিয়া তাঁহাদের নিবাস-স্থান ভারতবর্ষ কেন নিরূপিত হইবে না? পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে যে গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি নদীর নাম বেদে পাওয়া যায়। অতএব কেবল নাম দেখিয়া আর্য্যজাতির আদিনিবাস-স্থান কল্পনা করা নিতান্তই অযৌক্তিক। সামান্য দৃষ্টান্তেই বুঝা যায় যে যদি ইংরেজদিগের কোন প্রাচীন ইতিহাস বা ভূগোলে কামস্কাট্কার কোন সহরের নাম পাওয়া যায় তাহা হইলে কি এই সিদ্ধান্ত হইবে যে ইংরেজদিগের পূর্ব্বপুরুষ কামস্কাট্কায় বাস করিতেন? এরূপ যুক্তি নিতান্তই হাস্যজনক। পক্ষান্তরে এইরূপ সিদ্ধান্তই যুক্তি-যুক্ত হইবে যে ইংরেজদের পূর্ব্বপুরুষ কামস্কাট্কায় যাইয়া নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন তাই তাহাদের গ্রন্থে সে দেশের নাম পাওয়া যায়। এই দৃষ্টান্ত অনুসারে, বেদে অন্য দেশের নাম দেখিয়া তদ্দেশ-নিবাসী আর্য্যগণ এদেশে আসিয়াছেন এরূপ সিদ্ধান্ত না করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্তই সমীচীন হইবে যে ভারতবর্ষেই উৎপন্ন হইয়া আর্য্যগণ আপনাদের শৌর্য্যবীর্য্য বলে পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াছিলেন এবং এই উপলক্ষে তাঁহারা পৃথিবীর সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতেন সেই জন্যই তাঁহাদের গ্রন্থে পূর্ব্বোক্ত নাম দেখিতে পাওয়া যায়। আর্য্যজাতির অন্য কোন গ্রন্থে অন্য দেশের নাম দেখিয়া ঐরূপ সিদ্ধান্ত করা সমীচীন হইলেও বেদে মধ্য এশিয়া বা অন্য কোন দেশের নদ নদীর নাম দেখিয়া ওরূপ সিদ্ধান্ত কখনই করা উচিত নহে। কারণ বেদ যদি কাহারও রচিত গ্রন্থ হইত তবে আর্য্যজাতির অন্য দেশে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ

সকল দেশের নাম কিম্বা তত্রত্য নদ নদীর নাম বেদে সন্নিবেশিত হইয়াছে এরূপ বলা চলিত। কিন্তু বেদ এইরূপ মনুষ্য-কৃত গ্রন্থ নহে। বেদ ঈশ্বর-কৃত এবং জ্ঞান-স্বরূপ। ঋষিগণ বেদের কর্ত্তা নহেন দ্রষ্টা মাত্র। এই হেতু আর্য্যজাতি অমুক স্থানে গিয়া বাস করিলেন এবং সেখানে যাহা দেখিলেন তাহা বেদে লিখিয়া দিলেন, এরূপ হইতে পারে না। বেদে মধ্য এশিয়াস্থিত নদ নদীর নাম অথবা গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি ভারতবর্ষীয় নদীর নাম থাকিবার কারণ এই যে বেদ জ্ঞানরূপ এবং পূর্ণগ্রন্থ। এই নিমিত্ত জগতের যাবতীয় বৃত্তান্ত এবং দেশদেশান্তরের নাম তাহাতে রহিয়াছে। যখন প্রকৃতির অতীত পরমাত্ম-বিষয়ক অটল সিদ্ধান্ত বেদে করতলামলকবৎ প্রতিপাদন করা হইয়াছে তখন তাহাতে পৃথিবীর সামান্য দেশ, গ্রাম, নগর কিম্বা নদ নদীর নাম থাকায় আর বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? বেদ ত্রিকালদর্শী বলিয়া তাহাতে অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের সকল কথা এবং সমস্ত দেশদেশান্তরের নাম ও ঘটনা যথাযথভাবে লিখিত হইতে পারিয়াছে। এই জন্যই বেদে অন্যান্য দেশের নদ নদীর নাম পাওয়া যায়। মোক্ষমূলর প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষিগণ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে বেদই সমস্ত পৃথিবীর আদি গ্রন্থ এবং এ কথাও সকলে স্বীকার করিয়াছেন যে ভারতবর্ষই বেদের আদি বিকাশস্থান। অতএব সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ বেদ যখন ভরতের আদি গ্রন্থ তখন বৈদিক আর্য্য-জাতির আদি নিবাসস্থান এই ভারতবর্ষই হইবে ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

'আর্য্যগণ শ্বেতাঙ্গ পুরুষ ছিলেন, ভারতবর্ষে শ্বেতাঙ্গ পুরুষ নাই, ককেশিয়ায় আছে, এইজন্য আর্য্যগণ ককেশিয়া হইতে আসিয়াছেন, এইপ্রকার যুক্তি যাহারা প্রদর্শন করেন তাহারা সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া সকল দেশের মনুষ্য দেখেন নাই কিম্বা যথার্থত শ্বেতবর্ণ কাহাকে বলে তাহা তাহারা নিশ্চয়ই জানেন না। আর্য্যশাস্ত্রে ব্রাহ্মণের বর্ণ শ্বেত বলা হইয়াছে। হিমাচল ও বিন্ধ্যগিরি এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম সমুদ্রের মধ্যে যে সকল আর্য্য ব্রাহ্মণ বাস করেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই বর্ণ আজিও অনেকটা শ্বেতই, অন্য বর্ণ নহে। আর যে সকল স্থলে বিশেষ অন্যথা দেখা যায় তথায় কালের প্রকোপে পরম্পরাগত ধর্ম্মের পরিবর্ত্তনের ফলে ঐরূপ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ইহা দ্বারা বৈদিক সিদ্ধান্তে কোনই বিরোধ ঘটে না। আর ককেশিয়া ও পাশ্চাত্য প্রদেশের মনুষ্যের বর্ণ সম্বন্ধে

যাহা বলা হইয়া থাকে তাহা বর্ণ-বিজ্ঞানের অভাবেরই পরিচায়ক। কারণ ভারত ভিন্ন অন্য দেশের লোক যথার্থ শ্বেত বর্ণ নহে তাহাদের রং বিকৃত শ্বেত বর্ণ। তাহাদের বর্ণ দেখিলে সকলেই একথা স্বীকার করিবেন। সুতরাং বর্ণ সম্বন্ধীয় যুক্তিও অকিঞ্চিৎকর।

তৃতীয়তঃ দেবদেবীর নাম এবং ভাষাগত শব্দের ঐক্য দেখিয়া যাহারা মধ্য এশিয়ায় আর্য্যজাতির বাসস্থান নির্দ্দেশ করিতে চান অথবা সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে জার্ম্মাণ ভাষার কোন কোন স্থলে সাদৃশ্য দেখিয়া পোলণ্ড কিম্বা স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায় আর্য্যজাতির আদি বাসস্থান বলিতে চান তাহাদের যুক্তিও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অযথার্থ। কোন জাতি যদি একদেশ হইতে অন্য দেশে যাইয়া আপন অধিকার বিস্তার করে তবে তাহাতে তাহার আপন দেশের গৌরব বা স্মৃতিচিহ্ন লুপ্ত হয় না। বরং এইরূপ অধিকার-বিস্তারের ফলে আপন দেশের গৌরব আরও বৃদ্ধি পায়। আজকাল প্রবল পরাক্রমশালী ইংরেজ জাতি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যাইয়া আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিতেছেন। তাহাতে কি তাঁহাদের গৌরব হ্রাস হইতেছে বলিতে হইবে? বরং ইহাতে ইংলণ্ডের গৌরব দিন দিন বাড়িতেছে। এইরূপ যখন ভারতবর্ষে বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত বিষয়ে আর্য্যজাতির গৌরব সর্ব্ববাদিসম্মত; আর অন্য দেশের প্রাচীন কালের কেবল দুই চারিটী নামের উল্লেখ মাত্র বেদাদি গ্রন্থে পাওয়া যায় তখন এইরূপ সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত হইবে যে আর্য্যগণ অন্য কোন দেশ হইতে আগমন করেন নাই, এই ভারতবর্ষই আর্য্যগণের আদি নিবাসস্থান এবং এই দেশ হইতেই পৃথিবীর অধীশ্বর আর্য্যগণ বিজয় পতকা উড্ডীন করিয়া পৃথিবীর যে যে প্রদেশে গিয়াছিলেন সেই সেই দেশে বিজয় পতাকা নষ্ট হওয়ায় কেবল আর্য্যভাষার কোন কোন শব্দ এবং দেবদেবীর নামের ঐক্য মাত্র রহিয়া গিয়াছে। এই জন্যই আর্য্যজাতির আদি বাসস্থান সম্বন্ধে আজকাল এত সন্দেহ উৎপন্ন হইতেছে। বিদেশে অধিকার-বিস্তার হইলে স্বদেশের গৌরব নিদর্শন বৃদ্ধিই পায়, কমে না। সৃষ্টির আদিকাল হইতে বসুন্ধরার বিশাল বক্ষে বিরাজমান পৃথিবীপতি আর্য্যজাতির সম্বন্ধে এইরূপই হইয়াছে; তাহারই ফলে ভারতে আর্য্যজাতির গৌরব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং অন্য দেশে তাঁহাদের অধিকার-বিস্তারের স্মৃতিচিহ্ন আজও বিদ্যমান রহিয়াছে।

সুতরাং উপর্য্যুক্ত যুক্তি অনুসারে দেখা গেল আধুনিক ঐতিহাসিকগণের কল্পনা নিতান্তই নিঃসার। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ব্যাপ্তি বা গমন অর্থবাচক 'ঋ' ধাতু হইতে আর্য্য শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে বলিয়া যাঁহারা পৃথিবীর সর্ব্বত্র গমন করিয়া আপনাদের অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন তাঁহারাই আর্য্যজাতি. এইরূপ অর্থ নিষ্পন্ন হয়। আর্য্যজাতির প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলেও উপরোক্ত সিদ্ধান্তের সত্যতা উপলব্ধি হয়। শাস্ত্রে লেখা আছে, স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রত পৃথবীকে সপ্তদ্বীপে বিভক্ত করিয়াছিলেন। যথা, জম্বু, প্লক্ষ, পুষ্কর, ক্রৌঞ্চ, শাক, শাল্মলী ও কুশ। আধুনিক এশিয়া, য়ুরোপ প্রভৃতি মহাদেশ এই সপ্তদ্বীপেরই অন্তর্ভুক্ত। রাজা প্রিয়ব্রত আপন পুত্রগণের নিমিত্ত পৃথিবীকে এইরূপ সাত ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। সুতরাং শাস্ত্র অনুসারে প্রমাণিত হইতেছে যে, এই সপ্তদ্বীপই প্রাচীনকালে আর্য্যরাজাগণের অধিকার-ভুক্ত ছিল। প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ ব্রুগস্‌বে সাহেব বলিয়াছেন, অতি প্রাচীন কালে সুয়েজ ক্যানাল পার হইয়া আর্য্যজাতির এক সম্প্রদায় নীল নদীর তীরে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। কর্ণেল অলকট সাহেব বলিয়াছেন, ভারতবর্ষ হইতেই আর্য্যগণ মিশর (*Egypt*) দেশে যাইয়া আপনাদের সভ্যতা ও শিল্পকলার বিস্তার করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্ব্বে পাণ্ডবগণ দিগ্বিজয় করিতে করিতে যে সকল দেশে আপনাদের অধিকার স্থাপন করিয়াছিলেন মহাভারতের সভাপর্ব্বে সেই সকল দেশের বর্ণনা আছে। প্রথম যাত্রায় চীন, তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, পারস্য এবং দ্বিতীয় যাত্রায় আরব ও মিশ্র প্রভৃতি দেশে পাণ্ডবগণ স্বকীয় বিজয় পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন। সগর রাজাও দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া ভারত সমুদ্রস্থিত যাবতীয় দ্বীপে আপন অধিকার স্থাপন করিয়াছিলেন। মহাভারতের আদিপর্ব্বে একথা লেখা আছে। এমন কি উত্তর মেরু প্রদেশেও আর্য্যদের যাতায়াত ছিল। মহাভারতের বনপর্ব্বে পাণ্ডুরাজা কুন্তীর নিকট উত্তর মেরুর স্ত্রীজাতির অবস্থার বিষয় বর্ণন করিয়া বলিয়াছেন যে সে দেশের স্ত্রীলোকেরা নগ্ন থাকে। ঋগ্বেদেও সুদাস এবং ভুজ্যু নামক নরপতিদ্বয়ের দিগ্বিজয়ের বৃত্তান্ত লিখিত আছে। অতএব বেদাদি হিন্দুশাস্ত্র এবং পাশ্চত্য পণ্ডিতগণের মতে ইহাই সিদ্ধান্ত হইল যে, ভারতবর্ষই আর্য্যদিগের আদিম বাসস্থান এবং এখানকার আর্য্যরাজাগণই পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিচরণ ও

রাজ্যস্থাপন করিতেন। যেখানে যেখানে তাঁহাদের অধিকার বিস্তার হইত সেই সেই স্থানেই তাঁহাদের প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে আর্য্যভাষার বহুতর শব্দ সে সকল দেশের ভাষার ভিতরে মিলিত হইয়া যাইত। কারণ জেতা জাতির সহিত বিজিত জাতির এই প্রকার ভাষা ও ভাবের সম্বন্ধ স্বাভাবিক। আজকাল ভারতে ইংরেজ জাতির অধিকার, সেইজন্য এদেশের জাতিগত ভাষা ও ভাবের উপর ইংরেজী ভাষা ও ভাবের যথেষ্ট প্রভাব পড়িয়াছে। এই প্রকার প্রাচীন কালে আর্য্যজাতির ভাষা ও ভাবের যথেষ্ট প্রভাব পৃথিবীর অন্যান্য জাতির উপর ছিল। অধুনা কালচক্রের বিপরীত গতি প্রযুক্ত আর্য্যজাতির সেই প্রভাব নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সেইজন্য সেই সকল দেশে ইঁহাদের অধিকারও বিলুপ্ত হইয়াছে। কেবল স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ কোন কোন স্থলে ভাষা প্রভৃতির সাদৃশ্য পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত আজিও মধ্যএশিয়া, পোলণ্ড প্রভৃতি দেশে আর্য্যভাষার শব্দ, নাম এবং দেবদেবীর সংজ্ঞা প্রভৃতি উপলব্ধ হইতেছে। আর্য্যজাতির প্রাচীন তথ্য বিষয়ে ইহাই সত্য সিদ্ধান্ত, বুদ্ধিমান ব্যক্তি ধীরভাবে বিচার করিলে ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। সংস্কৃত ভাষার সহিত জার্ম্মাণ, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া, পোলণ্ড আদি দেশের ভাষার সাদৃশ্য আরও দুই কারণে হওয়া সম্ভব। যে সময় পৃথিবীর অধীশ্বর আর্য্যরাজাগণ সর্ব্বত্র আপনাদের অধিকার বিস্তার করিয়া বাস করিতেন সেই সময় হইতে তাঁহাদের মধ্যে অনেকে সেই সকল দেশে নিজেদের স্থায়ী বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে যখন আর্য্যজাতির আধিপত্য পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্ত হইতে বিলুপ্ত হইয়া ভারতবর্ষ মাত্রেই পর্য্যবসিত হইল তখন হইতে যাহারা বিদেশের নিবাসী হইয়া গিয়াছিলেন তাহাদের সহিত আর্য্যাদিগের সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। তাহারা সেই সকল দেশে থাকিয়া ক্রমশঃ আর্য্যজাতির আচার-ব্যবহার হইতে চ্যুত হইয়া গেলেন এবং কালক্রমে ভিন্নজাতি রূপে আখ্যাত হইতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাদের ভাষা আর্য্যভাষা ছিল বলিয়া নূতন ভাব ও জীবনের সঙ্গে সঙ্গে উহাতে কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইলেও সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইতে পারে নাই। এই হেতুই ভারতীয় আধুনিক ভাষা ব্যতীত অন্যান্য দেশের ভাষায়ও সংস্কৃত ভাষার সহিত সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই প্রকার ক্রিয়ালোপ হইয়া ভিন্নজাতিতে পরিণত হওয়া সম্বন্ধে মহর্ষি মনু বলিয়াছেন ;—

শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥
পৌণ্ড্রকাশ্চৌণ্ড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদাঃ পহ্লবাশ্চীনাঃ কীরাতা দরদাঃ খশাঃ॥
মুখবাহূরুপজ্জানাং যা লোকে জাতয়ো বহিঃ।
ম্লেচ্ছবাচশ্চার্য্যবাচঃ সর্ব্বে তে দস্যবঃ স্মৃতাঃ॥

ভারতের বাহিরে থাকায় উপনয়নাদি ক্রিয়ার লোপ এবং বেদাধ্যয়নাধ্যাপনার অভাবে নিম্নলিখিত ক্ষত্রিয়েরা ক্রমশঃ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। যথা;— পৌণ্ড্রক, ঔণ্ড্র, দ্রবিড়, কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ ও খশ। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের যে সকল জাতি ভারতের বাহিরে বাস করেন তাহারা আর্য্যভাষাই বলুন আর ম্লেচ্ছভাষাই বলুন তাহারা সকলেই পতিত। এইরূপে বর্ণাশ্রমধর্ম্মোক্ত ক্রিয়ার লোপ হওয়ায় প্রাচীন আর্য্যজাতি হইতে অনেক জাতি উৎপন্ন হইয়াছে এবং পৃথিবীর নানা দেশে তাহাদের বাসস্থান হইয়াছে। মহাভারতে বর্ণিত আছে যে, রাজা যযাতি আপনার কয়েকটী পুত্রকে ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন এবং রাজা সগরও আপন প্রজাগণের মধ্য হইতে অনেককে ভারতবর্ষ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। ঋগ্বেদে লিখিত আছে, সুদাস রাজা রাজ্যের অনেক বিদ্রোহী প্রজাকে রাজ্য হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। এইরূপেও ভারতবর্ষ হইতে আর্য্যগণ আফ্রিকা, য়ুরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি অনেক স্থানে যাইয়া বাস করিয়াছিলেন। কালক্রমে তাহাদের আচার, ব্যবহার ও প্রকৃতি অন্যরূপ হইয়া গেলেও অনেক বিষয়ে এখনও আর্য্যজাতির সহিত ঐক্য রহিয়াছে এবং ভাষার সাদৃশ্যও এই কারণেই দেখা যায়। সংস্কৃত ভাষার সহিত ল্যাটিন, গ্রীক, জার্ম্মাণ প্রভৃতি ভাষার সাদৃশ্যের আর একটি কারণ সংস্কৃত ভাষার মৌলিকতা। সংস্কৃত ভাষা অন্য দেশের ভাষার মত অস্বাভাবিকরূপে উৎপন্ন ভাষা নহে। সংস্কৃত প্রকৃতি-স্পন্দন জনিত প্রাকৃতিক নাদ হইতে উৎপন্ন ভাষা।

প্রলয়ান্তে প্রকৃতির স্পন্দনে যখন সৃষ্টি হইতে আরম্ভ হয় সেই সময়ের প্রথম স্পন্দন জনিত শব্দ ওঁ। এই নিমিত্ত শাস্ত্রে ওঁকারকেই সকল শব্দের মূল বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। অতঃপর ঐ মূল শব্দ হইতে প্রকৃতিবিকারজনিত অনন্ত স্পন্দন দ্বারা অনন্ত শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে। সেই সকল প্রাকৃতিক

শব্দের সমষ্টিই সংস্কৃত ভাষা। অন্যান্য দেশীয় সমস্ত ভাষাই ঐ প্রকৃতির বিকৃতি হইতে উৎপন্ন। ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই এবিষয়ে একমত। বিকৃতি যখন প্রকৃতিমূলক তখন সাক্ষাৎ প্রকৃতি-সম্ভূত সংস্কৃত ভাষা ঐ প্রকৃতির বিকৃতি হইতে উৎপন্ন যাবতীয় ভাষার মূল এবিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। এই নিমিত্তই সমস্ত ভাষার মূলে (Root) সংস্কৃত ভাষা দৃষ্ট হইয়া থাকে। জার্ম্মাণ প্রভৃতি ভাষার সহিত সংস্কৃতের সাদৃশ্যের ইহাই কারণ। আর্য্যজাতির পোলণ্ড প্রভৃতি স্থান হইতে ভারতে আগমন ইহার কারণ নহে। বেদে দীর্ঘকালব্যাপী দিন ও রাত্রি এবং শৈত্যাধিক্যের কথা লিখিত আছে, এই হেতু আর্য্যগণ উত্তর মেরুতে বাস করিতেন, এইরূপ যাহারা বলেন তাহাদের কল্পনাও উপর্য্যুক্ত কারণ সমূহ হইতে কপোল-কল্পনা মাত্র বলিয়া মনে হয়। বেদ পূর্ণ ও ভগবদ্বাক্য, সুতরাং তাহাতে সকল দেশের সকল কথাই থাকিবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি? সুতরাং বেদে এই প্রকার বাক্য দেখিয়াই ঐরূপ কল্পনা করিয়া বসা ঠিক নহে। বেদের ত কথাই নাই, যখন কুন্তীর প্রতি পাণ্ডুরাজার উক্তিতেই প্রমাণিত হয় যে মহাভারতের ন্যায় ইতিহাসেও উত্তর মেরুর বর্ণন রহিয়াছে এবং তদ্দ্বারা আর্য্যগণের উত্তর মেরুতে যাতায়াতও প্রতিপন্ন হইতেছে তখন ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানের অবদ্যোতক বেদে উত্তর মেরুর বর্ণন থাকিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? পারসীক জাতির জেন্দা আভেস্তা গ্রন্থে যে আর্য্যদের স্বর্গ উত্তর মেরু ছিল এইরূপ বর্ণন পাওয়া যায় তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। হিন্দু শাস্ত্রে স্বর্গ অনন্ত সুখের স্থান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যথা,—

> সুসুখঃ পবনঃ স্বর্গে গন্ধশ্চ সুরভিস্তথা।
> যন্ন দুঃখেন সম্ভিন্নং ন চ গ্রস্তমনন্তরম্।
> অভিলাষোপনীতঞ্চ তৎ সুখং স্বপদাস্পদম্।

স্বর্গে সুখময় পবন প্রবাহিত, সেখানে মাত্র সুরভি গন্ধই বিদ্যমান। যে সুখ দুঃখ-সম্পৃক্ত নহে, এবং যাহা অন্তে দুঃখের দ্বারা গ্রস্তও হয় না; ইচ্ছা মাত্রেই যেখানে অভিলষিত বস্তু উপনীত হয় সেইরূপ সুখময় স্থানই স্বর্গপদবাচ্য। কিন্তু যেখানে ছয়মাস পর্য্যন্ত সূর্য্যের মুখ দেখিতে পাওয়া যায় না এবং দারুণ শীতে যেখানে প্রাণ বহির্গত হইবার উপক্রম হয় সেই স্থান যে উপর্য্যুক্ত স্বর্গ-লক্ষণযুক্ত নহে তাহা বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে বুঝাইয়া দিতে হইবে না।

(ক্রমশঃ)

জন্মান্তর-তত্ত্ব।

[স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

জীবের গতি।

তাহার স্থূলশরীর ব্রীহি যব ওষধি প্রভৃতি হইতে উপাদান প্রাপ্ত হইয়া পিতার শুক্রগত হয়। এবং সূক্ষ্মশরীর সেই শুক্রকে অবলম্বন করিয়া কর্ম্মানুসারে যথা-দেশকালে মাতৃগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপে ধূমযানগতি সমাপ্ত হইয়া পুনরায় পৃথিবীতলে নবীন কর্ম্ম লাভ করিবার জন্য জীবের জন্ম হয়। ধূমযানগতি হইতে জীব মৃত্যুলোকে আসিবার সময় পিতৃদেব সাহায্যে স্থূলশরীর প্রাপ্ত হয় এবং দেবতাদের সাহায্যে উহার সূক্ষ্মশরীর মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে। ইহাই ধূমযান-গতির সংক্ষিপ্ত রহস্য।

দেবযান গতি।

দেবযানগতি উত্তরায়ণ পথে হয়। এই গতিতে সর্ব্বোত্তম লোক অতিক্রম করিয়া জীব আরও উন্নত লোকে চলিয়া যায়। তাহার আর পুনরাবৃত্তি হয় না। সপ্তমলোকে গিয়া মুক্তি লাভ হয়। যথা ছান্দোগ্যোপনিষদে—

যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধা তপ ইত্যুপাসতে তেঽর্চ্চিষমভিসম্ভবন্ত্যর্চ্চিষোঽহরহ্ন আপূর্য্যমাণপক্ষমাপূর্য্যমাণপক্ষাদ্যান্ ষড়ুদঙেতি মাসাংস্তান্। মাসেভ্যঃ সংবৎসরং সংবৎসরাদাদিত্যমাদিত্যাচ্চন্দ্রমসং চন্দ্রমসো বিদ্যুতং তৎপুরুষোঽমানবঃ স এনাং ব্রহ্ম গময়ত্যেষ দেবযানঃ পন্থা ইতি।

নিবৃত্তিপরায়ণ যে সকল মুনি অরণ্যে নিবাস করতঃ শ্রদ্ধার সহিত তপ, উপাসনা আদির অনুষ্ঠান করেন তাঁহাদের গতি দেহাবসানে সূর্য্যদ্বার-পন্থা দ্বারা হইয়া থাকে। তাঁহারা অর্চ্চিঅভিমানিনী দেবতার লোক, দিবসাভিমানিনী দেবতার লোক, আপূর্য্যমাণপক্ষ দেবতার লোক, ষণ্মাস দেবতার লোক, সংবৎসর দেবতার লোক আদিত্য দেবতার লোক এবং চন্দ্রমা দেবতার লোক অতিক্রম করিয়া যখন বিদ্যুৎ দেবতার লোকে পৌছান তখন এক অমানব পুরুষ আসিয়া তাঁহাদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। ইহাই দেবযান পন্থা। এই ব্রহ্মলোক বা সপ্তমলোক হইতে উপাসককে আর সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না। তিনি ওখানেই জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করতঃ নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। যাঁহারা সগুণ পঞ্চোপসনার মধ্যে কোন ইষ্টদেবতার আরাধনা করত ইষ্টমূর্ত্তির

সহযোগে সবিকল্প সমাধি লাভ করেন এবং সগুণভাবেই তন্ময় হইয়া শরীর ত্যাগ করেন তাঁহাদেরও তত্তৎ ইষ্টদেবতার লোকে সালোক্য সামীপ্যাদিরূপ মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। এই সকল ইষ্টলোকই ষষ্ঠ লোকের অন্তর্গত। অর্থাৎ শিবলোক, বিষ্ণুলোক, শক্তিলোক সকল লোকই ষষ্ঠ লোকে বিদ্যমান। শিবভক্ত শিব ভাবে তন্ময় হইয়া শিবলোক প্রাপ্ত হন, বিষ্ণুভক্ত বিষ্ণুভাবে তন্ময় হইয়া বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হন এবং দেবীর উপাসক তদ্ভাবে তন্ময় হইয়া শক্তিলোক মণিদ্বীপ প্রাপ্ত হন। এই সকল লোকের চমৎকার বর্ণন বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্‌ভাগবত, দেবী ভাগবত আদি উপাসনাসম্বন্ধীয় পুরাণসমূহে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল লোকে ভক্ত সামীপ্য, সাযুজ্যাদি মুক্তি লাভ করত মহাপ্রলয়কাল পর্য্যন্তও অবস্থান করিতে পারেন। মহাপ্রলয়ের সময়ে যখন শিব, বিষ্ণু আদির পরব্রহ্মে লয় হয়, তখন ভক্ত পরজ্ঞান লাভ করিয়া স্বকীয় ইষ্টদেবতার সহিত পরব্রহ্মে বিলীন হইয়া নির্ব্বাণ মোক্ষ লাভ করেন। যথা দেবীভাগবতে—

ভক্তৌ কৃতায়াং যস্যাপি প্রারব্ধবশতো নগ।
ন জায়তে মম জ্ঞানং মণিদ্বীপং স গচ্ছতি॥
তত্র গত্বাঽখিলান্ ভোগাননিচ্ছন্নপি চার্চ্ছতি।
তদন্তে মম চিদ্রূপজ্ঞানং সম্যগ্ ভবেন্নগ॥

ইহলোকে ভক্তিপূর্ব্বক সাধন করা সত্ত্বেও অপূর্ণ প্রারব্ধহেতু যে ভক্তের পরজ্ঞান লাভ না হয় মৃত্যুর পর দেবীলোক মণিদ্বীপে তাঁহার গতি হইয়া থাকে। তথায় ইচ্ছা না থাকিলেও আপনা আপনি ভক্ত বিবিধ ভোগ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং তদনন্তর কালপ্রাপ্ত হইলে ভক্ত পরব্রহ্মের জ্ঞান লাভ করত মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। ভক্ত সে কাল কতদিনে প্রাপ্ত হন এ বিষয়ে শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—

ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে।
পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্॥

উন্নত লোকপ্রাপ্ত ভক্ত ইষ্টদেবের সহিত প্রলয়কাল পর্য্যন্ত উক্ত লোকে বাস করিয়া মহাপ্রলয়ের সময় পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকারলাভ করত ইষ্টদেবের সহিত ব্রহ্মে বিলীন হইয়া যান। ইহাই দেবযানগতির চরম পরিণামে নিঃশ্রেয়সলাভ। এ বিষয়ে মুণ্ডক শ্রুতিতেও প্রমাণ পাওয়া যায় যথা—

তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যুপবসন্ত্যরণ্যে শান্তা বিদ্বাংসো ভৈক্ষচর্য্যাং চরন্তঃ।
সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রযান্তি যত্রামৃতঃ স পুরুষো হ্যব্যয়াত্মা॥

বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ সন্ন্যাসযোগাদ্ যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ।
তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে॥

ভিক্ষাচর্য্যাবলম্বন করত যে সকল শান্ত বিদ্বান্ পুরুষ অরণ্যে বাস করেন এবং শ্রদ্ধার সহিত তপস্যাদি আচরণ করেন তাঁহারা দেহত্যাগের পর সূর্য্যদ্বারপথে অর্থাৎ দেবযানপথে অব্যয় অমৃত পুরুষের লোকে গমন করেন। ইহারই নাম ব্রহ্মলোক। বেদান্তের জ্ঞানানুসারে লব্ধতত্ত্ব এবং সন্ন্যাসযোগের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব যতিগণ এই ব্রহ্ম লোকে বহু বর্ষ বাস করিয়া মহাপ্রলয়কালে ব্রহ্মার লয়ের সহিত পরব্রহ্মে বিলীন হইয়া নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করেন। সহজগতি এবং শুক্লগতি সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণন দেওয়া হইল। এই দুইই জীবের মুক্তিবিধায়িনী গতি। এতদ্ব্যতীত আর এক মুক্তি-বিধায়িনী গতি আছে। উহাকে ঐশীগতি বলে। ইহার রহস্য পরে বর্ণিত হইবে।

ধূমযানগতি পাপ-পুণ্যের মিশ্রণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এজন্য ধূমযানের অন্তর্গত পিতৃলোক ব্যতীত নরকলোক এবং প্রেতলোক প্রাপ্তিও হইয়া থাকে।

প্রেতত্ব ও নরকাদি গতি।

যে সকল মনুষ্য পুণ্যার্জ্জন করে নাই, প্রত্যুত বিষয়বিলাসে পাপময় জীবন যাপন করিয়াছে তাহাদের মৃত্যুকালে বড়ই কষ্ট হইয়া থাকে এবং মৃত্যুর পরেও প্রেতযোনি প্রাপ্তি অথবা নরকে গতি হইয়া থাকে। ইহা কিরূপে হয় তাহা নীচে ক্রমশঃ বিবৃত হইতেছে। আজীবন বিষয়ভোগের ফলে বিষয়বাসিতচিত্ত মনুষ্য মৃত্যুর সময়েও বিষয়চিন্তা পরিত্যাগ করিতে পারে না। কারণ মৃত্যুরূপী ভীষণ পরিবর্ত্তনের জন্য মানবচিত্ত স্বভাবতই বিমূঢ় হইয়া কিছু দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এবং অন্তঃকরণের প্রকৃতিই এইরূপ যে দুর্ব্বল চিত্তে আজীবন অভ্যস্ত বলবান্ সংস্কার আপনা আপনিই উদিত হইয়া থাকে। দুর্ব্বল অন্তঃকরণে স্বভাবতঃ উদিত এইরূপ বলবান্ সংস্কারকেই প্রারব্ধ সংস্কার বলে এবং জীব এই প্রারব্ধানুকূল ভাবনায় চিত্তকে অভিভূত করত মৃত্যুর পর সদসদ্ ভাবনানুসারে নানারূপ গতি প্রাপ্ত হয়। বেদ বলেন—

"প্রাণস্তেজসা যুক্তঃ সহাত্মনা যথাসঙ্কল্পিতং লোকং নয়তি।"

সূক্ষ্মশরীর, কারণশরীর এবং জীবাত্মা চিত্তনিহিত সংকল্পানুসারে পরলোকে শুভাশুভ গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শ্রীভগবান্ গীতাতেও বলিয়াছেন—

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয়! সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥

যে যে ভাব স্মরণ করিতে করিতে জীব শরীর ত্যাগ করে, মৃত্যুর পর সেই ভাবানুসারে জীবের গতি হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের চরণকমলে ভৃঙ্গায়মানচিত্ত হইয়া মৃত্যুর সময়েও যে সাধক ভগবানকে স্মরণ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিতে পারেন তাঁহার নিশ্চয়ই ঊর্দ্ধগতি হইয়া থাকে। কিন্তু আজীবন বিষয়মুগ্ধচিত্ত জীবের সে সৌভাগ্য কোথায়? তাহার মৃত্যুর সময়ে বিষয়বাসনার স্থপরিণামহেতু চারপ্রকার নিদারুণ দুঃখপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। নিম্নে ক্রমশঃ এই চারিপ্রকার দুঃখের বিষয় বর্ণন করা হইতেছে। প্রথম ক্লেশকে যোগশাস্ত্রে অভিনিবেশ নাম দেওয়া হইয়াছে। যথা যোগদর্শনে—

"স্বরসবাহী বিদুষোঽপি তথা রূঢ়োঽভিনিবেশঃ।"

যাহার সম্বন্ধ পূর্ব্বজন্ম হইতে লাগিয়া থাকে এবং যাহা বিদ্বান্ অবিদ্বান্ সকলকেই আশ্রয় করে, মৃত্যুভয় উৎপন্নকারী সেই ক্লেশকে অভিনিবেশ বলে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই মৃত্যুর ভয়ে ভীত কেন? যে বালক মরণের কথা কিছুই জানে না সেও মরণের নামে কাঁপিয়া উঠে কেন? ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে যোগদর্শনোক্ত পূর্ব্বজন্ম-সংস্কারই কারণ বলিয়া বোধ হয়। মৃত্যু স্থূল শরীরেরই হইয়া থাকে, আত্মার মৃত্যু নাই। শ্রুতি বলিয়াছেন—

"জীবাপেতং কিলেদং ম্রিয়তে ন জীবো ম্রিয়তে।"

জীবাত্মা-পরিত্যক্ত স্থূলশরীরেরই মৃত্যু হইয়া থাকে জীবাত্মার মৃত্যু হয় না। 'বাসাংসি জীর্ণানি' আদি শ্লোকের দ্বারা গীতায় একথা ভগবান্ স্পষ্টই প্রতিপাদন করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্তানুসারে মৃত্যুর সময় যখন জীবাত্মা, কারণশরীর ও সূক্ষ্মশরীরের দ্বারা স্থূলশরীর পরিত্যক্ত হয় তখন জীবের যে দারুণ ক্লেশ হয় উহার সূক্ষ্ম সংস্কার সূক্ষ্মশরীরগত চিত্তের মধ্যে থাকিয়া যায়। মৃত্যুর কথা বলিলেই জীবের মনে পূর্ব্বজন্মের ঐ দুঃখের সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়া থাকে। তাহাতেই জীব মৃত্যু ভয়ে ভীত হয়। এই ভয় এত ভীষণ যে ভগবান্ পতঞ্জলি যোগদর্শনে পঞ্চক্লেশের বর্ণন করিতে সময় অভিনিবেশকেও একটি ক্লেশের মধ্যে গণনা করিয়াছেন। যথা—

"অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চক্লেশাঃ।

অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ সংসারে জীবকে এই পাঁচ প্রকার ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। এক্ষণে অভিনিবেশহেতু মৃত্যুকালে জীবের কিরূপ ক্লেশ হয় তাহা বর্ণিত হইতেছে। মৃত্যুকালে স্থূলশরীরের সহিত সূক্ষ্মশরীর,

কারণশরীর এবং জীবাত্মার বিচ্ছেদ হয়। যে বস্তুর সহিত অনেকদিনের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ থাকে তাহার সহিত বিচ্ছেদের সময় অবশ্যই অত্যধিক কষ্ট হইবে। দৃষ্টান্ত রূপে বুঝা যাইতে পারে যে যদি দুইখণ্ড কাগজকে নির্য্যাসের দ্বারা সংলগ্ন করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে কিছুক্ষণ পরে নির্য্যাস শুষ্ক হইলে কাগজখণ্ডদ্বয়কে পৃথক করা বড়ই কষ্টকর হইয়া উঠে। অনেক সময় কাগজ ছিন্ন হইয়া যায় তথাপি বিশ্লিষ্ট হয় না। ঠিক ঐ প্রকারে পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার এবং জীবাত্মার যখন বিষয়বাসনারূপ নির্য্যাসের দ্বারা স্থূলশরীরের সঙ্গে অনেক বর্ষ পর্য্যন্ত সম্বন্ধ ছিল এবং সেই বাসনা মৃত্যুকাল অবধি ঘৃতাহুত বহ্নির ন্যায় ক্রমাগত বাড়িয়াই আসিয়াছে, কমে নাই, তখন যদি হঠাৎ দৈববশে পরম প্রেমাস্পদ স্থূলশরীরকে চিরকালের জন্য ত্যাগ করিতে হয় তাহা হইলে অবশ্যই জীবের অন্তঃকরণে দারুণ দুঃখের উদয় হইবে ইহাতে আর সন্দেহ কি? এই গূঢ় আন্তরিক দুঃখকেই মৃত্যুযাতনা বলে এবং ইহারই সংস্কার অন্তঃকরণে অনেক জন্ম হইতে সঞ্চিত থাকায় মৃত্যুর নামমাত্রেই উদ্‌বোধিত হইয়া জীবকে মৃত্যুভয়ে ভীত করে। ইহাই মরণকালীন প্রথম ক্লেশ যাহা ধীর যোগী ভিন্ন বিদ্বান্ অবিদ্বান্ সকলকেই ভোগ করিতে হয়। ধীর ভক্ত যোগীর সূক্ষ্মশরীর ও আত্মা বিষয়বাসনা-রূপ নির্য্যাসের দ্বারা স্থূলশরীরের সহিত সম্বন্ধ না হইয়া ভক্তি ও প্রেম নির্য্যাসের দ্বারা শ্রীভগবানের চরণকমলের সহিত সংলগ্ন থাকে, এজন্য মৃত্যুর সময় তাঁহাকে কোনই ক্লেশ পাইতে হয় না। তিনি মৃত্যুরূপ বিষম সন্ধির সময়েও অপূর্ব্ব ধৈর্য্যের সহিত নিজের মনোমধুকরকে ভগবচ্চরণারবিন্দের মধুর মকরন্দ পানে তন্ময় করিয়া ঐ অবস্থাতেই স্থূলশরীর ত্যাগ করেন এবং এইজন্যই দেহত্যাগে তাঁহার উত্তরায়ণ গতিলাভ হইয়া থাকে। মৃত্যুর সময়ে বিষয়ীপুরুষের দ্বিতীয়প্রকার ক্লেশের কারণ 'মোহ'। মোহের স্থান পুত্রকলত্রাদি মুমূর্ষু ব্যক্তির চারিদিকে বসিয়া করুণস্বরে যখন বিলাপ করিতে থাকে তখন তাহার মনোবেদনার আর সীমা থাকে না। "হায়! আমি আমার প্রাণপ্রিয় শিশুগুলিকে কিরূপে পরিত্যাগ করিব, উহারা আমার অভাবে অনাহারে মারা যাইবে, আমার সহধর্ম্মিণী অনাথিনী হইয়া চিরজীবন কষ্টে কালযাপন করিবেন, এত ক্লেশে অর্থোপার্জ্জন করিলাম, অট্টালিকা সুসজ্জিত করিলাম, কিছুই ভোগে আসিল না" ইত্যাদি ইত্যাদি মোহমূলক দুঃখচিন্তায় মুমূর্ষু ব্যক্তির হৃদয় বিদীর্ণ হইতে থাকে। ইহাই সব মৃত্যুকালীন দ্বিতীয় দুঃখ। যথা ভাগবতে—

এবং কুটুম্বভরণে ব্যাপৃতাত্মাঽজিতেন্দ্রিয়ঃ।
ম্রিয়তে রুদতাং স্বানামুরুবেদনয়াঽস্তধীঃ॥

কুটুম্বপোষণে ব্যাপৃতচিত্ত অসংযমী বিষয়ী ব্যক্তি কুটুম্বগণের দুঃখ দেখিয়া এইরূপে হতবুদ্ধি হইয়া থাকে। মুমুর্ষু ব্যক্তির তৃতীয়প্রকার দুঃখ অনুতাপজন্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। "হায়! আমি শাস্ত্র জানিয়াও বিষয়ের উন্মাদে মত্ত থাকিয়া কিছুই ধর্ম্মানুষ্ঠান করি নাই, স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি আসক্ত হইয়া উহাদিগকে সুখে রাখিবার নিমিত্ত কতই চুরি, জুয়াচুরি, মিথ্যাচার, কপটতা, প্রবঞ্চনাদির অনুষ্ঠান করিয়াছি, যাহাদের জন্য এরূপ পাপকার্য্য করিয়াছি, তাহারা ত কেহ আমার পাপের ভাগী হইবে না বা আমার সঙ্গে যাইবে না, কেবল আমাকেই একাকী ভীষণ নরকে পতিত হইয়া সকল পাপের ফলভোগ করিতে হইবে। হায়! আমি যৌবন মদোন্মত্ত হইয়া কতই অনাচার, ব্যভিচার, সতীর সতীত্ব নাশ আদি ঘৃণিত পাপাচরণ করিয়াছি, তখন ওসকলের ভীষণ পরিণামের প্রতি উপেক্ষা করিয়াছিলাম, কিন্তু এখন ঐ সকল পাপ মূর্ত্তিমান্ হইয়া আমাকে দারুণ যমদণ্ডের ভয় দেখাইতেছে এবং অন্তঃকরণে শতশত বৃশ্চিকদংশনতুল্য ক্লেশ উৎপন্ন করিতেছে। যৌবনের ঘোরে অহঙ্কৃত হইয়া স্বর্গ নরকাদি বিষয়ক শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তকে মিথ্যা বোধে উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিতাম এবং শাস্ত্রগর্হিত কদাচরণ করিতে কুণ্ঠিত হইতাম না, কিন্তু এখন মৃত্যুকালে ঐ সকল পরোক্ষ লোকের ভীষণ ছায়া আমার হৃদয়ের উপর পতিত হইতেছে এবং ঋষিদের বাক্য সত্য বলিয়া মনে হইতেছে, নাজানি মহাপাপের ফলে আমাকে কোন রৌরব বা কুম্ভীপাকে পড়িতে হইবে" ইত্যাদি ইত্যাদি পূর্ব্বদুষ্কর্ম্মজনিত অনুতাপের অনলে বিষয়সেবী মুমুর্ষুর চিত্ত দগ্ধ হইতে থাকে। অনেক বিষয়ী ত এইপ্রকার দারুণ দুঃখের দ্বারা বিমুগ্ধ ও বিকৃতমস্তিষ্ক হইয়া বিকারাবস্থায় নিজের পাপ বলিতে আরম্ভ করে যাহা শুনিয়া আত্মীয়স্বজন সকলেই অত্যন্ত আতঙ্কিত ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে। ইহাই মরণকালীন অনুতাপজন্য তৃতীয় দুঃখ। মরণকালীন চতুর্থ দুঃখ কিছু অলৌকিক এবং বিচিত্র। উহা এই যে ঠিক মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে মনুষ্যের প্রকৃতি মৃত্যুর পর তাঁহাকে স্বকর্ম্মানুসারে যে লোকে যাইতে হইবে সেই লোকের প্রকৃতির সহিত সমভাবাপন্ন হইয়া যায় এবং এইহেতু মৃত্যুর সময় জীব পরলোকের অনেক দৃশ্য দেখিতে পায়। যিনি স্বর্গে যাইবেন তিনি স্বর্গীয় দেবদেবীকে দেখিতে পান এবং যে যমলোকে শাস্তি পাইবার জন্য যাইবে সে ভীষণ যমদূতগণকে দেখিতে পায়।

যথা মুণ্ডকোপনিষদে—

এহ্যেহীতি তমাহুতয়ঃ সুবর্চ্চসঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভির্যজমানং বহন্তি।
প্রিয়াং বাচমভিবদন্ত্যোঽর্চ্চয়ন্ত্যঃ এষ বঃ পুণ্যঃ সুকৃতো ব্রহ্মলোকঃ॥

যজ্ঞের ফলে যাঁহারা দিব্যলোকের অধিকারী হন এরূপ পুণ্যাত্মা পুরুষগণকে মৃত্যুর সময় জ্যোতিষ্মতী আহুতিগণ 'এস এস' বলিয়া আহ্বান করেন এবং সূর্য্যরশ্মি দ্বারা দিব্যলোকে লইয়া যান, উহাঁদিগকে মধুরবচনে সম্বোধন এবং অর্চ্চনা করেন। এইরূপে পুণ্যাত্মা ব্যক্তিগণের দিব্যলোকে গতি হইয়া থাকে। পুরাণেও স্বর্গ হইতে বিমান আসা এবং তাহাতে আরোহণ করিয়া পুণ্যাত্মার স্বর্গে যাওয়া আদির অনেক বর্ণন দেখিতে পাওয়া যায়। মৃত্যুকালে পুণ্যাত্মাগণ এরূপ বিমান ও দেবতাদির দর্শন করিয়া প্রফুল্লিত হন। কিন্তু পাপীর ভাগ্যে এরূপ দিব্যদর্শন কোথায়? সে মৃত্যুর পর যমলোকে যায় এবং এজন্য মৃত্যুর সময় ভীষণ লগুড়হস্ত যমদূতগণকেই দেখিয়া থাকে। যথা ভাগবতে—

যমদূতৌ তদা প্রাপ্তৌ ভীমৌ সরভসেক্ষণৌ।
স দৃষ্ট্বা ত্রস্তহৃদয়ঃ শকৃন্মূত্রং বিমুঞ্চতি॥

পাপীর মৃত্যুকালে ভীম আরক্তলোচন যমদূত দ্বয় সম্মুখে আসে এবং তাহা দেখিয়া ভয়ে মুমুর্ষু ব্যক্তি মল মূত্র ত্যাগ করিয়া ফেলে। এই সকল যমলোকবাসী জীব করাল মূর্ত্তি ধারণ করত পাপীর নিকটে উপস্থিত হয়, নরকের বীভৎস দৃশ্য সমূহ তাহাকে দেখায়, কাল্পনিক নরকাগ্নি উৎপন্ন করিয়া পাপীকে তাহার মধ্যে ফেলিল এরূপ ভয় জন্মায়, বল পূর্ব্বক তাহার কেশাকর্ষণ করিয়া কৃমিকীটাদিপূর্ণ বিষ্ঠাকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত করিতে যায়। এই সকল ভয়ঙ্কর অমানুষিক দৃশ্য দেখিয়া পাপীর হৃদয় ভয়ে বিহ্বল হইয়া উঠে এবং সে চীৎকার করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। এই সব বিষয়ী ব্যক্তির মৃত্যুকালীন চতুর্থ দুঃখ। এ কথা সকলেই জানেন যে দারুণ ক্লেশে চিত্ত অভিভূত হইলে মনুষ্য প্রায়ই মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হয়। এই নিয়মানুসারে বিষয়ী মনুষ্যের সূক্ষ্মশরীর উপর-কথিত চতুর্ব্বিধ ক্লেশের বশে প্রায়ই মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হয় এবং এই মূর্চ্ছাবস্থাতেই তাহার সূক্ষ্মশরীর স্থূলশরীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া থাকে। মৃত্যুর সময়ে সূক্ষ্মশরীরের এই মূর্চ্ছাবস্থার জন্য যে লোকপ্রাপ্তি হয় তাহাকে প্রেতলোক বলে। কিন্তু এই মূর্চ্ছা সাধারণ সংজ্ঞাহীনতাযুক্ত মূর্চ্ছার মত নহে। ইহাতে সূক্ষ্মশরীর সংজ্ঞাহীন হয় না, কেবল মোহাদিজনিত প্রবল ভাবনা ও দুঃখের বশে অজ্ঞানতাময় একপ্রকার উন্মত্তদশা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

কোথাও কোথাও শাস্ত্রে এরূপ বর্ণনও পাওয়া যায় যে পূর্ব্বশরীর ত্যাগ করিবা-মাত্রই জীবের দ্বিতীয় শরীর লাভ হইয়া থাকে। যথা শ্রুতি—

তদ্ যথা তৃণজলৌকা তৃণস্যান্তং গত্বাঽন্যমাক্রমমাক্রম্যাত্মানমুপসংহরত্যেব-মেবায়মাত্মেদং শরীরং নিহত্যাঽবিদ্যাং গময়িত্বাঽন্যমাক্রমমাক্রম্যাত্মানমুপসংহরতি।

আরও ভাগবতে—

দেহে পঞ্চত্বমাপন্নে দেহী কর্ম্মানুগোঽবশঃ।
দেহান্তরমনুপ্রাপ্য প্রাক্তনং ত্যজতে বপুঃ॥
ব্রজংস্তিষ্ঠন্ পদৈকেন যথৈবৈকেন গচ্ছতি।
যথা তৃণজলৌকেব দেহী কর্ম্মগতিং গতঃ॥

এক স্থূলশরীর মৃত হইবার পর কর্ম্মপরতন্ত্র জীব বিবশ হইয়া অন্য দেহ প্রাপ্ত হয়। যেরূপ জলৌকা পূর্ব্ব তৃণ পরিত্যাগ করিবামাত্রই পরবর্ত্তী তৃণ প্রাপ্ত হয় সেইপ্রকার জীবও কর্ম্মবশে পূর্ব্বশরীর ত্যাগ করত তৎক্ষণাৎ অন্য শরীর প্রাপ্ত হয়। পরন্তু এইরূপ পূর্ব্বশরীর ত্যাগের পরক্ষণেই দ্বিতীয় শরীর প্রাপ্তি জীবের তখনই হইতে পারে যদি বিষয়বাসনাদির পরিণামে জীবের প্রেতযোনি প্রাপ্তি না হয় অথবা অন্য লোকে ভোগ্য কোন কর্ম্মসংস্কার না থাকে। অন্যথা যতদিন জীবের প্রেতত্বমুক্তি না হয় অথবা স্বর্গনরকাদি ভোগ সমাপ্ত না হয় ততদিন তাহার ইহলোকে পুনর্জ্জন্ম হইতে পারে না। এক্ষণে প্রেতযোনি কি এবং কিরূপে তাহার প্রাপ্তি ও তাহা হইতে মুক্তি হয় তাহাই বর্ণিত হইতেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বিষয়ী জীবের চিত্তে মৃত্যুকালে চার প্রকার দুঃখের উদয় হইয়া সূক্ষ্ম শরীরের মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। ঐ মূর্চ্ছাই প্রেতত্বের কারণ এবং যতদিন না ঐ মূর্চ্ছা কাটে জীবকে ততদিন প্রেতযোনিতে অবস্থান করিতে হয়। এইরূপ মূর্চ্ছা ব্যতীত আরও কয়েকপ্রকারে প্রেতত্ব প্রাপ্তি হইয়া থাকে। যথা—কোন মনুষ্য বা অর্থাদির প্রতি বিশেষভাবে আসক্ত হইয়া উহাতেই চিত্তকে মুগ্ধ করতঃ প্রাণত্যাগ করিলেও প্রেতযোনিপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। গৃহস্থগণ পুত্র কলত্রাদির মায়ায় মুগ্ধ হইয়া ব্যভিচারপরায়ণ স্ত্রীপুরুষ পরস্পরে আসক্ত হইয়া, কৃপণ ধনে আসক্ত হইয়া এইরূপে প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়। ইহা ছাড়া হঠাৎ অপঘাত মৃত্যু হইলেও প্রেতযোনি প্রাপ্তি হইয়া থাকে। রাস্তা চলিতে চলিতে মস্তকে বজ্রপাত হইল, উপর হইতে ঘর ভাঙ্গিয়া মাথায় পড়িল, হঠাৎ কেহ বন্দুক মারিয়া দিল বা সুপ্ত অবস্থায় শিরশ্ছেদন করিল এরূপ মৃত্যুতেও প্রেতযোনি প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

[ক্রমশঃ]

মহাকাশ গোলক।

নব পর্য্যায়।
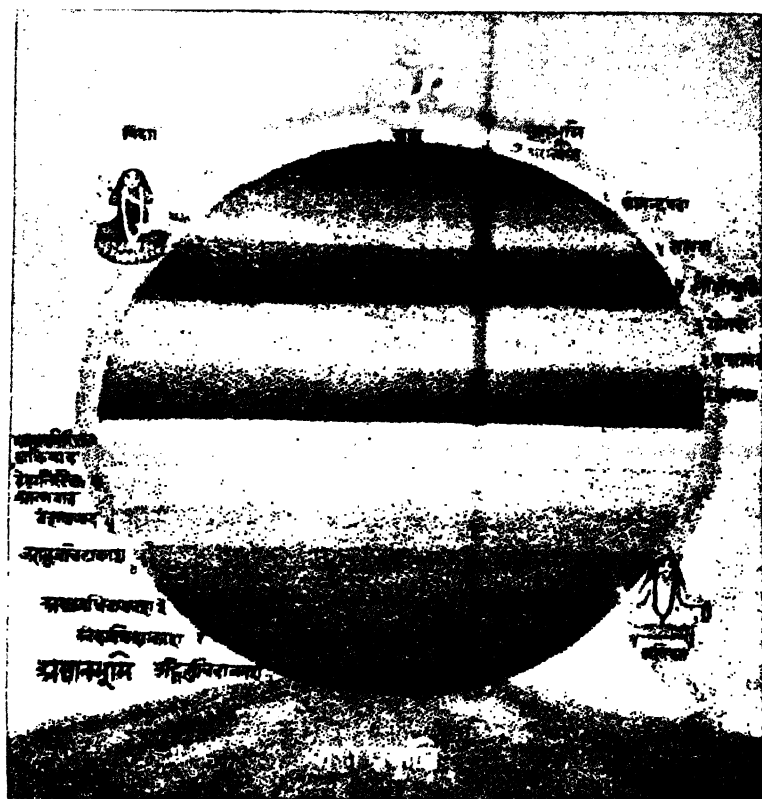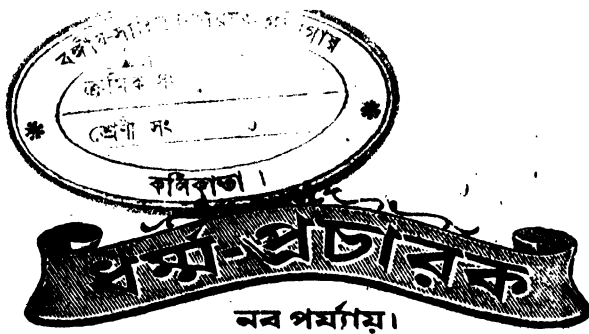
অকুণ্ঠং সর্ব্বকার্য্যেষু ধর্ম্ম-কার্য্যার্থমুদ্যতম্।
বৈকুণ্ঠস্য হি যদ্রূপং তস্মৈ কার্য্যাত্মনে নমঃ॥

২য় ভাগ { জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭। ইং মে, ১৯২০ } ২য় সংখ্যা।

ধর্ম্মই সকল উন্নতির মূলভিত্তি।

[শ্রীবিজয় লাল দত্ত।]

দ্বিতীয় প্রস্তাবের অবশিষ্ট অংশ।

ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা।

বাঙ্গালী মুসলমানগণের ভাগ্য বাঙ্গালী হিন্দুর সহিত বিদেশীয় রাজার অধীনে একই শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিলেও মুসলমান সম্প্রদায় আজিও বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের ন্যায় ধর্ম্মভাবহীন হয় নাই। সন্ধ্যা সমাগমে যখন ধর্ম্মানুরাগী মুসলমানগণ তাঁহাদের ধর্ম্মানুমোদিত প্রণালী অনুসারে পরম দেবতার ধ্যানে নিমগ্ন হন, ইদ্, বক্‌রিদ্ ও মহরম প্রভৃতি পর্ব্বদিনে উক্ত সম্প্রদায়ের নিরক্ষর ব্যক্তি পর্য্যন্ত যেরূপ একাগ্রচিত্তে ধর্ম্মভাবে উদ্দীপ্ত ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে তখন তাহাদের ধর্ম্মানুরাগ দেখিয়া ধর্ম্মভাব বিহীন বাঙ্গালীর বিস্তর শিখিবার আছে। কিন্তু তাহা দেখিয়াও উদ্‌ভ্রান্ত বাঙ্গালীগণ স্বধর্ম্মানুরাগী হইতে পারিয়াছেন কি?

পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী অনেকে বলিয়া থাকেন যে যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিবেই যুগধর্ম্মের প্রভাব কেহ অতিক্রম করিতে পারে না, এবং সময়ের স্রোতের প্রতিকূলে গমন করাও একান্ত অসম্ভব। যতদিন ভারতের স্বাধীনতা ছিল, ততদিন ভারতের সুখ ও ঐশ্বর্য্যের দিন অস্তগত হয় নাই, ততদিন ভারতবাসী

জাতীয় বিশেষত্ব ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিতে সমর্থ হইয়াছিল। এক্ষণে বিদেশীয় রাজার শাসনে সেরূপ পূর্ব্বের ন্যায় নিয়ম-পালন ও ধর্ম্মানুষ্ঠান করা অসম্ভব, এবং যাহারা তজ্জন্য চেষ্টা করে তাহারা উপহাসাস্পদ হইয়া থাকে। তাঁহাদের এরূপ যুক্তি-বাদ যে একান্ত অসার ও নিতান্ত ভিত্তিহীন তাহার বিস্তৃত রূপে পরিচয় দান অনাবশ্যক। এজগতে কিছুই চিরস্থায়ী নয়, পরিবর্ত্তন ও অবস্থান্তর-প্রাপ্তিই জগতের ধর্ম্ম; এইজন্যইত উহার নাম "জগৎ"। কাল সংহার কার্য্যে সর্ব্বক্ষণ ব্যাপৃত থাকিলেও ধ্বংসের চিতাভস্ম অথবা সমাধি-ক্ষেত্রের ভগ্নস্তরের উপর আবার অভিনব ভাবে সংগঠন কার্য্য চলিতে থাকে—জগৎ পুনরায় নববেশে নবীনভাবে উন্নতির পথে অগ্রসর হয়—গতি ও পরিবর্ত্তনশীল জগতে উন্নতি-অবনতি পর্য্যায়ক্রমে সংঘটিত হইয়া থাকে। "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে সুখানি চ দুঃখানি চ" এই প্রাচীন বাক্য ধ্রুব সত্য। উত্থানের পর পতন প্রকৃতি-সিদ্ধ, কিন্তু পতনের পর পুনরুত্থান ও পুনরুন্নতিও ধ্রুব সত্য। অন্ধকারের পর আলোক যেমন স্বভাবসিদ্ধ, প্রচণ্ড গ্রীষ্মের অসহনীয় উত্তাপের পর বর্ষার সুশীতল বারিবর্ষণ যেমন অনিবার্য্য, অবনতির পর উন্নতিও তেমনি অবশ্যম্ভাবী। উপযুক্ত সাধনা-প্রভাবে অভীষ্ট উন্নতিলাভ চিরদিন সুসাধ্য হইয়া থাকে। জাতীয় উন্নতি-অবনতি জাতীয় সাধনার উপর নির্ভর করে। যে জাতি ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন না দিয়া স্বীয় বিশেষত্ব ও অতীত গৌরবের প্রতি স্থির লক্ষ্য রাখিয়া ধর্ম্মের পথ দিয়া পার্থিব সকল প্রকার উন্নতির জন্য একাগ্রচিত্তে সাধনা করে তাহার উত্থান ও অভ্যুদয় অনিবার্য্য। অতীত বৈভব আলোক-বর্ত্তিকার ন্যায় তাহাকে গন্তব্য স্থানে পথ দেখাইয়া লইয়া যায়। যে জাতি তাহার অতীত সমুজ্জ্বল গৌরব ভুলিয়া অসার, জঘন্য অনুকরণ-পরায়ণ হইয়া স্বধর্ম্ম বিসর্জ্জন পূর্ব্বক হীনবৃত্তি অবলম্বনে নীচতাকে আলিঙ্গন করে, তাহার উন্নতি সুদূর-পরাহত। কত দেশ পতিত হইয়া আবার উঠিয়াছে; তাহার একমাত্র কারণ এই যে, সেই সকল দেশ তাহার জাতীয় বিশেষত্ব, জাতীয় ধর্ম্ম, জাতীয় প্রকৃতির অনুকূল সাধনা এবং অতীত গৌরব বিস্মৃত হয় নাই। ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া বিরাট সাধনা-প্রভাবে বিলুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করিয়াছে। ইটালী প্রুসিয়ার নির্য্যাতন ও উৎপীড়নে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াও মরে নাই। দেশ-মাতৃকার ক্ষণ-জন্মা সুসন্তান সন্ন্যাসী-কল্প ম্যাজিনি ও গ্যারিবল্ডীর পুণ্য-পুঞ্জময়

কঠোর সাধনা-প্রভাবে তাঁহাদের সুমন্ত্রণা পরিচালিত রোমক সন্তানগণ স্বদেশ-উদ্ধার মহামন্ত্র স্ব স্ব হৃদয়ের নিভৃত মন্দিরে সর্ব্বক্ষণ পূত হোমাগ্নির ন্যায় প্রজ্জ্বালিত রাখিয়া ধর্ম্মের অব্যর্থ উদ্দীপনায় ইটালীর হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারে জাতীয় সমাজে সমুচ্চ আসন অধিকার করিয়া ধন্য হইয়াছে। ধর্ম্মই ইটালীকে রক্ষা করিয়াছে।

আমাদের দেশের নেতৃ-স্থানীয় ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণের মধ্যে যাঁহারা রাজনীতিক আন্দোলনকে জীবনের সার-সর্ব্বস্ব এবং স্বদেশোন্নতির অমোঘ উপায় বিবেচনায় ধর্ম্মনীতির প্রতি ঔদাসীন্য ও অনাস্থা প্রদর্শন করেন, তাঁহারা মনে করেন যে রাজনীতির সহিত ধর্ম্মনীতির বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই, উহাদের স্বার্থকতা ভিন্ন ভিন্ন পথে বিভিন্ন উদ্দেশ্য সংসাধনে। কিন্তু তাঁহাদের জানা উচিত যে ধর্ম্মনীতি যে মহাশক্তির বিভূতি, রাজনীতি ও সমাজনীতিও সেই পরমদেবতার ঐশ্বর্য্য। ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ধর্ম্মের পথ দিয়া না চলিলে কি রাজনীতিক, কি সমাজনীতিক কোন সম্পদই সহজে আয়ত্তাধীন হয় না। দেশের দুর্দ্দিনে দেশ-নায়কগণ এবং তাঁহাদের মন্ত্র-শিষ্য-বর্গ দেশের বিপন্ন অবস্থা দর্শনে তন্নিবারণের উপায় বিহীন হইয়া যখন দ্রৌপদীর ন্যায় একাগ্রচিত্তে একান্ত ব্যাকুল অন্তরে ধর্ম্ম-রাজের নিকট আত্মনিবেদন পূর্ব্বক তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করেন, তখনই ভগবৎকৃপায় জাতীয় শক্তির উদ্বোধন হইয়া থাকে, সেই মাহেন্দ্র মুহূর্ত্তে ঐশী শক্তির প্রেরণায় দেশাত্মবোধের বন্যায় দেশভক্ত সন্তানগণের হৃদয় প্লাবিত হইয়া যায়, স্বয়ং ভগবান তখন ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরুর ন্যায় বিপন্ন ভক্তজন-গণের প্রাণের আকুল প্রার্থনা পূর্ণ করিবার উদ্দেশে অবতার-রূপে প্রকাশিত হন। ইটালীর ঘোর দুর্দ্দিনে নব ইটালীর উদ্ধার-কর্ত্তা জোসেফ ম্যাজ্জিনি ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর ন্যায় উহা বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই প্রাণ খুলিয়া বলিয়াছিলেন—"In critical moments God manifests himself successfully in humanity". আমরা শ্রীগীতায় শ্রীভগবানের শ্রীমুখের মধুর বাণী অধিকতর পরিষ্কার ভাবে শুনিতে পাই—

"অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।

* * * * *

ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

দুর্ভাগ্য-বশতঃ ভারতের মহাপুরুষগণের প্রাণস্পর্শী কথা আমাদের বর্ত্তমান দেশনায়কগণের মধ্যে অনেকের কর্ণে পৌছে না; এজন্য ইটালীর নব-জীবন বিধাতা ম্যাজিনির কথা উল্লেখ করিতে হইল। কোন্ শ্রেণীর জন-নায়কদিগের দ্বারা দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে তৎসম্বন্ধে উক্ত মহাত্মা জলদগম্ভীর ভাবে যে মহাসত্য প্রচার করিয়াছিলেন, এস্থলে তাহা কিঞ্চিৎ মাত্র উদ্ধৃত করিয়া জানাইতে চাই,—অধঃপতিত জাতির পুনরুত্থান জন্য ধর্ম্মভাব-প্রচার কত উপযোগী ও কল্যাণকর। তিনি তাঁহার মন্ত্র-শিষ্যগণ ও স্বদেশবাসী জনসাধারণের নিকট সুস্পষ্টরূপে এই মহাসত্য ঘোষণা করিয়াছিলেন—"The religious sentiments sleep in our people waiting to be awakened. He who knows how to rouse them will do more for the nation than can be done by numerous political theories."

উহার অর্থ এই—"আমাদের জাতির হৃদয়ে রাশি রাশি ধর্ম্মভাব নিদ্রিত অবস্থায় রহিয়াছে এবং উহা জাগ্রত হইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। যিনি সেই সুষুপ্ত ধর্ম্মভাব গুলিকে জাগরিত করিতে পারিবেন, তিনিই প্রচুর রাজনীতিক সত্য প্রচারে যাহা না হইতে পারে, তদ্দ্বারা জাতির অধিকতর কল্যাণ সাধন করিতে সমর্থ।" এই মহাবাক্যের সত্যতা ও সার্থকতার প্রতিধ্বনি করিয়া একজন বিদেশীয় স্বদেশ-প্রেমিক কবি প্রাণের ভাষায় গাইয়াছেন—

"Religion comes from God's right hand
And needs a godly train,
For 'tis righteousness that makes our land
A nation once again."

ধর্ম্ম এবং সত্যানুরাগ ভিন্ন জাতীয় জীবনের কোন উন্নতি সাধিত হইতে পারে না। ধর্ম্ম বিহীন জীবন মরুভূমির ন্যায় ভীষণ; তাহাতে কোন সুফল জন্মে না। আমরা জানি ধর্ম্মই মানবের জীবনে মরণে একমাত্র সুহৃদ—

"এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি॥"

ইহা জানিয়াও আমরা কয়জন লোকে পরলোকগত পিতৃ-পিতামহগণের প্রদর্শিত পুণ্য পথ অবলম্বনে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকি?

অনেক পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী ধর্ম্ম-শিক্ষা-বর্জ্জিত যুবকের মনে এই এক ভ্রান্ত কুসংস্কার বদ্ধমূল আছে যে আমাদের দেশের ধর্ম্মগ্রন্থগুলি কুসংস্কারে পরিপূর্ণ

এবং হিন্দু শাস্ত্রের অধিকাংশ স্থল শাস্ত্র প্রণেতাগণের স্বকপোল-কল্পিত অসার মত ও তীব্র অনুশাসনের ঘন ঘটায় পূর্ণ। তাহাতে সরল উদার সত্যের পরিবর্ত্তে জটিল অনুদার অভিমতের অভিব্যক্তিই অধিক। একথা তাঁহারা ইয়ুরোপীয় মিশনারিগণের মুখে শুনিয়াছেন। ভারতের মহাজ্ঞানী ও মহাযোগী ঋষি ও সাধু সন্ন্যাসীর বাক্যে তাঁহাদের আস্থা নাই, কিন্তু ধর্ম্মসম্বন্ধে ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ কি বলিয়াছেন তাহা জানিবার জন্য অনেকেই উৎসুক। স্বদেশের ধর্ম্মগ্রন্থের বিপুল ভাণ্ডারে কত মহামূল্য অত্যুজ্জ্বল রত্নরাজি যুগ-যুগান্তর হইতে কি অনন্ত সুষমায় সুসজ্জিত ও সুশোভিত রহিয়াছে তাহার সন্ধান লইতে তাঁহাদের প্রবৃত্তি নাই; কিন্তু ইয়ুরোপের সুবিখ্যাত পণ্ডিত উইলসন্, মণিয়র উইলিয়মস্, হারবার্ট স্পেন্সার, জনষ্টুয়ার্ট মিল, ক্যাণ্ট, ম্যাকস্ মুলার, হাক্স্‌লি, কম্‌টে, সোপেনহর প্রভৃতি দার্শনিকগণ কি মহাসত্যের আলোচনা ও প্রচার করিয়াছেন, তাহা জানিবার জন্য তাঁহাদের একান্ত আগ্রহ এবং ঐসকল পাশ্চাত্য দার্শনিকের মতে তাঁহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা। পাশ্চাত্য বিশ্ব-বিশ্রুত দার্শনিকগণের মধ্যে যে সকল মহাত্মা আর্য্য ঋষিগণের গভীর জ্ঞান সম্বন্ধে প্রাণের ভাষায় যাহা অভিব্যক্ত করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া কয়জন লোকের ভ্রান্ত সংস্কার দূরীভূত হইয়াছে?

সুপণ্ডিত ম্যাকস্ মুলার প্রণীত "What India can teach us" নামক সুপাঠ্য গ্রন্থে তিনি প্রাণখুলিয়া যাহা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী ব্যক্তি মাত্রেরই বিশেষ ভাবে চিন্তা ও আলোচনার বিষয়। সুপ্রসিদ্ধ জর্ম্মাণ দার্শনিক পণ্ডিত সোপেন্ হর আর্য্যঋষিগণ-প্রণীত উপনিষৎ নিচয়ের অনন্ত মহিমা কীর্ত্তন উপলক্ষে ভক্তির উচ্ছ্বাসে মুক্ত কণ্ঠে বলিয়াছেন—"In the whole world there is no study so beautiful and so elevating as that of the Upanishads. It has been the solace of my life, and will be the solace of my death."

কয়জন শিক্ষিত ভারতবাসী অমৃতময় উপনিষৎ গুলিকে তাঁহাদের জীবনে-মরণে শান্তি-জ্ঞানে ভক্তিভরে পাঠ করিয়া থাকেন? দুর্ভাগ্য আমাদের, আমরা অমৃতের সন্তান হইয়া অমৃতের প্রস্রবণের সন্ধানে বিমুখ হইয়াছি। আমরা অমূল্য নিধি ধর্ম্মকে ভুলিয়া পাপের ভরা পূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি একদিন এজন্য আমাদিগকে কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

আমাদের সকল শিক্ষা ও সাধনায় ধিক্ যদি আমরা বাহিরের অসার কোলাহল হইতে আমাদের চক্ষু ফিরাইয়া অন্তর্জ্জগতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে না পারি। যিনি সকল ঈশ্বরের মহেশ্বর, সকল ভয়ের ভয়, যিনি সৃষ্টি, স্থিতি, পালন ও লয় কর্ত্তা, যিনি সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্বমঙ্গলময় তাঁহাকে যদি আমরা অকপট অন্তরে প্রগাঢ় ভক্তিভরে আমাদের হৃদয়ের পবিত্র মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সর্ব্বান্তঃ-করণে ধর্ম্মানুষ্ঠানে আত্মোন্নতি ও তৎসঙ্গে স্বদেশ ও স্বজাতির উন্নতি সাধনে বিমুখ হই তাহা হইলে আমাদের দুর্লভ মানব জীবনের সার্থকতা কোথায়? তাঁহাকে ছাড়িয়া, তাঁহাকে ভুলিয়া জগতের কোন উন্নতি সাধন অসম্ভব। তাঁহাকে ভুলিয়া ভরতের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে যিনি অনন্ত জগতাধার, যিনি সমস্ত জগতের প্রাণ, যিনি অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের সকল ঐশ্বর্য্য, সকল সম্পদ এবং সকল উন্নতির নিয়ামক, যিনি শিবময়, যিনি সর্ব্ববিধ কল্যাণের অনন্ত নির্ঝর, বিগলিত করুণা যাঁহার বিপুল বিভূতি, দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা সেই সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্বমঙ্গলময় বিভূতি-ভূষণকে ভুলিয়া ধর্ম্মভাব বর্জ্জিত এবং ধর্ম্মশিক্ষা ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে বীতশ্রদ্ধ হইয়াছি বলিয়া আজি আমাদের এত দুর্গতি ও এত দুরবস্থা। দেশের দুর্দ্দশা দেখিয়া যদি কাহারও হৃদয় যথার্থই আকুল হইয়া থাকে তবে তিনি সর্ব্বাগ্রে সুসংযত ভাবে, সুপবিত্র হৃদয়ে, সমাহিত চিত্তে, সর্ব্বান্তঃকরণে সেই বিরাট বিভূতি-ভূষণের পবিত্র চরণে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে বল ভিক্ষা করিয়া স্বদেশবাসী নরনারীগণকে ধর্ম্মভাবে উদ্দীপ্ত ও বিভোর করিয়া ধর্ম্মশিক্ষা বিস্তারে স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির ললাট হইতে কলঙ্কের কালিমা প্রক্ষালণে মন্ত্রগ্রহণ করুন। ধর্ম্মভাব-বিবর্জ্জিত শুষ্ক, নীরস ও অসার রাজনীতিক আন্দোলনে অধঃপতিত, বিগত-শ্রী দেশের পুনরুদ্ধার ও পুনরভ্যুদয়ের আশা বিড়ম্বনা মাত্র। বর্ত্তমানে ভারতের মঙ্গলকামী পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী নবভাবের ভাবুক জননায়কগণের হৃদয় যে ভাবে স্পন্দিত হইতেছে এবং তাঁহারা যে পথে চলিতেছেন, তাহার পরিবর্ত্তন আবশ্যক। তাঁহাদেরই প্রদর্শিত পথ ও দৃষ্টান্ত অবলম্বনে দেশ-জননীর লক্ষ লক্ষ সুকুমার-মতি বালক ও অপরিণত বয়স্ক যুবকগণ পথভ্রান্ত পথিকের ন্যায় ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। দেশ-মাতৃকার এই স্নেহের দুলালগণ স্ব স্ব জীবনের লক্ষ্য স্থির করিতে অসমর্থ হইয়া দিন দিন গভীর নৈরাশ্যের অন্ধকারে ডুবিতেছে। ধর্ম্মশিক্ষার

অভাবে, ধর্ম্মাচরণের জলন্ত আদর্শের অবিদ্যমানতায় তাহাদের মনোবৃত্তি সকল মলিন হইয়া পড়িতেছে। বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষার অভাব, নিজ নিজ বাসগৃহেও উপযুক্ত ধর্ম্মশিক্ষা ও সংযমের সুনিয়মের অব্যবস্থা বশতঃ কত অসংখ্য বালক ও যুবক পাশ্চাত্য ধর্ম্মহীন শিক্ষার প্রভাবে দিন দিন নিতান্ত অসংযত, দুর্ব্বিনীত, পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজন, শিক্ষক ও বয়োজ্যেষ্ঠ শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তিগণের প্রতি নিতান্ত ভক্তিহীন ও অবজ্ঞা-পরায়ণ হইয়া অনেক সময় একান্ত উচ্ছৃঙ্খল ভাবে স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইয়া নানা অনর্থের উৎপত্তি করিতেছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই সকল বালক ও যুবকগণ দেশ-মাতৃকার প্রধান আশা ভরসার স্থল—এই বংশের তিলক সোণার চাঁদগণকে প্রকৃত ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত, ধর্ম্মশিক্ষায় সমুন্নত, সুসংযত, নিষ্ঠাবান, সদাচারী ও কর্ত্তব্য-পরায়ণ করিয়া তাহাদের জীবনের সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহাদিগকে সৎপথে পরিচালিত করিতে পারিলে বর্ত্তমান দেশ-নায়কগণের একটী পবিত্র ও মহৎ কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদিত হইবে। এই মহা সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে তাহাদের অন্তরে যে সকল ধর্ম্মভাব ও সদ্‌গুণ রাজি সুষুপ্ত অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছে তাহাদিগকে জাগরিত ও উন্মেষিত করিতে হইবে। তাহাদের নিকট বিশুদ্ধ হৃদয়ের চারু শোভা, চরিত্রের বিমলতা, অন্তরের উদারতা এবং পরার্থপরতা ও পরোপকার বৃত্তির অতুলনীয় সম্পদ প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহাদিগকে এক অপূর্ব্ব মহা সাধনায় দীক্ষিত করিতে হইবে। নব আমেরিকার সৌভাগ্য-বিধাতা ক্ষণ-জন্মা জর্জ্জ ওয়াশিংটন্, ফ্রাঙ্কলীন্, ও জেফারসন্ প্রভৃতি মহা মনীষী ও মনস্বীগণ যেরূপ ধর্ম্মভাবে বিভোর হইয়া স্বদেশের কল্যাণের জন্য কঠোর সাধনা করিয়াছিলেন, বৃটিস রাজতরণীর মহাশক্তিশালী কর্ণধার মহাপ্রাণ ধর্ম্মবীর ও কর্ম্মবীর গ্লাডষ্টোন ও তাঁহার সহৃদয় ধর্ম্মানুরাগী সহচর ও মন্ত্র শিষ্যগণ যেরূপ ধর্ম্মভাবে বিভোর হইয়া জাতির কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন, নব ইটালীর উদ্ধার কর্ত্তা সন্ন্যাসী ম্যাজিনি যোগরত তপস্বীর ন্যায় ধর্ম্মভাবে বিভোর হইয়া স্বদেশের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বিশুষ্ক কঙ্কাল রাশিতে যেরূপ আক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে মহাসাধনা প্রভাবে নব জীবন সঞ্চার করিয়াছিলেন, ভারতভূমির বরেণ্য ও সম্পূজ্য প্রাতঃস্মরণীয় সমুজ্জ্বল রত্ন তুল্য রাণা প্রতাপ ও শিবাজী প্রভৃতি সুসন্তানগণ যে মহা সাধনা-প্রভাবে জন্মভূমির মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন, সেইরূপ ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া সেইরূপ বিরাট সাধনায় দীক্ষিত হইয়া সহৃদয় দেশনায়কগণ স্বদেশের বর্ত্তমান কুলতিলক ও ভবিষ্য বংশীয়গণের ধর্ম্মশিক্ষাদানের সুব্যবস্থা ও তাহাদিগকে ধর্ম্ম পথে পরিচালিত করিতে পারিলে দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধনে সক্ষম হইবেন। আমরা যদি ধর্ম্মকে সযত্নে রক্ষা করি, তাহা হইলে স্বয়ং ধর্ম্মরাজ আমাদিগকে রক্ষা করিবেন।

"ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষকান্।"

চিত্র পরিচয়।

মহাকাশ-গোলক।

এই চিত্রের উপরের অংশে ব্রহ্মের স্থান এবং নিম্নাংশে জড়া প্রকৃতির স্থান দেখান হইয়াছে। ব্রহ্মের দিকে বিদ্যার এবং জড়া প্রকৃতির দিকে অবিদ্যার অধিকার। বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়েরই সপ্ত স্তর। অবিদ্যার স্তর সমূহকে সপ্ত অজ্ঞানভূমি এবং বিদ্যার স্তর সমূহকে সপ্ত জ্ঞান ভূমি বলে। জীব জড়া প্রকৃতির নিম্নতম স্তর হইতে উৎপন্ন হইয়া সপ্ত অজ্ঞান ভূমি ও সপ্ত জ্ঞান ভূমি অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হইয়া মুক্তিলাভ করে।

সপ্ত অজ্ঞান ভূমির নাম নিম্ন হইতে যথাক্রমে যথা,—উদ্ভিজ্জ চিদাকাশ, স্বেদজ চিদাকাশ, অণ্ডজ চিদাকাশ, জরায়ুজ চিদাকাশ, দেহাত্মবাদ, দেহাতিরিক্ত আত্মবাদ ও আত্মাতিরিক্ত শক্তিবাদ; অর্থাৎ প্রথম চারিটি অজ্ঞানভূমি উদ্ভিজ জীব, স্বেদজ জীব, অণ্ডজ জীব এবং জরায়ুজ জীবের সমষ্টি চিদাকাশে বর্ত্তমান। তাহার পর পঞ্চম অজ্ঞানভূমি দেহাত্মবাদী নাস্তিক অথবা চার্ব্বাকাদি দার্শনিক-দিগের অন্তঃকরণে বর্ত্তমান। তাহার পরের ষষ্ঠ অজ্ঞানভূমি দেহাতিরিক্ত আত্মবাদী দার্শনিকদিগের অন্তঃকরণে বিদ্যমান। এবং সর্ব্বশেষ সপ্তম অজ্ঞানভূমি আত্মাতিরিক্ত শক্তিবাদ প্রচারকারী দার্শনিকদিগের অন্তঃকরণে থাকে। এই শেষোক্ত তিনটি অজ্ঞান ভূমির সহিত পৃথিবীর সকল অবৈদিক দার্শনিক মতের সামঞ্জস্য আছে। সপ্ত জ্ঞানভূমির নাম—জ্ঞানদা, সন্ন্যাসদা, যোগদা, লীলোন্মুক্তি, সৎপদা, আনন্দপদা ও পরাৎপরা। এই সপ্ত জ্ঞানভূমির সহিত যথাক্রমে বৈদিক সপ্তদর্শনের সামঞ্জস্য আছে। যথা জ্ঞানদার সহিত ন্যায়দর্শনের সন্ন্যাসদার সহিত বৈশেষিক দর্শনের, যোগদার সহিত যোগদর্শনের, লীলোন্মুক্তির সহিত সাংখ্যদর্শনের, সৎপদার সহিত কর্ম্ম মীমাংসা দর্শনের, আনন্দপদার সহিত দৈবী মীমাংসা দর্শনের এবং পরাৎপরার সহিত ব্রহ্মমীমাংসা অর্থাৎ বেদান্ত দর্শনের সামঞ্জস্য আছে।

জীব অবিদ্যার প্রথম চারিভূমি প্রকৃতির স্বাভাবিক প্রবাহে এবং পরবর্ত্তী তিন ভূমি ও বিদ্যার সাত জ্ঞান ভূমি সাধনা প্রভাবে অতিক্রম করে এবং অন্তে পরব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হইয়া মুক্তি লাভ করে।

এই সপ্ত অজ্ঞানভূমি এবং সপ্ত জ্ঞানভূমির রহস্য মহর্ষি ভরদ্বাজ কথিত কর্ম্ম মীমাংসাদর্শনে বিস্তৃতভাবে পাওয়া যায় এবং এই গোলকের বর্ণন শ্রীভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডল হইতে প্রকাশিত শ্রীধীশ গীতায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীগোপালচন্দ্র বেদান্তশাস্ত্রী।

নারীধর্ম্ম।

[স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী।]

বিবাহকাল।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এই সকল শাখা প্রশাখা সতীর চিত্তক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত থাকে এবং সাধারণ লোকেও এগুলিকে দেখিতে পায়। সতীত্বরূপী কল্পতরু আশীর্য সুন্দর পল্লবে সুশোভিত। সতীর ক্রিয়া কলাপই এই সকল পল্লব। উহা অগণিত এবং বিবিধ হইলেও একবর্ণাত্মক। কারণ পতি ভিন্ন সতীর দ্বিতীয় দেবতা আর কেহই নাই। সকল ক্রিয়া পতিদেবতার পূজার জন্যই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। গৃহকার্য্য, নিজহস্তে রন্ধন, স্বয়ং পরিবেশন, অলঙ্কার ধারণ আদি সকল কার্য্য সতী কেবল পতির জন্যই করিয়া থাকেন। যে কার্য্যে পতিপূজা নাই, উহা অন্যভাবে মূল্যবান্ হইলেও, সতীর হৃদয়ে উহার কোনই মূল্য নাই। এজন্য সতীত্বরূপী কল্পতরুর পত্রগুলি বিবিধ হইলেও একবর্ণাত্মক। কল্পতরুর ফুল কোথায়? যদি দেখিতে চান, একটু কাছে আসুন। যে গৃহে সতীমাতা বিরাজমান, তথায় দাস দাসী, কুটুম্ব, প্রিয়জন, পরিবারবর্গ সকলেই আনন্দ-চিত্ত, কলহ-শূন্য, বিনয়ী এবং কর্ত্তব্য-পরায়ণ হইয়া থাকে। বাটীর পুত্রকন্যাগুলিও সরলস্বভাব, উদার, ধার্ম্মিক এবং ঈর্ষ্যাশূন্য হয়। যেন সতীমাতার কুক্ষিতে নিবাস করিয়া কল্পতরুর পুষ্পসৌরভে আমোদিত হইয়া উঠিয়াছে। এই সৌরভময় মধুর ভাবই সতীত্বরূপী কল্পতরুর পুষ্প এবং ইহারই সুগন্ধে ও সংস্পর্শে সংসার পবিত্রতাময়, ভক্তিময় এবং আর্য্য-গৌরবময় হইয়া থাকে। এইভাবে আর্য্যমনীষিগণ সতীত্বরূপী কল্পতরুর বর্ণনা করিয়াছেন।

সতী-ধর্ম্মের প্রশংসাবাদ

সতীত্ব ধর্ম্মের মহিমা বর্ণন প্রসঙ্গে পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ অনেক কথা লিখিয়াছেন। মনুসংহিতায় আছে—

প্রজনার্থং মহাভাগা পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।
স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন॥
পতিং যা নাভিচরতি মনোবাগ্‌দেহসংযতা।
সা ভর্ত্তৃলোকমাপ্নোতি সদ্ভিঃ সাধ্বীতি চোচ্যতে॥

সন্তান প্রসব করেন বলিয়া মহাভাগ্যবতী, পূজনীয়া, গৃহের জ্যোতিঃ-স্বরূপিণী স্ত্রী এবং লক্ষ্মীর মধ্যে কোনই ভেদ নাই। যিনি শরীর, মন অথবা

বচনের দ্বারা নিজ পতি ভিন্ন অন্য কোন পুরুষে রত নহেন, তাঁহাকে সতী বলা হয়। এরূপ স্ত্রী অবশ্যই আনন্দময় পতিলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—

মৃতে জীবতি বা পত্যৌ যা নান্যমুপগচ্ছতি।
সেহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি মোদতে চোময়া সহ॥

পতির জীবিতাবস্থায় অথবা মৃত্যুর পরে যে স্ত্রী অন্য পুরুষের আকাঙ্ক্ষা করেন না, ইহলোকে তাঁহার যশোলাভ এবং পরলোকে ভগবতী উমার সহিত সানন্দে বিহার হইয়া থাকে। দক্ষসংহিতায় লেখা আছে—

অনুকূলা ন বাগ্‌দুষ্টা দক্ষা সাধ্বী প্রিয়ম্বদা।
আত্মগুপ্তা স্বামিভক্তা দেবতা সা ন মানুষী॥

যে স্ত্রী পতির ইচ্ছানুকূল আচরণ করিয়া থাকেন, কটুবাক্য কহেন না, গৃহকর্য্যে পরম নিপুণা, সাধ্বী এবং প্রিয়ভাষিণী হন, যিনি নিজ ধর্ম্মের রক্ষা করত সদাই পতি-চরণানুরাগিণী, এরূপ স্ত্রী মানবী নহেন কিন্তু সাক্ষাৎ দেবী। মহর্ষি যম বলিয়াছেন—

একদৃষ্টিরেকমনা ভর্ত্তুর্বচনকারিণী।
তস্যা বিভীমহে সর্ব্বে যে তথাহন্যে তপোধন!॥
দেবানামপি সা সাধ্বী পূজ্যা পরমশোভনা॥
ভর্ত্তুর্মুখং প্রপশ্যন্তী ভর্ত্তুশ্চিত্তানুসারিণী।
বর্ত্ততে চ হিতে ভর্ত্তুর্মৃত্যুদ্বারং ন পশ্যতি॥

একদৃষ্টি এবং একচিত্ত হইয়া যিনি পতির আজ্ঞানুসারে কার্য্য করেন এরূপ সতী স্ত্রীকে দেখিয়া মহর্ষি যমের মত তপস্বিগণও ভয় পাইয়া থাকেন। এরূপ শোভনশীলা সতী দেবতাদিগেরও পূজনীয়া। পতিমুখাপেক্ষিণী, পতিচিত্তানুগামিনী এবং পতি-হিতরতা সতী স্ত্রীকে মৃত্যুদ্বার আর দেখিতে হয় না। তিনি পতিদেবতায় তন্ময় হইয়া অমরত্বলাভ করেন। এইরূপে স্মৃতি-শাস্ত্রে সতীধর্ম্মের অনন্ত মহিমা বর্ণিত হইয়াছে।

সতী গৃহিণীর কর্ত্তব্য বিবেচন

সতী গৃহিণীর কর্ত্তব্য বিষয়ে আর্য্য শাস্ত্রে নানাপ্রকার আজ্ঞা দেখিতে পাওয়া যায়। মহর্ষি ভৃগু বলিয়াছেন—

পতিব্রতাৎ পরং নাস্তি স্ত্রীণাং শ্রেয়স্করং ব্রতম্।
ধর্ম্মং কামঞ্চ মোক্ষঞ্চ সর্ব্বমাপ্নোত্যতো যতঃ॥
অন্যেষামন্যধর্ম্মঃ স্যাৎ স্ত্রীণাং পতিনিষেবণম্॥

তীর্থস্নানার্থিনী নারী পতিপাদোদকং পিবেৎ।
বিষ্ণোর্ব্বা শঙ্করাদ্বাপি পতিরেবাধিকঃ প্রিয়ঃ॥

স্ত্রীজাতির পক্ষে পতিব্রত অপেক্ষা শ্রেয়স্কর আর কোন ব্রতই নাই, কারণ ইহার দ্বারাই স্ত্রীজাতি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সকলই প্রাপ্ত হইতে পারেন। অন্যের পক্ষে অন্যধর্ম্ম থাকিলেও স্ত্রীজাতির পক্ষে পতিসেবাই একমাত্র ধর্ম্ম। তীর্থস্নানের ইচ্ছা হইলে সতী স্ত্রী পতির পাদোদক পান করিবেন, কারণ স্ত্রীর পক্ষে বিষ্ণু এবং শঙ্কর হইতেও পতি অধিক প্রিয় এবং পূজ্য। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে লেখা আছে—

সর্ব্বদানং সর্ব্বযজ্ঞঃ সর্ব্বতীর্থ-নিষেবণম্।
সর্ব্বং ব্রতং তপঃ সর্ব্বমুপবাসাদিকঞ্চ যৎ॥
সর্ব্বধর্ম্মঞ্চ সত্যঞ্চ সর্ব্বদেবপ্রপূজনম্।
তৎ সর্ব্বং স্বামিসেবায়াঃ কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥

সকল প্রকার দান, যজ্ঞ, তীর্থ-সেবা, ব্রত, তপ, উপবাস, ধর্ম্ম, সত্য, এবং দেবপূজা দ্বারা যে পুণ্য হয়, পতিসেবা জনিত পুণ্যের উহা ষোড়শাংশের একাংশও নহে। মহর্ষি ভৃগু বলিয়াছেন—

মিতং দদাতি হি পিতা মিতং ভ্রাতা মিতং সুতঃ।
অমিতস্য চ দাতারং ভর্ত্তারং কা ন পূজয়েৎ॥
ভর্ত্তা দেবো গুরুর্ভর্ত্তা ভর্ত্তা তীর্থব্রতানি চ।
তস্মাৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্য পতিমেকং সমর্চ্চয়েৎ॥

পিতা, ভ্রাতা অথবা পুত্র পরিমিত দান করিয়া থাকেন। কেবল পতিই স্ত্রীকে অসীম দান করেন। অতএব এরূপ পতির সেবা সকল স্ত্রীরই করা উচিত। পতিই স্ত্রীর আরাধ্য দেবতা, গুরু, তীর্থ এবং পরম ব্রত স্বরূপ। অতএব সমস্ত ত্যাগ করিয়া পতিপূজা করা কর্ত্তব্য। পদ্মপুরাণে বর্ণিত আছে—

পত্যুঃ পাদং দক্ষিণঞ্চ প্রয়াগং দ্বিজসত্তম!
বামঞ্চ পুষ্করং তস্য যা নারী পরিপালয়েৎ॥
তস্য পাদোদকং বন্দেৎ স্নানাৎ পুণ্যং প্রজায়তে।
প্রয়াগঃ পুষ্করো ভর্ত্তা বরস্ত্রীণাং ন সংশয়ঃ॥

মথানাং যজনাৎ পুণ্যং যদ্বৈ ভবতি দীক্ষিতে।
বহুপুণ্যমবাপ্নোতি যা তু ভর্ত্তরি সুব্রতা ॥
গয়াদীনাং সুতীর্থানাং যাত্রাং কৃত্বা হি যদ্ভবেৎ।
তৎফলং সমবাপ্নোতি ভর্ত্তৃশুশ্রূষণাদপি ॥
সমাসেন প্রবক্ষ্যামি তন্মে নিগদতঃ শৃণু।
নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ্‌ধর্ম্মো ভর্ত্তৃশুশ্রূষণং বিনা ॥

সতী স্ত্রীর পক্ষে পতির দক্ষিণ চরণ প্রয়াগ এবং বাম চরণ পুষ্কর তীর্থ। অতএব তীর্থ সেবার ইচ্ছা হইলে সতী স্ত্রী পতির পবিত্র পাদোদক পান করিবেন এবং তীর্থ স্নানের ইচ্ছা হইলে পতির পাদোদকে স্নান করিবেন। পতিই সতী স্ত্রীর পক্ষে প্রয়াগ এবং পুষ্কর তীর্থ ইহাতে সন্দেহ নাই। বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান অথবা গয়াদি তীর্থ যাত্রা দ্বারা যাহা কিছু পুণ্যলাভ হয়, একমাত্র পতিসেবা দ্বারা সতী স্ত্রী সে সকলই প্রাপ্ত হইতে পারেন। সারকথা এই যে পতি-সেবা ভিন্ন স্ত্রীজাতির পক্ষে দ্বিতীয় ধর্ম্ম আর নাই। আদর্শ সতী সীতার স্বভাব বর্ণনা প্রসঙ্গে শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রও এইরূপ ভাবে লক্ষণকে বলিয়াছিলেন যথা—

কার্য্যেষু মন্ত্রী করণেষু দাসী
ধর্ম্মেষু পত্নী ক্ষময়া ধরিত্রী।
স্নেহেষু মাতা শয়নেষু রম্ভা
রঙ্গে সখী লক্ষণ! সা প্রিয়া মে ॥

সীতা কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ সময়ে মন্ত্রীর ন্যায় সৎপরামর্শ দেন, কর্ত্তব্যানুষ্ঠান সময়ে দাসীর মত সেবা করেন, ধর্ম্মকার্য্যে অর্দ্ধাঙ্গিনী সহধর্ম্মিণীর মত আচরণ করেন, ক্ষমাপ্রদর্শনে বসুন্ধরার মত ভাব দেখান, তিনি মাতার মত স্নেহশীলা, রম্ভার মত রতি-সুখদায়িনী এবং সখীর মত প্রমোদ-প্রদান-কারিণী। ইহাই সতী গৃহিণীর পতিসেবা বিষয়ে আদর্শ স্থানীয় আচরণ। এইভাবে শরীর, মন, প্রাণ সমর্পণ করত পতিদেবতার পূজা করিলে গৃহিণীজীবনে পাতিব্রত্য ধর্ম্মের চরিতার্থতা হইয়া থাকে। পরাশর, ব্যাস, বশিষ্ঠ, আপস্তম্ভ, যাজ্ঞবল্ক্য আদি মহর্ষিগণ এই পাতিব্রত্যধর্ম্মের চরিতার্থতার জন্য গৃহিণী-জীবনে অবশ্য পালনীয় অনেক কর্ত্তব্যের বিধান করিয়াছেন। যথা—

সংযতোপস্করা দক্ষা হৃষ্টা ব্যয়পরাঙ্মুখী।
কুর্য্যাচ্ছ্বশুরয়োঃ পাদবন্দনং ভর্ত্তৃতৎপরা ॥
অহঙ্কারং বিহায়াথ কামক্রোধৌ চ সর্ব্বদা।
মনসো রঞ্জনং পত্যুঃ কার্য্যং নান্যস্য কস্যচিৎ ॥

সতী গৃহিণী গৃহের সমস্ত দ্রব্যকে যথাস্থানে সাজাইয়া রাখিবেন। গৃহকার্য্যে সুনিপুণা, হৃষ্টচিত্তা এবং অতিব্যয়-পরাঙ্মুখিনী হইবেন। শ্বশুর ও শ্বশ্রূর পাদ-বন্দনা করিবেন এবং পতিপরায়ণা হইবেন। অহঙ্কার, কাম এবং ক্রোধ পরিত্যাগ করত সর্ব্বদা একান্তরতি হইয়া পতির মনোরঞ্জন করিবেন।

ক্ষেত্রাদ্ বনাদ্বা গ্রামাদ্বা ভর্ত্তারং গৃহমাগতম্।
প্রত্যুত্থায়াভিনন্দেত আসনেনোদকেন চ ॥
ততোঽন্নসাধনং কৃত্বা স্বভর্ত্রে বিনিবেদ্য তৎ।
বৈশ্বদেবকৃতৈরন্নৈর্ভোজনীয়াংশ্চ ভোজয়েৎ ॥
প্রসন্নবদনা নিত্যং কালে ভোজনদায়িনী।
ভুক্তবন্তং তু ভর্ত্তারং ন বদেৎ কিঞ্চিদপ্রিয়ম্ ॥
পতিনৈবাভ্যনুজ্ঞাতঃ শিষ্টমন্নাদ্যমাত্মনা।
ভুক্ত্বা নয়েদহঃশেষমায়ব্যয়বিচিন্তয়া ॥
পুনঃ সায়ং পুনঃ প্রাতর্গৃহশুদ্ধিং বিধায় চ।
কৃতান্নসাধনা সাধ্বী সুভৃশং ভোজয়েৎ পতিম্ ॥
নাতিতৃপ্তা স্বয়ংভুক্ত্বা গৃহনীতিং বিধায় চ।
আস্তীর্য্য সাধুশয়নং ততঃ পরিচরেৎ পতিম্ ॥

স্থানান্তর হইতে পতি গৃহে আসিলে সতী স্ত্রী দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে প্রত্যুত্থান দিবেন এবং আসন ও পদধৌত করিবার জন্য জল দান করিবেন। তদনন্তর ভোজন প্রস্তুত করত পতিকে নিবেদন করিবেন এবং বলি-বৈশ্বদেবানুষ্ঠানের পর পতি ও অন্যান্য কুটুম্বকে ভোজন করাইবেন। সর্ব্বদা প্রসন্নবদনা থাকিবেন, যথাসময়ে পতিকে ভোজ্য দ্রব্য প্রস্তুত করত খাওয়াইবেন, ভোজনের সময় তাঁহাকে কোনরূপ অপ্রিয় কথা বলিবেন না, তাঁহার ভোজন শেষ হইলে আজ্ঞা লইয়া অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করিবেন এবং আয় ব্যয়ের চিন্তা করত অপরাহ্ণ কাল যাপন করিবেন। এইরূপে সায়ংকালে এবং পুনঃ

প্রাতঃকালে গৃহশুদ্ধি করত ভোজন প্রস্তুত করিয়া পতিকে ভোজন করাইবেন এবং স্বয়ং মিতাহার করিবেন। তদনন্তর সন্ধ্যাকালে সমুদায় গৃহকার্য্য সমাপ্ত করিয়া পতির জন্য শয্যা প্রস্তুত করিবেন এবং পতিসেবা করিবেন।

আসনে ভোজনে দানে সম্মানে প্রিয়ভাষণে।
দক্ষয়া সর্ব্বদা ভাব্যং ভার্য্যয়া গৃহমুখ্যয়া ॥
অন্যালাপমসন্তোষং পরব্যাপারবর্ণনম্।
অতিহাসাতিরোষাতিকামঞ্চ পরিবর্জয়েৎ ॥
যচ্চ ভর্ত্তা ন পিবতি যচ্চ ভর্ত্তা ন চেচ্ছতি।
যচ্চ ভর্ত্তা ন চাশ্নাতি সর্ব্বং তদ্‌বর্জ্জয়েৎ সতী ॥
নোচ্চৈর্বদেন্ন পরুষং ন বহূন্ পত্যুরপ্রিয়ম্।
ন কেনচিদ্বিবদেচ্চ অপ্রলাপবিলাপিনী ॥
ন চাতিব্যয়শীলা স্যান্ন ধর্ম্মার্থবিরোধিনী।
প্রমাদোন্মাদরোষের্ষ্যাবঞ্চনঞ্চাতিমানিতাম্ ॥
পৈশুন্যহিংসাবিদ্বেষমহাহঙ্কারধূর্ত্ততাঃ।
নাস্তিক্যসাহসস্তেয়দম্ভান্ সাধ্বী বিবর্জ্জয়েৎ ॥
এবং পরিচরন্তী সা পতিং পরমদৈবতম্।
যশঃ শমিহ যাত্যেব পরত্র চ সলোকতাম্ ॥

আসন, ভোজন, দান, সম্মান এবং প্রিয়ভাষণ বিষয়ে গৃহশ্রেষ্ঠা গৃহিণীর সদাই নিপুণা হওয়া উচিত। পরচর্চ্চা, অসন্তোষ, অতিহাস্য, অতিরোষ এবং অতিকাম পরিত্যাগ করা উচিত। পতি যে সকল দ্রব্য চান না অথবা ভোজন করেন না, সতী স্ত্রীর সে সকল ত্যাগ করা উচিত। উচ্চস্বরে কথা বলা, কটু বচন বলা, অতিরিক্ত অথবা অপ্রিয় কথা বলা, বিবাদ, প্রলাপ ও বিলাপ—এ সকল সতী গৃহিণীর ত্যাগ করা উচিত। সতী অধিক ব্যয়শীলা হইবেন না, পতির ধর্ম্ম বা অর্থ সাধন বিষয়ে বাধক হইবেন না, এবং প্রমাদ, উন্মাদ, ক্রোধ, ঈর্ষ্যা, বঞ্চনা, অতিমানিতা, খলতা, হিংসা, বিদ্বেষ, অহঙ্কার, ধূর্ত্ততা, নাস্তিকতা, দুঃসাহস, চৌর্য্য ও দম্ভাদি দোষ ত্যাগ করিবেন। এইভাবে পরম দেবতা পতির পরিচর্য্যা করিলে সতী স্ত্রী ইহলোকে কীর্ত্তি ও কল্যাণভাগিনী এবং মৃত্যুর পর পতিলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

তৈলাভ্যঙ্গং তথা স্নানং শরীরোদ্বর্ত্তনক্রিয়াম্।
মার্জ্জনঞ্চৈব দন্তানাং কুর্য্যাৎ পতিমুদে সতী॥
ভর্ৎসিতা নিন্দিতাঽত্যর্থং তাড়িতাঽপি পতিব্রতা।
ব্যথিতাঽপি ভয়ং ত্যক্ত্বা কণ্ঠে গৃহ্ণীত বল্লভম্॥
উচ্চৈর্ন রোদনং কুর্য্যান্নৈবাক্রোশেচ্ছিশুং প্রতি।
পলায়নং ন কর্ত্তব্যং নিজগেহাদ্ বহিঃ স্ত্রিয়া॥
আহূতা গৃহকার্য্যাণি ত্যক্ত্বা গচ্ছেচ্চ সত্বরম্।
কিমর্থং ব্যাহৃতা স্বামিন্! সুপ্রসাদো বিধীয়তাম্॥
সেবেত ভর্ত্তুরুচ্ছিষ্টমিষ্টমন্নং ফলাদিকম্।
মহাপ্রসাদ ইত্যুক্ত্বা মোদমানা নিরন্তরম্॥
সুখসুপ্তং সুখাসীনং রমমাণং যথেচ্ছয়া।
অবশ্যেষ্বপি কার্য্যেষু পতিং নোত্থাপয়েৎ ক্বচিৎ॥
নৈকাকিনী ক্বচিদ্ গচ্ছেন্ন নগ্না স্নানমাচরেৎ।
ভর্ত্তৃবিদ্বেষিণীং নারীং সাধ্বী নো ভাষয়েৎ ক্বচিৎ॥
গৃহব্যয়নিমিত্তঞ্চ যদ্দ্রব্যং প্রভুণাঽর্পিতম্।
নির্ব্বর্ত্ত্য গৃহকার্য্যং সা কিঞ্চিদ্ বুদ্ধ্যাঽবশেষয়েৎ॥
ত্যাগার্থমর্পিতাদ্দ্রব্যাল্লোভাৎ কিঞ্চিন্ন ধারয়েৎ।
ভর্ত্তুরাজ্ঞাং বিনা নৈব স্ববন্ধুভ্যো দিশেদ্ধনম্॥
ছায়েবাঽনুগতা স্বচ্ছা সখীব হিতকর্ম্মসু।
দাসীবাঽদিষ্টকার্য্যেষু ভার্য্যা ভর্ত্তুঃ সদা ভবেৎ॥
গৃহিধর্ম্মধুরং সাধ্বী পত্যা সহ বহেৎ সদা।
যতো গৃহস্থধর্ম্মস্য ফলভোক্ত্রীতি কথ্যতে॥
পতির্নারায়ণঃ স্ত্রীণাং ব্রতং ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।
সর্ব্বং কর্ম্ম বৃথা তাসাং স্বামিনাং বিমুখাশ্চ যাঃ॥

তৈলমর্দ্দন, স্নান, শরীর-সংস্কার, দন্তধাবন আদি সকল কার্য্যই সতী স্ত্রী পতির প্রীতির জন্য করিবেন, নিজের জন্য করিবেন না। পতি কর্ত্তৃক অত্যন্ত ভর্ৎসিতা, নিন্দিতা, তাড়িতা অথবা ব্যথিতা হইলেও ভয় ত্যাগ করত পতির সন্তোষ বিধানের নিমিত্ত সতী স্ত্রী পতিকে কণ্ঠে ধারণ করিবেন। উচ্চৈঃস্বরে

রোদন, শিশুদের প্রতি তাড়না, অথবা নিজগৃহ হইতে পলায়ন সতী স্ত্রীর কদাপি কর্ত্তব্য নহে। পতি আহ্বান করিলে সহস্র কার্য্য পরিত্যাগ করত তৎক্ষণাৎ সতী স্ত্রী পতির নিকট উপস্থিত হইবেন এবং "স্বামিন্! কেন আহ্বান করিয়াছেন, কি আজ্ঞা" এইরূপ প্রার্থনা করিবেন। পতির উচ্ছিষ্ট অন্ন ফলাদি মহাপ্রসাদ বোধে সানন্দে গ্রহণ করিবেন। শুইয়া অথবা বসিয়া আরাম করিতেছেন কিম্বা কোনরূপ আনন্দে রত আছেন, এরূপ অবস্থায় বিশেষ আবশ্যক কার্য্য উপস্থিত হইলেও, সতী স্ত্রী পতিকে কদাপি উঠাইবেন না। একাকিনী কোথাও যাইবেন না, নগ্না হইয়া স্নান করিবেন না এবং পতি বিদ্বেষিণী স্ত্রীদিগের সহিত কদাপি বার্ত্তালাপ করিবেন না। গৃহ-ব্যয় নির্ব্বাহার্থ যে কিছু দ্রব্য পতি দিবেন তাহার দ্বারা সমস্ত ব্যয় সম্পাদন করত সাবধানতার সহিত কিছু উদ্বৃত্ত রাখিবেন। কিন্তু দানের নিমিত্ত প্রদত্ত দ্রব্যাদি হইতে লোভ বশতঃ কিছু বাঁচাইবেন না এবং পতির আজ্ঞা ব্যতীত নিজ কুটুম্বদিগকেও কোন দ্রব্যাদি প্রদান করিবেন না। পবিত্রচিত্ত হইয়া ছায়ার ন্যায় পতির অনুবর্ত্তন করিবেন, তাঁহার হিতকর কার্য্যে সখীর মত এবং আদিষ্ট কার্য্যে দাসীর মত আচরণ করিবেন। গৃহস্থাশ্রমের সকল ভারই সতী গৃহিণী পতির সহিত বহন করিবেন যেহেতু অর্দ্ধাঙ্গিনী সতী সমস্ত গার্হস্থ্যধর্ম্মেরই ফলভোক্ত্রী হইয়া থাকেন। সতী স্ত্রীর পক্ষে পতি সাক্ষাৎ নারায়ণরূপ, সমস্ত ব্রত এবং সনাতন ধর্ম্মরূপ হইয়া থাকেন, তাঁহার অনিচ্ছায় স্ত্রীর দ্বারা আচরিত সমস্ত কার্য্যই বৃথা হইয়া থাকে। এইরূপে আর্য্যশাস্ত্রে সতী গৃহিণীর নিত্য কর্ত্তব্যের বিধান করা হইয়াছে।

সতী গৃহিণীর নৈমিত্তিক কর্ম্ম

তদনন্তর মহর্ষিগণ সতীগৃহিণীর নৈমিত্তিক কৃত্য সমূহের বিধান করিয়াছেন, যথা ব্যাসসংহিতায়—

যোষিতো নিত্যকর্ম্মোক্তং নৈমিত্তিকমথোচ্যতে।
রজোদর্শনতো দোষান্ সর্ব্বমেব পরিত্যজেৎ॥
সর্ব্বৈরলক্ষিতা শীঘ্রং লজ্জিতাহন্তর্গৃহে বসেৎ।
একাম্বরবৃতা দীনা স্নানালঙ্কারবর্জ্জিতা॥
মৌনিন্যধোমুখী চক্ষুঃপাণিপদ্ভিরচঞ্চলা।
অশ্নীয়াৎ কেবলং ভক্তং নক্তং মৃণ্ময়ভাজনে॥

আর্য্যজাতি

[স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী]

আদি নিবাস নির্ণয়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

স্বর্গ উর্দ্ধলোক বলিয়া তথায় প্রকাশের আধিক্য হওয়া শাস্ত্র ও বিজ্ঞান-সিদ্ধ। সুতরাং স্বর্গে ছয় মাস দিন ছয় মাস রাত্রি হইতে পারে না। পৃথিবীর গতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ লোকেরা জানেন যে বিষুব রেখার উপরিস্থিত এবং নিকটবর্ত্তী প্রদেশেই সূর্য্যরশ্মি অধিক পতিত হয়; এইজন্য উত্তর দিকের প্রদেশ সমূহে উত্তাপ কম হওয়ায় শীত অধিক হয় সুতরাং উত্তর মেরুতে শৈত্যাধিক্য হওয়া প্রকৃতিসিদ্ধ। পৃথিবীর জন্ম হইতেই এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে। সেখানে কোন সময়ে চিরবসন্ত বিরাজমান ছিল, জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আর্য্যগণ সেখানে বাস করিতেন, পরে শীত অধিক হওয়ায় সহ্য করিতে না পারিয়া তথা হইতে পলায়ন করিয়াছেন—এইরূপ সিদ্ধান্ত ভূগোল-বিদ্যারও অনুমোদিত নহে, হিন্দু শাস্ত্রে স্বর্গের যেরূপ বর্ণন পাওয়া যায় তাহা হইতেও এই মত সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। যদি স্বর্গের এইরূপ দুর্দ্দশা হয় তবে এত তপস্যা ও যজ্ঞ করিয়া কেন রাজর্ষি মহর্ষিরা স্বর্গের কামনা করিবেন এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই বা কেন গীতায়

অশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্

এই প্রকার স্বর্গের মহিমা বর্ণন করিবেন? অতএব উক্ত প্রকার কল্পনা সর্ব্বথা ভ্রমাত্মক। চতুর্দ্দশ ভুবন ও স্বর্গাদি লোকের রহস্য অতি সূক্ষ্ম বিজ্ঞান-পূর্ণ। অধ্যাত্ম, অধিদৈব ও অধিভূত এই তিন ভাব যাহারা না বোঝেন তাহারা সহজে এই বিষয়টী বুঝিতে পারিবেন না। স্বর্গাদি লোক সূক্ষ্ম ও অতিন্দ্রিয়, এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণন স্থানান্তরে করা হইবে। যখন বেদের বর্ণনা অনুসারে উত্তর মেরুর অবস্থা পূর্ব্বের ন্যায় এখনও রহিয়াছে তবে আর্য্যগণ সেখান হইতে এখানে আসিলেন কেন? প্রথমে সেখানে শীত কম ছিল, মধ্যে শীত বাড়িয়াছিল এবং এখন আবার কমিয়াছে এরূপ সিদ্ধান্ত বেদ ও যুক্তি বিরুদ্ধ। আর এইরূপ হইলেও আর্য্যগণ সেখানে থাকিতেন এরূপ কল্পনার ভিত্তি কি? বেদে কেবল শৈত্যাধিক্যেরই বর্ণন নাই। বেদে যে প্রকার শীতের বর্ণন আছে সেইরূপ হেমন্ত, শরৎ, গ্রীষ্ম প্রভৃতিরও বর্ণন রহিয়াছে। ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলে শরৎ ঋতুর, পঞ্চম ও ষষ্ঠ মণ্ডলে হেমন্ত ঋতুর, দশম মণ্ডলে গ্রীষ্ম ও বসন্ত ঋতুর এবং অনেক স্থানে শীত ঋতুর বর্ণন রহিয়াছে। যদি বেদে শীতের বর্ণন দেখিয়া শীতপ্রধান উত্তরমেরু আর্য্যজাতির আদি বাসস্থান ছিল এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হয় তবে বেদে শরৎ, হেমন্ত, বসন্ত ও গ্রীষ্ম প্রভৃতি ঋতুর বর্ণন দেখিয়া যে যে স্থানে

এই সকল ঋতুর প্রাধান্য আছে সেই সেই স্থানেও আর্য্যজাতি প্রাচীনকালে বাস করিতেন এবং তথা হইতে এদেশে আগমন করিয়াছেন এইরূপ বলিতে হইবে। এই প্রকার কল্পনার ফলে আর্য্যজাতির আদি নিবাসস্থান সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তই স্থিরীকৃত হইতে পারিবে না। যদি বেদ-বর্ণিত ঋতুর দ্বারা আর্য্যজাতির আদি বাসস্থান নির্ণয় করিতে হয় তবে ধীর ভাবে বিচার করিলে সমীচীন সিদ্ধান্ত এই হইবে যে, যখন বেদে সকল ঋতুরই সমান ভাবে বর্ণন দেখিতে পাওয়া যায় তখন যেখানে সকল ঋতুই ভ্রাতৃভাবে বিরাজমান পূর্ণ-প্রকৃতিযুক্ত সেই স্থানই আর্য্যগণের আদি নিবাসস্থান। এবং পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র ভারতবর্ষই এইরূপ সর্ব্বর্ত্তু-সমাযুক্ত দেশ। সুতরাং বিচার, শাস্ত্রীয় প্রমাণ, ইতিহাস, ভূগোলাদি সমস্ত প্রমাণের দ্বারাই সিদ্ধান্ত হইল যে ভারতবর্ষই আর্য্যজাতির আদি নিবাসস্থান।

কাহারও কাহারও মতে আদি সৃষ্টি তিব্বত হইতে হইয়াছে। বিচার ও প্রমাণ বিরুদ্ধ বলিয়া এই মতও গ্রহণ-যোগ্য নহে। তিব্বত শীত প্রধান স্থান। তথায় ছয় ঋতুর বিকাশ হয় না সুতরাং সে স্থান পূর্ণ-প্রকৃতিযুক্ত নহে। অতএব পূর্ব্বকথিত বিজ্ঞান অনুসারে অপূর্ণ-প্রকৃতিযুক্ত স্থান তিব্বতে পূর্ণ-প্রকৃতিযুক্ত আর্য্যগণ উৎপন্ন হইতে পারেন না। মধ্য এশিয়া প্রভৃতি স্থান হইতে আর্য্যদের এদেশে আগমন সম্বন্ধে যে সকল যুক্তি প্রদত্ত হইয়া থাকে তিব্বতের পক্ষে তাহাও নাই। সুতরাং যুক্তি-প্রমাণ-হীন এমত গ্রহণীয় নহে। আর তিব্বত শব্দকে ত্রিবিষ্টপ (স্বর্গ) শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া স্বর্গ হইতে দেবপ্রতিম আর্য্যগণের উৎপত্তি স্বীকার করাও ভ্রমযুক্ত। কারণ পূর্ব্বসিদ্ধান্তানুসারে আর্য্যগণই আদি সৃষ্টিতে উৎপন্ন মানব, কিন্তু তাঁহারা যে স্বর্গে উৎপন্ন হইয়াছিলেন একথা শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। মনুসংহিতায় আছে,—

তস্মিন্নণ্ডে স ভগবানুষিত্বা পরিবৎসরম্।
স্বয়মেবাত্মনো ধ্যানাত্তদণ্ডমকরোদ্দ্বিধা॥
তাভ্যাঞ্চ শকলাভ্যাঞ্চ দিবং ভূমিঞ্চ শাশ্বতম্।
মধ্যে ব্যোম দিশশ্চাষ্টাবপাং স্থানঞ্চ নির্ম্মমে॥

প্রজাপতি ব্রহ্মা সমুদায় সৃষ্টির আধাররূপ অণ্ডের মধ্যে এক বর্ষ বাস করিয়া ধ্যানবলে উহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন। উপরের খণ্ডে স্বর্গাদি এবং নীচের খণ্ডে পৃথিবী প্রভৃতি লোক সৃষ্টি করিলেন। এইরূপ সৃষ্টির প্রাক্কালে

স্বর্গ ও পৃথিবী প্রভৃতি লোক সৃষ্ট হইবার পর স্বর্গে দিব্য সৃষ্টি এবং পৃথিবীতে মনুষ্য সৃষ্টি আরম্ভ হয়। এই মনুষ্য সৃষ্টিতেই প্রথম উৎপন্ন পূর্ণ মানব আর্য্যঋষিগণ, তাহার প্রমাণ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। অতএব তিব্বতকে ত্রিবিষ্টপ অর্থাৎ স্বর্গ বলিয়া তথা হইতে প্রথম সৃষ্টি বর্ণন করা শাস্ত্র-বিরুদ্ধ কপোল-কল্পনা মাত্র। অবশেষে,পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্র-প্রমাণ ও যুক্তি অনুসারে এই সিদ্ধান্তই স্থিরীকৃত হইল যে এই ভারতবর্ষই আর্য্যজাতির আদি নিবাসস্থান।

প্রসঙ্গত 'হিন্দু' শব্দ সম্বন্ধে বিচার করা হইতেছে। হিব্রু ভাষায় 'হন্দ্' শব্দের অর্থ তেজ, গৌরব বা শক্তি। এই ভাষার 'এস্তার' নামক গ্রন্থে লেখা আছে যে, রাজা আহাসুরেশ 'হন্দ্' হইতে ইথিওপিয়া পর্য্যন্ত রাজ্য করিতেন অর্থাৎ তাহার রাজ্যের একপ্রান্তে হিন্দুস্থান ও অপর প্রান্তে মিশর দেশ ছিল। ভারতবর্ষকে তাহারা 'হন্দ্' অর্থাৎ গৌরবান্বিত দেশ বলিতেন। জেন্দা আভেস্তায় হন্দ শব্দের উৎপত্তি 'হিন্দব' শব্দ হইতে স্বীকার করা হইয়াছে এবং ইহাই গ্রীক ভাষায় 'হন্দকোশ'; 'ইন্দিকোশ' ও 'ইণ্ডিকোশ' শব্দরূপে পরিণত হইয়াছে এবং ইহা হইতেই 'হিন্দু' ও 'ইণ্ডিয়া' শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব 'হিন্দু' শব্দের অর্থ পবিত্র গৌরবান্বিত জাতি। পরসীদের অতি প্রাচীন জেন্দা আভেস্তা গ্রন্থে যখন হিন্দু জাতিকে গৌরবান্বিত জাতি বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে তখন হিন্দু শব্দ সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই। কোন কোন আধুনিক গ্রন্থে হিন্দু শব্দের নিন্দনীয় অর্থ লেখা আছে, এইরূপ বলিয়া আজকাল লোকে আপনাকে হিন্দু বলিতে সঙ্কুচিত হইয়া থাকেন, তাহাদের এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা উপর লিখিত প্রাচীন গ্রন্থের প্রমাণের দ্বারা দূর হইয়া যাওয়া উচিত। হিন্দু শব্দ বিশেষ গৌরবান্বিত শব্দ এবং হিন্দু জাতি বলিতে আর্য্য জাতিকেই বুঝা উচিত। মেরুতন্ত্রে লেখা আছে—

হীনঞ্চ দূষয়ত্যেব হিন্দুরিত্যুচ্যতে প্রিয়ে!

হীনতার বিরোধী উচ্চ গৌরবান্বিত জাতিই হিন্দু জাতি। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে উক্ত গ্রন্থে হিন্দু শব্দ আর্য্য শব্দের পর্য্যায়বাচকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

আর্য্যজাতির সর্ব্বাঙ্গীণ পূর্ণতা।

ভারতের আকাশ অজ্ঞানের ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া জ্ঞানসূর্য্য বিলুপ্তপ্রায় হইয়া আছে। তাহারই ফলে বর্ত্তমান ভারতবাসীগণের হৃদয় হইতে প্রাচীন পিতৃপিতামহ পুণ্যশ্লোক আর্য্যগণের গৌরবস্মৃতি দিন-প্রতিদিন নষ্ট হইয়া নবীন বিদেশীয় জাতির আপাত-মনোরম ভাবসম্পদ তাহাদের চিত্ত বিমুগ্ধ করিতেছে। এবং স্বাধীন অনুসন্ধান প্রবৃত্তি নষ্ট হইয়া অনুকরণ প্রবৃত্তি বাড়িতেছে। এই সকল কারণেই ভারতের অধঃপতন হইতেছে। এইজন্য ক্রমশঃ প্রাচীন আর্য্য গৌরবের উল্লেখ করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে আর্য্য ও অনার্য্যের পার্থক্য বর্ণন করা হইবে। পাশ্চাত্য মনস্বী মোক্ষমূলর সাহেব বলিয়াছেন,— "যে জাতি আপন প্রাচীন গৌরব, ইতিহাস ও সাহিত্যে নিজেকে গৌরবান্বিত না মনে করে সে জাতি আপন জাতীয় জীবনের প্রধান আশ্রয় নষ্ট করিয়া ফেলে। যে সময় জার্ম্মাণ জাতি রাজনৈতিক অবনতির অন্ধকূপে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছিল সেই সময় তাহারা অন্য উপায়ান্তর না দেখিয়া আপন প্রাচীন সাহিত্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছিলেন এবং সেই অতীতের আলোচনার ফলে তাহাদের ভাবী আশা-লতিকা ফলে ফুলে সুশোভিত হইয়াছিল।"

যে জাতি নিজ পিতৃপুরুষের গৌরব বিস্মৃত হইয়া যায় অথবা তাঁহাদের প্রতি দোষদৃষ্টি-পরায়ণ হইয়া পড়ে সে জাতি কদাপি আপন জাতীয় জীবন উন্নত করিতে সক্ষম হয় না। আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমরা আজ আমাদের পিতৃপিতামহগণের জীবনচর্য্যায় দোষারোপণ করিয়া বিদেশীয়দের আচার ব্যবহারের অনুকরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া পড়িয়াছি এবং তাহাতেই নিজেদের গৌরব ও উন্নতি মনে করিতেছি। মনুসংহিতায় লিখিত আছে—

যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতা পিতামহাঃ।
তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তেন গচ্ছন্ন রিষ্যতে॥

পিতা পিতামহ প্রভৃতি দ্বারা প্রদর্শিত পথই উত্তম পথ। ঐ পথ অবলম্বন করিলে কোনই বিপদের সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং স্বকীয় উন্নতির নিমিত্ত আমাদের প্রাচীন আর্য্যদের সর্ব্বতোমুখী মহিমার প্রতি ঐকান্তিক দৃষ্টিপাত আবশ্যক। আর্য্যজাতি ও তদীয় নিবাস স্থান ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রোফেসর মোক্ষমূলর

বলিয়াছেন,—"সমগ্র পৃথিবীতে যদি এমন কোন দেশের কথা আমাকে বলিতে হয়, যে দেশকে প্রকৃতিমাতা নিজ ধন-ঐশ্বর্য্য ও শক্তি-সৌন্দর্য্যের দ্বারা পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন এমন কি, যে দেশকে পৃথিবীতে স্বর্গ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, তবে আমি মুক্তকণ্ঠে বলিব, সে দেশ ভারতবর্ষ। যদি আমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করে যে, কোন আকাশের নীচে মনুষ্য-অন্তঃকরণের পূর্ণতা সাধিত হইয়াছিল এবং জীবন-রহস্যের কঠিন সিদ্ধান্ত মীমাংসিত হইয়াছিল, যে মীমাংসা হইতে প্লেটো ও ক্যাণ্টের ন্যায় দার্শনিক গ্রন্থের পাঠকও জ্ঞান লাভ করিতে পারেন, তবে আমি বলিয়া দিব, সে দেশ ভারতবর্ষ। যদি আমি আমার আত্মার কাছে জিজ্ঞাসা করি যে, গ্রীক, রোমান ও সেমেটিক জাতির চিন্তাশক্তি হইতে যে দেশের চিন্তাশক্তি পরিপুষ্ট হইয়াছিল সেই ইয়ুরোপবাসী আমরা আমাদের অন্তর্জীবনকে পূর্ণ, উদার, বিশ্বব্যাপী ও মহত্ত্বপূর্ণ করিবার জন্য বিশেষতঃ ইহজীবন ব্যতীত চিরজীবনের নিমিত্ত পূর্ণোন্নত করিবার উদ্দেশ্যে কোন্ দেশের সাহিত্য ও শাস্ত্র হইতে শিক্ষা লাভ করিতে পারি? তবে আমার ভিতর হইতে এই উত্তর আসিবে, সে দেশ ভারতবর্ষ।" ভাষা, ধর্ম্ম, পুরাবৃত্ত, দর্শনশাস্ত্র, আচার, শিল্প ও বিজ্ঞান প্রভৃতি যে কোন বিষয় লোকে জানিতে চায়, সকলেরই অপূর্ব্ব ও অনুপম আদর্শ প্রকৃতি মাতার অনন্ত ভাণ্ডার এই ভারতবর্ষেই পাওয়া যাইবে। আর্য্য জাতির প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করিলে প্রোফেসর মোক্ষমূলরের কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে,—

মন্যে বিধাত্রা জগদেককাননং
বিনির্ম্মিতং বর্ষমিদং সুশোভনম্।
ধর্ম্মাখ্যপুষ্পাণি কিয়ন্তি যত্র বৈ
কৈবল্যরূপঞ্চ ফলং প্রচীয়তে॥

ভারতবর্ষ ভগবানের রচিত পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ একটী পরম রমণীয় উদ্যান; ইহাতে ধর্ম্মরূপী ফুল ও মুক্তিরূপী ফল উৎপন্ন হয়। যে প্রকার সায়ন্স ও শিল্প-কলার উন্নতিতে আধিভৌতিক উন্নতি হইয়া থাকে সেই প্রকার জ্ঞান ও আত্মতত্ত্ব বিজ্ঞানের উন্নতিতে আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত হয়। প্রাচীনকালে আর্য্যজাতি আধ্যাত্মিক উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন একথা নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করেন। যে গভীর আত্মতত্ত্বের গবেষণায় প্লেটো ও সক্রেটিসের ন্যায়

মনীষীর চিন্তাশক্তি প্রত্যাহৃত হইয়াছিল এবং স্পেন্সার ঈশ্বরতত্ত্ব অবগত হওয়া তাহার বুদ্ধির অতীত বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন, সেইস্থানে স্বীয় সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি দ্বারা আত্মতত্ত্বের পূর্ণ পর্য্যবেক্ষণ করা প্রাচীন আর্য্যঋষিগণের মহতী শক্তিরই ফল। ইহার জন্য কেবল ভারতবর্ষই নহে সমস্ত পৃথিবী তাঁহাদের নিকট চিরকাল ঋণী থাকিবে। পাশ্চাত্য দার্শনিক বিজ্ঞান ও আর্য্যজাতির দার্শনিক বিজ্ঞানের পরস্পর তুলনা করিয়া সংক্ষেপে এই বলাই যথেষ্ট হইবে যে, যেখানে অন্যদেশীয় বিজ্ঞান সমাপ্ত হইয়াছে আর্য্যজাতির বিজ্ঞান সেই স্থান হইতে আরম্ভ হইয়া অনন্ত জ্ঞান সমুদ্রে যাইয়া বিলীন হইয়াছে। যে প্রকার জ্ঞানের পূর্ণতায় পুরুষের পূর্ণতা বা মুক্তি হয় সেই প্রকার পাতিব্রত্যের পূর্ণতায় নারীজাতির পূর্ণতা বা মুক্তি হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত যে দেশের নারীগণের মধ্যে সতীধর্ম্মের পূর্ণতা দেখিতে পাওয়া যায় সেই দেশই পূর্ণোন্নত ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। সমগ্র ভূমণ্ডলে কেবল আর্য্যমাতা ভারতভূমিই এই সতীত্বের মহিমায় বিভূষিত একথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। আর্য্য নারীর জীবন আপন সুখের জন্য নহে কিন্তু পতিদেবতার পূজার জন্য। এই নিমিত্ত পতিদেবতার দেহত্যাগের পর আর্য্য রমণী একাকিনী সংসারে থাকিতে পারেন না। কারণ দেবতার বিসর্জ্জন হইয়া গেলে পর নৈবেদ্যের কি প্রয়োজন? এই হেতু শাস্ত্রে মৃত পতির সহিত সহমৃতা হইবার আদেশ পর্য্যন্ত দেওয়া হইয়াছে। প্রাচীন কালে এই আজ্ঞা পূর্ণরূপে প্রতিপালিত হইত।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের অষ্টাদশ সূক্তের অষ্টম ঋকে সঙ্কুশক ঋষি পতিবিয়োগ-কাতরা সহগমনোদ্যতা কোন স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—

উদীর্ষ্ব নার্য্যভিজীবলোকমিতাসুমেতমুপশেষ এহি।
হস্তাগ্রাভস্য দিধিষোস্তবেদং পত্যুর্জ্জনিত্যমভিসম্বভূবা॥

হে স্ত্রী! সংসারে ফিরিয়া আইস, উঠ, তুমি যাহার সহিত শয়ন করিতে যাইতেছ সে মৃত হইয়াছে এই নিমিত্ত তাহার সহিত তোমার গর্ভাধানাদি সম্বন্ধ সমাপ্ত হইয়াছে। এখন ঘরে যাইয়া পুত্রকন্যাদির সহিত বাস কর। এই মন্ত্রের তাৎপর্য্য এই যে, স্ত্রী সহমৃতা হইতে চাহিতেছেন এবং অন্য লোকেরা তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতেছেন। রাজা পাণ্ডুর মৃত্যুতে মাদ্রীর সহমরণ প্রভৃতি

আর্য্যরমণীগণের পূর্ণতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই স্থানেই পাওয়া যায়। অতএব প্রাচীন আর্য্যজাতির আধ্যাত্মিক উন্নতির পূর্ণতা সর্ব্ববাদী-সম্মত।

প্রাচীন আর্য্যজাতির মানসিক উন্নতি কতদূর হইয়াছিল, আর্য্যজাতির ব্যবহারিক জীবন সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করিলে তাহা সম্যক উপলব্ধ হইবে। যেখানে হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় মহাত্মা সত্যরক্ষার নিমিত্ত রাজ্য, ধন, স্ত্রী, পুত্র পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া দাসত্ব করিতে পারেন, যেখানে শরণাগত পক্ষীর রক্ষার নিমিত্ত শিবি রাজা আপন শরীর খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া দিতে পারেন, যেখানে আসুরী শক্তির দমনের নিমিত্ত মহর্ষি দধীচি আপন অস্থি পর্য্যন্ত দান করিতে পারেন, যেখানে ময়ূরধ্বজের ন্যায় গৃহস্থ অতিথি-সৎকারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের জন্য পতিপত্নী মিলিত হইয়া নিজ শিশু পুত্রের আপাদ মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিতে পারেন, যেখানে পিতৃসত্য প্রতিপালনের জন্য শ্রীরামচন্দ্র জটাধারণ করিয়া বনবাসী হইতে পারেন, যেখানে পিতার তৃপ্তির নিমিত্ত ভীষ্মদেব আজীবন ব্রহ্মচারী থাকিতে পারেন, যেখানে সমস্ত রাজ্য হইতে চ্যুত হইয়া এবং দারুণ বনবাস ক্লেশ সহ্য করিয়াও যুধিষ্ঠির সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে বিস্মৃত হন নাই, সেই দেশ নিবাসী জনগণের মানসিক, নৈতিক ও চারিত্রিক কতদূর উন্নতি হইয়াছিল তাহা সাধারণ বিচার-বিশিষ্ট লোকেও নির্ণয় করিতে সক্ষম। প্রাচীন আর্য্যজাতির উদারতা, সরলতা, সত্যপ্রিয়তা, সাহসিকতা, শিষ্টাচার, সদাচার, দয়া ও পরোপকারবৃত্তি প্রভৃতি দৈবী সম্পদ সমূহ জগতে আদর্শস্থল। মহর্ষি মনু নিজ সংহিতায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন,—

এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ॥

ভারত নিবাসী আর্য্য ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে পৃথিবীর অন্যান্য জাতির চারিত্রিক আদর্শ গ্রহণ করা উচিত। ইহার সত্যতা ভারতীয় ইতিহাস পাঠ করিলে উপলব্ধ হইবে। কেবল মনুর কথাই নহে অনেক বিদেশীয় ভারত ভ্রমণকারী আর্য্যজাতির অপূর্ব্ব চরিত্র ও মানসিক উন্নতি সম্বন্ধে মুক্তকণ্ঠে বার বার এই কথাই বলিয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিত চসার সত্যকে সকল ধর্ম্মের সার বলিয়াছেন। হিন্দু শাস্ত্রে—

নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ

বলিয়া সত্যেরই মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। আর্য্যজাতির সত্যবাদিতা সম্বন্ধে দ্বিতীয় শতাব্দীর ঐতিহাসিক এরিয়ান সাহেব বলিয়াছেন, "আমি কখনও কোন আর্য্যকে মিথ্যা বলিতে শুনি নাই।" গ্রীক ঐতিহাসিক ষ্ট্রাবো বলিয়াছেন, "আর্য্যেরা এত সুন্দর স্বভাবের লোক যে চোরের ভয়ে তাঁহাদের দরজায় তালা লাগাইতে হয় না এবং কোন কার্য্যের জন্য তাহাদিগকে একরার-নামা লিখিতে হয় না।" চীন দেশীয় প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী হুয়েনসাং বলিয়াছেন, "সচ্চরিত্রতা ও সরলতার জন্য আর্য্যজাতি চিরকাল হইতে প্রসিদ্ধ। তাঁহারা কদাপি অন্যায় পূর্ব্বক অপরের সম্পত্তি আত্মসাৎ করেন না। এবং ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন না।" ত্রয়োদশ শতাব্দীর ভ্রমণকারী মার্কোপোলো ভারতীয় ব্রাহ্মণগণের সত্যনিষ্ঠা দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে,—"জগতে এমন কোন বস্তু নাই যাহার লোভে ব্রাহ্মণ মিথ্যা বলিতে পারেন।" বিচারপতি কর্ণেল শ্লিম্যান সাহেব বলিয়াছেন, "আমি শত শত মোকদ্দমার বিচার করিতে সময় দেখিয়াছি যে, যেখানে সামান্য একটি মিথ্যা কথায় একজনের প্রাণ বা সম্পত্তি রক্ষা হইতে পারে সেখানেও বাদী বা প্রতিবাদীর বশবর্ত্তী হইয়া কোন আর্য্যসন্তান মিথ্যা বলিতে স্বীকার করেন নাই।" ভারতবর্ষের প্রথম গভর্ণর জেনারল ওয়ারেন হেষ্টিংস্ সাহেব পার্লিয়ামেণ্টে সাক্ষ্য প্রদানের সময় হিন্দুগণকে বিনয়ী, পরোপকারী, কৃতজ্ঞ, বিশ্বাসী এবং স্নেহশীল বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। অধ্যাপক ইয়ুলিয়মস্ সাহেব বলিয়াছেন,—"ইয়ুরোপের কোন জাতি ভারতবাসীর ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণ নহে।" প্রফেসর মোক্ষমূলর বলিয়াছেন,—"আর্য্যজাতির সত্যপ্রিয়তাই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট জাতীয় লক্ষণ।" কোন ব্যক্তিই এই জাতির উপরে অসত্যের কলঙ্ক-কালিমা লেপন করেন নাই। গ্রীস দেশের প্রসিদ্ধ সেকন্দর শাহ ভারত পরিত্যাগের সময় মেগাস্থিনিস নামক নিজের একজন দূতকে এদেশের রীতি নীতি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য রাখিয়া গিয়াছিলেন। আর্য্যজাতির সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন,—"আর্য্যজাতির মধ্যে দাসত্বভাব একেবারেই নাই, ইঁহাদের নারীগণের মধ্যে পাতিব্রত্য ও পুরুষগণের মধ্যে বীরত্ব অসীম। সাহসিকতায় আর্য্যজাতি পৃথিবীর অন্য সকল জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং তাঁহারা পরিশ্রমী, শিল্পী ও নম্র-প্রকৃতি-বিশিষ্ট। ইঁহারা কখনও আদালতে মোকদ্দমা করিতে যান না এবং পরস্পর মিলিত হইয়া শান্তিতে বাস করেন।"

ক্রমশঃ।

জন্মান্তর-তত্ত্ব।

[স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

জীবের গতি।

এই সকল ঘটনাস্থলে সূক্ষ্মশরীর ধীরে ধীরে স্থূলশরীর পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া হঠাৎ আঘাত পাইয়া বেগে বহির্গত হইয়া পড়ে। এবং এই আঘাতেই সূক্ষ্মশরীরের মূর্চ্ছা হইয়া প্রেতত্ব প্রাপ্তি হয়। তৃতীয়তঃ আত্মহনন করিলে প্রেতত্ব প্রাপ্তি অবশ্যই হইয়া থাকে। উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ, জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ, বিষ ভক্ষণ করিয়া প্রাণত্যাগ ইত্যাদি প্রকারে আত্মঘাতী হইলে প্রেতযোনিলাভ হইয়া থাকে। এইরূপ মৃত্যু অত্যন্ত কষ্টের সহিত হয় এবং তাহাতেই সূক্ষ্মশরীর মূর্চ্ছিত হইয়া প্রেতত্ব লাভ করে। যুদ্ধে যাঁহারা বীরের মত প্রাণ দেন তাঁহাদিগকে প্রেতযোনি ভোগ করিতে হয় না। কিন্তু ভীরুর মত হায় হায় করিয়া অতিকষ্টে প্রাণ দিলে প্রেতত্বলাভ হয়। এইরূপ নানাপ্রকারে জীবের প্রেতযোনি প্রাপ্তি হয়। এতদ্ব্যতীত কোন শত্রুর উপর জিঘাংসাবৃত্তিযুক্ত হইয়া প্রেতযোনিলাভের কারণও বর্ণিত আছে। ঐ সকল প্রেত যাহার উপর আক্রোশ করিয়া প্রেতত্ব লাভ করে তাহাকে প্রায়ই সবংশে নাশ করিয়া থাকে। মনুসংহিতায় কর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া প্রেতত্ব প্রাপ্তি বিষয়ে দ্বাদশাধ্যায়ে বর্ণন পাওয়া যায় যথা—

> বান্তাশ্যুল্কামুখঃ প্রেতো বিপ্রো ধর্ম্মাৎ স্বকাচ্চ্যুতঃ।
> অমেধ্যকুণপাশী চ ক্ষত্রিয়ঃ কটপূতনঃ॥
> মৈত্রাক্ষজ্যোতিকঃ প্রেতো বৈশ্যো ভবতি পূয়ভুক্।
> চৈলাশকশ্চ ভবতি শূদ্রো ধর্ম্মাৎ স্বকাচ্চ্যুতঃ॥

ব্রাহ্মণ স্বকর্ম্মভ্রষ্ট হইলে বর্দ্দিভক্ষক জ্বালামুখ প্রেত ও ক্ষত্রিয় ঐরূপ হইলে শব ও বিষ্ঠাভক্ষক কটপূতননামক প্রেত হয়। বৈশ্য স্বকর্ম্মভ্রষ্ট হইলে পূয়ভক্ষক মৈত্রাক্ষ-জ্যোতিক নামক প্রেত এবং শূদ্র ঐরূপ হইলে চৈলাশক নামক প্রেত হয়।

এই মৃত্যুলোকরূপী পৃথিবীর সঙ্গে তিনটি সূক্ষ্মলোক আছে। উহাদের একটির নাম প্রেতলোক, দ্বিতীয়টির নাম নরকলোক এবং তৃতীয়টির নাম পিতৃলোক। অর্থাৎ এই মৃত্যুলোকের সহিত সংশ্লিষ্ট পুণ্যলোকের নাম পিতৃলোক এবং পাপভোগপ্রদ লোকের নাম প্রেতলোক ও নরকলোক। জীব আতিবাহিক দেহ ধারণ করিয়া এই তিন লোকে কর্ম্মানুসারে গমন এবং সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। প্রেতের সাধারণ স্থূলশরীর থাকে না, কিন্তু বাসনার

তীব্রতানুসারে প্রেত যখন ইচ্ছা নানাপ্রকার স্থূলশরীর ধারণ করিতে পারে। ইহা কিরূপে হয় তাহা বিচার্য্য। আর্য্যশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, সূক্ষ্মশরীরের বেগ বশতঃ স্থূলশরীর লাভ হইয়া থাকে। সূক্ষ্মশরীরের এত বল আছে যে সে বাসনার বেগে প্রকৃতি হইতে স্থূলশরীরের উপাদান সংগ্রহ করিয়া যখন তখন স্থূলশরীর প্রস্তুত করিতে পারে। বদ্ধজীবের সূক্ষ্মশরীর স্থূলশরীর ও ইন্দ্রিয়ের সহিত আসক্তিযুক্ত এবং তন্নিবন্ধন বদ্ধ থাকায় বদ্ধজীব যথেচ্ছভাবে স্থূলকায়া পরিগ্রহ করিতে পারে না। যোগীর সূক্ষ্মশরীর ইন্দ্রিয়বদ্ধ নহে এজন্য শিক্ষা করিলে যোগীও নানারূপ স্থূলশরীর পরিগ্রহ করিতে পারেন। এইরূপে প্রেতের স্থূলশরীর না থাকায় একাকী সূক্ষ্মশরীরের বল অসীম থাকে, এজন্য প্রেতও সূক্ষ্মশরীরের বাসনা-বেগকে বর্দ্ধিত করিয়া স্থূলশরীর ধারণ করিতে পারে। তবে যোগীর স্থূলদেহ ধারণ এবং প্রেতের স্থূলশরীর ধারণের মধ্যে অনেক প্রভেদ আছে। যোগীর চিত্ত বাসনাশূন্য হওয়ায় যোগী যোগসিদ্ধিবলে নানারূপ শরীর ধারণ করিতে পারেন। কিন্তু প্রেত তাহা পারে না। সে কেবল নিজের বাসনানুসারেই শরীর ধারণ করিতে পারে। যেমন যদি কোন পুরুষ নিজের স্ত্রী বা পরস্ত্রীতে আসক্ত হইয়া উহাকেই চিন্তা করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করে এবং তন্নিবন্ধন উহার প্রেতযোনি প্রাপ্তি হয় তবে সে পতি বা উপপতির শরীর ধারণ করিয়া ঐ স্ত্রীর নিকট আসিতে পারে এবং প্রবল বাসনার বেগে কামের স্থূলক্রিয়াদিও করিতে পারে। কিন্তু উক্তপ্রকার কামুক পুরুষের রূপধারণ ব্যতীত সে যথেচ্ছভাবে অন্যরূপ ধারণ করিতে পারে না, কারণ তাহার বাসনার নৈসর্গিক বেগ ঐ প্রকারই আছে, অন্যপ্রকার নাই। এইরূপে মৃতমাতা জীবিত পুত্রের নিকট মাতৃমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আসিতে পারে. মৃতা স্ত্রীও পূর্ব্ব পতির নিকট আসিতে পারে। প্রেতের শরীর সকল সময় একরকম হয় না। পঞ্চতত্ত্বের উপর অধিকার থাকায় প্রেত আবশ্যকতানুসারে কোন না কোন তত্ত্বকে আকর্ষণ করিয়া তদনুরূপ শরীর ধারণ করিতে পারে। সে কথনও বায়ুতত্ত্বকে আকর্ষণ করতঃ বায়বীয় শরীর ধারণ করিতে পারে এবং প্রবল ঝড়রূপে গ্রাম্যজনের হৃদয়ে ভীতি উৎপাদন করিতে পারে। কথন বা অগ্নিতত্ত্বকে আকর্ষণ করতঃ অগ্নিময় রূপ ধারণ করিয়া শ্মশান বা নিভৃত স্থানে ভীতিজনক আগ্নেয়রূপ দেখাইতে পারে। কখন কখন ছায়ারূপ ধারণ করিয়া মনুষ্যের সম্মুখে দেখা দিতে ও কথা কহিতে পারে। এইরূপ ছায়াশরীরের কথা মুখদিয়া

নিঃসৃত ও বায়ুকম্পন দ্বারা কর্ণগোচর হয় না। প্রেত যাহাকে নিজের কথা শুনাইতে বা জানাইতে চাহে তাহার হৃদয়ের মধ্যে ঐরূপ প্রেরণা উৎপন্ন করে এবং শ্রোতা নিজের ভিতরেই প্রেতের কথা শুনিতে পায় এবং তাহার সহিত বাক্যালাপ করিতে পারে। অনেক জীবের এরূপ দৃষ্টি থাকে যে তাহারা প্রেত দেখিতে পায়। সাধারণতঃ কুকুর স্বভাবতই প্রেত দেখিতে পায়। রাত্রিতে অনেক সময় ছায়াময় বা শরীরযুক্ত প্রেত দেখিয়া কুকুর চীৎকার করিয়া থাকে। অনেক সময় এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে যে কোন প্রেতনিবাস গৃহে মনুষ্য ও কুকুর একই সময়ে গেল, মনুষ্য কিছুই দেখিতে পাইল না, কিন্তু কুকুর গৃহমধ্যে প্রেতের বিকটমূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে চীৎকার করতঃ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। এতদতিরিক্ত অনেক মনুষ্যেরও প্রেত দেখিবার দৃষ্টি (Psychic sight) আছে। উহারা প্রেতের ছায়া, প্রেতের মূর্ত্তি অথবা প্রেত যদি কোন স্ত্রী বা পুরুষকে আক্রমণ করে তবে সেই আক্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে প্রেতের শরীর দেখিতে পায়। প্রাক্তন কর্ম্ম ও স্বভাবানুসারে ভালমন্দ নানাপ্রকার প্রেত হইয়া থাকে। সচ্চরিত্র. নিরীহ অথচ মোহাদিবশে প্রেতযোনি প্রাপ্ত পুরুষ বা স্ত্রী প্রেত প্রায়ই কাহারও অনিষ্ট করে না। কিন্তু জীবিতাবস্থায় কুকর্ম্মরত দুষ্ট মনুষ্য মরিয়া প্রেত হইলে প্রেতত্বাবস্থাতেও তাহার দুষ্টতা যায় না। সে মনুষ্যকে ভয় দেখায়, অত্যাচার করে. আক্রমণ করে এবং নানারূপ উপদ্রব করিয়া থাকে। তবে প্রেত এ সকল উপদ্রব দুর্ব্বলচিত্ত মনুষ্যের উপরই করিতে পারে। প্রেত আত্মারং বলে বলীয়ান্ উন্নতচরিত্র, উন্নতমনা, যুক্ত পুরুষ বা স্ত্রীর কিছুই করিতে পারে না। স্ত্রীপ্রকৃতিতে মানসিক বেগের আধিক্য এবং জ্ঞানের অল্পতা থাকায় পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর প্রতিই প্রেতের আক্রমণ অধিক হইয়া থাকে। দুষ্ট প্রেতের মধ্যে এরূপ একটি বিচিত্র স্বভাব দেখা যায় যে তাহারা প্রায়ই বিকৃতমনা বা বিকৃত মস্তিষ্ক স্ত্রীপুরুষগণকে আত্মহত্যা করিবার জন্য প্রেরিত করে এবং নিজের যোনিতে আনিতে চেষ্টা করে। আত্মহনন দ্বারা প্রেতযোনি প্রাপ্ত জীবের মধ্যে এই অভ্যাসটি বড়ই প্রবল হয়। যদি কেহ উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিবার চেষ্টা করে তবে ইতিপূর্ব্বে উদ্বন্ধনে মৃত ও প্রেতযোনিপ্রাপ্ত জীব তাহাকে ঐ পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত করিতে চেষ্টা করে। সে চারিদিকে ঐরূপ উদ্বন্ধনপ্রাপ্ত স্ত্রীপুরুষের দৃশ্য দেখায় যাহার দ্বারা উন্মত্তপ্রায় হইয়া সেই ব্যক্তিও আত্মঘাতী হইয়া পড়ে। এইরূপে জলমগ্ন হইয়া আত্মহননের সময়েও জলমগ্ন প্রেত বিভীষিকাময়ী

নানামূর্ত্তি দেখাইয়া ঐ আত্মহননেচ্ছু ব্যক্তিকে নিজের পাপকার্য্যে প্রলোভিত করিয়া থাকে। এইরূপে দুষ্ট প্রেতের অনেক লীলা দেখা গিয়াছে।

আর্য্যশাস্ত্রে প্রেত ডাকিবার অনেকপ্রকার প্রক্রিয়া বর্ণিত আছে। বাসনাবদ্ধ প্রেতের দৃষ্টি সদা সংসারের দিকে থাকায় একটু চেষ্টা করিলেই প্রেত ডাকা যায়। কারণ প্রেত সাংসারিক জীবের সহিত সর্ব্বদাই মিলিত হইতে চেষ্টা করে। প্রেত ডাকিবার সাধারণ প্রক্রিয়াকে পীঠাসন (Table rapping) বলে। পীঠাসনের উৎপত্তি নিম্নলিখিত ভাবে হইয়া থাকে। একটি ত্রিপাদ টেবিলের উপর দুই, তিন, পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তি পরস্পর হাত মিলাইয়া বসিয়া যদি সকলে একই মৃত ব্যক্তির মূর্ত্তি চিন্তা করে তবে কিছুক্ষণ পরেই উহাদের হস্তসমূহের সম্মিলন স্থানে একটি বৈদ্যুতিক চক্রাবর্ত্ত উৎপন্ন হয় এবং এই চক্রাবর্ত্তে মৃতব্যক্তির সূক্ষ্মশরীর সমাবিষ্ট হইয়া থাকে। তখন ঐ সূক্ষ্মশরীরের বেগে টেবিল নড়িতে থাকে এবং জিজ্ঞাসা করিলে ইঙ্গিতে টেবিল নড়িয়া প্রশ্নোত্তর হইয়া থাকে। তবে প্রেতের বুদ্ধি বিকৃত থাকে বলিয়া ঠিক ঠিক উত্তর পাওয়া যায় না এবং পীঠাসন ক্রিয়ায়ও সফলতা লাভ হইতে পারে না। যদি প্রেত না ডাকিয়া দিগ্‌বন্ধবিধি অনুসারে উক্ত পীঠাসনে ভাল আত্মাকে আহ্বান করা যায় তবে ভাল উত্তর ও অনেক গূঢ় তত্ত্বের সন্ধান লাভ হইয়া থাকে। প্রেত ডাকিবার দ্বিতীয় বিধিকে প্রাণবিনিময়বিধি (mesmerism) বলে। উহার দ্বারা প্রথমতঃ নিজ প্রাণশক্তির বলে কোন স্ত্রী বা পুরুষকে অভিভূত করিতে হয়। সে এইরূপে অভিভূত হইয়া মূর্চ্ছিত বা নিদ্রিতের মত হইলে কোন প্রেতকে চিন্তা করিয়া তাহার শরীরের মধ্যে ডাকিতে হয়। তদনন্তর ঐ শরীরে যখন প্রেতাবেশ হয় তখন আবিষ্ট ব্যক্তি কথা কহিতে থাকে এবং অনেক প্রশ্নের উত্তর দেয়। ওসকল কথা প্রেতেরই কথা হইয়া থাকে। প্রেত ঐ শরীরকে যন্ত্ররূপে পরিণত করিয়া কথা কহিয়া থাকে। এইরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা অন্যের মধ্যে প্রেত ডাকার মত নিজের মধ্যেও ডাকা যায়। উহাকে স্বতঃপ্রাণবিনিময় অর্থাৎ Self mesmerism বলে। তান্ত্রিক ভৈরবীচক্র আদি সাধনাতেও এইরূপে চক্রমধ্যবর্ত্তী কোন স্ত্রী বা পুরুষকে পাত্ররূপে পরিণত করিয়া উহার মধ্যে প্রেতের আবেশ করা যাইতে পারে। ইহা ব্যতীত তান্ত্রিক শব-সাধনার মধ্যেও প্রেত ডাকিবার বিধি আছে। যথা ভাবচূড়ামণিতে—

শূন্যাগারে নদীতীরে পর্ব্বতে নির্জ্জনেঽপি বা।
বিল্বমূলে শ্মশানে বা তৎসমীপে বনস্থলে॥

অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং পক্ষয়োরুভয়োরপি।
ভৌমবারে তমিস্রায়াং সাধয়েৎ সিদ্ধিমুত্তমাম্॥
মাষভক্তঞ্চ বল্যর্থং ধূপদীপাদিকং তথা।
তিলাঃ কুশাঃ সর্ষপাশ্চ স্থাপনীয়াঃ প্রযত্নতঃ॥
যষ্টিবিদ্ধং শূলবিদ্ধং খড়্গাবিদ্ধং জলে মৃতম্।
বজ্রবিদ্ধং সর্পদষ্টং চাণ্ডালঞ্চাভিভূতকম্॥
তরুণং সুন্দরং শূরং রণে নষ্টং সমুজ্জ্বলম্।
পলায়নবিশূন্যন্তু সম্মুখে রণবর্ত্তিনাম্॥
ধূপেণ ধূপিতং কৃত্বা গন্ধাদিনা বিলিপ্য চ।
কুশশয্যাং পরিষ্কৃত্য তত্র সংস্থাপয়েচ্ছবম্॥
চলচ্ছবাদ্ভয়ং নাস্তি ভয়ে জাতে বদেত্ততঃ।
যৎ প্রার্থয় বলিস্তেন দাতব্যং কুঞ্জরাদিকম্॥
দিনান্তরে চ দাস্যামি স্বনাম কথয়স্ব মে।
ইত্যুক্ত্বা সংস্কৃতেনৈব নির্ভয়শ্চ পুনর্জপেৎ॥

শূন্যগৃহ, নদীতীর, পর্ব্বত, নির্জ্জনস্থান, বিল্বমূল, শ্মশান অথবা তৎসমীপস্থ বনপ্রদেশে শবসাধন করা উচিত। কৃষ্ণ অথবা শুক্লপক্ষীয় অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে মঙ্গলবার রাত্রিকালে শবসাধন করিলে উত্তম সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। বলির নিমিত্ত মাষভক্ত এবং পূজার জন্য ধূপ, দীপ, তিল, কুশ এবং সর্ষপ রাখা উচিত। যষ্টি, ত্রিশূল বা খড়্গাঘাতে যাহার প্রাণ গিয়াছে, জলমগ্ন হইয়া, বজ্রাঘাতে অথবা সর্পদংশনে যাহার মৃত্যু হইয়াছে এরূপ চণ্ডালের শব সাধনকার্য্যে বিশেষ প্রশস্ত। শব তরুণ বয়স্ক এবং সুন্দরাঙ্গ হওয়া উচিত। সম্মুখসংগ্রামে পলায়ন না করিয়া যে প্রাণ দিয়াছে এরূপ ব্যক্তির শব সাধনায় বিশেষ উপযুক্ত। শবকে ধূপ ও গন্ধের দ্বারা সুগন্ধিত করতঃ কুশাসনের উপর পূর্ব্বমুখে স্থাপন করিতে হয়। শব নড়িলে ভয় পাওয়া উচিত নহে। যদি ভয় হয় ত বলা উচিত যে "দিনান্তরে বলি প্রদান করিব, এখন নিজের নাম বল।" এইরূপ বলিয়া নির্ভয় হৃদয়ে আবার জপ করা উচিত। এই প্রকারে শবসাধনা দ্বারা প্রেতের উপাসনা হইয়া থাকে। তাহাতে প্রেত উক্ত শবকে আশ্রয় করিয়া কথা কহিয়া থাকে এবং শবসাধকের অনেক সিদ্ধিলাভও হয়। মন্ত্রের শক্তিদ্বারা এইরূপে প্রেতকে বশীভূত করতঃ ধনাদির প্রাপ্তিও অনেকে করিয়া থাকে। তবে ঐ সকল

নিকৃষ্ট সাধনা সদাই বিপজ্জনক। প্রেতের সাধক প্রায় প্রেতের দ্বারাই নিহত হইয়া থাকে। অনিচ্ছাসত্ত্বে কেবল মন্ত্রের বলে বশীভূত প্রেত সর্ব্বদাই সুযোগ অনুসন্ধান করিয়া বেড়ায় এবং একটু সুবিধা পাইলেই উপাসকের প্রাণবিনাশ করিয়া থাকে। প্রেত ডাকিবার যাহা কিছু উপায় উপরে বলা হইল ঐ সকলের দ্বারাই উচ্চশ্রেণীর আত্মা এবং দেবতা পর্য্যন্তকে আকর্ষণ করা যায় এবং তাঁহাদের সহিত এইভাবে সম্বন্ধস্থাপিত হইলে সাধক বিবিধ কল্যাণ লাভ করিয়া থাকে।

প্রেতের জীবন বড়ই দুঃখময়। কারণ যে বাসনার বশে মনুষ্যের প্রেতত্ব প্রাপ্তি হয় প্রেত যোনিতে সে বাসনা নিবৃত্ত হয় না। এজন্য প্রেত পূর্ব্ববাসনার আধার বস্তুসমূহকে সদাই গ্রহণ করিবার জন্য লালায়িত থাকে। কিন্তু তাহার যে যোনি তাহাতে ঐ সকল বস্তু সে যথেচ্ছ প্রাপ্ত হইতে পারে না। এজন্য নৈরাশ্যের তুষানল প্রেতের হৃদয়ে দিবানিশি জ্বলিতে থাকে। স্ত্রীপুত্রাদির মোহে মুগ্ধচিত্ত প্রেত সর্ব্বদাই স্ত্রীপুত্রাদির সঙ্গে মিলিত হইয়া জীবিতাবস্থার মত ভোগবিলাস করিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু সে সুবিধা সুদূর-পরাহত হওয়ায় প্রেত বড়ই কষ্ট পায়। অনেক সময় সে তাহার ভালবাসার পাত্র স্ত্রীপুত্রাদিকে নিহত করিয়া নিজের যোনিতে আনিতে চেষ্টা করে এবং তাহাতেও নানাকারণে অকৃতকার্য্য হইলে প্রেত বড়ই দুঃখ পায়। হয়ত কোন পুরুষ পূর্ব্ব স্ত্রীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিল। যদি তাহার পূর্ব্ব স্ত্রী প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং তাহার আসক্তি জীবিত পতির প্রতি থাকে তবে সপত্নী বিদ্বেষের ভীষণ অগ্নি প্রেতযোনিপ্রাপ্ত উক্ত স্ত্রীকে দিবানিশি দারুণ দুঃখপ্রদান করিবে। সে পতির নিকট আসিতে এবং সপত্নীর সহিত জীবিত পতির বিচ্ছেদ ঘটাইতে অনেক চেষ্টা করিবে। যে ঘরে দম্পতি থাকে বা শয়ন করে তাহার নিকটে বা ভিতরে সে থাকিতে চেষ্টা করিবে। এইরূপে আজন্ম ধনসঞ্চয় করতঃ যে সকল কৃপণ ধনের মোহে প্রেত হয় সে ঘরের মধ্যে যেখানে তাহার নিজসঞ্চিত ধন আছে সেই স্থানে থাকিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করে। সেই ধন অপসারিত করিতেও চেষ্টা পায় এবং কৃতকার্য্য না হইয়া ভীষণ শোকাগ্নিতে দগ্ধ হয়। ব্যভিচারী কামুক পুরুষ প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়াও ব্যভিচার-বাসনা পরিত্যাগ করিতে পারে না, এজন্য এরূপ প্রেত পরস্ত্রীতে বা এরূপ প্রেতিনী পরপুরুষে কামক্রিয়া করিবার চেষ্টা করে। প্রেতের এরূপ কামাসক্তির অনেক প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক স্থলে প্রেত যে পুরুষ বা স্ত্রীতে

কামাসক্ত হয় তাহাকে মারিয়া ফেলে, অনেক স্থলে প্রেতনিবারক মন্ত্রৌষধি প্রভৃতি দ্বারা পরাস্ত-শক্তি হইয়া বড়ই দুঃখভোগ করে। প্রেতযোনি অজ্ঞানময় হওয়ায় অনেক সময় প্রেত বুঝিতে পারে না যে কেন তাহার অন্তঃকরণে তুষানলের মত দুঃখাগ্নি প্রজ্বলিত রহিয়াছে, কেন তাহার হৃদয়ের দুঃখ নিবারিত হইতেছে না। অজ্ঞানমুগ্ধচিত্ত প্রেত এইরূপে পাগলের ন্যায় ইতস্ততঃ দুঃখে ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া বেড়ায়। প্রাণ কি যে চায় তাহা সে বুঝিতে পারে না, হৃদয়ে অশান্তির কারণ কি তাহাও নির্ণয় করিতে পারে না, অথচ দিবানিশি তাহার অন্তঃকরণে দুঃখাগ্নি প্রজ্বলিত থাকে। এরূপ অবস্থা প্রেতের পক্ষে বড়ই কষ্টদায়ক। সে দুঃখে রোদন করে, হৃদয় বিদীর্ণ করে, অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করে, শ্মশানে উন্মত্তের মত উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া দৌড়িয়া বেড়ায় ইত্যাদি ইত্যাদি কতই না দুঃখ প্রেত যোনিতে জীব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হয়ত সে মরিবার সময় জল পায় নাই, পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া মরিয়া প্রেত হইয়াছে। তাহার সেই পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠতা প্রেত যোনিতেও নিবৃত্ত হইবে না, সে জল জল করিয়া দারুণ দুঃখে কাতরকণ্ঠে রোদন করিবে এবং যদি কেহ তাহার নামে কাহাকেও জলদান করে অথবা তাহাকেই জলদান করে তবেই তাহার পিপাসা নিবারিত হইবে। ঐরূপ দুর্ভিক্ষপীড়নে পরিত্যক্ত-প্রাণ প্রেতযোনিপ্রাপ্ত নরনারী বুভুক্ষার ভীষণ তাড়নে ছটফট করিয়া বেড়ায়। কোথায় যাইব, কি খাইব এই চেষ্টা তাহার সর্ব্বদাই থাকে। অথচ স্থূলসংসারের সহিত ঐরূপ আহার্য্য সম্বন্ধ স্থাপন করিবার সামর্থ্য না থাকায় হা অন্ন হা অন্ন করিয়াই তাহার সমস্ত দিবানিশি কাটিয়া যায়। যতদিন না তাহার উদ্দেশে তাহাকে বা অন্য কোন যোগ্যপাত্রকে অন্ন দান করা হয় ততদিন তাহার ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না। মূর্চ্ছাভঙ্গের দ্বারা প্রেতত্ব নাশ না হওয়া অবধি প্রেতকে এইরূপে নানাপ্রকার দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হয়। আর্য্যশাস্ত্রে প্রেতের এই মূর্চ্ছাভঙ্গের জন্য যে সকল উপায় বর্ণিত আছে তাহাকেই শ্রাদ্ধ বলা হয়। শ্রাদ্ধের বিস্তৃত বিজ্ঞান গ্রন্থান্তরে বর্ণিত হইবে। প্রকৃত প্রবন্ধে এতটুকু বুঝিলেই যথেষ্ট হইবে যে যেমন কোন ব্যক্তি মূর্চ্ছিত হইলে ঔষধির শক্তির প্রয়োগ করতঃ তাহার মূর্চ্ছাভঙ্গ করা হয়, সেই প্রকার শ্রাদ্ধে মহর্ষিগণ যে সকল ক্রিয়ানুষ্ঠান করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন উহার দ্বারা মনঃশক্তি, মন্ত্রশক্তি এবং দ্রব্যশক্তি নামক শক্তিত্রয়ের সাহায্যে প্রেতের মূর্চ্ছাভঙ্গ হইয়া থাকে। মনের শক্তি যে অপার তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে? যে মন নিজ শক্তিবলে ইন্দ্রিয়াতীত অপরায়কেও

বশীভূত করিতে পারে সে মনের মধ্যে অসীম শক্তি আছে, ইহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। সংযমের দ্বারা সেই শক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এজন্য অশৌচকালে নানাপ্রকার সংযমের বিধি আর্য্যশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপে সংযত মনকে লইয়া মৃতব্যক্তির পুত্রাদি নিকট আত্মীয় যদি শ্রাদ্ধ করে এবং পরলোকগত আত্মার সহিত নিজ আত্মার সম্বন্ধ স্থাপন করে তবে ঐ মূর্চ্ছিত আত্মা শ্রাদ্ধকর্ত্তার মানসিক শক্তি ও আত্মার শক্তির সাহায্য পাইয়া অবশ্যই মূর্চ্ছাত্যাগ করিতে সমর্থ হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই। শ্রাদ্ধে এইরূপেই মনঃশক্তির প্রয়োগ হইয়া থাকে। এবং এইজন্যই জ্যেষ্ঠ পুত্রের শ্রাদ্ধে প্রথম অধিকার বর্ণিত হইয়াছে। একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা এই তথ্যটি প্রকাশিত করা হইতেছে। যদি কোন গৃহের মধ্যে পাঁচটি সেতার বা বেহালাকে একসুরে বাঁধিয়া দেওয়া হয় এবং তদনন্তর একটিকে বাজান হয় তবে অন্য ৪টিও আপনা আপনি ঘাত-প্রতিঘাতের সাহায্যে বাজিয়া উঠিবে। কারণ একসুরে মিলিত থাকায় একটি যন্ত্রের আঘাত বায়ুকম্পিত করিয়া অন্য যন্ত্রে প্রতিঘাত উৎপন্ন করিবে এবং এইরূপে সব কয়টিই বাজিতে থাকিবে। শাস্ত্রে লেখা আছে—"আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ।" বেদ বলেন—

অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবসি হৃদয়াদধিজায়সে।
আত্মাসি পুত্রনামাসি স জীব শরদঃ শতম্॥

পুত্র পিতার অঙ্গ হইতে অঙ্গ লইয়া, হৃদয় হইতে হৃদয় লইয়া এবং আত্মা হইতে আত্মা লইয়া উৎপন্ন হয়। এজন্য পিতামাতার আত্মার সহিত ধর্ম্মসন্তান জ্যেষ্ঠ পুত্রের আত্মার সুর স্বভাবতই একতানে সম্মিলিত থাকায় পুত্রের শ্রাদ্ধকালীন প্রদত্ত মনঃশক্তি মোহমুগ্ধ প্রেতযোনি-প্রাপ্ত পিতার প্রেতত্ব নাশ অবশ্যই করিবে ইহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। ইহাই শ্রাদ্ধে সমন্ত্রক মনঃশক্তির সম্বন্ধ। মন্ত্রের বিজ্ঞান এবং মন্ত্রে কত শক্তি নিহিত থাকে তৎসম্বন্ধে 'সাধনতত্ত্ব' নামক পুস্তকে বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে। শ্রাদ্ধকালে যে সকল মন্ত্র উচ্চারিত হয় উহাদের সহিত পরলোকগত আত্মার আহ্বান, তাহার মূর্চ্ছাভঙ্গ, প্রেতত্ব নাশ আদি ক্রিয়ার বিশেষ সম্বন্ধ থাকে। এজন্য শ্রাদ্ধ-কর্ত্তা যদি সংযত মনের সহিত ঐ সকল মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক শ্রাদ্ধকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন তবে মন্ত্র-শক্তির দ্বারা প্রেতত্বনাশ অবশ্যই হইয়া থাকে। তৃতীয়তঃ যে সকল শাস্ত্রবিহিত দধি, মধু, তিল, তণ্ডুল আদি দ্রব্যের দ্বারা শ্রাদ্ধ করা হয় ঐ সকল দ্রব্যের মধ্যে এরূপ শক্তি নিহিত আছে যে সেই শক্তির বলে প্রেতাত্মা আকৃষ্ট, সম্যক পরিতৃপ্ত এবং প্রেতযোনি-মুক্ত হইয়া থাকে।

ক্রমশঃ—

নব পর্য্যায়।
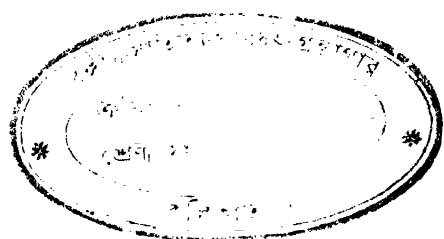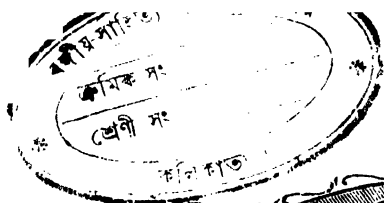
অকুণ্ঠং সর্ব্বকার্য্যেষু ধর্ম্ম-কার্য্যার্থমুদ্যতম্।
বৈকুণ্ঠস্য হি যদ্রূপং তস্মৈ কার্য্যাত্মনে নমঃ॥

২য় ভাগ { আষাঢ়, ১৩২৭। ইং জুন, ১৯২০ } ৩য় সংখ্যা।

হিন্দুধর্ম্ম বিশ্ববিদ্যালয়।

Hindu Religious University.

(শ্রীশারদা মণ্ডল)

কোন মনুষ্যজাতির কোনপ্রকার উন্নতি চিরস্থায়ী হইতে পারে না যদি তাহা ধর্ম্মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়। কোন মনুষ্যজাতি স্বীয় ইহলৌকিক অথবা পারলৌকিক স্থায়ী উন্নতি সাধন করিতে ততদিন সমর্থ হয় না, যতদিন সেই জাতির শিক্ষাপ্রণালী ধর্ম্মের আধারে গঠিত না হয় এবং কোন মনুষ্যজাতি চিরকাল কদাপি জীবিত থাকিতে পারে না যদি তাহার আচার এবং শিক্ষার মূলে ধর্ম্মের জীবনীশক্তি বিদ্যমান না থাকে। ধর্ম্মহীন শিক্ষা যতই উচ্চ হউক না কেন, উহার ফল বড়ই বিষময়। এই সিদ্ধান্তের সত্যতা সম্বন্ধে আজকাল আর কোন শিক্ষিত মনুষ্য সমাজেরই মতভেদ নাই। ইয়ুরোপের রোমহর্ষণ মহাসমর এবং তাহারই পরিণামে বলশেবিজম্ প্রমুখ সামাজিক ও রাজনৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতাপূর্ণ অবস্থা এবিষয়ের জাজ্বল্যমান প্রমাণ। অতএব বর্ত্তমানে প্রচলিত এবং জীবনযাত্রার উপযোগী সকলপ্রকার শিক্ষাপ্রণালী বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে যাবতীয় শিক্ষালয়ে ধর্ম্ম-শিক্ষা প্রবর্ত্তনের সুব্যবস্থা করা মনুষ্যজাতি মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।

ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুজাতির মধ্যে ধর্ম্মশিক্ষা বিস্তারের আবশ্যকতা আরও অধিক। সনাতন ধর্ম্ম অনুসারে আর্য্যজাতির ধর্ম্মই প্রাণ। বৈদিক বিজ্ঞান অনুসারে

তিনিই আর্য্য বা হিন্দুপদবাচ্য—যাঁহার জীবনের অন্তিম লক্ষ্য আধ্যাত্মরাজ্যের দিকে নিবদ্ধ। হিন্দুজাতির উঠা, বসা, চলা, ফেরা, ভোজনাচ্ছাদন প্রভৃতি সকল কার্য্যই ধর্ম্মমূলক। হিন্দুজাতির পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, এবং আভ্যন্তরিক অবস্থার কোনটীই ধর্ম্মসম্বন্ধ হীন হইলে স্থায়ী হইতে পারে না। এই জন্যই হিন্দুজাতিকে ধর্ম্মপ্রাণ বলা হয়। এইপ্রকার সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুজাতির শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে ধর্ম্মশিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক থাকা প্রয়োজন। প্রকৃত হিন্দুভাব-বর্জ্জিত অথচ হিন্দুনামধারী কতিপয় ব্যক্তি আজকাল রাজনৈতিক শক্তি লাভ করিয়া এবং গভর্ণমেণ্টের কাউন্সিলে প্রবিষ্ট হইয়া নানাপ্রকার ধর্ম্মবিরুদ্ধ আইন সংগঠনের উদ্যোগ করিয়া হিন্দু-ধর্ম্মের মূলোচ্ছেদ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। এই উচ্ছৃঙ্খলতার অন্যতম মূলকারণ যে পঠদ্দশায় ধর্ম্মশিক্ষার অভাব, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। যে প্রকার মহাত্মা যিশুখ্রীষ্ট বিনা খ্রীষ্টধর্ম্মের অস্তিত্বই থাকিতে পারে না এবং যে প্রকার মহাত্মা মহম্মদ ব্যতীত মুসলমান ধর্ম্মের অস্তিত্ব থাকা অসম্ভব সেই প্রকার বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম শূন্য হইলে হিন্দুজাতির অস্তিত্ব থাকাও সম্ভবপর নহে। যদি ধর্ম্মশিক্ষার অভাবে হিন্দুজাতির মধ্য হইতে এই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের মূলোচ্ছেদ হইয়া যায় তবে এই হিন্দুজাতি অন্যান্য অনেক পূর্ব্বতন মনুষ্যজাতির ন্যায় অচিরকাল মধ্যে কালসাগরে বিলীন হইয়া যাইবে।

এই সকল সিদ্ধান্তের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া হিন্দুজাতির অদ্বিতীয় বিরাট ধর্ম্মসভা শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের পরিচালকগণ মহামণ্ডলের অন্যান্য বিভাগের সহিত শ্রীশারদামণ্ডল বিভাগ স্থাপন করিয়াছিলেন। অধুনা মহামণ্ডলের এই বিভাগের কার্য্য—যাহাতে অগ্রসর হয়, তজ্জন্য বিশেষ যত্ন লওয়া হইতেছে। ভারতবর্ষব্যাপী হিন্দুজাতির মধ্যে ধর্ম্মশিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে কাশীধামে শ্রীশারদামণ্ডল নামে হিন্দু-ধর্ম্ম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। হিন্দু-জাতির পুনরভ্যুদয় এবং সমগ্র ভারতবর্ষে ধর্ম্মশিক্ষা বিস্তারের জন্যই এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রধানতঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নলিখিত পাঁচটী বিভাগ করা হইয়াছে।

১। উপদেশক মহাবিদ্যালয় (Hindu College of Divinity)—এই মহাবিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ ছাত্রগণ যোগ্য ধর্ম্মশিক্ষক এবং ধর্ম্মোপদেশক বা

ধর্ম্মবক্তারূপে গণ্য হন। তাঁহাদিগকে যোগ্যতানুসারে উপদেশক ও মহোপদেশক মানপত্র এবং অন্যান্য শাস্ত্রীয় উপাধি প্রদত্ত হইয়া থাকে। ইংরাজী ভাষায় বি,এ, পাশ অথবা সংস্কৃত ভাষার শাস্ত্রী, আচার্য্য বা তীর্থ পরীক্ষোত্তীর্ণ কিম্বা ঐ সকল পরীক্ষার যোগ্য কৃতবিদ্য পণ্ডিতগণকেই এই মহাবিদ্যালয়ে ছাত্ররূপে গ্রহণ করা হইয়া থাকে। মনোনীত প্রত্যেক ছাত্রকে মাসিক ২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত ছাত্রবৃত্তি দিবার নিয়ম করা হইয়াছে। ধর্ম্মবক্তৃতা, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিচার, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত নির্ণয়, সাধারণ ধর্ম্মশাস্ত্র, বৈদিক দর্শনশাস্ত্র, কর্ম্মকাণ্ড ও পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ প্রভৃতি বিষয়ে ঐরূপ বিদ্বান ছাত্রগণকে উন্নত শিক্ষা প্রদান করিয়া ধর্ম্মাচার্য্যের যোগ্য করিয়া এই মহাবিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ করা হইবে।

২। ধর্ম্মশিক্ষা বিভাগ—এই বিভাগ দ্বারা ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নগরে উপর্য্যুক্ত মহাবিদ্যালয় হইতে পরীক্ষোত্তীর্ণ এক একজন পণ্ডিত স্থায়ীরূপে নিযুক্ত করিয়া ঐ সকল স্থানের স্কুল, কলেজ ও পাঠশালা প্রভৃতির ছাত্রবৃন্দকে হিন্দুধর্ম্মশিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা হইবে। পণ্ডিতগণ সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল নগরের জনসাধারণের মধ্যেও সনাতন ধর্ম্মের প্রচার করিবেন। মহামণ্ডলের প্রযত্নে যাহাতে ভারতের সমস্ত প্রধান প্রধান নগরে এইরূপ ধর্ম্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মহামণ্ডল হইতে নিয়মিত মাসিক সহায়তা প্রদত্ত হইতে পারে তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতেছে।

৩। শ্রীআর্য্য মহিলা মহাবিদ্যালয়ও এই শারদামণ্ডলের অঙ্গরূপে পরিগণিত হইবে। এই মহাবিদ্যালয়ে উচ্চজাতীয় বিধবাগণের ভরণপোষণের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা করা হইবে এবং উঁহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশিকা, শিক্ষয়িত্রী এবং গভর্ণেস্ প্রভৃতির যোগ্যরূপে গঠিত করা হইবে।

৪। সর্ব্বধর্ম্মসদন (Hall of all Religions)—এই নামে ইয়ুরোপীয় মহাযুদ্ধ শান্তির স্মারকরূপে একটী প্রতিষ্ঠান সংস্থাপিত করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। এই প্রতিষ্ঠান মহামণ্ডলের প্রধান কার্য্যালয় ও উপদেশক মহাবিদ্যালয়ের নিকটে স্থাপিত হইবে। ইহার একদিকে সনাতনধর্ম্ম ভিন্ন পৃথিবীর অন্যান্য যাবতীয় ধর্ম্মমতের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র উপাসনালয় থাকিবে; অপর দিকে সনাতনধর্ম্মের পঞ্চোপাসনার পাঁচটী দেবস্থান এবং লীলাবিগ্রহোপসনা প্রভৃতিরও

দেবমন্দির থাকিবে। এই প্রতিষ্ঠানে এক বৃহৎ পুস্তকালয় থাকিবে, তাহাতে পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্মমতের সমস্ত ধর্ম্মগ্রন্থ রক্ষিত হইবে। এই প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট একটী বৃহৎ বক্তৃতালয় ও শিক্ষালয় (Hall) থাকিবে। উপর্য্যুক্ত ধর্ম্ম সম্প্রদায় সমূহের বহুদর্শী বিদ্বান এবং সনাতন ধর্ম্মের পণ্ডিত ও ধর্ম্মাচার্য্যগণ উক্ত হলে পর্য্যায়ক্রমে বক্তৃতাদি করিয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অনুসন্ধান এবং সাধারণের ধর্ম্মশিক্ষার সহায়তা করিবেন। যদি পৃথিবীর অন্য প্রদেশ হইতে কোন বিদ্বান ব্যক্তি কাশীতে আসিয়া এই সর্ব্বধর্ম্মসদনে শিক্ষালাভ করিতে ইচ্ছা করেন তবে তাহারও যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা হইবে। যদিও এই প্রতিষ্ঠান ইয়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের স্মারকরূপে স্থাপিত হইতেছে তথাপি কার্য্যতঃ ইহা দ্বারা শ্রীশারদামণ্ডলে সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের জন্য, সনাতন ধর্ম্মের দৃঢ়তার নিমিত্ত এবং উপদেশক মহাবিদ্যালয়ের পণ্ডিতগণকে পৃথিবীর অন্য সমস্ত ধর্ম্মের জ্ঞান-লাভ করাইবার ও সকল প্রকার দার্শনিক শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে বিশেষ সহায়তা হইবে।

৫। শাস্ত্রপ্রকাশ বিভাগ—এই বিভাগের দ্বারা ধর্ম্মশিক্ষা প্রদানের উপযোগী বিভিন্ন ভাষার পুস্তক এবং সনাতন ধর্ম্মের যাবতীয় উপযোগী মৌলিক পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে এবং ভবিষ্যতে এইরূপ হইতে থাকিবে।

এই প্রকার পাঁচ বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানে বিভক্ত হইয়া শ্রীশারদামণ্ডল সনাতন ধর্ম্মাবলম্বিগণের সেবা ও উন্নতিকর কার্য্যে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিবে।

এ পর্য্যন্ত এই হিন্দুধর্ম্ম বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যে নিম্নলিখিতরূপ সফলতা লাভ হইয়াছে :—১নং বিভাগ অর্থাৎ উপদেশক মহাবিদ্যালয়ের কার্য্য সামান্য-রূপে আরব্ধ হইয়াছে এবং এই বিদ্যালয় হইতে সাধু ও গৃহস্থ ধর্ম্মোপদেশগণ পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া বহির্গত হইতেছেন। ধনাগমের সঙ্গে সঙ্গে এই মহা-বিদ্যালয়ের কার্য্য যথাযোগ্য উন্নতির পথে অগ্রসর করান হইবে। ২নং বিভাগ অর্থাৎ স্কুল কলেজে ধর্ম্মশিক্ষা বিস্তার বিভাগের সম্বন্ধে ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট এবং প্রায় যাবতীয় প্রান্তীয় গভর্ণমেণ্টের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। এ পর্য্যন্ত ভারতের প্রধান প্রধান চার পাঁচটী নগরে সফলতার সহিত কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে। ঐ সকল স্থানে উপদেশক মহাবিদ্যালয় হইতে পরীক্ষোত্তীর্ণ এক একজন পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছেন। এখন কেবল আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা

হইলেই অন্যান্য প্রত্যেক নগরে ঐরূপ যোগ্য ধর্ম্মোপদেশক রাখা হইবে। ৩নং বিভাগ অর্থাৎ আর্য্যমহিলা মহাবিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ করিবার মত আবশ্যকীয় ধনের ব্যবস্থা রাণী মহারাণীদিগের দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য উপযুক্ত জমি গভর্ণমেণ্টের মারফতে পাইবার আশ্বাস পাওয়া গিয়াছে। ৪নং বিভাগ অর্থাৎ সর্ব্বধর্ম্ম সদনের সম্বন্ধে বিভিন্ন স্থান হইতে অনেক প্রকার সহানুভূতি পাওয়া গিয়াছে। সনাতন ধর্ম্মে পরম নিষ্ঠাবতী একজন মহারাণী এই বিভাগে ৬০০০০০৲ ছয় লক্ষ টাকা দিতে স্বীকার করিয়াছেন এবং ইতিমধ্যেই উহার অর্দ্ধেক টাকা ট্রাষ্টীগণের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। এই কার্য্যে সার্ব্বজনীন উদার মতাবলম্বী বিদ্বদ্বৃন্দের সহানুভূতি একান্ত আবশ্যক। ৫নং বিভাগ অর্থাৎ শাস্ত্রপ্রকাশ বিভাগের কার্য্য কিরূপ দৃঢ়তা ও প্রচুর ধন ব্যয়ের সহিত সম্পাদিত হইতেছে তাহা বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিবর্গ অবগত আছেন। শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের পরিচালকগণ উহার বিভিন্ন অনেক কার্য্যবিভাগে ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও শারদামণ্ডলের কার্য্যের উন্নতির জন্য নিয়মিতরূপে পূর্ব্ব হইতেই চেষ্টা করিতেছেন।

শ্রীশারদামণ্ডলের শাস্ত্রপ্রকাশ বিভাগ, সর্ব্বধর্ম্মসদন ও আর্য্যমহিলা মহা-বিদ্যালয় এই তিন বিভাগের কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন উপায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে এবং এই তিন বিভাগের কার্য্য নিয়মিতরূপে উন্নতির দিকে অগ্রসরও হইতেছে। এই তিন বিভাগের সহিত অপর দুই বিভাগ অর্থাৎ উপদেশক মহাবিদ্যালয় এবং ধর্ম্মশিক্ষা বিস্তারের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না রাখিয়া এই দুই বিভাগকে স্বতন্ত্ররূপে চালাইবার নিমিত্ত ভিন্ন, সুগম এবং সর্ব্বজনপ্রিয় উপায় স্থির করা হইয়াছে। হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান ভয়জনক অবস্থার সঙ্গে এই দুই কার্য্যবিভাগের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে অর্থাৎ সুযোগ্য ধর্ম্মবক্তা ও ধর্ম্মশিক্ষক গঠিত করা অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এই প্রকার কার্য্যের উপযোগী কোন বিদ্যালয় ভারতবর্ষের কোথাও নাই। উপদেশক মহাবিদ্যালয় হইতে প্রতি বৎসর সুযোগ্য ধর্ম্মবক্তা ও ধর্ম্মশিক্ষক উত্তীর্ণ হইয়া বাহির হইলেই তাঁহাদিগকে ভারতের বিভিন্ন নগরে স্থায়ীরূপে রাখিয়া ছাত্র-গণের মধ্যে ধর্ম্মশিক্ষাদান এবং ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে নিযুক্ত করা হইবে। এই দুই কার্য্যবিভাগ সুচারুরূপে পরিচালনের নিমিত্ত মহামণ্ডলের সঞ্চালকগণ যে সুগম ও সর্ব্বজনপ্রিয় উপায় গঠন করিয়াছেন তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।

সনাতন ধর্ম্মশিক্ষা-কোষের নিয়ম।

১। এই কোষের নাম সনাতনধর্ম্মশিক্ষা কোষ হইবে।

২। এই কোষ স্থাপনের নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য থাকিবে—

(ক) শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্রীশারদামণ্ডল (Hindu Religious University) বিভাগ এবং উহার ভারতবর্ষব্যাপী কার্য্যব্যবস্থা চিরস্থায়ীরূপে রক্ষা করা।

(খ) হিন্দুধর্ম্মের শিক্ষক ও ধর্ম্মবক্তা (সাধু ও গৃহস্থ), উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করিয়া, গঠিত করা।

(গ) মহাবিদ্যালয় হইতে পরীক্ষোত্তীর্ণ ধর্ম্মশিক্ষক ও ধর্ম্মবক্তাগণকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন নগরে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের দ্বারা ঐ সকল স্থানের গভর্ণমেণ্ট স্কুল কলেজ, সাধারণ স্কুল কলেজ এবং অন্যান্য পাঠশালায় সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী বালকগণকে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করান।

(ঘ) উপর্য্যুক্ত উদ্দেশ্যসমূহ কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যে সকল কার্য্য আবশ্যক বোধ হইবে তাহা করা।

(৩) এই কোষের সভ্য দুই শ্রেণীর হইবেন,—

(ক) যে সকল দাতা এই কোষ ও উপদেশক মহাবিদ্যালয় স্থায়ী রাখিবার জন্য, জমি প্রভৃতি খরিদ করিবার জন্য এবং ভবনাদি প্রস্তুত করিবার জন্য এই ধর্ম্মকোষে অন্যূন এক লক্ষ টাকা দান করিবেন তাঁহারা কণ্ট্রোলার অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়ক অথবা প্রধান ব্যবস্থাপকরূপে গণ্য হইবেন। তাঁহারা যাবজ্জীবন এই কোষের ট্রাষ্টী থাকিবেন এবং এই কোষের সকলপ্রকার সুব্যবস্থা করিবার ভার তাঁহাদেরই উপর থাকিবে। এইরূপ যে সকল দাতা এক লক্ষ বা তাহা অপেক্ষাও অধিক টাকা মহামণ্ডলের এই বিদ্যাবিস্তার কার্য্যের উন্নতির জন্য দান করিবেন তাঁহারা সকল অবস্থায়ই শ্রীমহামণ্ডলের সংরক্ষক পদ প্রাপ্ত হইয়া ঐ পদের যাবতীয় অধিকার যথানিয়মে লাভ করিবেন।

(খ) যাঁহারা এই কোষে অন্যূন ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা এককালীন দান করিবেন তাঁহারা এই কোষের সাপোর্টার অর্থাৎ সহায়করূপে গণ্য হইবেন। তাঁহারা এই ধর্ম্মকোষের সুপ্রবন্ধের সম্বন্ধে এবং ছাত্র, অধ্যাপক, ধর্ম্মোপদেশক ও পরিদর্শক প্রভৃতির মাসিক বৃত্তির সুব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রস্তাব পেশ করিতে পারিবেন।

(৪) এই কোষের টাকা নিম্নলিখিতরূপে জমা থাকিবে।

(ক) কণ্ট্রোলার মহাশয়গণের দ্বারা যে অর্থ সংগৃহীত হইবে তাহা কোন দেশীয় রাজ্যের বিশ্বস্ত ব্যাঙ্কে অথবা ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের গ্যারাণ্টেড নোট প্রভৃতিতে জমা থাকিবে।

(খ) ভারতের বিভিন্ন নগরে চাঁদারূপে যে অর্থ সংগৃহীত হইবে, যদি তথাকার চাঁদাদাতা (সহায়ক) ইচ্ছা করেন, তবে তাহা সেই নগরেরই কোন বিশ্বস্ত ব্যাঙ্কে জমা রাখা হইবে।

(গ) এই কোষের কোন টাকা বার্ষিক শতকড়া ৬৲ টাকার কম সুদে কোথাও জমা রাখা হইবে না।

(৫) মাসিক ২৫৲ টাকা এক বৃত্তির পরিমাণ ধার্য্য করা হইল। উপদেশক মহাবিদ্যালয়ের বিদ্বান ছাত্রগণকে ইহার এক একটী বৃত্তি দেওয়া হইবে। এই মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক, প্রত্যেক নগরে নিযুক্ত ধর্ম্মবক্তা, ধর্ম্মশিক্ষক এবং পরিদর্শকগণকে মাসিক দুই হইতে আট বৃত্তি (পঞ্চাশ টাকা হইতে দুই শত টাকা) পর্য্যন্ত দেওয়া হইবে।

(৬) এই কোষের কণ্ট্রোলার (তত্ত্বাবধারক) এবং সাপোর্টার (সহায়ক) মহাশয়গণের নামে এই সকল বৃত্তির নামকরণ হইবে অর্থাৎ যাঁহাদের প্রদত্ত টাকার সুদ হইতে এই সকল বৃত্তি ধার্য্য হইবে তাঁহাদের পবিত্র নাম এই বৃত্তির সহিত চিরকাল স্থায়ী থাকিবে। যদি কোন নগরে শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের কোন শাখা ধর্ম্ম সভা অথবা পোষক সভা কর্ত্তৃক ইহার কোন এক বা ততোধিক বৃত্তির টাকা সংগৃহীত হয় তবে ঐ সভা বা নগরের নামানুসারে ঐ বৃত্তির নামকরণ হইবে।

(৭) এই ধর্ম্মকোষের যাবতীয় হিসাব, রসিদ ও ভাউচার প্রভৃতি শ্রীভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রধান কার্য্যালয়ে উক্ত কণ্ট্রোলার মহাশয়গণের অধীনে থাকিবে। বৎসরান্তে আয় ব্যায়ের বার্ষিক হিসাব পরীক্ষিত হইয়া মহামণ্ডলের ও প্রান্তীয় মণ্ডল সমূহের যাবতীয় মুখ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

(৮) উপদেশক মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপকগণের মাসিক বৃত্তি কণ্ট্রোলার মহাশয়দিগের দ্বারা মহামণ্ডলের জেনারল সেক্রেটারী মহাশয়ের মারফত এবং মফস্বলের ধর্ম্মবক্তা, ধর্ম্মশিক্ষক ও পরিদর্শকগণের বৃত্তি শাখা কিম্বা প্রাদেশিক মণ্ডলের মারফত দেওয়া হইবে।

(৯) এই ধর্ম্মকোষ শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের শ্রীশারদামণ্ডল বিভাগের রক্ষা ও সহায়তা করিবার জন্য এবং মহামণ্ডলের ভারতবর্ষ-ব্যাপী ধর্ম্মশিক্ষা বিস্তারের সহায়তার জন্য স্থাপিত হইয়াছে। এইজন্য ইহাকে মহামণ্ডল ট্রাষ্টের এক অংশরূপে গণ্য করা হইবে। (ঈশ্বর না করুন) এই ফণ্ডের প্রতিষ্ঠাতা

কণ্ট্রোলার মহাশয়গণ লোকান্তরিত হইলে এই ফণ্ডের সমস্ত ভার মহামণ্ডল ট্রাষ্ট ফণ্ডের ট্রাষ্টীগণের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং ভবিষ্যতে তাঁহারাই ইহার ট্রাষ্টী হইবেন।

(১০) যদি ঈশ্বরেচ্ছায় কণ্ট্রোলারদিগের সংখ্যা তিনের কম হয় তবে মহামণ্ডল ট্রাষ্টের ট্রাষ্টীগণই উক্ত কণ্ট্রোলারবা কণ্ট্রোলারদ্বয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া এই ফণ্ডের সুব্যবস্থা করিবেন।

(১১) প্রত্যেক সাপোর্টার নিজ নিজ যোগ্যতা অনুসারে শ্রীমহামণ্ডলের সংরক্ষক, প্রতিনিধি অথবা সহায়ক সভ্যের পদ যথা নিয়মে প্রাপ্ত হইবেন। তাঁহারা এই কোষে যে দান করিবেন তদতিরিক্ত উক্ত পদের জন্য তাঁহাদের নিকট অন্য কোন চাঁদা দাবী করা হইবে না।

(১২) বিশ্বস্ত দাতাগণ যে সকল দানের প্রতিশ্রুতি দিবেন অথচ দানের টাকা এককালীন দিতে অসমর্থ হইবেন তাঁহারা কিস্তীবন্দী হিসাবে দেওয়া স্বীকার করিয়া এই দণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবেন। কিন্তু যতদিন উক্ত দানের টাকা দিতে অসমর্থ থাকিবেন ততদিনের পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে বাকী টাকার সুদ দিবেন।

(১৩) যে ব্যক্তি বা যে নগরের দ্বারা কম পক্ষে দশ হাজার টাকা এই ফণ্ডে সংগৃহীত হইবে সেই ব্যক্তি বা সেই নগরের কোন বিশেষ নগরের জন্য ঐ টাকার সুদ হইতে বৃত্তি ধার্য্য করিবার অধিকার থাকিবে। কিন্তু ধর্ম্মোপদেশক নিযুক্ত করিবার ভার মহামণ্ডলের উপর থাকিবে।

(১৪) যাবতীয় পদের নিযুক্তি এবং ধর্ম্মশিক্ষক ও পরিদর্শক প্রভৃতিকে বর্খাস্ত করার ভার মহামণ্ডলের কমিটির উপর থাকিবে।

বিশেষ প্রার্থনা।

সনাতন ধর্ম্মশিক্ষা কোষ স্থাপনের অত্যল্প কাল মধ্যেই কোন পরম ধার্ম্মিক বিশিষ্ট ব্যক্তি উক্ত কোষে লক্ষমুদ্রা দান করিয়াছেন এবং কয়েকটী বৃত্তির উপযুক্ত কিছু টাকাও পাওয়া গিয়াছে। এই অত্যাবশ্যক ধর্ম্ম কার্য্যে সর্ব্বসাধারণের আন্তরিক সহানুভূতি একান্ত প্রার্থনীয়।

সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী ধনী, মানী এবং শক্তিশালী ব্যক্তিবর্গ এই ধর্ম্মকোষ দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য যত্নবান হউন, ইহাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।

প্রধান মন্ত্রী,

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল।

কাশী।

নারীধর্ম্ম।

[স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী।]

বিবাহকাল।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

স্বপেদ্‌ভূমাবপ্রমত্তা ক্ষপেদেবমহস্ত্রয়ং।
স্নায়ীত চ ত্রিরাত্রান্তে সচৈলমুদিতে রবৌ॥
বিলোক্য ভর্ত্তুর্বদনং শুদ্ধা ভবতি ধর্ম্মতঃ।
কৃতশৌচা পুনঃ কর্ম্ম পূর্ব্ববচ্চ সমাচরেৎ॥

স্ত্রীদিগের নিত্যকর্ম্ম বলা হইল। এক্ষণে নৈমিত্তিক কর্ম্ম বলা হইতেছে। মাসিক রজোদর্শনের সময় সমস্ত নিত্যকর্ম্ম ত্যাগ করত লজ্জাবতী হইয়া স্ত্রীর একান্ত গৃহে থাকা উচিত। একবস্ত্র ধারণ করত স্নান ও অলঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া দীন ও মৌনী হইয়া থাকা উচিত। নেত্র অথবা হস্ত পদের দ্বারা কোনরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ করা উচিত নহে। কেবল রাত্রিকালে মৃণ্ময় পাত্রে অন্নভোজন করা উচিত। ভূমিশয্যায় শয়ন করা উচিত। এইরূপে প্রমাদশূন্য হইয়া তিনদিন যাপন করত চতুর্থ দিবসে সূর্য্যোদয়ের পর সবস্ত্রা স্নান করিবেন এবং পতির মুখদর্শন করিবার পর ধর্ম্মতঃ শুদ্ধ হইয়া পুনরায় নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন। যদি পতি উপস্থিত না থাকেন তবে মনে মনে পতির ধ্যান করিয়া সূর্য্যদর্শন করিলেও শুদ্ধ হইবেন, মহর্ষি ভৃগু এরূপ আজ্ঞা দিয়াছেন। পরাশর সংহিতায় লেখা আছে—

স্নাত্বা রজস্বলা যা তু চতুর্থেঽহনি শুধ্যতি।
কুর্য্যাদ্রজোনিবৃত্তৌ তু দৈবপিত্র্যাদি কর্ম্ম চ॥
রুগ্নানাং যদ্‌রজঃ স্ত্রীণামন্বহস্তু প্রবর্ত্ততে।
নাশুচিঃ সা ততস্তেন তৎ স্যাদ্বৈকালিকং মতম্॥
প্রথমেঽহনি চাণ্ডালী দ্বিতীয়ে ব্রহ্মঘাতিনী।
তৃতীয়ে রজকী প্রোক্তা চতুর্থেঽহনি শুধ্যতি॥
আতুরে স্নান উৎপন্নে দশকৃত্বো হ্যনাতুরঃ।
স্নাত্বা স্নাত্বা স্পৃশেদেনং ততঃ শুধ্যেৎ স আতুরঃ॥

রজস্বলা স্ত্রী চতুর্থদিনে স্নান করত শুদ্ধ হইয়া সাধারণ নিত্যকর্ম্ম করিতে পারিবেন, কিন্তু দৈব এবং পিতৃকর্ম্ম পূর্ণ রজোনিবৃত্তির পরেই করিতে পারিবেন। কোনপ্রকার রোগপ্রযুক্ত প্রত্যহ রজস্রাব হইলে স্ত্রী অপবিত্রা হন না, কারণ উহা অস্বাভাবিক। রজোদর্শনের প্রথম দিন, স্ত্রী চণ্ডালীতুল্যা, দ্বিতীয় দিন

ব্রহ্মঘাতিনীতুল্যা এবং তৃতীয় দিন রজকী তুল্যা অপবিত্রা হইয়া থাকেন। চতুর্থ দিনে স্নানের পর তিনি শুদ্ধা হন। রোগিণী স্ত্রী চতুর্থদিবসে যদি স্নান করিতে না পারেন তবে অরোগিণী কোন স্ত্রী দশবার স্নান করত প্রত্যেক বারে রোগিণী স্ত্রীকে স্পর্শ করিলে তিনি শুদ্ধ হইবেন।

নৈমিত্তিক কর্ত্তব্য বর্ণন প্রসঙ্গে গর্ভাবস্থায় সতী গৃহিণীর কিরূপ আচরণ হওয়া উচিত এতদ্বিষয়ে মৎস্য পুরাণে নিম্নলিখিত বর্ণন আছে—

সন্ধ্যায়াং নৈব ভোক্তব্যং গর্ভিণ্যা বরবর্ণিনি।
ন স্থাতব্যং ন গন্তব্যং বৃক্ষমূলেষু সর্ব্বদা॥
বিলিখেন্ন নখৈর্ভূমিং নাঙ্গারেণ ন ভস্মনা।
ন শয়ানা সদা তিষ্ঠেদ্ ব্যায়ামঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥
ন তুষাঙ্গারভস্মাস্থিকপালেষু সমাবিশেৎ।
বর্জ্জয়েৎ কলহং লোকে গাত্রভঙ্গং তথৈব চ॥
ন মুক্তকেশী তিষ্ঠেত নাশুচিঃ স্যাৎ কদাচন।
ন শয়ীতোত্তরশিরা ন চাপরশিরাঃ ক্বচিৎ॥
ন বিভৎসং কিঞ্চিদীক্ষেন্ন রৌদ্রাং শৃনুয়াৎ কথাম্।
গুরুং বাত্যুষ্ণমাহারমজীর্ণং ন সমাচরেৎ॥
গুর্ব্বিণী ন তু কুর্ব্বীত ব্যায়ামমপতর্পণম্।
মৈথুনং ন চ সেবেত ন কুর্য্যাদতিতর্পণম্॥
ন বস্ত্রহীনা নোদ্বিগ্না ন চার্দ্রচরণা সতী।
নামাঙ্গল্যাং বদেদ্বাচং ন চ হাস্যাধিকা ভবেৎ॥
কুর্য্যাচ্চ গুরুশুশ্রূষাং নিত্যমঙ্গলতৎপরা।
সর্ব্বৌষধিভিঃ কোষ্ণেণ বারিণা স্নানমাচরেৎ॥
কৃতরক্ষা সুভূষা চ বাস্তুপূজনতৎপরা।
তিষ্ঠেৎ প্রসন্নবদনা ভর্ত্তুঃ প্রিয়হিতে রতা॥
দানশীলা তৃতীয়ায়াং পার্ব্বত্যা নক্তমাচরেৎ।
ইতিবৃত্তা ভবেন্নারী বিশেষেণ তু গর্ভিণী॥
যস্তু তস্যা ভবেৎ পুত্রঃ শীলায়ুর্বৃদ্ধিসংযুতঃ।
অন্যথা গর্ভপতনমবাপ্নোতি ন সংশয়ঃ॥

গর্ভবতী স্ত্রীর সন্ধ্যাকালে ভোজন করা উচিত নহে এবং বৃক্ষতলে যাওয়া বা থাকা উচিত নহে। নখ, অঙ্গার অথবা ভস্মের দ্বারা ভূমিতে রেখা টানা উচিত নহে, সর্ব্বদা শয়ন করিয়া থাকা এবং ব্যায়াম করাও উচিত নহে। তুষ, অঙ্গার, ভস্ম, অস্থি এবং নর-কপালের উপর উপবেশন করা অথবা এই সকল বস্তু নিকটে রাখা উচিত নহে। কাহারও সহিত কলহ এবং গাত্রভঙ্গ করা উচিত নহে। তিনি উন্মুক্তকেশ অথবা অশুচিভাবে কখনও থাকিবেন না এবং উত্তর ও পশ্চিম শিয়রে শুইবেন না। বীভৎসরসের দৃশ্যদর্শন এবং রৌদ্ররসের কথা শ্রবণ করিবেন না। গুরুপাক, অত্যুষ্ণ অথবা অজীর্ণ-রোগোৎপাদক কোন আহার্য্য সেবন করিবেন না। ব্যায়াম, অপতর্পণ, কামক্রিয়া এবং অতিতর্পণ করিবেন না। নগ্না, উদ্বিগ্নচিত্তা এবং আর্দ্রপদ হইয়া শয়ন করিবেন না, অমঙ্গলকর বাক্য বলিবেন না এবং অধিক হাস্য করিবেন না। গুরুজনের শুশ্রূষা এবং মঙ্গলকর কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকিবেন, ঔষধিমিশ্রিত ঈষদুষ্ণজলে স্নান করিবেন। রক্ষাদ্রব্য এবং আভূষণ ধারণ করিবেন, গৃহদেবতার পূজা করিবেন। সর্ব্বদা প্রসন্নবদনা এবং পতিদেবতার প্রীতিজনক মঙ্গলকর কার্য্যে তৎপর থাকিবেন। দানশীলা হইবেন এবং পার্ব্বতীতৃতীয়ার ব্রতানুষ্ঠান করিবেন। যেরূপ গুণবান্ ও ধার্ম্মিক পুত্রের ইচ্ছা থাকে সেইপ্রকার ইতিহাস ও ধর্ম্মবীর-গণের জীবনী পাঠ অথবা শ্রবণ করিবেন, কারণ শিশুর গর্ভবাসকালে মাতার চিত্তে যেরূপ ভাব উদয় হয় সন্তানও ঐ প্রকার প্রকৃতি-প্রবৃত্তি-যুক্ত হইয়া থাকে। আর্য্যশাস্ত্রে গর্ভবতী স্ত্রীর পক্ষে যে বিষয়চিন্তা ও পুরুষসহবাস ত্যাগ এবং ধর্ম্মচিন্তা ও মহৎপুরুষের চরিত্র শ্রবণ, চিত্র দর্শনাদির বিধান করা হইয়াছে মাতার গর্ভাবস্থাকালীন ভাবশুদ্ধির দ্বারা সুসন্তানোৎপাদনই উহার তাৎপর্য্য। পুরাণ-শাস্ত্রে এ বিষয়ে অনেক আখ্যায়িকা দেখিতে পাওয়া যায়। ভক্তশিরোমণি প্রহ্লাদ যে সময় মাতৃগর্ভে ছিলেন, তখন দেবর্ষি নারদ প্রহ্লাদের মাতাকে ভক্তিকথা শুনাইতেন এবং এই কারণেই প্রহ্লাদ এরূপ ভক্ত হইয়াছিলেন। অভিমন্যুর গর্ভনিবাস সময়েই তদীয়া মাতা অর্জ্জুন কর্ত্তৃক ব্যূহভেদ-রহস্য শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং এই বিদ্যা অভিমন্যু এইরূপে গর্ভ হইতেই প্রাপ্ত হন। অতএব গর্ভবতী স্ত্রীর উপর-লিখিতরূপ ভাবশুদ্ধির একান্ত প্রয়োজন অন্যথা কদাচরণ দ্বারা গর্ভপাতের সম্ভাবনা হইয়া থাকে।

অনন্তর শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে কিরূপে উহার শুশ্রূষা হওয়া উচিত এতদ্‌বিষয়ে স্মৃতিশাস্ত্রে নিম্নলিখিত আজ্ঞা দেখিতে পাওয়া যায় যথা—

বালমঙ্কে সুখং দধ্যান্ন চৈনং তর্জ্জয়েৎ কচিৎ।
সহসা বোধয়েন্নৈব নাঽযোগ্যমুপবেশয়েৎ ॥
তচ্চিত্তমনুবর্ত্তেত তং সদৈবানুমোদয়েৎ।
নিম্নোচ্চস্থানতশ্চাঽপি রক্ষেদ্‌ বালং প্রযত্নতঃ ॥
অভ্যঙ্গোদ্বর্ত্তনং স্নানং নেত্রয়োরঞ্জনং তথা।
বসনং মৃদু যত্তচ্চ তথা মৃদ্বনুলেপনম্‌।
জন্মপ্রভৃতি পথ্যানি বালস্যৈতানি সর্ব্বদা ॥

মাতা শিশুকে যত্নের সহিত অঙ্কে ধারণ করিবেন, কখনও তাহাকে তাড়না করিবেন না, নিদ্রিত শিশুকে সহসা জাগাইবেন না এবং অযোগ্য স্থানে বা অযোগ্যভাবে বসাইবেন না। শিশুর মনের অনুকূল ব্যবহার করিবেন, তাহার ইচ্ছার অনুমোদন করিবেন এবং যাহাতে নিম্ন অথবা উচ্চস্থান হইতে পড়িয়া তাহার কোনরূপ আঘাত না লাগে সে বিষয়ে সাবধান থাকিবেন। তৈলমর্দ্দন, স্নান, অঞ্জনধারণ, মৃদু বস্ত্র পরিধান ও মৃদু বস্তু লেপন—এইগুলি জন্ম হইতেই শিশুর পুষ্টি বিধানের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। যেরূপ আমকুম্ভে সংস্কার সন্নিবেশ করিলে উহা কদাপি নষ্ট হয় না, সেই প্রকার শৈশবকালে শিশুর চিত্তে যে সংস্কার উৎপন্ন করা যায় তাহাও কদাপি নাশপ্রাপ্ত হয় না। শৈশবকালে পিতা অপেক্ষা মাতার সঙ্গে শিশুর সম্বন্ধ অধিক থাকে, এজন্য শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনকে মধুময় করিবার দায়িত্ব পিতা অপেক্ষা মাতারই বেশী। তাঁহার নিজের আচরণ, আদর্শ ও শিক্ষার দ্বারা শিশুর কোমল চিত্তে ধর্ম্মপ্রেম, আস্তিকতা, ভক্তিভাব, উদারতা, সদাচার, সচ্চরিত্রতা, জাতীয় গৌরব, স্বদেশহিতৈষিতা, স্বার্থত্যাগ আদি সদ্‌বৃত্তির অঙ্কুর উৎপন্ন করা উচিত যাহাতে এই অঙ্কুর বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়া শিশুর ভবিষ্যৎ সামাজিক ও জাতীয় জীবনকে পূর্ণাদর্শযুক্ত করিতে পারে। এইরূপ করিলেই করুণাময়ী মাতা শিশুর প্রতি নিজের কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিবেন।

পতি প্রবাসে গেলে সতী স্ত্রীর কিরূপ আচরণ করা উচিত এ বিষয়ে স্মৃতিশাস্ত্রে নিম্নলিখিত উপদেশ পাওয়া যায় যথা—

শ্বশ্রূশ্বশুরয়োঃ পার্শ্বে নিদ্রা কার্য্যা ন চান্যথা।
প্রত্যহং পতিবার্ত্তা চ তয়াহন্বেষ্যা প্রযত্নতঃ ॥
অপ্রক্ষালনমঙ্গানাং মলিনাম্বরধারণম্।
তিলকাঞ্জনহীনত্বং গন্ধমাল্যবিবর্জনম্ ॥
ক্রীড়াং শরীরসংস্কারং সমাজোৎসবদর্শনম্।
হাস্যং পরগৃহে যানং ত্যজেৎ প্রোষিতভর্তৃকা ॥

নিজগৃহে শ্বশ্রূর নিকট শয়ন করা উচিত এবং প্রত্যহ যত্নের সহিত পতির সংবাদ লওয়া উচিত। পতির প্রবাসকালে সতী স্ত্রীর শারীরিক শোভার প্রতি দৃষ্টি যাওয়া উচিত নহে। কারণ স্ত্রীর শরীর-শোভা পতিসেবার জন্যই বিহিত হইয়াছে। এজন্য উত্তম বস্ত্র পরিধান, তিলক, অঞ্জন, গন্ধদ্রব্য অথবা মাল্যাদিধারণ করা উচিত নহে। ক্রীড়া, শরীর সংস্কার, উৎসব দর্শন, সামাজিক কার্য্যে যোগদান, হাস্য কৌতুক এবং বৃথা পরগৃহে গমন প্রোষিতভর্তৃকা স্ত্রীর সর্ব্বথা পরিত্যাগ করা উচিত।

লজ্জা নারীজাতির ভূষণ কেন?

সতীজীবনে শ্রীর সহিত হ্রীর মধুর বিকাশ নয়নগোচর হইয়া থাকে। দুর্গা সপ্তশতীতে দেবতাগণ বলিয়াছেন—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু লজ্জারূপেণ সংস্থিতা।"

মনুষ্যের মধ্যে লজ্জা দেবীর ভাব। নারীজাতি দেবীর অংশরূপিণী এজন্য লজ্জাও নারীজাতির মধ্যে একটি নৈসর্গিক ভাব। এজন্য সতীত্বের যতই উৎকর্ষ সাধন হয় ততই নারীজীবনে হ্রীরও পূর্ণ বিকাশ হইয়া থাকে। সতী নারী স্বভাবতই অধিক লজ্জাবতী হইয়া থাকেন। লজ্জার উৎপত্তি কোথা হইতে হয় এ বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান করিলে দেখা যায়, পশুধর্ম্মের প্রতি মনুষ্যের যে স্বাভাবিক ঘৃণা আছে উহা হইতেই লজ্জার আবির্ভাব হইয়া থাকে। মনুষ্য-প্রকৃতিতে পশুত্বের আবেশ অনুভব করিবামাত্রই লজ্জার উদয় হইয়া থাকে। পশুপ্রকৃতিতে লজ্জা নাই, এজন্য পশু নির্লজ্জ হইয়াই আহার, নিদ্রা মৈথুনাদি করিয়া থাকে। যখন জীবের প্রকৃতির অতীত পরব্রহ্মপদে প্রতিষ্ঠালাভ হয় তখনও ভেদভাব বিগলিত হওয়ায় লজ্জারূপ পাশ দূরীভূত হইয়া যায়। এই সর্ব্বাধম ও সর্ব্বোত্তম অবস্থা ভিন্ন মাধ্যমিক অবস্থায় লজ্জার বিকাশ হইয়া

থাকে। দিব্যভাবের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে লজ্জার আবির্ভাব এবং পশুভাবের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে লজ্জার তিরোভাব হয়। আহার নিদ্রা মৈথুনাদি কার্য্যের সহিত স্থূলশরীরের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ থাকায় ইহারা স্বভাবতই পশুভাবযুক্ত; কিন্তু জীবনরক্ষা ও বংশরক্ষার সঙ্গে এই সকল কার্য্যের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ থাকায় সহসা ইহাদিগকে পরিত্যাগ করাও যায় না। এজন্য জ্ঞানী মহর্ষিগণ ভাবশুদ্ধির সহিত এ সকল কার্য্য করিবার বিধান করিয়া ইহাদের মধ্য হইতে পশুভাব বিদূরিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। সাধনার সহায়স্বরূপে শরীর রক্ষণার্থ ভগবৎ প্রসাদরূপে অন্নভোজন এব কুলদেশোজ্জলকারী সৎপুত্রোৎপাদনের জন্য কামসেবা আদি উল্লিখিত ভাবশুদ্ধিরই দৃষ্টান্ত স্বরূপ। তথাপি দিব্যভাবযুক্ত প্রকৃতিতে এ সকল কার্য্য করিবার সময় অবশ্যই লজ্জার উদয় হইয়া থাকে। পুরুষের মধ্যে দেবীর ভাব অপেক্ষা পুরুষভাবের আধিক্য থাকায় পুরুষ স্বভাবতই এ সকল কার্য্যে কম লজ্জাবোধ করিয়া থাকে। পরন্তু স্ত্রীজাতির মধ্যে পুরুষ-ভাব অপেক্ষা দেবীর ভাব অধিক থাকায় স্ত্রীজাতি স্বভাবতই এ সকল কার্য্যে বিশেষ লজ্জানুভব করিয়া থাকে। লজ্জার বিচারে পুরুষ-প্রকৃতির সহিত স্ত্রীপ্রকৃতির এই প্রভেদ আছে। এই হেতু এরূপ প্রভেদকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই স্ত্রী ও পুরুষ নিজ নিজ অধিকারানুসারে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতে পারে। জ্ঞানপথের পথিক পুরুষ যতই অদ্বৈতভাবময় স্বরূপের দিকে অগ্রসর হয় ততই তাহার লজ্জারূপ পাশ আপনা আপনিই কাটিয়া যায়। এজন্য পরমহংস ব্রহ্ম-ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দিগম্বর হইয়া পড়েন। তাঁহার মধ্যে যে ব্রহ্মভাবের অংশ ছিল তাহার পূর্ণতাতেই পরমহংসের এরূপ স্থিতিলাভ হইয়া থাকে। কিন্তু স্ত্রীজাতির মধ্যে ব্রহ্মভাবের অংশ প্রধানরূপে না থাকিয়া দেবীভাবের অংশই প্রধানরূপে থাকায় দেবীভাবের পূর্ণতাতেই স্ত্রীজাতি পূর্ণতা লাভ করিতে পারে। লজ্জা দেবীভাবেরই প্রকাশক, এজন্য পাতিব্রত্যের পূর্ণতা দ্বারা নারী যতই দেবীভাবের পূর্ণতা-পদে প্রতিষ্ঠিতা হন, ততই স্ত্রীগুণের উন্নত বিকাশ তাঁহার মধ্যে স্বভাবতই হইয়া থাকে। অতএব লজ্জাশীলতা সতীধর্ম্মের একটি প্রধান লক্ষণ। নির্লজ্জা স্ত্রী সতী হইতে পারে না। লজ্জা স্ত্রীজাতির ভূষণ, ইহা ব্যতীত স্ত্রীর স্ত্রীভাবই রক্ষিত হইতে পারে না। লজ্জার বলেই স্ত্রী পাতি-ব্রত্যধর্ম্ম পূর্ণরূপে প্রতিপালন করিতে পারেন। স্ত্রীকে পুরুষের মত অধিকার

প্রদান অথবা শিক্ষা দান করিয়া নির্ল্লজ্জ করিয়া ফেলিলে স্ত্রীজাতির বড়ই হানি করা হইয়া থাকে। এরূপ স্ত্রীর দ্বারা সতীধর্ম্মের উন্নত আদর্শ পালন কখনই হইতে পারে না। অধিকন্তু প্রকৃতিবিরুদ্ধ আচরণের দ্বারা উহাদের আধ্যাত্মিক অবনতিই হইয়া থাকে। অতএব এরূপ আচরণ সর্ব্বথা আর্য্যশাস্ত্র-বিগর্হিত এবং নারীধর্ম্মের মূলোচ্ছেদকর ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

পশ্চিম দেশে স্ত্রীপুরুষের একত্র ভোজন, আলাপ ও একত্র ভ্রমণাদি আচার প্রচলিত আছে, একারণ তদ্দেশীয় নারীগণের মধ্যে লজ্জাহীনতা ও পুরুষভাব অধিক এবং সতীধর্ম্মের উপর দৃষ্টিও কম। উত্তম সতী কিরূপে হয়, স্ত্রী পতির সহিত অনুমৃতা কিরূপে হইতে পারেন, পশ্চিমীয় নারীগণ স্বপ্নেও এ সকল বিষয় চিন্তা করিতে পারেন না। আর্য্যশাস্ত্রে পাতিব্রত্য বিনা নারীর জীবনই বৃথা এরূপ সিদ্ধান্ত সুনিশ্চিত হইয়াছে এবং এজন্যই অন্তঃপুর-প্রথাদির ব্যবস্থা দ্বারা নারীজাতির মধ্যে যাহাতে লজ্জাভাব অক্ষুণ্ণ থাকে তাহারই বিধান করা হইয়াছে এবং স্ত্রীপুরুষের সহভোজন বা সহভ্রমণ ব্যাপারকে প্রশংসার চক্ষে দেখা হয় নাই। শ্রীভগবান্ মনু ত এ সকলের তীব্র তিরস্কারই করিয়াছেন। আজকাল ধর্ম্মহীন পাশ্চাত্য শিক্ষাদ্বারা বিকৃতমস্তিষ্ক অনেক অদূরদর্শী ব্যক্তি অন্তঃপুর-প্রথা নষ্ট করিয়া স্ত্রীজাতিকে নির্লজ্জতার অভ্যাস করান, পুরুষের মধ্যে নিরঙ্কুশভাবে ভ্রমণ, নৃত্য, গীত, বাদ্য, নাটকাদি অভিনয় এবং পুরুষের হাত ধরিয়া যথেচ্ছ ভ্রমণ ও বায়ু সেবনাদিকে সভ্যতার লক্ষণ ও নারীজাতির প্রতি দয়া প্রদর্শন মনে করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং তদ্বিপরীত সনাতন প্রথাকে স্ত্রীজাতির প্রতি অত্যাচার ও নিষ্ঠুর ব্যবহার বলিতেও কুণ্ঠিত হইতেছেন না। কিন্তু ধীরভাবে একটু বিচার করিলেই উল্লিখিত সিদ্ধান্ত সমূহকে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর এবং ভ্রমমূলক বলিয়া বোধ হইবে। কাহারও প্রতি দয়া প্রকাশ করা কখনই মন্দ নহে, কিন্তু বিচারহীন দয়ার দ্বারা কল্যাণ না হইয়া বহুধা অকল্যাণই হইয়া থাকে। স্ত্রীজাতি দয়ার পাত্র অবশ্যই বটে, কিন্তু যে দয়ার পরিণামে পাতিব্রত্যধর্ম্মেরই মূলোচ্ছেদ হইয়া যায়, স্ত্রীভাব সমূলে উন্মূলিত হয় এবং সংসারে মহান্ অনর্থের উদয় হয়, তাহাকে দয়া বলা বিড়ম্বনামাত্র, উহা প্রত্যুত মহাপাপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। দূরদর্শী, জ্ঞানময় আর্য্যশাস্ত্র এরূপ মিথ্যা দয়ার বিধান করিতে পারেন না। স্ত্রীজাতিকে নির্লজ্জের মত যথেচ্ছ

ভ্রমণ করিতে না দিলে নিষ্ঠুরতা হয় এজন্য সনাতনী অন্তঃপুর-প্রথা নিষ্ঠুরতাময় এরূপ বিচার সম্পূর্ণ ভ্রমমূলক ইহাতে সন্দেহ নাই ; কারণ আর্য্যশাস্ত্রে স্ত্রীজাতির যেরূপ গৌরব বাড়ান হইয়াছে এরূপ অন্য কোন জাতি, দেশ বা শাস্ত্রের মধ্যে করা হয় নাই। অন্য জাতির পক্ষে স্ত্রী পুরুষের বিষয়-বিলাসের সহচারিণী কিন্তু আর্য্যশাস্ত্রানুসারে ভার্য্যা সমস্ত গার্হস্থ্য ধর্ম্মে পতিদেবতার সহধর্ম্মিণী ও অর্দ্ধাংশ-ভাগিনী। অন্যজাতির বিচারে সাধারণতঃ স্ত্রীদেহ কামসেবার যন্ত্রস্বরূপ, কিন্তু আর্য্যশাস্ত্রমতে স্ত্রী জগন্মাতার রূপ এবং ইঁহার প্রত্যেক অবস্থায় দিব্যভাবে পূজা দ্বারা মুমুক্ষু মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। স্ত্রীজাতি প্রকৃতিমাতার অংশরূপিণী বলিয়া উহার প্রত্যেক দশাকে দিব্যভাবে পূজা করিবার বিধি আর্য্যশাস্ত্রে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। দশমহাবিদ্যার দশমূর্ত্তি দিব্যভাবে স্ত্রী-জাতিরই দশদশার সূচক এবং প্রত্যেক দশাই পূজার যোগ্য। তদনুসারে কুমারী গৌরীরূপিণী, যুবতী গৃহিণী সুহাসিনী ষোড়শী ভুবনেশ্বরী আদিরূপিণী, বৃদ্ধা বিধবা ধূমাবতীরূপিণী এবং রজস্বলা ত্রিধারাময়ী ছিন্নমস্তারূপিণী। এইরূপ সকলভাবেরই দিব্য সম্বন্ধ ও দিব্যপূজা আর্য্যশাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। দেবী-ভাগবতে লেখা আছে—

সর্ব্বাঃ প্রকৃতিসম্ভূতা উত্তমাধমমধ্যমাঃ।
যোষিতামবমানেন প্রকৃতেশ্চ পরাভবঃ॥
রমণী পূজিতা যেন পতিপুত্রবতী সতী।
প্রকৃতিঃ পূজিতা তেন বস্ত্রালঙ্কারচন্দনৈঃ॥
কুমারী চাহষ্টবর্ষা যা বস্ত্রালঙ্কারচন্দনৈঃ॥
পূজিতা যেন বিপ্রেণ প্রকৃতিস্তেন পূজিতা॥
কুমারী পূজিতা কুর্য্যাদ্দুঃখদারিদ্র্যনাশনম্।
শত্রুক্ষয়ং ধনায়ুষ্যং বলবৃদ্ধিং করোতি বৈ॥

উত্তম, মধ্যম, অধম সকল প্রকার স্ত্রীই প্রকৃতির অংশরূপিণী, এজন্য স্ত্রীজাতির অবমাননায় প্রকৃতির অবমাননা হইয়া থাকে। পতিপুত্রবতী সতী রমণীর পূজায় প্রকৃতি মাতারই পূজা করা হয়। বস্ত্রালঙ্কার চন্দনাদি দ্বারা অষ্টবর্ষীয়া কুমারীর পূজা করিলে প্রকৃতিমাতা পূজিতা ও প্রসন্না হইয়া থাকেন। ইহার দ্বারা দুঃখদারিদ্র্যনাশ, শত্রুক্ষয়, ধনলাভ, আয়ুবৃদ্ধি এবং শক্তিলাভ হইয়া থাকে।

আর্য্যজাতি।

[স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী]

আর্য্যজাতির সর্ব্বাঙ্গীণ পূর্ণতা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

বিখ্যাত ঐতিহাসিক আবুল ফজল বলিয়াছেন,—"হিন্দুগণ ধর্ম্মপরায়ণ, মধুর স্বভাব, অতিথিসেবী, সন্তুষ্ট, জ্ঞানপ্রিয়, ন্যায়শীল, কার্য্যদক্ষ, কৃতজ্ঞ, সত্যপরায়ণ এবং অত্যন্ত বিশ্বস্ত।"

এইরূপ প্রাচীন ঐতিহাসিকগণের মত আলোচনা করিলে আর্য্যজাতির মধুর ও পূর্ণ চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। যে সময় পৃথিবীর অন্যান্য জাতি অসভ্যতার ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল সেই সময় ভারতবর্ষ সভ্যতার আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। এবং পরবর্ত্তীকালে সেই আলোকেই পাশ্চাত্য দেশসমূহ আলোকিত হইয়াছিল।

যিশু খৃষ্টের জন্মের ৫৫ বৎসর পূর্ব্বে যখন প্রবল পরাক্রান্ত জুলিয়াস সিজর গ্রেটব্রিটেন অধিকার করিবার জন্য তথায় গমন করিয়াছিলেন তখন তিনি এই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, যে দেশ তিনি দখল করিতে আসিয়াছেন সে দেশের লোক পশুতুল্য। কাঁচা মাংস ভোজন, মাটির ভিতরে বাস, বৃক্ষশাখায় বিহার এবং নানা রঙ্গে শরীর রঞ্জিত করা ——এই সকল তাহাদের আচার ছিল। এবং তাহাদের ভাষাও পশুদের মত ছিল। কিন্তু যখন বীরচূড়ামণি সেকন্দর জুলিয়াস সিজরের তিন শত বৎসর পূর্ব্বে ভারত বিজয় করিবার মানসে পাঞ্জাবে আগমন করিয়াছিলেন তখন তিনি ইহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন যে, যাহাদের তিনি স্বদেশে বসিয়া অসভ্য ও কাপুরুষ মনে করিতেন সেই আর্য্যজাতি গ্রীক-দিগেরও গুরুস্থানীয়। তিনি রাজা পোরসের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে সময় বুঝিয়াছিলেন যে, আর্য্যজাতির ন্যায় বীর জাতি জগতে আর কোথাও নাই। তাঁহাদের বীরত্ব, বেশভূষা, স্বাভাবিক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য, দয়াশীলতা, নির্ভয়তা, আতিথেয়তা এবং ধর্ম্মবুদ্ধি প্রভৃতি গুণসমূহ জগতে অতুলনীয়! তাঁহাদের ভাষা মন্দাকিনীর মৃদুমন্দ নাদের ন্যায় সুমধুর। এইরূপ শত শত প্রমাণ রহিয়াছে যদ্দারা মহামহিম আর্য্যজাতির অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হয়।

যে জাতির নৈতিক জীবন যত উন্নত তাহার রাজনীতিও ততই উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রাচীন আর্য্যজাতির চরিত্র দেখিয়া তাঁহাদের রাজকীয় শাসন জানা যাইতে পারে। হার্ব্বার্ট স্পেন্সার বলিয়াছেন প্রজার চরিত্র সম্বন্ধীয় উন্নতি দেখিয়া রাজ্যশাসন প্রণালীর উৎকর্ষ বা অপকর্ষ জানা যায়। শাস্ত্রে লিখিত আছে,—

রাজ্ঞি ধর্ম্মিণি ধর্ম্মিষ্ঠাঃ পাপে পাপাঃ সমে সমাঃ।
রাজানমনুবর্ত্তন্তে যথা রাজা তথা প্রজাঃ॥

রাজা ধার্ম্মিক হইলে প্রজা ধার্ম্মিক, রাজা পাপী হইলে প্রজা পাপী এবং রাজা সমভাবাপন্ন হইলে প্রজাও সমভাবাপন্ন হয়। প্রজা রাজারই অনুকরণ করিয়া থাকে এবং রাজার ন্যায় স্বভাবযুক্ত হয়। যখন পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ হইতে সিদ্ধ হয় যে, আর্য্যজাতি মিথ্যা, চুরী এবং আদালতে যাওয়া পর্য্যন্ত অবগত ছিলেন না। তখন ইহা অপেক্ষা অধিক উৎকৃষ্ট রাজানুশাসনের পরিচয় আর কি হইতে পারে। আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধ পলিটিশিয়ান এড্‌মণ্ড বার্ক সাহেব বলিয়াছেন,—"প্রজার জনসংখ্যা এবং ধনসম্পত্তি দেখিয়া রাজ্যানু-শাসনের পরীক্ষা হয়।" যদি এ বিষয়েরও পরীক্ষা লওয়া যায় তবেও আর্য্যজাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইবে কারণ আর্য্যজাতির জন সংখ্যা ও ধন সম্পত্তি জগতে অতুলনীয় ছিল। প্রোফেসর ম্যাক্স উক্কার এবং টেসিয়স সাহেব বলিয়াছেন, "পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত জাতির যত জনসংখ্যা এক আর্য্যজাতিরই জনসংখ্যা তত হইবে।" সম্পত্তির বিষয়ে ত ভারত স্বর্ণভূমি নামে চিরপ্রসিদ্ধ। অতএব যদি বার্ক সাহেবের কথা মানিয়া লওয়া যায় তাহা হইলেও প্রাচীন আর্য্যজাতির শাসনপ্রণালীর পূর্ণতা প্রমাণিত হইবে। বাস্তবিক রাজার যাহা লক্ষণ তাহা প্রাচীন আর্য্যজাতির মধ্যেই পাওয়া যায়। যে জাতিতে রাজা প্রজাকে আপন পুত্রের ন্যায় দেখিতেন, যে জাতিতে রাজা প্রজার ধনসম্পত্তিকে আপন বিষয় বিলাশের উপকরণ না মনে করিয়া নিজেকে উহার রক্ষক মাত্র মনে করিতেন, যে জাতিতে রাজা প্রজারঞ্জন ব্যতীত আপন জীবন এবং রাজকার্য্যকে ব্যর্থ মনে করিতেন, যে জাতিতে রাজা কেবল প্রজার সান্তোষ বিধানের নিমিত্ত স্বীয় নিরপরাধিনী পতিব্রতা স্ত্রীকে বনবাস দিতে পারেন, সেই জাতির রাজকীয়

শাসনপ্রণালী কিরূপ উন্নত ছিল তাহা আর বিচারবান্ ব্যক্তিকে বলিয়া দিতে হইবে না। মহাভারতে যে রাজধর্ম্মের বর্ণন করা হইয়াছে, শুক্রাচার্য্য যে রাজনীতির উপদেশ প্রদান করিয়াছেন এবং মহর্ষি মনু নিজ সংহিতায় রাজানুশাসনের যে পদ্ধতি নিরূপণ করিয়াছেন জগতে কুত্রাপি তাহার তুলনা পাওয়া যায় না। প্রোফেসর উইলসন সাহেব মনুর আইন সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"এই প্রকার আইন যে জাতির মধ্যে গঠিত হইতে পারে সে জাতি সামাজিক সভ্যতা এবং অনুশাসনের পরাকাষ্ঠায় উপনীত হইয়াছিল সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই" 'বাইবেল অফ ইণ্ডিয়া'য় লেখা আছে,—"মনুস্মৃতিই মিশ্র, গ্রীস ও রোমের আইনের ভিত্তিস্বরূপ এবং পাশ্চাত্য প্রদেশে মনুস্মৃতির প্রভাব সকলেই অনুভব করেন।" ডাক্তার রবার্টসন সাহেব বলিয়াছেন,—"মনুর রাজনীতি দেখিয়া বোধ হয় যে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোত্তম সভ্যজাতিই এই প্রকার আইন নির্ম্মাণ করিতে পারেন। সূক্ষ্ম বিচার, গভীর গবেষণা, ন্যায়পরতা, স্বাভাবিক ধর্ম্মবৃত্তি ও ধর্ম্মানুশাসন প্রভৃতির বিশেষত্ব থাকায় মনুর নীতি পাশ্চাত্য রাজনীতি হইতে অনেক অংশে উৎকৃষ্ট।" সার চার্লস মেটকাফ সাহেব বলিয়াছেন,—"আর্য্য রাজনীতির প্রভাব কেবল সমষ্টি রাজ্যেই পড়িত না, অধিকন্তু তাহারই প্রভাবে গ্রামে গ্রামে প্রজাতন্ত্র প্রণালীর এরূপ সুন্দর ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল যে, লোকেরা নিজেদের যাবতীয় রাজনীতি নিজেরাই নির্ণয় করিয়া লইতেন। তাঁহাদের কখনও বড় আদালতে যাইবার প্রয়োজন হইত না। এইরূপ এক বিরাট রাজশক্তির অধীন হওয়া সত্ত্বেও ব্যষ্টিরূপে তাঁহারা স্বতন্ত্র ও সুখী ছিলেন। এই সমস্তই প্রাচীন আর্য্যজাতির রাজশাসন প্রণালীর পূর্ণতার লক্ষণ।

স্বাধীন জাতি মাত্রেই বীরতার আদর করে এবং দেশের কল্যাণের নিমিত্ত জীবন উৎসর্গ করিতে গৌরব অনুভব করে, কিন্তু প্রাচীন আর্য্যজাতির মধ্যে বিশেষত্ব এই ছিল যে তাঁহাদের বীরত্ব ও স্বদেশের জন্য আত্মোৎসর্গ অপূর্ব্ব ধর্ম্মভাবে পূর্ণ ছিল। প্রাচীন আর্য্যজাতি আধুনিক পাশ্চাত্য জাতির ন্যায় মদোন্মত্ত হইয়া এবং ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া যুদ্ধ করিতেন না, কিন্তু ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের পরাজয় হওয়া প্রাকৃতিক নিয়ম এবং ভগবানের আজ্ঞা

এইরূপ মনে করিয়া নিমিত্ত-মাত্ররূপে তাঁহাকেই সহায়তা প্রদানের নিমিত্ত যুদ্ধ করিতেন। পিতামহ ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্য দুর্য্যোধনের অন্নে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, এইজন্য তাহার পক্ষে যুদ্ধ করা তাঁহারা ধর্ম্মানুমোদিত মনে করিয়াছিলেন, পক্ষান্তরে অধার্ম্মিক দুর্য্যোধনের নাশও ধর্ম্মানুকূল ছিল। এই হেতু পিতামহ ভীষ্ম ও আচার্য্য দ্রোণ পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলেও আপনাদের মৃত্যুর উপায় তাহাদিগকে বলিয়া দিয়া ধর্ম্মের বিজয় করাইয়াছিলেন। দুর্য্যোধন পাণ্ডবদের ভয়ানক শত্রু ছিলেন তথাপি যে সময় তিনি যুদ্ধে বিজয়ী হইবার উপায় জানিবার জন্য যুধিষ্ঠিরের নিকট আসিয়াছিলেন তখন যুধিষ্ঠির তাহাকে আপনাদের বিনাশের উপায় অকপটচিত্তে বলিয়া দিয়াছিলেন। 'অশ্বত্থামা হত' এই একটী মাত্র মিথ্যা কথা বলিলে দ্রোণাচার্য্যের মৃত্যু হইবে জানিয়া যখন যুধিষ্ঠিরকে মিথ্যা বলিবার পরামর্শ দেওয়া হইল তখন তিনি উত্তর দিয়াছিলেন,——"ইন্দ্রপ্রস্থের রাজ্য ত তুচ্ছ যদি স্বর্গরাজ্য অথবা ব্রহ্মলোকও প্রাপ্ত হওয়া যায় তথাপি কখনও যুধিষ্ঠির মিথ্যা বলিবে না।" এইরূপ অনেক আদর্শ বিদ্যমান আছে যদ্দ্বারা প্রাচীন আর্য্যদের ধর্ম্মানুকূল বীরত্বের লক্ষণ প্রমাণিত হয়। আর্য্যজাতির মধ্যে স্থূল পার্থিব সম্পত্তি লইয়া সংগ্রাম উপস্থিত হইলেও তাহাতে তাঁহাদের চিত্তের উদারতা নষ্ট হইত না। ধার্ম্মিক পাণ্ডবদের উপর দুষ্ট কৌরবেরা জগতে এমন কোন অত্যাচার ও নৃশংসতা ছিল না যাহার প্রয়োগ করিতে বাকী রাখিয়াছিল, কিন্তু জ্যেষ্ঠ আত্মীয় সর্ব্বদাই পূজনীয় বলিয়া প্রতিদিন যুদ্ধের শেষে পাণ্ডবগণ জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে প্রণাম করিতে যাইতেন এবং দুর্য্যোধনের গৃহের রমণীগণ তীর্থের পথে যে সময় বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন সেই সময় পাণ্ডবেরা সকলে মিলিয়া তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। নিরস্ত্র শত্রুর উপর প্রহার করা, দুর্ব্বল শত্রুর প্রতি অত্যাচার করা এবং অন্যায়রূপে যুদ্ধ করা আর্য্যজাতির স্বপ্নেরও অগোচর ছিল, যদি কখনও প্রমাদ বশতঃ কেহ হঠাৎ এইরূপ কোন আচরণ করিয়া বসিত তবে তাহাকে সমাজে অতিশয় নিন্দিত হইতে হইত। প্রসঙ্গত আর্য্যজাতির শস্ত্রপ্রয়োগের একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে। খাণ্ডব দাহন করিতে সময় যখন অর্জ্জুন ময় নামক দানবরাজের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন তখন কৃতজ্ঞতার পরিচয় প্রদানের

উদ্দেশ্যে দানবরাজ ময় অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, —"আমার নিকট যে অলৌকিক দানবাস্ত্র আছে আমার প্রাণ রক্ষা করার বদলে আমি তাহা আপনাকে প্রদান করিয়া কৃতার্থ হইতে ইচ্ছা করি।" অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ঐ অস্ত্রের গুণ কি?" ময় বলিলেন,—"এই দানবাস্ত্র এরূপ অলৌকিক গুণসম্পন্ন যে ইহা দ্বারা আকাশে উড়িয়া কিম্বা অদৃশ্য হইয়া শত্রু বিনাশ করা যাইতে পারে এবং জলে ডুবিয়া অথবা শত্রুর সম্মুখে না যাইয়া দূর হইতে শত্রু ক্ষয় করা যাইতে পারে।" এই সকল লক্ষণ শুনিয়া অর্জ্জুন ঐ অস্ত্রের প্রশংসা করিয়া কহিলেন,—"আমরা আর্য্য, এইরূপ অনার্য্য-সেবিত অস্ত্র আমাদের প্রয়োজনে আসিবে না, সুতরাং এই অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিতে আমি ইচ্ছুক নহি।" এই দৃষ্টান্তে স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে আর্য্যজাতি কি প্রকার ধর্ম্মলক্ষ্যযুক্ত যুদ্ধের পক্ষপাতী ছিলেন এবং অদ্ভুত ও অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন হইলেও দানব-সেবিত অস্ত্রের প্রয়োগ করিতে অধর্ম্ম মনে করিতেন।

আর্য্যদের দিব্যাস্ত্র কিরূপ ছিল তাহার কিছু কিছু বর্ণন পুরাণে পাওয়া যায়। মন্ত্রের বিনিয়োগ ভেদে এই সকল অস্ত্র ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ বিভিন্ন রূপে ব্যবহার করিতেন। মন্ত্রের সহায়তায় ক্ষত্রিয়গণের বিভিন্ন অস্ত্র অলৌকিক শক্তিযুক্ত হইয়া যাইত। ব্রাহ্মণগণ ঐ সকল মন্ত্রের দ্বারা সাধন ক্রিয়া এবং বিনিয়োগ ভেদে অন্তর্রাজ্যের সহায়তায় স্তম্ভন, মোহন, বশীকরণ, ব্যাধি ও গ্রহদোষ হইতে রক্ষা প্রভৃতি অলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। রামায়ণ, মহাভারতাদি গ্রন্থে যে ক্ষত্রিয়গণের দিব্যাস্ত্রের অলৌকিক শক্তির বর্ণন দৃষ্ট হয় তাহা কবির কল্পনা নহে। উহাদের মূলে অলৌকিক সত্য নিহিত আছে। যদিও ঐ সকল মন্ত্রযুক্ত অস্ত্রের সাধনপ্রণালী অধুনা প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে তথাপি ঐ সকল দিব্যাস্ত্রের পদ্ধতি গ্রন্থ ভারতের কোন কোন স্থানে এখনও পাওয়া যায়। আর্য্যজাতির যুদ্ধে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা ছিল। আর্য্যজাতি কেবল ইহলৌকিক ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য যুদ্ধ করিতেন না, কিন্তু ধর্ম্ম-যুদ্ধে আত্মবলিদান করিয়া উত্তরায়ণ গতি দ্বারা অনন্ত দিব্য সুখ লাভ করিবার নিমিত্ত যুদ্ধ করিতেন। মনুসংহিতায় লেখা আছে,—

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে সূর্য্যমণ্ডল-ভেদিনৌ।

পরিব্রাড্ যোগযুক্তশ্চ রণে চাভিমুখো হতঃ॥

পরিব্রাজক যোগী এবং সম্মুখ সংগ্রামে নিহত বীর উভয়েই উত্তরায়ণ গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। গীতায় লিখিত আছে,—

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।

যুদ্ধে নিহত হইলে স্বর্গলাভ হইবে এবং জয়ী হইলে স্বরাজ্য প্রাপ্ত হইবে। এই প্রকার শাস্ত্রোক্ত উপদেশ হইতে প্রমাণিত হয় যে, আর্য্যজাতি বীরত্বের সহিত দেশ ও ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ করিতেন, তাঁহারা ও তাঁহাদের সহধর্ম্মিণীগণ পরলোকে পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতেন এবং তাঁহারা জানিতেন যে সম্মুখ সংগ্রামে মৃত্যু হইলে এবং ঐরূপ মৃত পতির সহিত সহমরণ গমন করিলে উভয়েই অক্ষয় স্বর্গলাভ ও অনন্ত আনন্দ ভোগ করিতে পারিবেন। এইজন্য আর্য্য বীরগণের মরিতে ভয় ছিল না, তাঁহারা শয্যায় শয়ন করিয়া মরা নিন্দনীয় মনে করিতেন এবং যুদ্ধে মরণকে পরম পবিত্র ও আর্য্যজনোচিত বিবেচনা করিতেন। তাঁহাদের সহধর্ম্মিণীগণও তাঁহাদের সহিত সহমৃতা হইতেন। স্বদেশহিতৈষীতার ভাব তাঁহাদের প্রতি রোমকূপে অনুপ্রবিষ্ট ছিল। স্বদেশ ও স্বধর্ম্মের সেবাকে তাঁহারা ভগবানের পূজা মনে করিয়া নিষ্কাম কর্ম্মযোগের দ্বারা আত্মোন্নতি সাধন করিতেন এবং এই সকল কারণেই প্রাচীনকালে ভারতের সেই শোভনীয় গৌরব মহিমা দিগ্‌দিগন্তে পরিব্যাপ্ত ছিল। প্রাচীন আর্য্যজাতির সেই গৌরবরবির সমুজ্জ্বল রশ্মি অতীতের অমানিশা ভেদ করিয়া বর্ত্তমান আর্য্যজীবনকেও উদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়াছে। এই অল্পদিন পূর্ব্বেও মিবারের পুণ্যশ্লোক মহারাণা প্রতাপ প্রমুখ রাজপুত বীরগণ এবং রাঠোর দুর্গাদাস ও মিবারের পৃথ্বীরাজ প্রভৃতি বীরবর্গ ভারতমাতার মুখচ্ছবি নিজেদের প্রতিভা ও বীরত্বে যে প্রকার উজ্জ্বল করিয়াছিলেন পৃথিবীর কোন দেশের ইতিহাসে তাহার তুলনা পাওয়া যায় না। ইহাই প্রাচীন আর্য্যজাতির ধর্ম্মমূলক বীরত্বের দৃষ্টান্ত।

কেবল বীরত্বই নহে অধিকন্তু যুদ্ধবিদ্যারও পূর্ণোন্নতি প্রাচীন আর্য্যজাতির মধ্যে সাধিত হইয়াছিল। প্রাচীন ধনুর্ব্বেদে যে প্রকার অদ্ভুত অস্ত্রশস্ত্রের বর্ণন দেখা যায় সে সকলের প্রয়োগ করা দূরের কথা, তাহাদের রহস্য হৃদয়ঙ্গম করা অথবা তাহাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করাও আজ কাল প্রায়

অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। নাগপাশ, শক্তিশেল, সম্মোহন, অগ্নিবাণ, বারুণাস্ত্র প্রভৃতিতে বৈদ্যুতিক শক্তি এবং দৈবীশক্তি সঞ্চার করিয়া উহাদের দ্বারা কি প্রকারে প্রতিপক্ষের মূর্চ্ছাদি উৎপন্ন করা যায় তাহা আজকাল আমরা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছি এবং পাশ্চাত্য জাতিবৃন্দও আজ পর্য্যন্ত তাহার রহস্যোদ্ভেদ করিতে সমর্থ হন নাই। উইলসন্ সাহেব বলিয়াছেন যে, বাণ নিক্ষেপ বিদ্যায় প্রাচীন আর্য্যজাতি অদ্বিতীয় ছিলেন। একবারে বহুসংখ্যক বাণ নিক্ষেপ করা, নিক্ষিপ্ত বাণ ফিরাইয়া আনা, বাণের অনেক প্রকার বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারা শত্রুকে কখনও মূর্চ্ছিত, কখনও মুগ্ধ এবং কখনও বা দগ্ধ করিয়া ফেলা——এই সকল প্রাচীন আর্য্যজাতির যুদ্ধবিদ্যার পূর্ণতার লক্ষণ ছিল। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় অর্জ্জুনের বাণবিদ্যা, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণের অদ্ভুত অস্ত্রচালনবিদ্যা, রাম রাবণের যুদ্ধে রাম, রাবণ ও মেঘনাদের বিচিত্র রহস্যময় শক্তিশেল, সম্মোহন, বারুণাস্ত্র, পাশুপতাস্ত্র, গরুড়াস্ত্র ও নাগপাশাস্ত্র প্রভৃতি অস্ত্রবিদ্যা জগতে অতুলনীয় এবং আধুনিক কালে স্বপ্নস্মৃতির ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। প্রাচীন আর্য্যজাতি এই সকল বিদ্যার পরাকাষ্ঠায় পঁহুছিয়াছিলেন। তরবারি চালনায় আর্য্যজাতি যে প্রকার নিপুণ ছিলেন জগতে এরূপ আর কোন জাতি নিপুণ ছিল না। প্রসিদ্ধ টেসিয়া সাহেব ভারতবর্ষীয় তরবারিকে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্র বলিয়াছেন। মুসলমানেরা রাজপুত বীরগণের তরবারিকে এত ভয় করিতেন যে তাহাদের গ্রন্থের প্রতিপৃষ্ঠায় তাহার ইতিহাস পাওয়া যায়। পৃথিবী বিজয়ী মহাবীর অ্যালেকজেণ্ডার ভারত বিজয় করিবার নিমিত্ত এখানে আসিয়া প্রথমে মহাবীর রাজা পুরুর বীরত্ব দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলেন এবং তৎপশ্চাৎ মগধ সম্রাটের সেনাবল দেখিয়া ভারতবর্ষ হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। হাণ্টার সাহেব বলিয়াছেন,—"সৈন্যচালনা, সৈন্যসন্নিবেশ, ব্যূহরচনা প্রভৃতি যুদ্ধবিদ্যার বর্ণন মহাভারতের অনেক স্থানে পাওয়া যায়, ইহা দ্বারা সিদ্ধ হয় যে প্রাচীন আর্য্যজাতির মধ্যে এই বিদ্যার কিছুমাত্র ন্যূনতা ছিল না।" তাঁহাদের সৈন্য সন্নিবেশের প্রক্রিয়া উরস, কক্ষা, পক্ষ, প্রতিগ্রহ, কোটী, মধ্য, পৃষ্ঠ প্রভৃতিরূপে বিভক্ত ছিল। তাঁহাদের ব্যূহরচনায় যে কৌশল অবলম্বিত হইত তাহা কি পাশ্চাত্য কি এতদ্দেশীয় কেহই আজকাল অবগত নহে। কোন কোন

ব্যূহের নাম আক্রমণের অনুসারে রাখা হইত। যেমন, মধ্যভেদী, অন্তর্ভেদী ইত্যাদি। কোন কোন ব্যূহের নাম বস্তু-সাদৃশ্য অনুসারে গঠিত হইত। যেমন,—মকরব্যূহ, শ্যেনব্যূহ, শকটব্যূহ, অৰ্দ্ধচন্দ্র, সর্ব্বতোভদ্র, গোমুত্রিকা, দণ্ড, মণ্ডল, অসংহত ইত্যাদি। মহাভারতে বর্ণিত আছে যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে (মেসিডোনিয়ান ব্যূহের ন্যায়) সূচীমুখ ব্যূহ নির্ম্মাণ করিতে বলিতেছেন এবং অর্জ্জুন বজ্রব্যূহ রচনাই ঠিক হইবে বলিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিতেছেন। অপরপক্ষে দুর্য্যোধন অভেদ্য ব্যূহ রচনা করিবার আজ্ঞা প্রদান করিতেছেন। এই সকল বর্ণন দেখিয়া অবগত হওয়া যায় যে প্রাচীনকালে আর্য্যজাতি যুদ্ধবিদ্যায় পূর্ণ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, আর্য্যজাতি বন্দুক ও কামানের ব্যবহার জানিতেন না সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে যুদ্ধবিদ্যার উন্নতি কি প্রকারে হইতে পারে? আর্য্যজাতির প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে তাহাদের এইরূপ সন্দেহ মিথ্যা প্রমাণিত হইবে। যখন প্রাচীন ভারতের অনন্ত অস্ত্র শস্ত্রের মধ্যে নালাস্ত্র ও শতঘ্নী প্রভৃতির বর্ণন দেখিতে পাই এবং বড় বড় যুদ্ধে ঐ সকল অস্ত্রের প্রয়োগও দেখিতে পাই তখন কিরূপে বলিব যে আর্য্যজাতি কামান বন্দুকের ব্যবহার জানিতেন না? আর্য্যজাতির প্রাচীন ইতিহাস দেখিলে প্রমাণিত হয় যে তাঁহারা বন্দুককে নালাস্ত্র, কামানকে শতঘ্নী, বারুদকে উর্ব্বাগ্নি এবং গোলাকে গুড়ক বলিতেন। বারুদ উর্ব্ব নামক ঋষি কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছিল বলিয়া উহার নাম উর্ব্বাগ্নি হইয়াছিল। যদ্যপি এই সকল শব্দের প্রয়োগ অন্য অর্থেও পাওয়া যায় তথাপি অনেক স্থানে এই শব্দ চতুষ্টয় বন্দুক কামান, গোলা ও বারুদ অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে এই প্রকার যুদ্ধযন্ত্র আর্য্যজাতির যুদ্ধে ব্যবহৃত হইত। তবে আর্য্যধর্ম্মে বাধা উৎপন্ন না হয়, আর্য্যশস্ত্র অনার্য্যশস্ত্র হইয়া না যায় এবং ধর্ম্মযুদ্ধের রীতি পরিবর্ত্তিত হইয়া অধর্ম্মযুদ্ধ না হইয়া পড়ে কেবল এই উদ্দেশ্যেই এই সকল মারাত্মক অস্ত্রের উন্নতির প্রতি আর্য্যজাতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান করেন নাই, ইহাই সুধীবৃন্দের সিদ্ধান্ত।

উর্ব্বাগ্নিপ্রোথিতাং কৃত্বা শতঘ্নীং গুড়কৈর্য্যুতাম্।

বারুদ ও গোলা ভরিয়া যুদ্ধে কামান চালান হইয়াছিল। (ক্রমশঃ)

জন্মান্তর-তত্ত্ব

[স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী]
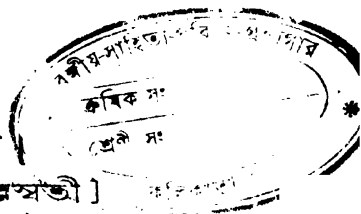
(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

জীবের গতি।

এই কারণেই অনেক সময় প্রেতাত্মাকে আকর্ষণ করিবার জন্য তাহার জীবিতাবস্থার প্রিয় খাদ্যদ্রব্য শ্রাদ্ধকালে তাহার উদ্দেশে সমর্পণ করা হয়। এরূপ করিলে প্রেতের আত্মা শ্রাদ্ধক্ষেত্রে শীঘ্রই আকৃষ্ট হইয়া থাকে এবং তদনন্তর মন ও মন্ত্রের শক্তির প্রভাবে তাহার প্রেতযোনি হইতে মুক্তিলাভ হয়। শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণভোজন করাইবার যে বিধি পরিদৃষ্ট হয় তাহারও মূলে এইরূপ বৈজ্ঞানিক শক্তি-প্রয়োগ-তথ্য নিহিত আছে। মনুসংহিতায় লেখা আছে যে শ্রাদ্ধে বিচার করিয়া ব্রাহ্মণভোজন করাইতে হয়। এক সহস্র নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণভোজন করান অপেক্ষা একজন তপস্বী ও শক্তিশালী ব্রাহ্মণভোজন করাইলে বেশি ফল হয়। তাহার কারণ এই যে তপস্বী ব্রাহ্মণ ভোজনানন্তর নিজের তপঃ-শক্তির দ্বারা প্রেতাত্মাকে সহায়তা প্রদান করিয়া থাকেন এবং এই শক্তির প্রভাবে শীঘ্রই তাহার আত্মা প্রেতত্বমুক্ত হইয়া থাকে। নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণের মধ্যে সে শক্তির অভাব থাকায় তাহাকে ভোজন করাইলে তাদৃশ ফল হয় না এবং এইরূপ শ্রাদ্ধ-ভোজনের দ্বারা ব্রাহ্মণের আরও অধোগতি হইয়া থাকে। কারণ ব্রাহ্মণ-ভোজনের সময় পরলোকগত আত্মা ভোজ্য অন্নের প্রতি দৃষ্টিপাত ও মনঃ-সংযোগ করিয়া থাকে এবং ভোক্তৃগণের মধ্যেও তাহার আত্মার অভিনিবেশ উৎপন্ন হয়। একারণ শক্তিমান্ ব্রাহ্মণই এরূপ অন্নগ্রহণ করিয়া নিজেকে স্থির রাখিতে পারেন। সাধারণ ব্রাহ্মণের শ্রাদ্ধান্ন ভোজনের দ্বারা পতন হয়।

এইরূপে শ্রাদ্ধক্রিয়ার যথাবিধি অনুষ্ঠান দ্বারা পরলোকগত আত্মা প্রেতত্বমুক্ত হইয়া নিজ প্রাক্তনানুসারে স্বর্গ নরক অথবা নবীন জন্ম লাভ করিয়া থাকে। যদি কেহ শ্রাদ্ধ না করে অথবা অবিধিপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করে তবে প্রেতত্ব মুক্তি হইতে বিলম্ব হয়। তবে যেরূপ ঔষধিপ্রয়োগে মূর্চ্ছিত ব্যক্তির শীঘ্রই মূর্চ্ছা ভঙ্গ হয়, কিন্তু ঔষধিপ্রয়োগ না করিলেও প্রকৃতি কিছুকাল পরে নিজেই মূর্চ্ছাভঙ্গ করিয়া দেন, সেই প্রকার যদি প্রেত শ্রাদ্ধ ক্রিয়ার সহায়তা পায় তবে শীঘ্রই উল্লিখিত দুঃখসমূহ হইতে নিস্তার লাভ করিয়া নবীন শরীর ধারণ করিতে পারে নতুবা কিছু বিলম্বে আপনা আপনিই মহাপ্রকৃতির সাহায্যে প্রেতত্ব মুক্ত হইয়া তাহার প্রাক্তনানুসারে ঊর্দ্ধলোকপ্রাপ্তি হয় অথবা মৃত্যুলোকে জন্মলাভ হয়। ইহাই মৃত্যুকালীন বিশেষ

কারণবশতঃ প্রেতযোনিপ্রাপ্তি এবং তাহা হইতে মোক্ষলাভের উপায়। অতঃপর নরকাদি গতির বর্ণন করা হইতেছে।

নরকাদি গতি।

মৃত্যুর পরে এবং পুনর্জ্জন্মলাভের পূর্ব্বে বাসনা দ্বারা পরলোকে কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য জীবের যে দেহ প্রাপ্তি হয় তাহাকে আর্য্যশাস্ত্রে যাতনাদেহ বলে। যথা মনুসংহিতার দ্বাদশাধ্যায়ে—

পঞ্চভ্য এব মাত্রাভ্যঃ প্রেত্য দুষ্কৃতিনাং নৃণাম্।
শরীরং যাতনার্থীয়মন্যদুৎপদ্যতে ধ্রুবম্॥

পাপের ফলভোগের জন্য পঞ্চভূতের সূক্ষ্মাংশ হইতে পরলোকে একটি যাতনা দেহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। আর্য্যশাস্ত্রে যেমন স্বর্গীয় সুখদুঃখের কথা বর্ণিত আছে, তেমনই নরকে অবশ্য-ভোগ্য দুঃখের বিষয়েরও ভূরিভূরি বর্ণন আছে। স্বর্গের বিষয়ে দেবযানগতি বর্ণন প্রসঙ্গে ইতিপূর্ব্বেই অনেক কথা বলা হইয়াছে। এক্ষণে নরকে জীবের কিরূপ কষ্ট হয় তাহাই সংক্ষেপে বর্ণন করা হইতেছে। বেদ বলেন—

অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥

আত্মঘাতী স্ত্রীপুরুষ ঘোর অন্ধকারময় অসুরসেব্য নরকে মৃত্যুর পর গমন করিয়া থাকে। মনুসংহিতার দ্বাদশাধ্যায়ে নরকের বিষয়ে অনেক কথা লেখা আছে যথা—

যথা যথা নিষেবন্তে বিষয়ান্ বিষয়াত্মকাঃ।
তথা তথা কুশলতা তেষাং তেষূপজায়তে॥
তেঽভ্যাসাৎ কর্ম্মণাং তেষাং পাপানামল্পবুদ্ধয়ঃ।
সম্প্রাপ্নুবন্তি দুঃখানি তাসু তাস্বিহ যোনিষু॥
তামিস্রাদিষু চোগ্রেষু নরকেষু বিবর্ত্তনম্।
অসিপত্রবনাদীনি বন্ধনচ্ছেদনানি চ॥
বিবিধাশ্চৈব সম্পীড়াঃ কাকোলূকৈশ্চ ভক্ষণম্।
করম্ভবালুকাতাপান্ কুম্ভীপাকাংশ্চ দারুণান্।
বহূন্ বর্ষগণান্ ঘোরান্ নরকান্ প্রাপ্য তৎক্ষয়াৎ।
সংসারান্ প্রতিপদ্যন্তে মহাপাতকিনস্ত্বিমান্॥

বিষয়মুগ্ধ জীব একাদশেন্দ্রিয় দ্বারা যতই বিষয় ভোগ করে ততই ভোগকুশলতা উৎপন্ন হইয়া পরলোকে জীবের নানা দুঃখের কারণ উপস্থিত হয়। পাপকর্ম্মের

ফলে তামিস্র, অসিপত্রবন, বন্ধনচ্ছেদন আদি নরকে জীবকে ভীষণ যন্ত্রণাভোগ করিতে হয়। নানাপ্রকার পীড়ন, কাক উলুক আদি দ্বারা ভক্ষণ, সন্তপ্ত বালুকার উপর গমন, কুম্ভীপাকে রোমহর্ষণ যন্ত্রণা আদি নরকের ভীষণ দুঃখ পাপী অবশ্যই ভোগ করিয়া থাকে। এইরূপে বহুবর্ষ পর্য্যন্ত অশেষবিধ কষ্ট ভোগের পর পাপক্ষয়ান্তে জীব আবার সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে।

মৃত্যুর অনন্তর যমলোকে যাইবার সময় পাপী জীবকে কিরূপ ক্লেশভোগ করিতে হয় শ্রীমদ্‌ভাগবতে তাহার বর্ণন আছে যথা—

যাতনাদেহমাবৃত্য পাশৈর্বদ্ধা গলে বলাৎ।
নয়তো দীর্ঘমধ্বানাং দণ্ড্যং রাজভটা যথা॥
তয়োর্নির্ভিন্নহৃদয়স্তর্জ্জনৈর্জাতবেপথুঃ।
পথি শ্বভির্ভক্ষ্যমাণ আর্ত্তোহধঃ স্বমনুস্মরন্॥

ক্ষুৎতৃট্‌পরীতোঽর্কদবানলানিলৈঃ,
সন্তপ্যমানঃ পথি তপ্তবালুকে।
কৃচ্ছ্রেণ পৃষ্ঠে কষয়া চ তাড়িত-
শ্চলত্যশক্তোঽপি নিরাশ্রয়োদকে॥

তত্র তত্র পতন্ শ্রান্তো মূর্চ্ছিতঃ পুনরুত্থিতঃ।
পথা পাপীয়সা নীতস্তমসা যমসাদনম্॥
যোজনানাং সহস্রাণি নবতিং নব চাধ্বনঃ।
ত্রিভির্মুহূর্ত্তৈর্দ্বাভ্যাং বা নীতঃ প্রাপ্নোতি যাতনাঃ॥

যেরূপ রাজকর্ম্মচারিগণ অপরাধী ব্যক্তিকে পীড়ন করতঃ টানিয়া লইয়া যায় সেইপ্রকার যমদূতগণ পাপীর গলায় ফাঁসি দিয়া তাহাকে অত্যন্ত কষ্ট দিতে দিতে সুদূরবর্ত্তী যমলোক পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া যায়। দুঃখে ভগ্নহৃদয়, যমদূতের তর্জ্জনে কম্পিতশরীর পাপী নিজ পাপরাশি স্মরণ করিতে করিতে যমলোকের দিকে চলিয়া থাকে। ক্ষুধাতৃষ্ণায় পীড়িত, প্রচণ্ড সূর্য্যতাপ, অনল ও অনিল দ্বারা ব্যথিত, তপ্ত বালুকার উপর গমনের দ্বারা সন্তপ্ত, পৃষ্ঠে কষাঘাত দ্বারা ব্যথিত এবং সুদূর পথ গমনে অশক্ত হওয়া সত্ত্বেও পাপীকে বলপূর্ব্বক আকৃষ্ট হইয়া যাইতে হয়। অতি শ্রম ও ক্লেশহেতু তাহার মূর্চ্ছা হইতে থাকে, তথাপি মূর্চ্ছাভঙ্গ হওয়া মাত্র আবার যমদূতগণ তাহাকে টানিয়া লইয়া যায়। এইরূপে সহস্র সহস্র যোজন পথ দুই তিন মুহূর্ত্তের মধ্যে অতিক্রম করিতে হয় বলিয়া পাপীর বড়ই কষ্ট হইয়া থাকে।

যমলোকে যাইবার সময় এই সকল দুঃখ পাপীকে ভোগ করিতে হয়। তদনন্তর যমলোকে পৌঁছিয়া নিজ প্রাক্তনানুসারে পাপীকে যাতনাদেহে যে সকল নরক যাতনা ভোগ করিতে হয় তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে যথা—

আদীপনং স্বগাত্রাণাং বেষ্টয়িত্বোল্মুকাদিভিঃ।
আত্মমাংসোদনং ক্বাপি স্বকৃত্তং পরতোঽপি বা ॥
জীবতশ্চান্ত্রাভ্যুদ্ধারং শ্বগৃধ্রৈর্যমসাদনে।
সর্পবৃশ্চিকদংশাদ্যৈর্দশদ্ভিশ্চাত্মবৈশসম্ ॥
কৃন্তনঞ্চাবয়বশো গজাদিভ্যো ভিদাপনম্।
পাতনং গিরিশৃঙ্গেভ্যো রোধনঞ্চাম্বুগর্ত্তয়োঃ ॥
যাস্তামিস্রান্ধতামিস্ররৌরবাদ্যাশ্চ যাতনাঃ।
ভুঙ্‌ক্তে নরো বা নারী বা মিথঃ সঙ্গেন নির্ম্মিতাঃ ॥
অধস্তান্নরলোকস্য যাবতীর্যাতনাস্তু তাঃ।
ক্রমশঃ সমনুক্রম্য পুনরত্রাব্রজেচ্ছুচিঃ ॥

পাপীর সমস্ত শরীর অগ্নিশিখার দ্বারা বেষ্টিত করিয়া দগ্ধ করা হইয়া থাকে। সে কখন নিজের মাংসই নিজে কাটিয়া খায় আবার কখন অন্য কেহ তাহার মাংস কাটিয়া তাহাকে খাইতে দেয়। শ্বান ও শকুনি দ্বারা উহার দেহের অন্ত্রসমূহ টানিয়া বাহির করান হয়, সর্প, বৃশ্চিক ও অন্যান্য বিষাক্ত কীটের দ্বারা উহাকে দংশন করান হয়। শরীর কাটিয়া খণ্ডবিখণ্ড করা, হস্তীপদে মর্দ্দিত করা, পর্ব্বত শৃঙ্গ হইতে অধোনিক্ষেপ করা, জলপূর্ণ গর্ত্তে ডুবাইয়া দেওয়া ইত্যাদি নানাবিধ যন্ত্রণা তামিস্র, অন্ধতামিস্র, রৌরব আদি নরকে স্ত্রীপুরুষ উভয়কেই ভোগ করিতে হয়। এইরূপে মনুষ্যলোকের অধঃস্থিত লোকসমূহে যতপ্রকার যাতনা আছে সব ভুগিয়া পরিশেষে জীব আবার সংসারে আসিয়া মনুষ্য দেহ লাভ করে। গরুড় পুরাণেও নরকযাতনার এইরূপ অনেক বর্ণন পাওয়া যায় যথা—

তত্রাগ্নিনা সুতীব্রেণ তাপিতাঙ্গারভূমিনা।
তন্মধ্যে পাপকর্ম্মাণং বিমুঞ্চন্তি যমানুগাঃ ॥
স দহ্যমানস্তীব্রেণ বহ্নিনা পরিধাবতি।
পদে পদে চ পাদোঽস্য জায়তে শীর্য্যতে পুনঃ ॥
ঘটিযন্ত্রেণ বদ্ধা যে বদ্ধাস্তোয়ঘটী যথা।
ভ্রাম্যন্তে মানবা রক্তমুদ্‌গিরন্তঃ পুনঃ পুনঃ ॥

হা মাতর্ভ্রাতস্তাতেতি ক্রন্দমানাঃ সুদুঃখিতাঃ।
দহ্যমানাঙ্‌ঘ্রিযুগলা ধরণিস্থেন বহ্নিনা॥

নরকের কোন কোন স্থানে তীব্র অনল জ্বলিতেছে, উহার মধ্যে যমদূতগণ পাপীকে ফেলিয়া দেয়। সে অগ্নিতে দগ্ধকলেবর হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হয় এবং পদে পদে তাহার পাদদ্বয় বিদগ্ধ হইতে থাকে। কোথাও ঘটিযন্ত্রস্থিত জলঘটির মত পাপীগণকে একসঙ্গে বাঁধিয়া ঘূর্ণিত করা হয়, ইহাতে তাহাদের রুধির বমন হইতে থাকে। পাপীগণ, হা মাতঃ, হা ভ্রাতঃ! হা পিতঃ! ইত্যাদি করুণ স্বরে হাহাকার করিতে থাকে, ধরণিস্থিত অগ্নির সংযোগে তাহাদের চরণযুগল দগ্ধ হইয়া যায়। এইরূপে কোথাও দহ্যমান, কোথাও ভিদ্যমান, কোথাও ক্লিদ্যমান, কোথাও মুহ্যমান এবং কোথাও বিদীর্ণ-কলেবর হইয়া রৌরব, কুম্ভীপাকাদি নরকে পাপীগণকে বর্ণনাতীত দারুণ দুঃখ পাইতে হয়। যমলোকস্থিত বৈতরণী নদী পার হইবার সময় পাপীগণ যেরূপভাবে বিলাপ করে তাহা জানিয়া কাহার না হৃৎকম্প হইবে? গরুড়পুরাণে এই বিলাপের বিষয় লেখা আছে যথা—

ময়া ন দত্তং ন হুতং হুতাশনে
তপো ন তপ্তং ত্রিদসা ন পূজিতাঃ।
ন তীর্থসেবা বিহিতা বিধানতো
দেহিন্! কচিন্নিস্তর যৎ ত্বয়া কৃতম্॥
ন পূজিতা বিপ্রগণাঃ সুরাপগা
ন চাশ্রিতাঃ সৎপুরুষা ন সেবিতাঃ।
পরোপকারা ন কৃতাঃ কদাচন
দেহিন্! কচিন্নিস্তর যৎ ত্বয়া কৃতম্॥
জলাশয়ো নৈব কৃতো হি নির্জলে
মনুষ্যহেতোঃ পশুপক্ষিহেতবে।
গোবিপ্রকৃত্যর্থমকারি নাপ্যপি
দেহিন্! কচিন্নিস্তর যৎ ত্বয়া কৃতম্॥

পাপী অনুতপ্ত হইয়া বৈতরণীর তীরে নিজের আত্মাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে—হে দেহিন্! আমি দান, হবন, যজ্ঞ, তপ আদি কিছুই করি নাই এবং দেবপূজন ও তীর্থসেবা বিধিমতে করি নাই, এজন্য তোমার ভাগ্যে যাহা আছে তাহাই নীরবে ভোগ কর। আমি ব্রাহ্মণের পূজা করি নাই, সুরধুনী গঙ্গার

শরণ লই নাই, সাধুগণের সেবা করি নাই এবং পরোপকার ব্রতের দ্বারাও নিজের জীবনকে ধন্য করি নাই, এজন্য নিজ কর্ম্মানুসারে তোমার ভাগ্যে যে ভোগ আছে তাহা ভোগ কর। আমি নির্জল দেশে মনুষ্য, পশু ও পক্ষিগণের পিপাসা নিবারণের জন্য কূপতড়াগাদি খনন করাই নাই, এবং গো-ব্রাহ্মণ পালনের জন্য অর্থদানও করি নাই, অতএব হে দেহিন্! মন্দভাগ্যের যাতনা-ভোগ নীরবে সহ্য কর। কোন পাপিনী স্ত্রী অনুতপ্ত হইয়া দুঃখ করিতেছে যথা—

ভর্ত্তুর্ময়া নৈব কৃতং হিতং বচঃ
পতিব্রতং নৈব কদাপি পালিতম্।
ন গৌরবং বাপি কৃতং গুরূচিতং
দেহিন্! ক্বচিন্নিস্তর যৎ ত্বয়া কৃতম্॥
ন ধর্ম্মবুদ্ধ্যা পতিরেব সেবিতো
বহ্নিপ্রবেশো ন কৃতো মৃতে পতৌ।
বৈধব্যমাসাদ্য তপো ন সেবিতং
দেহিন্! ক্বচিন্নিস্তর যৎ ত্বয়া কৃতম্।

আমি কখনও পতি দেবতার প্রিয় ও হিতকারী বাক্য বলি নাই, পাতিব্রত্য ধর্ম্ম কখনও পালন করি নাই, তাঁহার প্রতি গুরুর মত গৌরব প্রদর্শন করি নাই, এজন্য হে দেহিন্! স্বকৃত কর্ম্মফল কোনরূপে ভোগ করিয়া নিস্তার পাও। আমি ধর্ম্মবুদ্ধিতে পতিসেবা করি নাই, মৃতপতির সঙ্গে জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করি নাই, বৈধব্যাবস্থায় তপোধর্ম্মেরও অবলম্বন করি নাই, এজন্য হে দেহিন্! নিজকৃত কুকর্ম্মের ফলভোগ কর। এইরূপে মন্দকর্ম্মের ফলে স্ত্রীপুরুষ উভয়কেই মৃত্যুর পর উপর কথিত নরকদুঃখ ভোগ করিতে হয়। ইহাই নরকাদি লোক প্রাপ্তির গূঢ় তত্ত্ব।

পূর্ব্বে যে সুখময় শুক্লগতি, আত্মজ্ঞানময় সহজগতি এবং সুখদুঃখময় কৃষ্ণগতির কথা বর্ণিত হইয়াছে উহা ব্যতীত এক অসাধারণ গতি আছে তাহার নাম ঐশী গতি। উহার সহিত মৃত্যুলোকস্থ জীবের কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। ইন্দ্র, বসু, রুদ্র আদি দেবতাগণ নিজ নিজ কর্ম্মের যোগ্যতা দেখাইলে এবং আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভে সমর্থ হইলে, অন্তে ব্রহ্মা, বিষ্ণু বা মহেশ পদ লাভ করিয়া থাকেন। গুণানুসারে এই ত্রিমূর্ত্তির কোন পদে পৌঁছিলে তাঁহারা আর দেবতা থাকেন না। তাঁহারা সগুণ ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরত্বে প্রতিষ্ঠিত হন এবং যে কর্ম্মের বেগে

তাঁহারা ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের অধিনায়ক হইয়াছেন তাহার অবসান হইলে স্বস্বরূপে বিলীন হইয়া যান। এজন্য শাস্ত্রে ত্রিমূর্ত্তিকে জীব বলা হয় না। তাঁহারা সগুণ ব্রহ্মস্বরূপ। যে গতির দ্বারা উন্নত দেবতাগণ এই ত্রিমূর্ত্তি পদ প্রাপ্ত হন তাহাকে ঐশী গতি বলে।

সূক্ষ্মলোকবাসী জীবগণকে দেবতা বলা হয়। উঁহারা অমানুষিক দৈবীশক্তি সম্পন্ন এবং এজন্য মনুষ্যের নমস্য। দেবতা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত যথা পিতৃগণ, ঋষিগণ এবং দেবগণ। অসুরগণও এক শ্রেণীর দেবতা। কর্ম্মানুসারে দেবাসুর সংগ্রামে কখন দেবতাদের জয় হয় এবং কখন অসুরদের জয় হয়। ঋষি, দেবতা এবং পিতৃগণ যথাক্রমে জ্ঞানরাজ্য, কর্ম্মরাজ্য এবং স্থূলরাজ্যের সঞ্চালক। স্থূল মৃত্যুলোক এই তিন শ্রেণীর দেবতার দ্বারা সুরক্ষিত। দেবতাদের রাজা আছেন, অসুরদের রাজা আছেন এবং নরক, প্রেতলোক আদিরও রাজা আছেন। পিতৃ নামধারী দেবতাদের বাস কেবল পিতৃলোকে। অসুরদের বাস সপ্ত অধোলোকে। দেবতাদের বাস সপ্ত ঊর্দ্ধলোকে। এবং ঋষিদের বাস চতুর্দ্দশ ভুবনের মধ্যেই হইয়া থাকে।

এইরূপে স্বর্গ, নরক অথবা প্রেতযোনিতে কর্ম্মক্ষয়ানন্তর জীব পিতার শুক্রকে আশ্রয় করিয়া নিয়মিত কালে মাতার গর্ভমধ্যে প্রবেশ করে যথা ভাগবতে—

গর্ভবাস দুঃখ।

কর্ম্মণা দৈবনেত্রেণ জন্তুর্দেহোপপত্তয়ে।
স্ত্রিয়াঃ প্রবিষ্ট উদরং পুংসো রেতঃকণাশ্রয়ঃ॥

জীব দেবতাদিগের দ্বারা সঞ্চালিত প্রারব্ধ কর্ম্মানুসারে নবীন দেহপ্রাপ্তির জন্য পুরুষের রেতঃকণাকে আশ্রয় করতঃ স্ত্রীর গর্ভে প্রবিষ্ট হয়। যেরূপ কোন বৃক্ষে আরোহণ করিবার সময় মনুষ্যের মধ্যে জ্ঞান থাকিলেও কদাচিৎ যদি বৃক্ষ হইতে সে পড়িয়া যায় তবে হতজ্ঞানের মতই পতন হইয়া থাকে, পৃথিবী নিজ মাধ্যাকর্ষণ শক্তিবলে বৃক্ষচ্যুত মনুষ্যকে টানিয়া লয়, ঠিক সেইপ্রকার সূক্ষ্মশরীরে, অথবা আতিবাহিকদেহে স্বর্গনরকাদি ভোগের সময় জীবের নিজ নিজ কর্ম্মের জ্ঞান থাকিলেও মাতৃগর্ভে আকৃষ্ট হইবার সময় সে হতচেতন জীবের মত বিবশ হইয়া আকৃষ্ট হইয়া থাকে। এই অচেতন অবস্থায় জীবকে যতদিন না গর্ভের মধ্যে তাহার সমস্ত অবয়ব পরিপুষ্ট হয় ততদিন নিবাস করিতে হয়। ছয়মাস পর্য্যন্ত এইভাবে থাকার পর সপ্তম মাসে গর্ভস্থ ভ্রূণ পূর্ণাবয়ব হইলে পর তবে জীবের

অতীত ও ভবিষ্যৎকালীন সমস্ত ঘটনা স্মৃতিপথে উদিত হইয়া থাকে। গর্ভমধ্যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কিরূপে ধীরে ধীরে পরিপুষ্টি লাভ করে তদ্বিষয়ে গর্ভোপনিষদ এবং ভাগবতে প্রমাণ পাওয়া যায় যথা—

কললং ত্বেকরাত্রেণ পঞ্চরাত্রেণ বুদ্‌বুদম্।
দশাহেন তু কর্কন্ধুঃ পেশ্যণ্ডং বা ততঃ পরম্॥
মাসেন তু শিরো দ্বাভ্যাং বাহ্বঙ্‌ঘ্র্যাদ্যঙ্গবিগ্রহঃ।
নখলোমাস্থিচর্ম্মাণি লিঙ্গচ্ছিদ্রোদ্ভবস্ত্রিভিঃ।
চতুর্ভির্ধাতবঃ সপ্ত পঞ্চভিঃ ক্ষুত্তৃডুদ্‌ভবঃ।
ষড়্‌ভির্জরায়ুণা বীতঃ কুক্ষৌ ভ্রাম্যতি দক্ষিণে॥
মাতুর্জগ্ধান্নপানাদ্যৈরেধদ্‌ধাতুরসম্মতে।
শেতে বিন্‌মূত্রয়োর্গর্ত্তে স জন্তুর্জন্তুসম্ভবে॥
কৃমিভিঃ ক্ষতসর্ব্বাঙ্গঃ সৌকুমার্য্যাৎ প্রতিক্ষণম্।
মূর্চ্ছামাপ্নোত্যুরুক্লেশস্তত্রত্যৈঃ ক্ষুধিতৈর্মুহুঃ॥
কটুতীক্ষ্ণোষ্ণলবণক্ষারাম্লাদিভিরুল্বণৈঃ।
মাতৃভুক্তৈরুপস্পৃষ্টঃ সর্ব্বাঙ্গোত্থিতবেদনঃ॥
উল্বেন সংবৃতস্তস্মিন্নন্ত্রৈশ্চ বহিরাবৃতঃ।
আস্তে কৃত্বা শিরঃ কুক্ষৌ ভুগ্নপৃষ্ঠশিরোধরঃ॥
অকল্পঃ স্বাঙ্গচেষ্টায়াং শকুন্ত ইব পঞ্জরে।
তত্র লব্ধস্মৃতির্দৈবাৎ কর্ম্ম জন্মশতোদ্ভবম্॥
স্মরন্ দীর্ঘমনুচ্ছ্বাসং শর্ম্ম কিং নাম বিন্দতে।
আরভ্য সপ্তমান্ মাসাংল্লব্ধবোধোঽপি বেপিতঃ॥
নৈকত্রাস্তে সূতিবাতৈর্বিষ্ঠাভূরিব সোদরঃ॥

একরাত্রিতে শুক্র ও শোণিত মিশ্রিত হয়, পাঁচ রাত্রিতে মিশ্রিত রজোবীর্য্য বর্ত্তুলাকার হইয়া যায়। দশ দিনের মধ্যে এই বর্ত্তুল বদরী ফলের মত কঠিন হইয়া যায়। তদনন্তর পেশি অর্থাৎ মাংসপিণ্ডের মত পদার্থ হইয়া যায়। এক মাসের মধ্যে মস্তক ও হস্তপদাদির পৃথক পৃথক বিভাগ হইয়া উৎপত্তি হইয়া যায়। তিন মাসের মধ্যে নখ, লোম, অস্থি, চর্ম্ম, লিঙ্গ এবং লিঙ্গচ্ছিদ্রের বিকাশ হয়। চতুর্থ মাসে সপ্তধাতু এবং পঞ্চম মাসে ক্ষুধাতৃষ্ণার উদয় হয়। ষষ্ঠ মাসে জরায়ুর দ্বারা আবৃত হইয়া গর্ভস্থ শিশু মাতার দক্ষিণ কুক্ষিতে ভ্রমণ করিতে থাকে।

ক্রমশঃ—
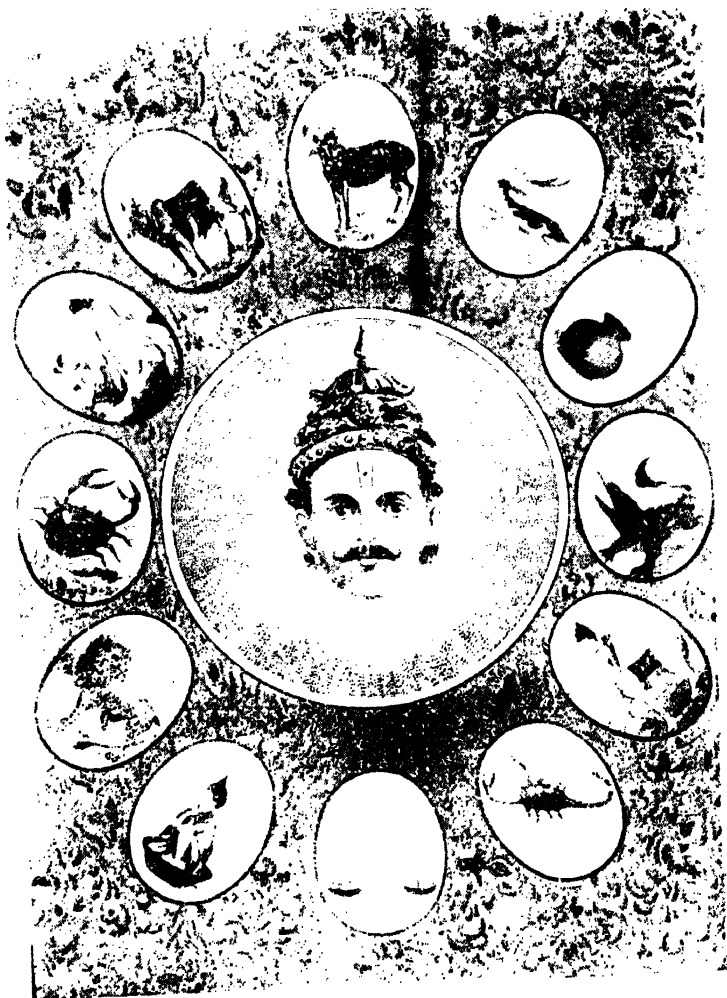
দ্বাদশ রাশি

অকুণ্ঠং সর্ব্বকার্য্যেষু ধর্ম্ম-কার্য্যার্থমুদ্যতম্।
বৈকুণ্ঠস্য হি যদ্রূপং তস্মৈ কার্য্যাত্মনে নমঃ॥

২য় ভাগ] শ্রাবণ, সন ১৩২৭। ইং, জুলাই ১৯২০। [৪র্থ সংখ্যা।

দেবতার মন্দির।

[শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র মিত্র।]

দিকে দিকে চাই, কোথা তুমি নাই ?
সদা সব ঠাঁই তুমি যে ;
আভাসে তোমার হেরি একাকার
ব্যোম অন্তরীক্ষ ভূমি যে ;
পর্ব্বত শিখরে, পারাবার 'পরে
দেখি যে মহিমা প্রভাতে
সব জল-স্থল সমান উজ্জ্বল
সেই মহিমার (ই) আভাতে ;
তুমি সুধাকরে প্রান্তরে নগরে
সমভাবে আছ মিশিয়া ;
সুরম্য কাননে গৃহস্থ অঙ্গনে
উঠিছ সমান হাসিয়া ;
গ্রহে গ্রহে গিয়া কেতু পরশিয়া,
তুমিই মরুৎ রূপেতে

সব ঘুরি ফিরি আস ধীরি ধীরি
আমার(ও) গবাক্ষ পথেতে;
মেঘ মন্দ্রে থেকে, ঊর্দ্ধে লও ডেকে,
ব্যোম-সহচর করিয়া;
বিহগের ডাকে ফিরাও আমাকে
ধরণীর প্রেমে ভরিয়া;
তুমি ওত প্রোত তারকা-খদ্যোত-
বিদ্যুত-অশনি-স্ফুরণে;
তুমি ওত প্রোত নীলাম্বুর স্রোত-
অম্বর-অবনী-বরণে;
কাশী বৃন্দাবনে, মন্দিরে, ভবনে
একই তব রূপ রাজিছে;
কোথা যাব আর মূরতি তোমার
নয়নের' পরে হেরিতে?
কোথা যাব আর স্বধ্বনি তোমার
শ্রবণ ভরিয়া শুনিতে?
এধূলাতে বসি', এবাতাসে মিশি,
তোমার মন্দির জানি যে,
প্রাণে বসি' তুমি সব তীর্থ ভূমি
হৃদয়ে দিতেছ আনি যে;
চরণে তোমার করি নমস্কার
এধূলায় শির রাখি' হে;
বিধি হরি হরে এ ধূলার স্তরে
মন সুখে দেখে আঁখি হে;
উপরে অম্বর চন্দ্রাতপ বর,
ধূপ রূপ দেখি অনিলে,
সে সপ্ত সরিৎ হয় সন্নিহিত
অমার নয়ন-সলিলে।

কান্যকুব্জের প্রতি বঙ্গদেশীয়গণের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

প্রাতঃস্মরণীয় ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের যোগ্য পুত্র ধর্ম্মসুধাকর রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় এম, এ, মহাশয়ের যত্নে নিম্নলিখিত প্রস্তাব পত্র শ্রীভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয় পাইয়াছে। এই প্রস্তাব পত্র পাঠ করিলে হিন্দু মাত্রেই আনন্দিত হইবেন।

(কান্যকুব্জ চতুষ্পাঠী কোষ)

যে কান্যকুব্জ হইতে বাঙ্গালায় আগত পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থের বংশীধরগণ আজও বাঙ্গালীর গৌরব সেই কান্যকুব্জে আজ একটীও সংস্কৃত চতুষ্পাঠী নাই। কয়েক বৎসর হইল লক্ষৌ কান্যকুব্জ সভা একটী চতুষ্পাঠী স্থাপনা করেন এবং তাহাতে স্থানীয় মিউনিসিপালিটী মাসিক ৮৲ এবং বিশ্বনাথ ফণ্ডের ভূদেব বৃত্তি বার্ষিক ৫০৲ সাহায্য ছিল। মিউনিসিপালিটীর কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের মধ্যে পরিবর্ত্তনে চতুষ্পাঠীর সাহায্যটী এক্ষণে মক্তবে (উর্দ্দু পার্শী পড়িবার পাঠশালায়) দেওয়া হইতেছে এবং চতুষ্পাঠীটী উঠিয়া গিয়াছে, বঙ্গদেশ কান্যকুব্জের নিকট যেরূপভাবে উপকৃত এবং শিক্ষা ও আর্থিক অবস্থায় বঙ্গদেশ এখন যেরূপ অপেক্ষাকৃত উন্নত এবং সচ্ছল তাহাতে বাঙ্গালাদেশ হইতে ২৫৲।৫০৲ এমন কি ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত মাসিক সাহায্য দেওয়া সঙ্গত। কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত মাতাদীন স্কুল বলিয়াছেন যে ইংলণ্ডের উপনিবেশিকবর্গ—মার্কিন, ক্যানেডিয়া, অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকগণ লক্ষ লক্ষ লোক ও বহু সহস্র কোটী অর্থ দিয়া ইংলণ্ড রক্ষা করিল বঙ্গদেশের কনোজীয়দিগের পক্ষে তাহাদের পিতৃভূমি কনোজে শাস্ত্র চর্চ্চা রক্ষার জন্য ৫০০০৲ টাকা তোলা কি এতই কঠিন?

উর্দ্দু আদালতের ভাষা, তাহার চর্চ্চা কনৌজে হয়। ব্রাহ্মণ আজও সদাচার সম্পন্ন কিন্তু অতীব দরীদ্র। আতর গোলাপের কারবারে যাহা কিছু ধন, কনৌজের কালোয়ারদিগের হস্তেই আছে। এই সকল বিষয়ের বিবেচনায় কয়েকটী উৎসাহী বাঙ্গালী স্থির করিয়াছেন যে সাধারণের নিকট চাঁদা লইয়া একটী স্থায়ী কোষ প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক তাহা সোমদেব সংকর্ম্ম ভাণ্ডার সমিতির হস্তে ন্যস্ত করা হয় এবং শ্রীভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডলের সদর আফিস দিয়া

মাসে মাসে কান্যকুব্জে বৃত্তি পাঠান হয়। সমিতির অনুমত্যানুসারে আমি সেইরূপ চাঁদা গ্রহণ করিয়া তাহা সোমদেব সংকর্ম্মভাণ্ডারে জমা করিয়া দিতে থকিব, এবং চাঁদার প্রাপ্তি স্বীকাব এজুকেশন গেজেটে করিতে থাকিব।

শ্রীকুমারদেব মুখোপাধ্যায়।

সেক্রেটারী সোমদেব সংকর্ম্মভাণ্ডার, চুঁচুড়া।

এই প্রস্তাব ধার্ম্মিকবর কর্ত্তব্যপরায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের যত্নে কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। মাসিক ২৫৲ টাকা সহায়তা মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বারা স্থাপিত সোমদেব সংকর্ম্ম ভাণ্ডারের দ্বারা দেওয়া নিশ্চয় হইয়াছে। ইহা ব্যতীত কান্যকুব্জ বিদ্যালয়ের জন্য আরও মাসিক বা বার্ষিক সাহায্য বঙ্গদেশ হইতে সংগৃহীত হইতেছে। শ্রীভারত ধর্ম্মমহামণ্ডল এই চতুষ্পাঠী স্থাপনের ব্যবস্থা করিতেছেন।

সাময়িকী।

মহামণ্ডল সম্বাদ—শ্রীভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রধান সভাপতি দারভাঙ্গার মহামান্য মহারাজাধিরাজ বাহাদুর মহামণ্ডলের শাখা সভা, পোষক সভা, সংযুক্ত সভা এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম্মানুযায়ী জনসাধারণের নামে সম্প্রতি একখানি মহত্ত্বপূর্ণ সারকুলার প্রকাশিত করিয়াছেন। তাহার সারাংশ নিম্নে প্রকাশিত করা হইতেছে। আশা করি বর্ণাশ্রম ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দু মাত্রেই মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের এই সুচিন্তিত মন্তব্যের অনুমোদন করিবেন।

ভারতীয় শাসন সংস্কার সম্বন্ধীয় যে মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড স্কীম প্রকাশিত হইয়াছে তদনুযায়ী 'সংস্কার সভা' (Reform Council) প্রতিষ্ঠিত হইলে সনাতন হিন্দুসমাজের সম্মুখে এক ভীষণ সঙ্কট উপস্থিত হইবে। ঐ 'স্কীমে' মুসলমান, খ্রীষ্টান, শিক, পঞ্চম, মাদ্রাজের অব্রাহ্মণ প্রভৃতি ভারতের যাবতীয় জনসমাজকেই আপন আপন সম্প্রদায়ের হিত রক্ষার নিমিত্ত সংস্কার সভায় প্রতিনিধি প্রেরণের বিশিষ্ট অধিকার দেওয়া হইয়াছে কিন্তু নিয়মানুবর্ত্তী শান্তিপ্রিয়, ধার্ম্মিক এবং সম্রাটের প্রজার মধ্যে সংখ্যায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দু সমাজকে স্বীয় প্রতিনিধি মনোনয়নের কোন অধিকার দেওয়া হয় নাই।

সাধারণ নিয়মানুসারে হিন্দুর প্রতিনিধি মনোনয়নের অধিকার আছে বটে কিন্তু হিন্দুসমাজের মধ্যে বহু শ্রেণী-বিভাগ থাকায় এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে বহুসংখ্যক লোক পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন হওয়ায় এরূপ মনোনয়নে যথার্থ হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী প্রতিনিধির কাউন্সিলে প্রবিষ্ট হওয়া কঠিন হইবে। তিনিই প্রকৃত সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী যিনি শ্রুতিস্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্রে শ্রদ্ধাসম্পন্ন এবং যিনি বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অনুশাসন মানিয়া চলেন। যে ব্যক্তি হিন্দুর কোন বিশিষ্ট সমাজের অন্তর্গত নহে, যাহার হিন্দু ধর্ম্মে শ্রদ্ধা নাই, যাহার সিদ্ধান্ত সমূহ ধর্ম্মের বহির্ভূত এবং যে পদে পদে হিন্দু সমাজের সীমা উল্লঙ্ঘন করে তাহাকেও হিন্দু বলা হইয়া থাকে এবং প্রায় সর্ব্বত্র এইরূপ ব্যক্তিরাই অর্থে, সামর্থ্যে ও বক্তৃতার বলে লোকমত সংগ্রহ করিয়া কাউন্সিলে হিন্দুদের প্রতিনিধি হইয়া বসিবে। মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতির বিশেষত্ব জানিবার নিশ্চিত লক্ষণ আছে। ধর্ম্মপ্রচারক মহম্মদকে না মানিলে সে মুসলমান নহে এবং যিশুখ্রীষ্ট ঈশ্বরের পুত্র একথা না মানিলে সে খ্রীষ্টান নহে। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের এই প্রকার কোন লক্ষণ নাই। যাহারা হিন্দুশাস্ত্র মানে না এইরূপও অনেক হিন্দু নামধারী সম্প্রদায় রহিয়াছে। কিন্তু যথার্থ হিন্দু-ধর্ম্ম শাস্ত্র ও প্রাচীন পরম্পরাগত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। যেরূপ ব্যবস্থা হইতেছে তাহাতে এইরূপ যথার্থ হিন্দুধর্ম্মালম্বী প্রতিনিধি গভর্ণমেণ্টের কাউন্সিল সমূহে মনোনীত হইবেন বলিয়া আশা করা যায় না। এবং যতদিন পর্য্যন্ত যথার্থ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীগণ আপনাদের স্বতন্ত্র প্রতিনিধি মনোনয়নের অধিকার না পাইবেন ততদিন হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধ নানাপ্রকার আইন গঠিত হইবার ভয় থাকিবে। এবং তাহার ফলে হিন্দু ধর্ম্মের মূলোচ্ছেদ হইবার সম্ভাবনা। এই নিমিত্ত ভারতের সমস্ত বর্ণাশ্রম-সদাচার-বিশিষ্ট সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুগণের পক্ষ হইতে গভর্ণমেণ্টের নিকটে এই প্রস্তাব করা হইতেছে যে,—

"ভারত গভর্ণমেণ্ট এই নূতন স্কীমের দ্বারা উদারতা পূর্ব্বক ভারতের বিভিন্ন জনসমাজকে বরিষ্ঠ এবং প্রান্তীয় কাউন্সিলে স্ব স্ব সম্প্রদায়ের হিত রক্ষার নিমিত্ত প্রতিনিধি প্রদানের বিশিষ্ট অধিকার দিয়াছেন তজ্জন্য মহামণ্ডলের কাউন্সিলে গভর্ণমেণ্টকে ধন্যবাদ দিতেছে। কিন্তু এই সঙ্গে কাউন্সিল (মহামণ্ডল) বিশেষ দুঃখের সহিত জানাইতেছে যে গভর্ণমেণ্ট তাঁহার লক্ষ লক্ষ সত্য

সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী শান্তিপ্রিয় মুক হিন্দুগণের প্রতি উপেক্ষা বা ভ্রমমূলক ধারণার ফলে উক্ত স্কীমে একেবারেই মনোযোগ দেন নাই। সম্ভবতঃ গভর্ণমেণ্ট ইহাই মনে করিয়াছেন যে "হিন্দু নামধারী দেশ-বিখ্যাত প্রতিনিধিগণের দ্বারাই সম্পূর্ণরূপে হিন্দুদের হিত রক্ষা হইবে।" কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কারণ যাঁহারা আজকাল দেশের প্রসিদ্ধ নেতা তাঁহাদের মধ্যে অল্প লোকেরই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মাচার-পর যথার্থ হিন্দু ধর্ম্মের উপর শ্রদ্ধা আছে। বর্ণাশ্রমই হিন্দুধর্ম্মের প্রাণ। জাতি বিভাগ অর্থাৎ চারি বর্ণ এবং চারি আশ্রমকে যিনি যথার্থতঃ মান্য করিয়া চলেন তিনিই সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী গণের প্রতিনিধিত্ব করিতে সমর্থ, অন্যে নহে। অতএব এই কাউন্সিল (মহা-মণ্ডল) সবিনয়ে ও সসম্মানে গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করিতেছে যে, সম্রাটের প্রজার মধ্যে অত্যন্ত অধিক সংখ্যক সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুগণকেও বরিষ্ঠ ও প্রান্তীয় কাউন্সিল সমূহে প্রতিনিধি প্রেরণের বিশিষ্ট অধিকার প্রদান করিয়া গভর্ণমেণ্ট হিন্দু সাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হউন।"

বরিষ্ঠ ও প্রান্তীয় কাউন্সিল সমূহে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের পক্ষ হইতে প্রতি-নিধি মনোনয়ন হয়, এ সম্বন্ধে সমস্ত ভারতবর্ষে এখন হইতে বিশেষ আন্দো-লন হওয়া প্রয়োজন। যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের এই অভিলাষ সিদ্ধ না হয় ততদিন এই আন্দোলন পূর্ণোদ্যমে চালান আবশ্যক। এই বিষয়ে উদাসীন অথবা দৈবাবলম্বী হইলে এই নবীন শাসন সংস্কারের ফলে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ভিত্তিমূল শিথিল হইতে থাকিবে। বর্ত্তমান সংস্কার সমিতিতে রাজকার্য্য পরিচালনার জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট তাঁহার যাবতীয় ধর্ম্মাবলম্বী প্রজাগণকে স্ব স্ব সম্প্রদায়ের উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার প্রদান করিতে স্বীকার করিয়াছেন এবং বর্ণা-শ্রম ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দু ব্যতীত অন্য সকল সম্প্রদায়কে উক্ত অধিকার প্রদান করাও হইয়াছে। এই সময় নিরুৎসাহ হইয়া বসিয়া থাকিলে আমাদের ঘোর অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। 'রিফর্ম্ম কাউন্সিলে' প্রতিনিধি বির্ব্বাচন শীঘ্রই হইবে। অতএব অবিলম্বে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের প্রত্যেক স্থানে বিশুদ্ধ সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীগণের পক্ষ হইতে এইরূপ প্রস্তাব সভাসমিতিতে পাশ করিয়া ভারত গভর্ণমেণ্ট, প্রান্তীয় গভর্ণমেণ্ট এবং প্রধান প্রধান সংবাদ পত্রে প্রেরণ করা উচিত।

আমাদের এই যত্ন যদি সফল না হয় এবং অদূর ভবিষ্যতে রিফর্ম্ম কাউন্সিলে হিন্দুধর্ম্মের মূলচ্ছেদকর প্রস্তাব সমূহ প্রতিরোধ করিবার জন্য হিন্দুধর্ম্মের পক্ষ হইতে উপযুক্ত সংখ্যক প্রতিনিধি যদি প্রেরিত না হন তবে এই সংস্কারের ফলে হিন্দুধর্ম্মের বিনাশ অনিবার্য্য।

সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক স্থানের ধর্ম্মপ্রেমী সজ্জনগণের প্রজাসাধারণকে বক্তৃতাদি দ্বারা ইহাও বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক যে, তাঁহারা যেন এরূপ ব্যক্তিকে ভোট দেন যাঁহার বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা আছে।

বিশেষ সন্তোষের বিষয় এই যে, মহামণ্ডলের প্রতিষ্ঠাতা, ও সঞ্চালক পূজ্যপাদ শ্রী১০৮ স্বামী জ্ঞানানন্দজী মহারাজ অল্পদিন পূর্ব্বে রাজপুতানায় ভ্রমণ করিয়া উক্ত বিষয়ে প্রধান প্রধান নরপতিগণের সম্মতি ও সহকারিতা লাভ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের মধ্যে একজন ইহাও স্বীকার করিয়াছেন যে তিনি স্বয়ং ইংলণ্ডে যাইয়া এ বিষয়ের আন্দোলন করিবেন।

উল্লিখিত উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত ভারতের প্রত্যেক প্রান্ত, বিভাগ, জেলা ও গ্রাম হইতে এই প্রকার প্রস্তাব ভারত গভর্ণমেণ্ট ও প্রান্তীয় গভর্ণমেণ্ট সমূহের নিকট প্রেরিত হওয়া আবশ্যক। যদি চতুর্দ্দিক হইতে এইরূপ প্রস্তাব প্রেরিত হয় তবে আশা করা যায় যে, সনাতন ধর্ম্মাবলম্বিদিগের এবম্বিধ বৈধ ও ন্যায়সঙ্গত মত সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট বিশেষ মনোযোগী হইবেন এবং সনাতন ধর্ম্মাবলম্বিদিগকে আপন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে অধিকার প্রদান করিবেন।

প্রধান মন্ত্রী নিয়োগ—ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ ও প্রসিদ্ধ স্বদেশসেবক জষ্টিস সারদাচরণ মিত্র ও বিদ্বন্মণি রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের মৃত্যুর পর মহামণ্ডলের প্রধান মন্ত্রীর পদ শূন্য ছিল। সংপ্রতি মাদ্রাজের সুপ্রসিদ্ধ ধার্ম্মিক ও বিদ্বান জমীদার ধর্ম্মভূষণ অনারেবল শ্রীযুক্ত কে, ভি, রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার বি, এ, বি, এল মহাশয় ঐ পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। অল্পদিন হইল ইনি মহামণ্ডলের প্রধান কার্য্যালয়ে আসিয়াছিলেন। মহামণ্ডলের যাবতীয় বিভাগ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিদর্শন করিয়া ইনি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং দাক্ষিণাত্যে মহামণ্ডলের ধর্ম্মপ্রচার কার্য্য পরিচালনের জন্য আত্মনিয়োগ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন।

"The World's Eternal Religion."

নারীধর্ম্ম।

(স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী)

বিবাহকাল।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আর্য্যশাস্ত্রে স্ত্রীজাতির এরূপ দিব্যস্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে বলিয়াই উহার রক্ষার জন্যও এত সাবধানতা অবলম্বিত হইয়াছে। কারণ যাহাকে আর্য্যজাতি জগন্মাতার প্রতিকৃতি বিবেচনায় পূজা করিয়া থাকে, তাহাকে নির্লজ্জা হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিবার অথবা পুরুষের সম্মুখে নাটক দেখাইবার আজ্ঞা দিতে পারে না। এরূপ আজ্ঞা দয়ার পরিচায়ক নহে, প্রত্যুত স্ত্রীধর্ম্মের সত্তা-নাশকর এবং জগন্মাতার উপর মূর্খতা-মূলক অত্যাচার মাত্র। যে বস্তু যাহার প্রিয় সে তাহাকে পরম যত্নেই রক্ষা করিয়া থাকে, হাটে বাজারে ফেলিয়া দেয় না। ধনালঙ্কারাদি প্রিয় বস্তু সমূহকে গৃহস্থগণ যত্নের সহিত সংগোপনেই রাখিয়া থাকে, সকলকে দেখাইয়া বেড়ায় না। একারণ উল্লিখিতরূপে আর্য্য মহিলাগণের রক্ষা তাঁহাদের প্রতি উপেক্ষা বা নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক নহে প্রত্যুত প্রেম ও ভক্তিভাবের পরিচায়ক। দ্বিতীয়তঃ স্ত্রী-পুরুষের এরূপ নিরঙ্কুশভাবে একত্র ভ্রমণে আরও অনেক অনর্থের উদয় হইয়া থাকে। শাস্ত্রে কামাদি কুবৃত্তির উদয়ের মূলে সঙ্গকেই কারণরূপে বর্ণন করা হইয়াছে যথা—

"সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ।"

"হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে।"

সঙ্গ হইতেই কামের উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং সঙ্গের দ্বারা উহা তিরোহিত না হইয়া ঘৃতাহুত বহ্নির ন্যায় উত্তরোত্তর আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। এজন্য স্ত্রী-পুরুষের অধিকক্ষণ একত্রাবস্থান এবং ভ্রমণাদি সংযমের বাধক ও পশু-ভাবের বৃদ্ধিকর ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। দূরদর্শী মহর্ষিগণ এরূপ পশু-ভাব বৃদ্ধিকর আজ্ঞা কখনই দিতে পারেন না। তাই আর্য্যশাস্ত্রে স্ত্রীজাতির পক্ষে স্বতন্ত্র ভ্রমণাদি নিবারিত হইয়াছে। তৃতীয়তঃ এরূপ ভ্রমণের দ্বারা

কামুক পুরুষের কামদুষ্ট দৃষ্টি স্ত্রীর উপর পতিত হইয়া পাতিব্রত্যেরও হানিকর হইতে পারে। শারীরিক ও মানসিক শক্তি নেত্রের দ্বারা কিরূপে মনুষ্য হইতে মনুষ্যান্তরে সঞ্চারিত হইতে পারে তাহা প্রাণ-বিনিময় (মেস্‌মেরিজম্) আদি প্রক্রিয়া দ্বারা বর্ত্তমান সময়ে বৈজ্ঞানিক-ভাবেও স্থিরীকৃত হইয়াছে। যোগজগতে ত এরূপ বিষয় সাধারণ সিদ্ধির মধ্যেই পরিগণিত। যদি আর্য্য রমণী নিরঙ্কুশ ভাবে পুরুষের মধ্যে ভ্রমণ করিয়া বেড়ান তবে অনেক অসৎ লোকের দৃষ্টি তাঁহার উপর অবশ্যই কুভাবে পতিত হইবে এবং ইহাতে সতী-ধর্ম্মের হানি বই লাভ আদৌ নাই। দেবী ভাগবতের তৃতীয় স্কন্দের বিংশতি অধ্যায়ে এরূপ একটি দৃষ্টান্তও দেখিতে পাওয়া যায়। তথায় শশিকলা নাম্নী একটি কন্যার বিষয় লিখিত আছে যে তাঁহাকে তাঁহার পিতা স্বয়ম্বর সভায় পতি-নির্ব্বাচনার্থ যাইতে বলিতেছেন এবং তিনি পুনঃ পুনঃ এই বলিয়া অস্বীকার করিতেছেন যে স্বয়ম্বর সভায় সমাগত অনেক রাজার কামপূর্ণ দৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হইলে তাঁহার সতীধর্ম্ম অক্ষুন্ন থাকিবে না। যথা—

তং তথা ভাষমানং বৈ পিতরং মিতভাষিণী।
উবাচ বচনং বালা ললিতং ধর্ম্মসংযুতম্॥
নাহং দৃষ্টিপথে রাজ্ঞাং গমিষ্যামি পিতঃ! কিল।
কামুকানাং নরেশানাং গচ্ছন্ত্যন্যাশ্চ যোষিতঃ॥
ধর্ম্মশাস্ত্রে শ্রুতং তাত! ময়েদং বচনং কিল।
এক এব বরো নার্য্যা নিরীক্ষ্যঃ স্যান্ন চাপরঃ॥
সতীত্বং নির্গতং তস্যা যা প্রযাতি বহূনথ।
সঙ্কল্পয়ন্তি তে সর্ব্বে দৃষ্ট্বা মে ভবতাত্বিতি॥
স্বয়ম্বরে স্রজং ধৃত্বা যদা গচ্ছতি মণ্ডপে।
সামান্যা সা তদা জাতা কুলটেবাপরা বধূঃ॥
বারস্ত্রী বিপণিং গত্বা যথা বীক্ষ্য নরান্ স্থিতান্।
গুণাগুণপরিজ্ঞানং করোতি নিজমানসে॥
নৈকভাবা যথা বেশ্যা বৃথা পশ্যতি কামুকম্।
তথাহং মণ্ডপে গত্বা কুর্ব্বে বারস্ত্রিয়া কৃতম্॥

পিতার এরূপ কথা শুনিয়া মিতভাষিণী শশিকলা মধুর স্বরে পিতৃ-

দেবকে নিম্নলিখিত ধর্ম্মভাবপূর্ণ বাক্য বলিলেন, "হে পিতঃ! আমি কাম-দৃষ্টি-সম্পন্ন রাজাদের নেত্রপথে আসিতে চাহি না, কারণ সতী স্ত্রীর এরূপ আচরণ কদাপি হইতে পারে না। আমি ধর্ম্মশাস্ত্রে শুনিয়াছি যে পতিব্রতা স্ত্রীর কেবল নিজপতির প্রতিই দৃষ্টিপাত করা উচিত, অন্য পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করা উচিত নহে। যে স্ত্রী অনেক পুরুষের দৃষ্টি পথে আসে তাহার পাতিব্রত্য কুণ্ঠিত হইয়া থাকে কারণ সে সময়ে 'এই স্ত্রী আমারই ভোগ্যা হউক'——এইরূপ ইচ্ছা প্রত্যেক পুরুষেই করিয়া থাকে। যে রাজকন্যা হাতে বরমালা লইয়া স্বয়ম্বর সভায় আসেন তাঁহাকে কুলটার ন্যায় সকলেরই স্ত্রী হইতে হয়। যেরূপ বারাঙ্গনা বিপণিতে গমন করিয়া তত্রাগত পুরুষগণের গুণাগুণ বিচার করে এবং এক পুরুষাশ্রিতা না হইয়া সকল কামুক পুরুষের প্রতিই দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে সেই প্রকার আমাকেও স্বয়ম্বর সভায় গিয়া করিতে হইবে।" এই সকল বিচারপূর্ণ উক্তির দ্বারা স্ত্রীজাতির পক্ষে হ্রীগুণের পরমাবশ্যকতা প্রমাণিত হইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে লজ্জাহীনা স্ত্রীর অস্তিত্বই অকিঞ্চিৎকর ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এই কারণেই প্রাচীন আর্য্যমহর্ষিগণ হ্রীশীলা নারীর এত প্রশংসা করিয়াছেন এবং বিবাহ প্রসঙ্গেও স্বয়ম্বর বিবাহকে উচ্চস্থান না দিয়া ব্রাহ্ম বিবাহকেই উচ্চস্থান প্রদান করিয়াছেন। ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলের চতুর্থ অধ্যায়ে ষড়্‌বিংশতি সূক্তে—

"যো বাং যজ্ঞেভিরাবৃতোঽধিবস্ত্রা বধূরিব।"

অর্থাৎ অবগুণ্ঠনবতী বধূর মত যিনি যজ্ঞের দ্বারা আবৃত—এরূপ মন্ত্রের দ্বারা স্ত্রীজাতির লজ্জাশীলতার অতি প্রাচীনতা এবং মৌলিকতা সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। রামায়ণেরও অনেক স্থানে স্ত্রীজাতির হ্রীসুলভ মর্য্যাদা রক্ষার প্রমাণ পাওয়া যায় যথা—

যা ন শক্যা পুরা দ্রষ্টুং ভূতৈরাকাশগৈরপি।
তামদ্য সীতাং পশ্যন্তি রাজমার্গগতা জনাঃ॥

সীতামাতাকে শ্রীরামচন্দ্রের সহিত বনবাসে যাইতে দেখিয়া অযোধ্যাবাসিগণ বলিতে লাগিল "অহো! কি দুঃখের বিষয় যে অন্তঃপুর-চির-নিবাসিনী সীতাকে খেচর জীব পর্য্যন্ত দেখিতে পাইত না সেই সীতা আজ রাজপথবার্ত্তী

সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টিগোচর হইলেন।" এইরূপ মৃতপতি রাবণকে দেখিয়া মন্দোদরীর বিলাপের প্রসঙ্গেও বর্ণিত আছে যথা—

দৃষ্ট্বা ন খল্বসি ক্রুদ্ধো মামিহানবগুণ্ঠিতাম্।
নির্গতাং নগরদ্বারাৎ পদ্ভ্যামেবাগতাং প্রভো!
পশ্যেষ্টদার! দারাংস্তে ভ্রষ্টলজ্জাবগুণ্ঠনাম্।
বহির্নিষ্পতিতান্ সর্ব্বান্ কথং দৃষ্ট্বা ন কুপ্যসি॥

হে স্বামিন্! আমি তোমার মহিষী হইয়াও অবগুণ্ঠন ত্যাগ করত পদব্রজে নগরের বাহিরে আসিয়াছি ইহা দেখিয়া তোমার কি ক্রোধ হইতেছে না? দেখ, তোমার সমস্ত পত্নীগণ আজ লজ্জা ও অবগুণ্ঠন ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়াছে, ইহাতেও কি তোমার ক্রোধের উদয় হইতেছে না? এই সকল দৃষ্টান্তের দ্বারা অতি প্রাচীন কালেও অবরোধপ্রথা এবং অন্তঃপুরপ্রথা বিদ্যমান ছিল তাহা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়। মালবিকাগ্নিমিত্র, মৃচ্ছকটিক আদি কাব্য ও উপন্যাস গ্রন্থ পাঠ করিলেও সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আর্য্য জাতির মধ্যে অবরোধ প্রথার প্রচলন সুসিদ্ধ হয়। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী আদি সতীগণকে কেবল ঘটনাচক্রে অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল অতএব উহা সাধারণ বিধির মধ্যে পরিগণিত হইবার যোগ্য নহে। এইরূপে স্ত্রীজাতির শীল ও লজ্জা রক্ষার জন্য অন্তঃপুর প্রথা আর্য্যাচার সঙ্গত হইলেও বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষের কোন কোন প্রদেশে যে অতি কঠিন কারাবাসের মত অবরোধ প্রথা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা আর্য্যরীতি নহে। এই নবীন রীতি যবন সাম্রাজ্য কালে উহাদেরই অনুকরণে বিহিত হইয়াছে। এরূপ কঠিন প্রথা অবশ্যই পরিত্যাজ্য অন্য পক্ষে আজকাল ভারতের কোন কোন প্রান্তে অন্তঃপুর এবং অবরোধ প্রথার যে একেবারেই শৈথিল্য দেখা যাইতেছে তাহাও অনার্য্য ভাবমূলক হওয়ায় অনুকরণীয় নহে। উভয় ভাবের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলাই আর্য্য শাস্ত্রানুমোদিত এবং ইহার দ্বারাই আর্য্যজাতি বর্ত্তমান দেশ-কালে আর্য্য মহিলাগণের মর্য্যাদা-রক্ষা, উন্নতি সাধন এবং আত্ম-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইবেন ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

নারীজীবন ।

বৈধব্যাবস্থা ।

নারীজীবনের তৃতীয় অবস্থা বৈধব্য নামে অভিহিত । যদি প্রারব্ধবশে সতী নারীর এই অবস্থা প্রাপ্তি হয় তবে ইহাতেই তাঁহার পাতিব্রত্যের চরম পরীক্ষা হইয়া থাকে । সতীত্বের পরমপবিত্র-ভাবে ভাবিত সতীর যে অন্তঃকরণ গার্হস্থ্য জীবনে পরমদেবতা পতির সাকাররূপে তন্ময় হইয়াছিল আবার সেই অন্তঃকরণই বৈধব্যরূপ সন্ন্যাস অবস্থায় পরমদেবতা পতির নিরাকার স্বরূপে তন্ময় হইয়া পাতিব্রত্যের চরম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া থাকে । এই কারণেই বৈধব্যাবস্থা এত তপোময়, গৌরবময় এবং পবিত্রতাময় । ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে শ্রীভগবানের চরণ কমলে বিলীনতা লাভ করিয়া ভক্ত যেমন মুক্তিপদ প্রাপ্ত হন, সেই প্রকার পতিদেবতার চরণকমলে মনপ্রাণ বিলীন করিয়া সতী-নারী নিজযোনি হইতে মুক্তিলাভ করত অত্যুন্নত পুরুষ যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । পতিব্রতা সতী পাতিব্রত্যের প্রভাবে পতিলোক অর্থাৎ পঞ্চম লোকে যাইয়া পতিদেবতার সহিত বহুকাল সানন্দে নিবাস করেন । এবং এইভাবে তন্ময়তা দ্বারা তাঁহার স্ত্রীসত্তা বিগলিত হইলে পরবর্ত্তী জন্মে তাঁহাকে আর স্ত্রীযোনি প্রাপ্ত হইতে হয় না । তিনি স্ত্রীযোনি হইতে মুক্তিলাভ করত নিঃশ্রেয়সপ্রদ পুরুষযোনি লাভ করিয়া থাকেন । উদ্ভিজ্জ যোনি হইতে যে স্ত্রীধারা প্রারম্ভ হইয়াছিল, তাহা এইস্থানে আসিয়া সমাপ্ত হয় । এইজন্যই সকল দিক বিচার করিয়া আর্য্যমহর্ষিগণ স্ত্রীজাতির পক্ষে তন্ময়তাপ্রদ একপতিব্রত ধর্ম্মেরই উপদেশ দিয়াছেন । কারণ যে চিত্ত বিবিধ কেন্দ্রে চঞ্চল হয় তাহাতে তন্ময়তা আসিতে পারে না এবং তন্ময়তা ভিন্ন পাতিব্রত্য ধর্ম্মের পূর্ণতা হইতে পারে না এবং পাতিব্রত্যের পূর্ণতা ভিন্ন স্ত্রীজাতি নিজ যোনি হইতে মুক্তিলাভ করত নিঃশ্রেয়সপ্রদ পুরুষযোনি লাভ করিতে পারে না । এজন্য সাধব্য অথবা বৈধব্য উভয় অবস্থাতেই মহর্ষিগণ স্ত্রীজাতির জন্য একপতিব্রত ধর্ম্মের অনন্য-শরণতার উপদেশ দিয়াছেন । সতীধর্ম্মের পূর্ণ পরিপালন ভিন্ন স্ত্রীজাতির জন্মই বৃথা । বিবাহ বিজ্ঞানের উপর সংযম করিলে দেখা যায় যে স্থূলতঃ পুরুষশক্তির সহিত স্ত্রীশক্তির সংযোগের দ্বারা কোন নবীন সৃষ্টি উৎপন্ন করিবার জন্যই বিবাহ ক্রিয়া সংঘটিত হইয়া থাকে ।

এতাদৃশ শক্তিদ্বয়ের সম্মেলন একটী প্রাকৃতিক ব্যাপার, এজন্য অণু পরমাণু হইতে ঈশ্বর পর্য্যন্ত ইহা সর্ব্বত্রই দৃষ্টি গোচর হইয়া থাকে। অণু সকলের ভিতরে স্ত্রীশক্তি এবং পুরুষশক্তি (negative and positive powers) বিদ্যমান থাকে। এইহেতু দ্ব্যণুকাদি ক্রমে স্থূল-জগতের বিস্তার উল্লিখিত শক্তিদ্বয়ের পারস্পরিক মিলনের দ্বারাই হইয়া থাকে। স্থূল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির সময়ে পুরুষ-পরমাণু স্ত্রী-পরমাণুর সহিত সম্মিলিত হয়। সাধারণতঃ গর্ভাধান কালেও এইরূপে রজোবীর্য্যের সম্মেলন দ্বারা উভয় শক্তি একত্রিত হইয়া সন্তানের স্থূলদেহ উৎপাদন করিয়া থাকে। উদ্ভিদ জগতেও এইরূপে শক্তি সম্মেলনের দ্বারা সৃষ্টি বিস্তার দেখা যায় কারণ বৃক্ষের মধ্যেও স্ত্রীপুরুষভেদ আছে পুরুষ বৃক্ষের পুং পরাগ বায়ু অথবা ভ্রমরগণের দ্বারা নীত হইয়া স্ত্রীবৃক্ষের স্ত্রীপরাগের সহিত সম্মিলিত হয় এবং এই ভাবে প্রাকৃতিকরূপে উদ্ভিদ সৃষ্টির বিস্তার হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে একই পুষ্পে দ্বিবিধ পরাগ বিদ্যমান থাকে। পুরুষ-শক্তিযুক্ত পুংপরাগ পুষ্পের উপরিভাগে এবং স্ত্রীশক্তিযুক্ত স্ত্রী-পরাগ পুষ্পের গর্ভ মধ্যে থাকে। ভ্রমর প্রথমতঃ উপরিভাগের পুং পরাগ নিজের অঙ্গে লাগাইয়া পরে পুষ্প গর্ভস্থিত স্ত্রীপরাগের সহিত তদঙ্গস্থিত পুং পরাগকে সংযুক্ত করে এবং এই ভাবে স্বভাবতঃ উদ্ভিদ সৃষ্টির বিস্তার হয়। উদ্ভিদ যোনির মত স্বেদজ যোনিতেও এইরূপে স্ত্রী-পুরুষ পরমাণুদ্বয়ের মিলনে স্বেদজ জীব সমূহের স্থূলশরীর উৎপন্ন হইয়া থাকে। অণ্ডজ এবং জরায়ুজ যোনিতে শক্তি সম্মেলন ত সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ হয়। এক্ষণে বিচার্য্য বিষয় এই যে নিখিল সৃষ্টির মধ্যে এইরূপে শক্তি সম্মেলন ব্যাপারের নিদান এবং হেতু কি আছে? প্রণিধান পূর্ব্বক দেখিলে বুঝা যায় যে সৃষ্টির আদি কারণ পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে উল্লিখিত দ্বিবিধ শক্তি বিদ্যমান থাকায় কার্য্য-ব্রহ্মরূপ জগতের সর্ব্বত্রই দ্বিবিধ শক্তি অবশ্য দৃষ্টিগোচর হইবে। মহাপ্রলয়ের পরে প্রলয়বিলীন জীব সমূহের কর্ম্মানুসারে অদ্বিতীয় পরমাত্মার হৃদয়ে যখন সিসৃক্ষা উৎপন্ন হয় তখনই তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গরূপিণী প্রকৃতি তাঁহা হইতে প্রকট হইয়া থাকেন এবং তৎপশ্চাৎ ঈশ্বর ও প্রকৃতির সম্মিলনে নিখিল জীবের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এইরূপে মূল কারণে দুই শক্তির সম্বন্ধ থাকায় কার্য্যরূপ জগতের স্থূল, সূক্ষ্মাদি সমস্ত

বিবাহের নৈসর্গিকতা।

বিভাগেই দ্বিবিধ শক্তির লীলা দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব সৃষ্টিধারাকে অবিচ্ছিন্ন রাখিবার জন্য উভয় শক্তির সংযোগই বিবাহের প্রথম উদ্দেশ্য। বিবাহের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য আরও সূক্ষ্মতর। উহা বিযুক্ত উভয় শক্তির পুনঃ সংযোগের দ্বারা অদ্বিতীয় পূর্ণতা সম্পাদন। ব্রহ্মভাবে অদ্বিতীয় পূর্ণতা বিরাজিত আছে। ঈশ্বরভাবে প্রকৃতি পৃথক হইয়া অনন্ত সৃষ্টি বিস্তার করিয়া থাকেন। এই হেতু সৃষ্টি অবস্থায় সর্ব্বত্র উভয় শক্তির পৃথক পৃথক কার্য্যকারিতা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এই বিযুক্ত ও লীলাবিলাসশীল প্রকৃতি-শক্তিকে পুরুষে লয় করত অদ্বিতীয় পূর্ণতা স্থাপন করাই বিবাহ ও সৃষ্টি বিস্তারের উদ্দেশ্য। প্রত্যেক সৃষ্টির মূলেই লয়ের বীজ বিদ্যমান আছে। যে সৃষ্টির মূলে লয়ের বীজ নাই অথবা যাহা লয়ের বাধক বা প্রতিকূল তাহা যথার্থ সৃষ্টিপদ-বাচ্য নহে। অতএব শক্তিদ্বয়ের লীলাবিলাসস্থল এই সংসারে যথার্থ বিবাহ তাহাকেই বলা যাইতে পারে যাহার দ্বারা প্রকৃতিশক্তি পুরুষে বিলীন হইয়া অদ্বিতীয় ব্রহ্মভাব নিপন্ন করিতে সমর্থ হয়। যে যাহা হইতে নির্গত হয় তাহার লয়ও উহাতেই হওয়া স্বতঃসিদ্ধ। প্রকৃতি পুরুষ হইতে নির্গত হন বলিয়া পুরুষে বিলীন হওয়াই প্রকৃতির নৈসর্গিক ধর্ম্ম। আর্য্য জাতির বিবাহ বিধি এই উদ্দেশ্যের পূর্ত্তির জন্য হইয়া থাকে। অতএব আর্য্যসিদ্ধান্তানুসারে প্রকৃতির অংশরূপিণী স্ত্রীজাতির তাহাই অনন্য ধর্ম্ম যাহার দ্বারা স্ত্রী সৃষ্টিবিস্তার করিতে করিতে চরমে পুরুষে লয় প্রাপ্ত হইতে পারেন। এই লয়ক্রিয়ার যাহা কিছু বাধক তাহা স্ত্রীজাতির ধর্ম্ম হইতে পারে না। এক-পতিব্রত ধর্ম্মই স্ত্রীজাতিকে পুরুষে বিলীন করত মুক্তিদান করাইতে পারে। অনেক পুরুষে রমমান চিত্ত একাগ্রতাও লাভ করিতে পারে না এবং তন্ময়তাও প্রাপ্ত হয় না। অতএব একপতিব্রতই স্ত্রীজাতির পক্ষে একমাত্র ধর্ম্ম। কন্যা-কালে এই ধর্ম্মের শিক্ষা, গৃহিণীকালে এই ধর্ম্মের চরিতার্থতা এবং বৈধব্য জীবনে এই ধর্ম্মানুষ্ঠানের চরম পরীক্ষা হইয়া থাকে। অতএব পাতিব্রত্যের পূর্ণানুষ্ঠান দ্বারা পরলোকগত পতিদেবতার আত্মায় নিজ আত্মাকে বিলীন করাই বিধবা নারীর একমাত্র ধর্ম্ম। কিন্তু পুরুষের ধর্ম্ম এরূপ নহে। কারণ আদি পুরুষ প্রকৃতি হইতে নির্গত হন না, প্রত্যুত প্রকৃতিই আদি পুরুষ হইতে নির্গতা হইয়া থাকেন। কেবল আদি পুরুষের অংশরূপী পুরুষ জীব জগতে প্রকৃতির

দ্বারা মুগ্ধ ও বদ্ধ হইয়া থাকে। এজন্য পুরুষের ধর্ম্ম প্রকৃতিতে লয় না হইয়া প্রকৃতির সহায়তায় সৃষ্টি বিস্তার করত প্রকৃতির মোহিনী শক্তি হইতে নিস্তার পাইয়া স্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠা দ্বারা পূর্ণ হইয়া থাকে। পুরুষ যোগ সাধনার সাহায্য এই স্বরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন। অতএব আর্য্যশাস্ত্রে পুরুষের পক্ষে সেইরূপ ধর্ম্মই বিহিত হইয়াছে যাহাতে পুরুষ সৃষ্টি বিস্তার কালে প্রকৃতির ত্রিগুণময়ী লীলা পরিদর্শন করত তাহা হইতে পৃথক হইয়া স্বরূপস্থিতি লাভ করিতে পারে। একারণ স্ত্রীজাতির এক-পতিব্রতের ন্যায় পুরুষের পক্ষে এক-পত্নীব্রত অনন্য ধর্ম্ম হইতে পারে না যেহেতু বংশ রক্ষার জন্য সৃষ্টি বিস্তার এবং প্রকৃতি হইতে পৃথক হইয়া মুক্তিলাভের নিমিত্ত প্রয়োজনানুসারে একাধিক বিবাহেরও আবশ্যকতা হইতে পারে। বিবাহ ক্রিয়ায় পুরুষ-ধর্ম্মের সহিত নারীধর্ম্মের ইহাই এক মুখ্য বিশেষত্ব।

স্থূল সৃষ্টি বিস্তার ও ক্রমশঃ আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিয়া মুক্তিপদ প্রাপ্তি—এই উভয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত বিবাহ দ্বারা পুরুষশক্তির সহিত স্ত্রীশক্তির সম্মেলন করা হইয়া থাকে। শক্তি পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়েতেই বিদ্যমান থাকায় আত্মা হইতে স্থূল শরীর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত। সুতরাং কেবল স্থূল শরীরের সহিত স্থূল শরীরের সম্বন্ধকে বিবাহ বলা যায় না। বিবাহ স্ত্রীপুরুষের স্থূল শরীরের সহিত স্থূল শরীরকে, সূক্ষ্ম শরীরের সহিত সূক্ষ্মশরীরকে, কারণ শরীরের সহিত কারণ শরীরকে এবং আত্মার সহিত আত্মাকে সম্মিলিত করে। মনুষ্য প্রকৃতি-রাজ্যে যতই উন্নতি লাভ করে ততই এই প্রকার উন্নত হইতে উন্নততর সম্মেলন অনুভব করিতে সমর্থ হয়। বৃক্ষাদি স্থূলপ্রধান সৃষ্টিতে স্থূলের সহিত স্থূলের সম্মেলন এবং তাহাতেই সৃষ্টি বিস্তার হইয়া থাকে। পক্ষী, পশু ও অনার্য্যজাতিতে স্থূল ব্যতীত সূক্ষ্মের কিঞ্চিৎ সম্বন্ধ থাকিলেও ঐ সকল জাতির মধ্যে সূক্ষ্মও স্থূল-ভাবাপন্ন হওয়ায় স্থূলেরই প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। এই নিমিত্ত পক্ষী, পশু ও অনার্য্যজাতিতে স্ত্রীদের বহু-পুরুষ-সংসর্গ বা বহু-বিবাহ প্রচলিত আছে। কারণ যেখানে কেবল স্থূল শরীরের সুখভোগের জন্যই বিবাহ তথায় এক স্থূল শরীর বিনষ্ট হইলে অপর স্থূল শরীরের সহিত সম্বন্ধ হওয়া স্বাভাবিক।

(ক্রমশঃ)

আর্য্যজাতি।

[স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী]

আর্য্যজাতির সর্ব্বাঙ্গীণ পূর্ণতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

উপর্য্যুক্ত প্রমাণ হইতে সিদ্ধ হয় যে প্রাচীন কালে যুদ্ধে কামান ও বন্দুক ব্যবহৃত হইত। মুসলমান আক্রমণের পূর্ব্ববর্ত্তী আর্য্যগণ এই প্রাচীন যুদ্ধ বিদ্যা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন, কারণ একথা সর্ব্ববাদি-সম্মত যে মহাভারতের মহাযুদ্ধ ও বৌদ্ধগণের মহাবিপ্লব দ্বারা ভারত শ্মশান সদৃশ হইয়া পড়িয়াছিল এবং এই জন্যই লোকে এই সকল বিদ্যা প্রায় বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল। তথাপি আধুনিক ইতিহাস আলোচনা করিলেও অবগত হওয়া যায় যে আর্য্যদের মধ্য হইতে এ বিদ্যা সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল না। শেষ হিন্দু সম্রাট পৃথ্বিরাজের সময় কামানের ব্যবহার ছিল একথা তাঁহার জীবন চরিত্রে পাওয়া যায়। যথা,—

জম্বুর তোপ ছুটহি ঝনঙ্কি।
দশ কোশ জায় গোলা ভনঙ্কি॥

জম্বুর কামান ভীষণ শব্দে ছুটিল এবং উহার গোলা দশ ক্রোশ চলিয়া গেল। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে গঙ্গার খাল কাটিতে সময় সার আর্থার কাটলী সাহেব ভূমধ্যে এক বৃহৎ নগরের ধ্বংশাবশেষ পাইয়াছিলেন এবং উহার মধ্যে কতকগুলি কামান পাওয়া গিয়াছিল। তদ্দ্বারা উক্ত সাহেব নিশ্চয় করিয়াছেন যে প্রাচীন ভারতবাসীগণ কামানের ব্যবহার জানিতেন। প্রোফেসর উইলসন সাহেব বলিয়াছেন যে হিন্দুদের চিকিৎসাশাস্ত্র পাঠ করিলে জানা যায় যে তাঁহারা বারুদ প্রস্তুত করিতে জানিতেন এবং তাঁহাদের গ্রন্থে ইহার প্রয়োগ করিবারও অনেক বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। মৈফী সাহেব বলিয়াছেন যে ভারতবাসীগণ পর্ত্তুগীজদের অপেক্ষা কামানাদি আগ্নেয় অস্ত্রের অনেক অধিক প্রয়োগ জানিতেন। গ্রীস দেশের থেমিসটিয়স এবং মহাবীর আলেকজেণ্ডার এরিষ্টোটলকে পত্র লিখিতে সময় লিখিয়াছিলেন যে তাঁহাদের সৈন্যের উপর হিন্দুগণ অজস্র কামানের গোলা বর্ষণ করিয়াছেন। শাস্ত্রে শতঘ্নীর এইরূপ বর্ণন পাওয়া যায় যে ইহা লৌহ দ্বারা নির্ম্মিত হইত এবং ইহার আকার প্রকাণ্ড বৃক্ষের কাণ্ডের ন্যায় হইত। ইহাদের দুর্গের উপরে রাখা হইত এবং যুদ্ধক্ষেত্রেও আনা হইত। ইহাদের শব্দ বজ্রের ন্যায় হইত। এই সকল প্রমাণ হইতে প্রাচীন কালে কামানের ব্যবহার প্রমাণিত হয়। ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের ফরেন সেক্রেটারী ইলিয়ট সাহেব

ভারতীয় আগ্নেয়াস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিতে সময় বলিয়াছেন যে, "বারুদের প্রধান উপাদান সল্টপিটর এবং উহার অন্যতম উপকরণ গন্ধক ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এবং আমার সিদ্ধান্ত এই যে প্রাচীনকালে ভারত-বাসীগণ এই প্রকার বারুদ ও কামানের ব্যবহার জানিতেন। তাঁহাদের বাড়ীর ফটকের সম্মুখে এই প্রকার বিস্ফোরক পদার্থ রক্ষিত হইত এবং প্রয়োজন অনুসারে উহাতে অগ্নি সংযোগ করা হইত। এতদ্ভিন্ন অগ্নি লাগিলে ফাটিয়া যায় হিন্দুগণ এইরূপ অনেক অস্ত্রেরও প্রয়োগ করিতেন।" এই প্রকার অনেক প্রমাণ হইতে প্রাচীনকালে এবং মুসলমান রাজত্বের সময় পর্য্যন্তও কোন কোন স্থানে কামানের ব্যবহার সিদ্ধ হয়।

জলযুদ্ধ ও আকাশ যুদ্ধেও প্রাচীন আর্য্যগণ বিশেষ নিপুণ ছিলেন, তাহারও প্রমাণ শাস্ত্রে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১১৬ সূক্তে লিখিত আছে যে, রাজর্ষি তুগ্র নিজ পুত্র ভুজ্যুকে সসৈন্যে সমুদ্র পথে দিগ্বিজয় করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা প্রাচীনকালে জলযুদ্ধ নিশ্চিত হয়। কর্ণেল টড ও ষ্ট্রাবো সাহেব অনেক স্থানে বলিয়াছেন যে, প্রাচীনকালে আর্য্যগণ জলযুদ্ধে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। কারণ পৃথিবীব্যাপী আপনাদের বাণিজ্য ব্যাপার সংরক্ষণের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে সর্ব্বদাই জলসৈন্য ও অর্ণবপোতাদি রাখিতে হইত। ফরিয়া সাউজা বলিয়াছেন, খ্রীষ্টীয় ১৫ পঞ্চদশ শতাব্দীতে এক গুজরাতী জাহাজ পর্ত্তুগীজদিগের প্রতি অনেক কামান চালাইয়াছিল। ১৫০২ খ্রীষ্টাব্দে কালিকাটে হিন্দুগণ যুদ্ধের জাহাজ ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং উহার পরবর্ত্তী বৎসর জামোরিন জাহাজে করিয়া ৩৮০ টা কামান আনা হইয়াছিল। আকাশ যুদ্ধের সম্বন্ধেও প্রাচীন ইতিহাসে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। রাবণ পুষ্পক বিমানে উঠিয়া দিগ্বিজয় করিয়াছিলেন, ইন্দ্রজীত আকাশ মার্গ হইতে রামচন্দ্রের সৈন্যের উপর অজস্র বাণ বর্ষণ করিয়াছিলেন, এইরূপ বিস্তর প্রমাণ রহিয়াছে যদ্দারা বিমান বিদ্যায় প্রাচীন আর্য্যজাতির পারদর্শিতা সিদ্ধ হয়। অল্পদিন পূর্ব্বে যখন বেলুন ও এরোপ্লেন আবিষ্কৃত হয় নাই তখন লোকে হিন্দুশাস্ত্রে আকাশযানাদির বর্ণন দেখিয়া উপহাস করিত। পরন্তু ভগবানের কৃপায় নবীন জেপলিন ও এরোপ্লেন প্রভৃতি আবিষ্কৃত হওয়ায় লোকের ঐ ভ্রম

বিদূরীত হইয়াছে এবং প্রাচীন আর্য্যজাতির যুদ্ধ বিদ্যার নৈপুণ্য দেখিয়া তাহাদিগকে বিস্মিত হইতে হইয়াছে। এই সকল প্রমাণ হইতে প্রাচীন আর্য্যজাতির মধ্যে যুদ্ধ বিদ্যার পূর্ণতার পরিচয় পাওয়া যায়।

মনুষ্য জাতির সর্ব্ববিধ পূর্ণতা সম্পাদনের নিমিত্ত যত প্রকার বিদ্যার উন্নতি হওয়া আবশ্যক প্রাচীন আর্য্যজাতি সেই সকল বিদ্যার পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কি ভাষার উন্নতি আর কি ভাবের উন্নতি; কি শিল্পকলার উন্নতি আর কি সঙ্গীতের উন্নতি; কি জ্ঞানের উন্নতি আর কি বিজ্ঞানের উন্নতি; কি শারীরিক রোগবিজ্ঞানরূপী চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতি আর কি ভবরোগ বিজ্ঞানরূপী অধ্যাত্ম শাস্ত্রের উন্নতি; কি বাণিজ্যাদি দ্বারা ধনের উন্নতি আর কি সর্ব্বত্র গমনাগমন পূর্ব্বক ব্যবহারিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার উন্নতি সকল বিষয়েই আর্য্যজাতি উন্নতির পূর্ণতা লাভ করিয়াছিলেন, একথা আজকাল ঐতিহাসিক পাশ্চাত্য ও এতদ্দেশীয় সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন। নিম্নে এই সকল বিষয় পৃথক পৃথক রূপে সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে।

পৃথিবীর অন্যান্য সমুদায় ভাষার নাম ভাষা, কিন্তু একমাত্র আর্য্য ভাষারই নাম সংস্কৃত। সংস্কৃতের ন্যায় মধুর, উন্নত, পূর্ণ ও হৃদয় গ্রাহী ভাষা পৃথিবীতে আর কোথাও নাই। অন্যান্য ভাষার মাধুর্য্য উপলব্ধি অর্থবোধ হইলে পর হয় কিন্তু কেবল সংস্কৃত ভাষাতেই এই অপূর্ব্বতা দেখা যায় যে, অর্থবোধ হউক চাই না হউক শ্রবণ মাত্রেই শ্রবণ-মন পরিতৃপ্ত হইয়া যায়। অন্য দেশের ভাষা ও অক্ষর কল্পনা দ্বারা গঠিত কিন্তু সংস্কৃত ভাষা সৃষ্টিকারিণী প্রকৃতি-শক্তির স্পন্দন হইতে স্বভাবত বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। ভাষা ভাবের দ্যোতক। অন্য দেশের ভাষায় মানব-প্রকৃতির সকল প্রকার ভাব বিকাশ করিবার শক্তি নাই। কেবল সংস্কৃত ভাষাই মানব-প্রকৃতির সকল রকম ভাব পূর্ণরূপে প্রকাশিত করিতে সমর্থ। সংস্কৃত ভাষার অলঙ্কার ও ব্যাকরণ জগতে অতুলনীয়। সংস্কৃতের পদ্যময়ী কবিতাশক্তি কখনও রণরঙ্গিনী শ্যামার ন্যায় অসুর দলন করে আবার কখনও লবকুশের সুমধুর কণ্ঠ হইতে সুধাধারার বর্ষণ করায়; রাজগিরিতে বিরহী যক্ষের দৌত্যকার্য্য করে এবং কখনও চক্রবাক চক্রবাকীর কণ্ঠে বিরহ সঙ্গীতের স্রোত প্রবাহিত করে; কখনও মন্দাকিনীর অমৃত সলিলে অবগাহন করিয়া কল্পতরুর ছায়ায় বিশ্রাম লাভ করে কখনও বা ঋষি পত্নী-গণের সঙ্গে লতাকুঞ্জে জলসিঞ্চন করে; কখনও বেদব্যাসের চিত্ত-ক্ষেত্রে

জগৎকল্যাণ চিন্তার উত্তাল তরঙ্গ উত্তোলন করে আবার কখনও বাল্মীকির বীণায় ভুবনমোহন অনন্তরাগ-প্রবাহ প্রবাহিত করে। সংস্কৃতের এই পদ্মময়ী কবিতাশক্তি, সংস্কৃতের শব্দবহুলতা, সংস্কৃত অভিধানের পূর্ণতা প্রভৃতি ভাষাসম্পদ প্রাচীন আর্য্যজাতির অপার করুণার ফল। অন্যান্য দেশের ভাষা সংস্কৃত ভাষার সম্মুখে শিশুর ন্যায় প্রতীয়মান হয়। দুর্ভাগ্য ভারতবাসী সংস্কৃতের এই গৌরব-মহিমা বিস্মৃত হইলেও গুণগ্রাহী পাশ্চাত্য জাতিবৃন্দ শতমুখে ইহার প্রশংসা করিয়া থাকেন।

সংস্কৃত ভাষার লিখন প্রণালীও এরূপ সংস্কৃত ও উন্নত যে বিচক্ষণ ব্যক্তি সামান্য বিচারেই বুঝিতে পারিবেন যে পৃথিবীতে যদি কোন সম্পূর্ণ লিখন প্রণালী থাকে তবে সে দেবনাগরী লিখন প্রণালী। সকল ভাষার শব্দ এই সকল অক্ষরের দ্বারা লিখিত হইতে পারে কিন্তু জগতে এমন কোন ভাষা নাই যাহার অক্ষর সংস্কৃতের যাবতীয় শব্দ যথাযথরূপে লিখিতে পারে। সংস্কৃতের এই পূর্ণতা ব্যতীত ইহার আর একটী বিশেষত্ব এই যে এই ভাষা জগতের অন্যান্য সমস্ত ভাষার জননী। বিশেষ প্রশংসনীয় বিষয় এই যে সংস্কৃতের সর্ব্বপ্রাচীনত্বে কোন দেশের কোন পণ্ডিত সন্দেহ করেন না। ভাষায় আর সমাজে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান। যে জাতির ভাষা এত উন্নত হইয়াছিল তাহার সমাজ বন্ধন অতিশয় দৃঢ় ও সমুন্নত ছিল এ বিষযে কোনই সন্দেহ নাই। জীব সমাজের প্রথম বন্ধন স্ত্রীপুরুষের পারস্পরিক সম্বন্ধ। উহাদের মধ্যে পরস্পর কিরূপ ব্যবহার হওয়া উচিত তাহা কামশাস্ত্রে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে। এই শাস্ত্রের বাৎস্যায়ন প্রভৃতি প্রধান আচার্য্যগণের গ্রন্থ পাঠ করিলে জানা যায় যে আর্য্যজাতি এই বিদ্যার উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পুরুষ ও স্ত্রীর কত প্রকার ভেদ, ঐ সকল ভেদের কি কি লক্ষণ, কিরূপ পুরুষের সহিত কিরূপ স্ত্রীর সম্বন্ধ হওয়া উচিত, স্ত্রীপুরুষের পারস্পরিক সম্বন্ধ কিরূপভাবে নির্ব্বাহিত হইলে ইহলোকে সুখ ও পরলোকে শান্তি লাভ করা যায়, কি উপায়ে উত্তম সন্তান উৎপন্ন হইতে পারে এবং কি প্রকারে একাধারে ধর্ম্ম ও কাম যুগপৎ প্রাপ্ত হওয়া যায় ইত্যাদি গভীর বিচার সমূহ এই শাস্ত্রে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। যদিও নব্য ইয়ুরোপ আজকাল বহির্জগতের স্থূল উন্নতির মোহে মুগ্ধ হইয়া জগতে আপনার সমান আর কাহাকেও মনে করে না তথাপি জার্ম্মানী,

আমেরিকা, ইংলণ্ড ও ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের বিদ্বানগণ মহর্ষি বাৎস্যায়নাদি প্রণীত গ্রন্থ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। সমাজগঠন সম্বন্ধে আর্য্যজাতি যতদূর উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন আজপর্য্যন্ত পৃথিবীর কোন জাতি সেরূপ উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। নদী স্রোতের অনুকূলে যদি বায়ু প্রবাহিত হয় তবে নৌকা যত শীঘ্র গন্তব্যস্থানে পঁহুছিতে পারে আর কোন উপায়ে তত শীঘ্র পারে না। ভারতের দিব্য ও পূর্ণ প্রকৃতি দ্বারা ভারতবাসীগণের প্রকৃতি স্বভাবতই পূর্ণ ছিল, উপরন্তু আর্য্যদিগের অসাধারণ তপস্যা ও যোগযুক্ত বুদ্ধির সহায়তা ছিল। উভয় অনুকূলতা একত্র মিলিত হইয়া ভারতবাসীগণের সামাজিকতা ও মনুষ্যত্বকে পূর্ণতার চরম সীমায় পঁহুছাইয়া দিয়াছিল। এই জন্য আর্য্যজাতির সমাজপদ্ধতি মানব জীবনের পূর্ণতা অর্থাৎ মুক্তির উপযোগীরূপে গঠিত হইয়াছিল। আর্য্যজাতির সদাচার, আর্য্যজাতির চাতুর্বর্ণ্যবিধি, আর্য্যজাতির আশ্রম চতুষ্টয়ের ব্যবস্থা, আর্য্যজাতির শিক্ষা ও দীক্ষা কৌশল, আর্য্যজাতির পিতৃমাতৃ ভক্তি, ভ্রাতৃপ্রেম, দাম্পত্যবন্ধনের দৃঢ়তা, সন্তানবাৎসল্য, অতিথিবেসা ও জীবরক্ষা প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলী এবং আর্য্যনারীগণের ত্রিলোকপবিত্রকারী সতীত্ব ধর্ম্ম প্রভৃতিই আর্য্যজাতির সমাজকৌশলের শ্রেষ্ঠতার পরিচায়ক। ইহা ভারতের প্রাচীন সমাজবিজ্ঞানেরই ফল যে, এস্থানের ব্রাহ্মণগণ জ্ঞানের এতদূর উন্নত অবস্থায় উপনীত হইয়াছিলেন যে তাঁহাদের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া আজ জগতে সমুন্নত জাতিবৃন্দ জ্ঞানরাজ্যে বিচরণ করিতেছেন। ইহা ভারতের প্রাচীন সমাজ বিজ্ঞানেরই ফল যে, এখানে শ্রীরামচন্দ্র, ভীম, অর্জ্জুন প্রভৃতি বীরগণ উৎপন্ন হইয়া লক্ষ লক্ষ বৎসর সমগ্র পৃথিবীতে আপনাদের অধিকার অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। ইহা ভারতের প্রাচীন সমাজবিজ্ঞানেরই ফল যে, এদেশের বৈশ্যগণের বাণিজ্য ও শূদ্রদের শিল্পকলার উন্নতিতে পৃথিবীর মধ্যে ভারত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সমৃদ্ধিশালী দেশ বলিয়া পরিগণিত হইত। আজকাল নব্য বৈজ্ঞানিকগণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছেন যে, ভারতের সমাজ বন্ধন, বর্ণবিভাগ ও বিবাহ-পদ্ধতি (যেমন স্বগোত্রা কন্যার সহিত বিবাহ না হওয়া, পাত্রের বয়স কন্যার বয়স অপেক্ষা কম না হওয়া, অসবর্ণ বিবাহ না করা, ধর্ম্মনীতির অধীন হইয়া স্ত্রীসহবাস করা ইত্যাদি) প্রভৃতি সুশৃঙ্খলার ফলেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন আর্য্যজাতি আজ পর্য্যন্তও পৃথিবীতে বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রাচীন

গ্রীকজাতি, ইজিপ্সিয়ান জাতি, ব্যবিলোনিয়ান জাতি ও রোমান জাতি প্রভৃতি কত প্রবল প্রতাপান্বিত জাতিরই নাম ইতিহাসে পাওয়া যায় কিন্তু আজকাল ঐ সকল জাতির নাম ব্যতিরেকে আর কোন চিহ্নই জগতে বিদ্যমান নাই। সামান্য বিপ্লবেই এই সকল জাতি সংসার হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহা আদি আর্য্যজাতির সমাজ বন্ধনেরই ফল যে, অগণিত মহাবিপ্লব সহ্য করিয়াও ঐ জাতি অমর রহিয়াছে। এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে আমাদের বেদোক্ত 'ধর্ম্ম' যে প্রকার সার্ব্বভৌম ভাবে ব্যবহৃত হয় তদনুসারে যেমন আমাদের 'ধর্ম্ম' শব্দের সহিত পাশ্চাত্য 'রিলিজিয়ন' (Religion) শব্দের একার্থতা হইতে পারে না সেইরূপ আমাদের 'আর্য্য' শব্দের সহিত পাশ্চাত্য 'এরিয়ন' (Arian) শব্দের কোন সম্বন্ধ নাই। এই উভয় শব্দই ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা আর্য্যজাতির সমাজ বিজ্ঞানেরই ফল যে, এই দেশে শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় রাজা, রাজর্ষি জনকের ন্যায় সদ্‌গৃহস্থ, সীতা ও সাবিত্রীর ন্যায় কুলকামিনী, ধ্রুবের ন্যায় বালক, মহর্ষি বেদব্যাসের ন্যায় গ্রন্থ রচয়িতা, রাজর্ষি মনুর ন্যায় বক্তা, শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় উপদেষ্টা, সিদ্ধশ্রেষ্ঠ কপিলের ন্যায় সাধক এবং পরমহংস শুকদেবের ন্যায় জ্ঞানী উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

বৈদিক যুগে তাড়িৎ বিজ্ঞান ও যোগ বিজ্ঞানের যে পরিমাণ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল সে সম্বন্ধে আজকাল লোকে চিন্তা করিয়া বিস্মিত হইতেছে। উন্নতিশীল পাশ্চাত্য বিদ্বানগণ যদিও ঐ সমস্ত ক্রমশঃ স্বীকার করিতেছেন তথাপি উহার কারণ অন্বেষণ করিতে যাইয়া তাঁহারাও বিমুগ্ধ হইয়া পড়িতেছেন। প্রাচীন আর্য্যজাতির ভোজন, শয়ন, উঠা, বসা, চলা, ফিরা, জল, স্থল এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রাপক যাবতীয় কার্য্যে এই তাড়িৎ বিজ্ঞানের অদ্ভুত সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। মহাবলী রাবণ যে দুর্জ্জয় শক্তিশেল দ্বারা সুমিত্রা নন্দন লক্ষ্মণকে জড়বৎ স্পন্দরহিত করিয়া দিয়াছিলেন তাহা তাড়িৎ বিজ্ঞানের উন্নতিরই প্রমাণ। বাণে বিদ্যুৎশক্তি অনুপ্রবিষ্ট করাইবার প্রক্রিয়া আজ পর্য্যন্তও ইয়ুরোপীয় বিদ্বানগণ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন নাই। নাগপাশ, শক্তিশেল, সম্মোহন-অস্ত্র প্রভৃতি যত প্রকার চমৎকার-শক্তি-যুক্ত অস্ত্র আর্য্যেরা যুদ্ধে ব্যবহার করিতেন সে সমস্ত তাড়িৎ বিজ্ঞানের সাহায্যেই নির্ম্মিত হইত।

দেবমন্দিরের উপর অষ্টধাতুচক্র ও ত্রিশূলাদি রক্ষার যে বিধি. দৃষ্ট হয় তাহা তাড়িৎ বিজ্ঞানের উন্নতিরই চিহ্ন। উত্তর দিকে মাথা রাখিয়া শয়ন না করা, নূতন অপক্ক ফলের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ না করা, নিম্ন বর্ণের স্পৃষ্ট অন্ন ভোজন না করা, চৈল, অজিন, কুশ ও কম্বলের আসনে বসিয়া উপাসনা করা, সৌভাগ্যবতী রমণীগণকে স্বর্ণময় অলঙ্কার ধারণ করিবার আদেশ দেওয়া এবং বিধবাগণকে না দেওয়া—এ সকল নিয়ম তাড়িৎ বিজ্ঞানের উন্নতিরই পরিচায়ক। আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করিয়াছে যে অষ্টধাতু বজ্রপাতের নিবারক। এই জন্যই মন্দিরের চূড়ায় উহা সংস্থাপিত হইত। সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে যে বিদ্যুৎশক্তির ধারা প্রবাহিত হইয়া থাকে তাহার গতি দক্ষিণ দিক্ হইতে উত্তরের দিকে। এই জন্য জাহাজের কম্পাসে দেখা যায় যে মধ্যস্থ চুম্বকের কাঁটা সর্ব্বদা উত্তরের দিকে আকৃষ্ট থাকে। সুতরাং উত্তরের দিকে মাথা রাখিয়া শয়ন করিলে ঐ পার্থিব বিদ্যুৎ শক্তি পায়ের দিক হইতে মাথার দিকে প্রবাহিত হইবে। উহাতে বিদ্যুতের তেজে মাথাধরা ও অন্য প্রকার মস্তিষ্কের ব্যাধি জন্মিতে পারে এবং শরীরের স্নায়ুগুলির মধ্যেও নানারূপ চাঞ্চল্য উপস্থিত হইতে পারে। প্রথমতঃ, সমস্ত দিনের পরিশ্রমে স্নায়ু ও মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তাহাতেই নিদ্রার আবেশ হয়, উপরন্তু নিদ্রাকালে ঐ গুলি আরও শিথিল হইয়া থাকে। সুতরাং ঐ সময় ঐরূপ বৈদ্যুতিক শক্তির আঘাত পাইলে শরীরে নানাপ্রকার রোগ হওয়া স্বাভাবিক। এই সব দেখিয়াই উত্তর শিয়রে শয়ন করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। দক্ষিণ দিকে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিলে ঐ বিদ্যুৎ প্রবাহ মস্তক হইতে পায়ের দিকে প্রবাহিত হইয়া যাইবে। উহাতে কোনরূপ অসুবিধা বা রোগোৎপত্তির সম্ভাবনা থাকিবে না। কচি ফলের প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিলে শরীরস্থ তাড়িৎ প্রবাহ অঙ্গুলীর ভিতর দিয়া ফলে যাইয়া প্রতিহত হয়, তাহাতে ফল অপক্ক অবস্থাতেই বিনষ্ট হইয়া যায়। চণ্ডালাদি নিম্ন বর্ণের লোকের মধ্যে তমোগুণ অধিক থাকায় তাহার স্পৃষ্ট অন্ন তাহার দূষিত তড়িৎ দ্বারা দোষযুক্ত হইয়া যায়, এই জন্য ঐরূপ দূষিত অন্ন শ্রেষ্ঠ তড়িৎযুক্ত ব্রাহ্মণাদির দেহের পক্ষে অত্যন্ত অপকারী। ধরিত্রী প্রতিনিয়ত জীবদেহের তাড়িৎ শক্তি আকর্ষণ করিতেছে। উপাসনা করিবার সময় শরীরে সাত্ত্বিক তড়িৎ বৃদ্ধি হওয়া স্বাভাবিক। ভূমিতে বসিয়া উপাসনা করিলে

পৃথিবীর আকর্ষণে শরীরের ঐ সাত্ত্বিক তাড়িৎ শক্তি বিনষ্ট হইয়া যাইতে পারে। চৈল, অজিন, কুশ ও কম্বলে তড়িৎ প্রবাহিত হয় না। (উহারা Nonconductor)। এই নিমিত্ত উহাদের উপর বসিয়া সাধন করিলে সাধকের কোন ক্ষতি হয় না। সুবর্ণাদি ধাতু তাড়িৎ শক্তি বৃদ্ধি করে। তাড়িৎ শক্তি বৃদ্ধি হইলে শারীরিক ইন্দ্রিয়াদির বিশেষ স্ফূর্ত্তি হয় এবং তাহাতেই রমণীগণ সুসন্তান উৎপন্ন করিতে সমর্থ হন। এই জন্য আর্য্য সদাচারের মধ্যে সধবাগণের অলঙ্কার ধারণ করা ও বিধবাগণের না করার বিধান হইয়াছে। তাড়িৎ-বিজ্ঞান পূর্ণ এ সমস্ত আচারের কথা শুনিয়া সাধারণ ব্যক্তিও বুঝিতে পারে যে প্রাচীন আর্য্যগণ এই সূক্ষ্ম বিজ্ঞান বিষয়ে কিরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন।

যোগ বিজ্ঞানের মোক্ষ প্রাপক শক্তি অবিসম্বাদিত। ইহা ব্যতীত যোগ প্রক্রিয়ার অন্যান্য ভৌতিক শক্তিও জগতে প্রসিদ্ধ। যোগ শক্তি দ্বারা মেঘ, বায়ু ও অগ্নি প্রভৃতি স্তম্ভন, শূন্য মার্গে বিচরণ, শরীরকে ইচ্ছামত লঘু অথবা ভারী করা, প্রস্তর ও মৃত্তিকাদি কঠিন পদার্থে প্রবিষ্ট হওয়া, দূরের দৃশ্য দেখা বা কথা শুনা, দীর্ঘ আয়ু লাভ করা, ইচ্ছামৃত্যু হওয়া, ক্ষুধা তৃষ্ণা জয় করা এবং গ্রহোপগ্রহাদি অথবা কোন ব্যক্তির ভবিষ্যৎ প্রারব্ধে সংযম করিয়া তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা প্রভৃতি নানাপ্রকার ভগবদ্বিভূতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইরূপ শক্তি মনুষ্য কি উপায়ে লাভ করিতে পারে তাহা বেদ ও যোগসম্বন্ধীয় শাস্ত্র সমূহে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে। ডাক্তার পল (Dr. Paul) সাহেব নিজ যোগ-বিজ্ঞান নামক গ্রন্থে বৈজ্ঞানিক যুক্তি দ্বারা পূর্ণরূপে প্রমাণিত করিয়া দেখাইয়াছেন যে প্রাণায়াম সাধন করিলে কি প্রকারে যোগীগণ দীর্ঘায়ু লাভ ও পঞ্চভূত জয় করিতে পারিতেন। তিনি তাঁহার পুস্তকে অষ্টাঙ্গ যোগের বিশেষ প্রশংসা করিয়া যোগের আঠ অঙ্গের যোগ্যতা ও অদ্ভুত অলৌকিক শক্তির বর্ণন করিয়াছেন।

প্রত্যক্ষ প্রমাণে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। যোগীবর হরিদাসের অনেক অলৌকিক যোগ সিদ্ধির কথা শুনিয়া তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত অনেক ইয়ুরোপীয় সভ্যের অনুরোধে উক্ত যোগীকে পাঞ্জাব কেশরী মহারাজা রণজিৎ সিংহের সভায় আনা হইয়াছিল।

জন্মান্তর-তত্ত্ব।

[স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

জীবের গতি।

মাতৃভুক্ত অন্ন-পানাদির দ্বারা উহার ধাতু পুষ্ট হইতে থাকে। বিষ্ঠামূত্রপূর্ণ জীবের উৎপত্তি স্থান গর্ভরূপ গর্ত্তে অনিচ্ছাসত্ত্বেও জীবকে এইরূপে পড়িয়া থাকিতে হয়। উহার কোমল শরীর তত্রত্য ক্ষুধাক্ষাম কৃমিকীটাদির দ্বারা পুনঃ পুনঃ দষ্ট হয়। ইহাতে গর্ভস্থ শিশু কষ্ট পাইয়া ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিত হইতে থাকে। মাতৃভক্ষিত কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, লবণ, ক্ষার ও অম্ল আদি রসযুক্ত পদার্থের সংযোগে তাহার সর্ব্বাঙ্গে বেদনার উৎপত্তি হইয়া থাকে। জীব গর্ভচর্ম্ম এবং অন্ত্র সমূহের দ্বারা চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত হইয়া কুক্ষিদেশে মস্তক রাখিয়া অতিকষ্টে পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় গর্ভপিঞ্জরে নিবাস করে। স্বল্প-পরিমিত গর্ভাশয়ে তাহার সচ্ছন্দে হস্তপদ সঞ্চালনেরও উপায় থাকে না। এই সময়ে দৈববশে পূর্ব্বকর্ম্মের স্মৃতি জীবের হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। তখন সে অনেক জন্মের মন্দকর্ম্ম স্মরণ করিয়া ব্যথিত ও অশান্তচিত্ত হইয়া পড়ে। সপ্তমমাসে লব্ধজ্ঞান হওয়া সত্ত্বেও গর্ভস্থ কৃমির মত প্রসববায়ু প্রকম্পিত হইয়া জীব স্থান হইতে স্থানান্তরে চালিত হয়। এইরূপ ভীষণ ক্লেশের মধ্যে থাকিয়া জীবের পূর্ব্বজন্মের সকল কথা মনে পড়ে যথা গর্ভোপনিষদে—

পূর্ব্বজাতিং স্মরতি, শুভাশুভং কর্ম্ম বিন্দতি।

পূর্ব্বজন্মে কোথায় নিবাস ছিল, কোন্ কোন্ শুভাশুভ কর্ম্মের ফলে কোথায় কিরূপ গর্ভে জন্ম হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে কিরূপ সুখদুঃখাদি ভোগ করিতে হইবে এ সকল স্মৃতিই জীবের অন্তঃকরণে জাগরূক হয়। এই অবস্থায় বিষণ্ণ জীব গর্ভের মধ্যে বড়ই অনুতাপ করিয়া থাকে। যদি পূর্ব্বজন্ম উত্তম হওয়া সত্ত্বেও কুসঙ্গাদি বশে তাহার দ্বারা পাপাচরণ হইয়া থাকে এবং সেই পাপের ফলে তাহাকে পাপময় কুগর্ভে আসিতে হইয়া থাকে তবে গর্ভস্থ জীবের অনুতাপের আর সীমা থাকে না। "অহো! কি ভীষণ পাপের ফলে দুরত্যয় কর্ম্মস্রোতে প্রবাহিত হইয়া পরাধীনের মত আমাকে এই প্রত্যক্ষ রৌরবরূপ গর্ভে আসিতে হইল! আমি পূর্ব্বজন্মে ব্রাহ্মণ ছিলাম, কিন্তু ব্রাহ্মণের মত আচরণ না করিয়া কুসঙ্গবশে অনেক পাপাচরণ করিয়াছিলাম। এবং সেই সকল পাপের ফলেই আমাকে এই

চণ্ডালিনীর গর্ভে আসিতে হইয়াছে। এই নীচজাতীয়া স্ত্রী কদর্য্য তামসিক অন্ন ভক্ষণ করিতেছে, ইহার ভুক্ত অন্ন দ্বারা আমার শরীর পুষ্ট হইতেছে, এজন্য এই জন্মে চণ্ডালযোনি অবশ্যই আমাকে পাইতে হইবে এবং তামসিক অন্নের দ্বারা তামসিক মতি হইয়া আমার অধিকতর পাপাচারে প্রবৃত্তি হইবে, যাহার ফলে আগামী জন্মে আমাকে পশুযোনি অবশ্যই প্রাপ্ত হইতে হইবে। হায়! যৌবনের মদে উন্মত্ত হইয়া শাস্ত্রোপদেশের অবমাননা করত আমি কতই প্রমাদ করিয়াছি, পাপপুণ্যের বিচার না করিয়া কত নরহত্যা করিয়াছি, এই সকল হত্যাপাপের ফলে আমাকে নানারোগাক্রান্ত এবং অল্পায়ু হইতে হইবে। যাহাদিগকে গত জন্মে হত্যা করিয়াছি তাহারা কৃতান্তের মত এই জন্মে আমাকেও যন্ত্রণা দিয়া বধ করিবে। কামোন্মাদে কতই ভ্রূণহত্যা, শিশুহত্যা করিয়াছি এজন্য গর্ভের মধ্যেই অথবা গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হওয়া মাত্র আমার প্রাণ যাইবে। আমার পতিব্রতা স্ত্রীর অবমাননা করিয়া পরস্ত্রীতে আসক্ত হইয়াছি, এই পাপে আমি দাম্পত্য প্রেম চ্যুত হইয়া অনেক কষ্ট পাইব, আমার সংসার শ্মশান হইবে, স্ত্রী পিশাচিনীর মত ঐ শ্মশানে আমাকে দুঃখ দিয়া নৃত্য করিবে। লক্ষ লক্ষ টাকা আমার নিকট থাকিলেও সৎকার্য্যে ও সৎপাত্রে ব্যয় করি নাই, বুভুক্ষুকে অন্ন দিই নাই, পিপাসার্ত্তকে জল দিই নাই, দরিদ্রের করুণ রোদন আমার পাষাণ হৃদয়কে বিগলিত করিতে সমর্থ হয় নাই, আমি সমস্ত সম্পত্তি ব্যভিচার, ব্যসন ও মদ্যপানে নষ্ট করিয়াছি, এই সকল কুকর্ম্মের ফলে এজন্মে আমায় ভিখারীর ঘরে উৎপন্ন হইয়া হা অন্ন, হা অন্ন, করিয়া দুর্ভিক্ষের করাল কবলে কবলিত হইতে হইবে। শরীর থাকিতে এ সকল বিষয়ে আমার জ্ঞান ছিল না। এখন নিজের চক্ষের সমক্ষে সমস্ত ঘটনা সত্যরূপে প্রতিভাত হইতেছে।" এইরূপে গর্ভস্থ জীব পূর্ব্ব কর্ম্ম স্মরণ করত অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে থাকে এবং নিরুপায় হইয়া দীনশরণ মধুসূদনের চরণকমলে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করে।

যথা ভাগবতে—

নাথমান ঋষির্ভীতঃ সপ্তবধ্রিঃ কৃতাঞ্জলিঃ।
স্তুবীত তং বিক্লবয়া বাচা যেনোদরেঽর্পিতঃ॥

গর্ভদুঃখসন্তপ্ত, পুনর্গর্ভবাসভীত, সপ্তধাতুরূপ সপ্তবন্ধনবদ্ধ জীব কৃতাঞ্জলি হইয়া যিনি তাহাকে গর্ভবাসদুঃখ দিয়াছেন সেই ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে, যথা গর্ভোপনিষদে—

পূর্ব্বযোনিসহস্রাণি দৃষ্ট্বা চৈব ততো ময়া।
আহারা বিবিধা ভুক্তাঃ পীতা নানাবিধাঃ স্তনাঃ॥
জাতশ্চৈব মৃতশ্চৈব জন্ম চৈব পুনঃ পুনঃ।
যন্ময়া পরিজনস্যার্থে কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্॥
একাকী তেন দহ্যেঽহং গতাস্তে ফলভোগিনঃ।
অহো দুঃখোদধৌ মগ্ন ন পশ্যামি প্রতিক্রিয়াম্॥
যদি যোন্যাঃ প্রমুচ্যেঽহং তং প্রপদ্যে মহেশ্বরম্।
অশুভক্ষয়কর্ত্তারং ফলমুক্তিপ্রদায়কম্॥
যদি যোন্যাঃ প্রমুচ্যেঽহং তং প্রপদ্যে নারায়ণম্।
অশুভক্ষয়কর্ত্তারং ফলমুক্তিপ্রদায়কম্॥
যদি যোন্যাঃ প্রমুচ্যেঽহং তৎ সাংখ্যযোগমভ্যসে।
অশুভক্ষয়কর্ত্তারং ফলমুক্তিপ্রদায়কম্॥
যদি যোন্যাঃ প্রমুচ্যেঽহং ধ্যায়ে ব্রহ্ম সনাতনম্॥

আমার ইতিপূর্ব্বে সহস্র সহস্র জন্ম হইয়াছে, কতপ্রকার আহার এবং কত মাতার স্তনপান করিয়াছি। কতবার জন্মিয়াছি, মরিয়াছি, আবার জন্মগ্রহণ করিয়াছি। যে সকল পরিজনের জন্য শুভাশুভের অনুষ্ঠান করিয়াছি, তাহারা কেহই আমার সঙ্গে আসে নাই, সকল কর্ম্মের ভার আমার উপরেই পড়িয়াছে। আমি একাকীই কর্ম্মফলে দুঃখানলে দগ্ধ হইতেছি। অহো! আমার দুঃখসাগরের অন্ত নাই, উদ্ধারের কোন উপায়ও দেখিতেছি না। হে মহেশ্বর! এবার গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে আর তোমাকে ভুলিব না, তোমারই রাতুল চরণের শরণ লইয়া দুরিতক্ষয় ও মোক্ষোদয়ের জন্য যত্ন করিব। হে নারায়ণ! এবার আমায় গর্ভদুঃখ হইতে ত্রাণ কর। তাহা হইলে আর বিষয়মদে মত্ত হইয়া তোমায় ভুলিব না। তোমারই চরণ সরোরুহে মনোভৃঙ্গকে নিশিদিন নিমগ্ন রাখিব। তুমিই আমার অশুভক্ষয়পূর্ব্বক মুক্তিফল দান করিবে। এবার গর্ভক্লেশমুক্ত হইয়া অবশ্যই ব্রহ্মধ্যান এবং জ্ঞান যোগের আশ্রয় গ্রহণ করিব। ইহাতে পাপনাশ এবং নিঃশ্রেয়স পদের উদয় হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতে গর্ভস্থ জীবের দুঃখ ও প্রার্থনা সম্বন্ধে বিশেষ বর্ণন আছে যথা—

তস্যোপসন্নমবিতুং জগদিচ্ছয়াত্ত-
নানাতনোর্ভুবি চলচ্চরণারবিন্দম্।

সোঽহং ব্রজামি শরণং হ্যকুতোভয়ং মে
যেনেদৃশী গতিরদর্শ্যসতোঽনুরূপা ॥
দেহ্যন্যদেহবিবরে জঠরাগ্নিনাসৃগ্-
বিন্মূত্রকূপপতিতো ভৃশতপ্তদেহঃ।
ইচ্ছন্নিতো বিবসিতুং গণয়ন্ স্বমাসান্
নির্ব্বাস্যতে কৃপণধীর্ভগবন্ কদা নু ॥
তস্মাদহং বিগতবিক্লব উদ্ধরিষ্যে-
আত্মানমাশু তমসঃ সুহৃদাত্মনৈব।
ভূয়ো যথা ব্যসনমেতদনেকরন্ধ্রং
মা মে ভবিষ্যদুপসাদিতবিষ্ণুপাদঃ ॥

হে ভগবন্! নিরাশ্রয় ভোগমুগ্ধ জগজ্জনের প্রতি কৃপা করিয়া তাহাদের উদ্ধারের নিমিত্ত যুগে যুগে তুমি অবতার ধারণ করিয়া থাক। আমি নিজের মন্দকর্ম্মের ফলে দুঃসহ গর্ভবাসদুঃখে মগ্ন হইয়া অনন্যশরণ তোমার শরণ লইতেছি, আমায় উদ্ধার কর। রক্তবিষ্ঠামূত্রপরিপূর্ণ এই গর্ভগর্ত্তে নিপতিত হইয়া কবে এই দুঃখের আগার হইতে নিস্তার লাভ করিতে পারি সেই আশায় দিন গণিতেছি। এবার এই কারাগার হইতে মুক্ত হইতে পারিলে আর সংসারজালে বদ্ধ হইব না, আত্মার দ্বারা অবশ্যই আত্মার উদ্ধার করিব এবং ব্রহ্মপদলাভ করিয়া জননমরণ চক্র হইতে নিস্তারলাভ করিব। এইরূপে প্রার্থনা করিতে করিতে যখন দশমাস পূর্ণ হয় তখনই জীব গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পড়ে, যথা ভাগবতে—

এবং কৃতমতির্গর্ব্ভে দশমাস্যঃ স্তবন্নৃষিঃ।
সদ্যঃ ক্ষিপত্যবাচীনং প্রসূত্যৈ সূতিমারুতঃ ॥
তেনাবসৃষ্টঃ সহসা কৃত্বা বাক্‌শিরআতুরঃ।
বিনিষ্ক্রামতি কৃচ্ছ্রেণ নিরুচ্ছ্বাসো হৃতস্মৃতিঃ ॥
পতিতো ভুব্যসৃঙ্‌মিশ্রো বিষ্ঠাভূরিব চেষ্টতে।
রোরূয়তি গতে জ্ঞানে বিপরীতাং গতিং গতঃ ॥

এইরূপে প্রসবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত গর্ত্তে থাকিয়া শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে করিতে একদিন হঠাৎ প্রসব বায়ু প্রবল হইয়া গর্ভস্থ শিশুকে চালিত করত উর্দ্ধপদ নিম্নমুখ করিয়া দেয় এবং ঐ বায়ুর পীড়নে শিশু ঐ প্রকারেই উর্দ্ধপদ নিম্নমুখে গর্ত্ত হইতে বহির্গত হয়। সে সময় যোনিযন্ত্রের দ্বারা অত্যন্ত

নিপ্পেষিত হইয়া ভীষণ ক্লেশের সহিত তাহাকে বাহির হইতে হয়। এই ক্লেশে সে হতস্মৃতি হইয়া যায়। রক্তাক্ত কলেবর জীব ভূমিতে পতিত হইয়া বিষ্ঠাক্রমির মত নড়িতে থাকে এবং গর্ভের সমস্ত জ্ঞান বিস্মৃত হইয়া এইপ্রকার বিপরীত গতি প্রাপ্ত হওয়ার দরুণ বিকলান্তঃকরণ হইয়া রোদন করিতে থাকে। যথা গর্ভোপনিষদে—

অথ যোনিদ্বারং সম্প্রাপ্তো যন্ত্রেণাপীড্যমানো মহতা দুঃখেন জাতমাত্রস্তু বৈষ্ণবেন বায়ুনা সংস্পৃষ্টস্তদা ন স্মরতি জন্মমরণানি ন চ কর্ম্ম শুভাশুভং বিন্দতি।

প্রসববায়ু দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া যোনিদ্বারে আসামাত্র যোনিযন্ত্রের দ্বারা অত্যন্ত পীড়নের সহিত ভূমিষ্ঠ হইয়াই জীব বৈষ্ণবী মায়াদ্বারা সংস্পৃষ্ট হয় এবং তাহাতেই জীবের গর্ভের সমস্ত স্মৃতি নষ্ট হয় এবং পূর্ব্ব জন্মের ও ভবিষ্যৎ কালের সমস্ত বিষয় বিস্মৃতির অতল জলে ডুবিয়া যায়। সংসারে প্রায়ই দেখা যায় যে কঠিন রোগ বা অন্যপ্রকারে কঠিন ক্লেশ প্রাপ্ত হইলে মনুষ্য অতীত ঘটনা ভুলিয়া গিয়া থাকে এবং আগামী নবীন নবীন ঘটনাবলীর নবীন সংস্কার যতই চিত্তের উপরিদেশকে আচ্ছন্ন করে ততই অতীত ঘটনাসমূহ অন্তঃকরণের গভীর তলদেশে প্রচ্ছন্ন হইয়া যায়। ঠিক এই কারণে গর্ভাশয় হইতে নির্গত হইবার কালীন দারুণ দুঃখ এবং নবীন দৃশ্যজগতের নবীন বস্তু প্রাপ্ত হইয়া জীব গর্ভের সব কথা ভুলিয়া যায়। যে মোহিনী বৈষ্ণবীমায়া নিখিলবিশ্বকে বিমোহিত করিয়া রাখিয়াছে তাহার তমোময় আবরণ গর্ভচ্যুত হইবামাত্র জীবের অন্তঃকরণকে আবৃত করে এবং তাহাতেই জীব পূর্ব্বজন্মের, গর্ভবাসের এবং ভবিষ্যতের কোন বিষয়ই স্মরণ করিতে পারে না। কেবল যে সকল ধীর যোগী প্রসবকালীন সন্ধির সময় ধৈর্য্যের সহিত প্রসব যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারেন, উহাতে অভিভূত হইয়া পড়েন না এবং যাঁহাদের উপর বৈষ্ণবী মায়ার বিশেষ প্রভাব নাই, তাঁহারাই গর্ভের কথা ও জন্মজন্মান্তরের কথা মনে রাখিতে পারেন। এই সকল যোগীকে 'জাতিস্মর' বলে। এইপ্রকার মহাপুরুষ ভিন্ন সকলকেই মহামায়ার মোহে আচ্ছন্ন হইতে হয়। জীব এইরূপে মোহাচ্ছন্ন হইয়া সব ভুলিয়া আবার মনে করে যে সে নূতনই সংসারে আসিয়াছে, সবই তাহার পক্ষে নূতন বস্তু, সবই তাহার ভোগের জন্য নূতন রূপে সজ্জিত হইয়াছে। এরূপ মনে করিয়া আবার সে নবরাগে চিত্তক্ষেত্রকে রঞ্জিত করে, আবার স্ত্রীপুত্রাদির নবীন প্রেমে উন্মত্ত

হইয়া ঘোর বিষয়সেবীর মত আচরণ করিতে আরম্ভ করে। ইহাই মহামায়ার অতীব গহন লীলা।

উপসংহার।

অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীব অবিদ্যার প্রভাবে সুখদুঃখময় এই আবাগমন চক্রে ক্রমাগত ঘুরিতে থাকে। কখনও স্বর্গে, কখনও নরকে, কখনও প্রেতযোনিতে ভ্রমণ করিয়া আবার মৃত্যুলোকে আসিয়া উপস্থিত হয়। কখন অসুর হইয়া আবার পতন হয় এবং কখন দেবতা হইয়া আবার পতন হয়। তথাপি জীবের মোহনিদ্রা ভঙ্গ হয় না। ভূর্লোক চতুর্দ্দশ ভুবনের এক চতুর্দ্দশাংশ এবং এই মৃত্যুলোক তাহারও এক চতুর্থাংশ।

পরলোক রহস্য বুঝিতে হইলে প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের গঠন প্রণালী বুঝা একান্ত আবশ্যক। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ড চতুর্দ্দশ ভুবনে বিভক্ত। ঐ চতুর্দ্দশ ভুবনের মধ্যে সাতটি ঊর্দ্ধলোক এবং সাতটি অধোলোক। অধোলোকসমূহের নাম যথা—অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল। এই সাতটি অধোলোকে অসুরদের বাস। অসুরগণ তামসিক। তাই এই সাতটি অসুর লোকে রাজানুশাসনের একান্ত আবশ্যক হওয়ায় অসুর রাজের রাজধানী সপ্তমলোক অর্থাৎ পাতাল লোকে।

সাতটি ঊর্দ্ধলোকের নাম ভূলোক, ভুবলোক, স্বর্গলোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক এবং সত্যলোক। এই সাতটি ঊর্দ্ধলোকে দেবতাদের বাস। সপ্ত ঊর্দ্ধলোকের মধ্যে সকলগুলিতেই উত্তরোত্তর সত্ত্বগুণের আধিক্য হওয়ায় কেবল তৃতীয় লোক অর্থাৎ স্বর্গলোক পর্য্যন্ত রাজানুশাসনের আবশ্যকতা থাকায় দেবরাজের রাজধানী স্বর্গোলোকে অবস্থিত। শাস্ত্রে এরূপ বর্ণন আছে যে, ব্রহ্মার নিদ্রাবস্থায় প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের অধঃ সাতটি লোক এবং ঊর্দ্ধ তিনটি লোক অর্থাৎ স্বর্লোক পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যায়। অর্থাৎ দশটি লোক নষ্ট হয়। বিষ্ণুর নিদ্রার সময় ঊর্দ্ধ চতুর্থলোক পর্য্যন্ত অর্থাৎ এগারটি লোক নষ্ট হইয়া যায়। রুদ্রের নিদ্রার সময় ঊর্দ্ধ পঞ্চম লোক পর্য্যন্ত অর্থাৎ বারটি লোক নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু সত্ত্বগুণে পূর্ণ তপোলোকরূপী উপাসনালোক এবং জ্ঞানময় সত্যলোক ব্রহ্মাণ্ডের নৈমিত্তিক প্রলয়াবস্থাতেও লয় হয় না। উহারা কেবল ব্রহ্মাণ্ডের মহাপ্রলয়াবস্থাকালীন লয়ের সহিতই লীন হইয়া থাকে।

এই চতুর্দ্দশ ভুবনের মধ্যে ভূলোক আবার চারিভাগে বিভক্ত। এই চারিভাগের নাম যথা—মৃত্যুলোক, প্রেতলোক, নরকলোক এবং পিতৃলোক। এই

চারিটি লোকের মধ্যে পিতৃলোক সুখপূর্ণ, নরক লোক ও প্রেতলোক দুঃখপূর্ণ এবং মৃত্যুলোক কর্ম্মের কেন্দ্রস্থল।

তথাপি জীব অহঙ্কারে আচ্ছন্ন হইয়া ভগবানকেও উপেক্ষা করে। ইহাই জগতে আশ্চর্য্যের কারণ। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ছদ্মবেশী ধর্ম্মের প্রশ্নের উত্তরে এই আশ্চর্য্য বার্ত্তাই বলিয়াছিলেন যথা মহাভারতে—

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
শেষা জীবিতুমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্॥
অস্মিন্ মহামোহময়ে কটাহে
সূর্য্যাগ্নিনা রাত্রিদিবেন্ধনেন।
মাসর্ত্তু দর্বী পরিঘট্টনেন
ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্ত্তা॥

প্রতিদিন শত শত ব্যক্তি যমালয়ে যাইতেছে, ইহা দেখিয়াও অবশিষ্ট লোকে চিরজীবন লাভের ইচ্ছা করিয়া থাকে, এতদপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি আছে? মহামোহময় এই ব্রহ্মাণ্ড কটাহে সমস্ত জীবকে ফেলিয়া কাল নিত্য উহাদিগকে পাক করিয়া থাকে। ইহাতে সূর্য্যই পাকাগ্নি স্বরূপ, দিবা ও রাত্রি ইন্ধনস্বরূপ এবং মাস ও ঋতু পাকদণ্ডস্বরূপ। অঘটন-ঘটনাপটীয়সী মহামায়ার চক্রে ঘটিযন্ত্রের মত জীব অনাদিকাল হইতে এইরূপে লক্ষ লক্ষ জন্ম-জন্মান্তর প্রাপ্ত হইতেছে। বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, শান্তি নাই, নিবৃত্তি নাই, অনন্তসিন্ধুবাহিনী স্রোতস্বতীর মত জীবনিবহের গতি অনন্তের দিকে অবিরাম চলিয়াছে। শেষ কোথায়, শান্তি কোথায় তাহার প্রকৃত পথ দেখাইবার জন্য করুণাময় ভগবান্ নিজমুখে গীতায় বলিয়াছেন—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎ প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥

অন্তর্য্যামী ভগবান্ সকল জীবের হৃদয়ে বিরাজমান থাকিয়া মায়ার সহায়তায় যন্ত্রারূঢ়ের মত সকলকে ঘূর্ণিত করিতেছেন। এজন্য সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই শরণ গ্রহণ করা উচিত। তাঁহারই প্রসাদে পরম শান্তিময় এবং নিত্যানন্দময় শাশ্বত ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি আরও বলিয়াছেন—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

আমার ত্রিগুণময়ী দৈবীমায়া হইতে নিস্তার পাওয়া বড়ই কঠিন। কেবল যে আমার শরণ লয় সেই মায়ার পাশ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। মায়াই অনন্তশূন্যে সংসার নাট্যের অভিনয় করিতেছেন। আমরা এই অভিনয়ের ক্রীড়া-পুত্তলি সাজিয়া আছি। এই ভাবেই বিভোর হইয়া জনৈক ভক্ত গাহিয়াছেন—

আনীতা নটবন্ময়া তব পুরঃ শ্রীকৃষ্ণ যা ভূমিকা,
ব্যোমাকাশকথাম্বরাব্ধিবসবস্তৎপ্রীতয়েঽদ্যাবধি।
প্রীতো যদ্যসি তাঃ সমীক্ষ্য ভগবন্! যদ্বাঞ্ছিতং দেহি মে,
নো চেদ্ ব্রূহি কদাপি মানয় পুনর্মামীদৃশীং ভূমিকাম্॥

হে ভগবন্! নট যেমন দর্শকগণের তৃপ্তি বিধানের জন্য কত সাজে সাজিয়া কত দৃশ্যই দেখায়, আমিও সেইরূপ সংসার রঙ্গমঞ্চে তোমার নিকট আজ পর্য্যন্ত আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী আদির কত দৃশ্যই দেখাইয়াছি। যদি তুমি ঐ সকল লক্ষাতিলক্ষ যোনির দৃশ্যাবলী দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া থাকে তবে আমাকে তোমার পুরস্কার দেওয়া উচিত। আমি মোক্ষরূপী পুরস্কারই চাই। আর যদি আমার দৃশ্যে তোমার আনন্দ না হইয়া থাকে, তবে আজ্ঞা দাও আর কখনও যেন তোমার সম্মুখে এরূপ দৃশ্য দেখাইতে না হয়। তাহা হইলেও আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। এইরূপে উভয়ভাবেই ভক্ত দীনশরণ ভগবানের নিকট দুর্লভ মুক্তিপদ প্রার্থনা করিতেছেন। আসুন পাঠক! জন্মান্তর তত্ত্ব অবগত হইয়া আমরাও করুণাবরুনালয় শ্রীভগবানের চরণকমলে মুক্তি পদেরই ভিক্ষালাভ করি। তাহা হইলে জনমমরণের অমোঘ চক্র নিবারিত হইবে, দুঃখের দাবদাহ অমৃতসিঞ্চনে চিরকালের জন্য নির্ব্বাপিত হইবে এবং তাঁহার অমিয়মাখা মধুর হরিনাম প্রাণ ভরিয়া গাহিতে গাহিতে তাঁহারই অনন্তানন্দময় অনন্তধামে অনন্তকালের জন্য যাত্রা করিতে পারিব।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শ্রীগৌরাঙ্গ।

নব পর্য্যায়।

অকুণ্ঠং সর্ব্বকার্য্যেষু ধর্ম্ম-কার্য্যার্থমুদ্যতম্।
বৈকুণ্ঠস্য হি যদ্রূপং তস্মৈ কার্য্যাত্মনে নমঃ॥

২য় ভাগ { ভাদ্র, ১৩২৭। ইং আগষ্ট, ১৯২০ } ৫ম সংখ্যা।

ধর্ম্মই সকল উন্নতির মূলভিত্তি।

তৃতীয় প্রস্তাব।

ধর্ম্মশিক্ষার আবশ্যকতা।

[শ্রীবিজয়লাল দত্ত।]

"ন ধর্ম্মকালঃ পুরুষস্য নিশ্চিতো
ন চাপি মৃত্যুঃ পুরুষং প্রতীক্ষতে।
সদাহি ধর্ম্মস্য ক্রিয়ৈব শোভনা
যদা নরো মৃত্যুমুখেঽভিবর্ত্ততে॥"

মানুষের ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই, মৃত্যু মানুষের সময় অসময় বিবেচনায় প্রতীক্ষা করে না; জন্মের পর হইতেই মানুষ যখন অবিরাম মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতেছে তখন বাল্যকাল হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বদা ধর্ম্মানুষ্ঠান করাই সকলের পক্ষে সুশোভন। এই সারগর্ভ উপদেশ অনুসারে প্রাচীন ভারতের হিন্দু সমাজে ধর্ম্মশিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। হিন্দু সন্তান বাল্যকাল হইতে গুরুগৃহে বাস করিয়া আচার্য্যের নিকট হইতে ব্রহ্মচর্য্য, সংযম, সদাচার, সত্যনিষ্ঠা, আস্তিক্য, স্বধর্ম্মানুরাগ ও পরার্থপরতা প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে সুশিক্ষা লাভে স্ব স্ব চরিত্র সুন্দরভাবে গঠিত করিতেন। যৌবন সমাগমে তাঁহাদের স্বভাবের চারু

শোভা ও ধর্ম্মভাব মনোজ্ঞভাবে বিকশিত হইয়া সমাজকে আশ্বস্ত ও উৎফুল্ল করিত। কালচক্রের পরিবর্ত্তনে ভারতভূমির দুর্ভাগ্য বশতঃ সে সনাতন প্রথা আর নাই। দীর্ঘকালের পরাধীনতার সেই পরম কল্যাণকর প্রথার আমূল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। এদেশে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই হিন্দু সন্তানের ধর্ম্মভাব শিথিল হইতে আরম্ভ হইয়া বিগত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে হিন্দু সমাজের শোচনীয় পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার অনিবার্য্য প্রভাবে এই অল্পকাল মধ্যে উক্ত পরিবর্ত্তন যেরূপ দ্রুতগতি সংঘটিত হইয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। উক্ত শিক্ষা ও সভ্যতা কোন কোন বিষয়ে এ দেশের উন্নতি সাধন করিলেও অনেক বিষয়ে যে ঘোর অনিষ্ট সাধন করিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ধর্ম্মহীন শিক্ষার প্রভাবে ভারতের অনেক স্থানের অধিবাসিগণ বিশেষতঃ যুবকবৃন্দ কিরূপ অসংযত, উচ্ছৃঙ্খল ও ধর্ম্মভাববিহীন হইয়া পড়িয়াছে তাহার পরিচয় দান অনাবশ্যক। বিজাতীয় সভ্যতা ও আচার ব্যবহারের জঘন্য অনুকরণে কত যুবক স্বধর্ম্মানুমোদিত সদাচার, নিষ্ঠা, সরলতা ও সত্যানুরাগ ভুলিয়া যথেচ্ছাচার সমর্থনে সমাজে দিন দিন কত অনর্থ, আবর্জ্জনা ও অশান্তি উৎপাদন করিতেছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য বিভাগ ও প্রদেশের কথা ছাড়িয়া কেবল এই বাঙ্গলা দেশের বর্ত্তমান শিক্ষিত ও অর্দ্ধ শিক্ষিত যুবক ও বালকগণের প্রকৃতি ও মতি-গতি পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায়, মেকলে-প্রমুখ ব্যবস্থাপকগণের উদ্যোগে প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মহীন ইংরাজী শিক্ষা ধীরে ধীরে বঙ্গ সমাজের ধর্ম্মজীবন শিথিল ও ধর্ম্মভাব বিনষ্ট করিয়া বাঙ্গালী জাতির কি ঘোরতর অনিষ্ট সাধন করিয়াছে ও করিতেছে। উক্ত অন্তঃসারশূন্য শিক্ষার প্রভাব বাঙ্গালীর অস্থি মজ্জায় প্রবিষ্ট হইয়া অধঃপতনের পথ অবাধে প্রসারিত করিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে যে সকল যুবক ও বালক প্রতি বৎসর দলে দলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে শতকরা কয়জন লোক সত্যানুরাগী, সদাচার সম্পন্ন ও স্বধর্ম্মপরায়ণ ? তাঁহাদের মধ্যে কত জন যুবক ও বালক স্ব স্ব পিতামাতা ও গুরুজনের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধাবান্ ? অন্যান্য বয়োজ্যেষ্ঠ লোকের প্রতি সমুচিত সম্মান প্রদর্শনে কয়জন অভ্যস্ত ? যাঁহারা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

কীর্ত্তিস্তম্ভ বলিয়া পরিগণিত—যে সকল ক্ষমতাশালী মনীষী ও মনস্বিগণ উহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি সাধন জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ উত্তমরূপে বুঝিতে পারিয়াছেন, ধর্ম্মহীন শিক্ষায় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চ পরীক্ষোত্তীর্ণ বিস্তর যুবকের অনেক বিষয়ে কিরূপ শোচনীয় অবনতি হইয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রভাবে অনেকের অন্তরে স্বদেশানুরাগ ও স্বাধীনতা-প্রিয়তা কিঞ্চিৎ পরিমাণে জন্মিলেও এক ধর্ম্মভাবের অভাবে তাহা হইতে কোন সুফল জন্মিতেছে না। আমরা জানি বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌভাগ্য ও উন্নতি-বিধাতা কোন কোন পুরুষ-সিংহ আক্ষেপ পূর্ব্বক এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন যে যদি তাঁহাদের সামর্থ্য থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা বিশ্ব বিদ্যালয়কে ভাঙ্গিয়া পুনরায় নূতনভাবে সংগঠন পূর্ব্বক সমস্ত স্কুল ও কলেজে ধর্ম্মশিক্ষা প্রচলনের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধানে প্রত্যেক শিক্ষালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদানের সুব্যবস্থা প্রচলিত হইলে এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলার প্রতি গৃহে ও ছাত্রাবাসে ধর্ম্মালোচনা ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে দেশের বর্ত্তমান দুর্দ্দিন দূরে যাইয়া আবার শুভ দিন আসিবে। তখন প্রতিভাশালী বাঙ্গালী জাতি নবীন জীবনে উদ্বুদ্ধ হইয়া সুপবিত্র ও সুসংযত ভাবে জীবন-যজ্ঞ উদ্‌যাপনে জাতীয় শক্তির উদ্বোধন করিতে সক্ষম হইবে। তখন বাঙ্গালীর স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতি প্রেম স্বতঃই পূর্ণ বিকশিত হইবে।

বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালীর শিক্ষালয়গুলি যেমন ধর্ম্মশিক্ষা লাভে বঞ্চিত, অনেক বাঙ্গালীর বাসগৃহও তেমনই ধর্ম্মালোচনায় বিরত। যে বাঙ্গালী জাতি এক সময় বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সুশীতল ছায়ায় পরিপুষ্টিলাভে বিপুল ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া সমাজ ও আত্মীয় স্বজনের কত কল্যাণ সাধন করিয়াছে, দুর্ভাগ্য বশতঃ সেই বাঙ্গালী জাতির বর্ত্তমান বংশধরগণের অনাস্থায় সেই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের কি শোচনীয় দুরবস্থা ঘটিয়াছে! অনেকে অবজ্ঞা ও অবহেলায় পিতৃপিতামহগণের পবিত্র ধর্ম্মভাব বিসর্জ্জন দিয়াছেন—বাঙ্গলার চারি শ্রেষ্ঠ-বর্ণের বিস্তর লোক ত্রিসন্ধ্যা-বন্দনা ও গায়ত্রীর ধ্যান-ধারণা ভুলিয়া পরম দেবতার আরাধনায় বিমুখ হইয়াছেন। অধিকাংশ স্থলে বাঙ্গালীর গৃহ-লক্ষ্মীগণ অসাধারণ নিষ্ঠা ও সদাচার প্রভাবে বাঙ্গালীর গৃহে অনেক পরিমাণে বিশুদ্ধ

ধর্ম্মভাব রক্ষা করিতেছেন। তাঁহাদেরই পুণ্যবলে বাঙ্গালী-সমাজ এখনও সজীব রহিয়াছে। তাঁহারাই শক্তিরূপা কল্যাণীর ন্যায় স্ব স্ব সাধনা প্রভাবে বাঙ্গালী-সমাজকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিয়া উহার অশেষ কল্যাণ কামনায় প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। ইঁহারাই বাঙ্গলার আঁধার গৃহে সাধনার পূত হোমাগ্নি প্রজ্জ্বালিত রাখিয়াছেন।

আমাদের দেশে একটী প্রবাদ আছে—"দেখে শেখে, আর ঠেকে শেখে।" লোকে ঠেকিয়া বিপন্ন অবস্থায় যে শিক্ষা লাভ করে, তাহাই যথার্থ শিক্ষা; তাহার অমোঘ প্রভাবে মানুষের জ্ঞান-চক্ষু প্রস্ফুটিত হইয়া মোহান্ধকার দূরে যায়; সে তখন দুর্লভ মানব জীবনের সার্থকতা সম্পাদনে যত্নবান হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে অনেক দুঃখ, লাঞ্ছনা ও নির্য্যাতন সহিয়া বিস্তর অভাব ও অশান্তিতে অবসন্ন ও হতাশ হইয়া বাঙ্গালীর বিশুষ্ক হৃদয়ে ধীরে ধীরে ধর্ম্মের পিপাসা জন্মিতেছে—অনেক শিক্ষিত বাঙ্গালী ধর্ম্ম আলোচনা ও ধর্ম্ম শিক্ষা লাভের আবশ্যকতা অনুভব করিতেছেন। অনেকের কুল-গুরু উপযুক্ত পবিত্রতা ও ধর্ম্মভাব বিরহিত এবং অনেকে অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন বিধায় বিস্তর শিক্ষিত ও ধর্ম্মানুরাগী বাঙ্গালী সুযোগ্য গৃহস্থ গুরুর অভাবে কোন কোন নিষ্ঠাবান ত্যাগশীল যোগরত পবিত্র-হৃদয় ব্রহ্মচর্য্য পরায়ণ সাধু-সন্ন্যাসীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অনেকে এই-রূপ সদ্‌গুরুর নিকট সস্ত্রীক এবং কেহ কেহ বা সপরিবারে দীক্ষা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালা দেশের সমগ্র শিক্ষিত বাঙ্গালীর সংখ্যার অনুপাতে ঐ সকল দীক্ষিত বাঙ্গালী পরিবারের সংখ্যা নিতান্ত অল্প হইলেও আশা করা যায় যে ইঁহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণে অনেক সহৃদয় ও সুশিক্ষিত বাঙ্গালীর অন্তরে ধর্ম্মোন্নতি লাভের জন্য আকুল পিপাসা জন্মিবে এবং তাঁহারা অচিরে দলে দলে ঐরূপ উপযুক্ত সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়া তাঁহাদের কৃপায় ধর্ম্মজীবন লাভ করিবেন। ভক্তের ভগবান্ সাধনার পথের সকল বিঘ্ন বাধা দূর করিয়া তাহার প্রাণের বাসনা পূর্ণ করিয়া থাকেন। ভক্তের বাঞ্ছা-কল্পতরু দয়াময় ভগবানের দয়ার অভাব নাই—অভাব, ভক্তের একাগ্রতা পূর্ণ সাধনার।

বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষার অভাব এক্ষণে অনেকেই বিশেষরূপে অনুভব করিতে-

ছেন। ইয়ুরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মিসনরি বিদ্যালয়ে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রন্থ বাইবল্ পাঠ ও খৃষ্ট ধর্ম্মানুমোদিত নীতি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় এই যে হিন্দুর দেশে হিন্দুর অর্থে প্রেতি-ষ্ঠিত ও পরিপুষ্ট বিদ্যালয় সমূহে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম শিক্ষাদানের কোনরূপ ব্যবস্থা নাই। যে সকল বিদ্যালয়ে জাতি ও সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে বিবিধ বিষয়ক শিক্ষা দানের ব্যবস্থা দীর্ঘকাল হইল প্রচলিত হইয়াছে, তথায় কি প্রণালীতে সাম্প্রদায়িক ভাবে ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইতে পারে তাহাও বিশেষ চিন্তা ও আলোচনার বিষয়। উহা যতই কঠিন হউক, উক্ত সমস্যার সমাধান না হইলে শিক্ষা মন্দিরে ধর্ম্ম শিক্ষাদানের কোন উপায় বিহিত হইবে না।

আমরা শুনিয়াছি সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত স্যাড্‌লার সাহেব প্রমুখ শিক্ষা কমিশনের সদস্যগণের মধ্যে উল্লিখিত বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা কোন সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। আমরা ইহাও শুনিয়াছি যে উক্ত অনুসন্ধান সমিতির সদস্যগণ শিক্ষা সম্বন্ধীয় বিবিধ তথ্যানুসন্ধান উপলক্ষে যুক্তপ্রদেশ ও পঞ্চনদ-ভূমি ভ্রমণকালে সমিতির সুবিজ্ঞ ও সহৃদয় সভাপতি উহার অন্যতর প্রবীণ ও সুযোগ্য সদস্য, বঙ্গ জননীর অসাধারণ শক্তিশালী সুসন্তান স্যর শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ডি,এল মহোদয়ের সহিত হরিদ্বারের গুরুকুল ও ঋষিকুল প্রতিষ্ঠিত দুইটী বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। উক্ত বিদ্যালয় দুইটীর ছাত্রগণ যে প্রণালীতে সংযম সদাচার ও ধর্ম্মশিক্ষা লাভ করেন তদ্দর্শনে তাঁহারা উভয়েই অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন। ঋষিকুলের উৎকৃষ্টতর প্রণালী-পরিচালিত বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের সুসংযত ও বিনয়-নম্রভাব, সদাচার, ব্রহ্মচর্য্য ও ধর্ম্মভাবের পরিচয় পাইয়া শ্রীযুক্ত স্যাড্‌লার সাহেব এতই পরিতৃপ্ত ও আনন্দিত হইয়াছিলেন যে তিনি প্রকাশ্যভাবে উক্ত বিদ্যালয়ের প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার আন্তরিক প্রীতি ও আনন্দ জ্ঞাপন পূর্ব্বক উক্ত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের নিকট স্ব-ইচ্ছায় উপযুক্ত পরিমাণে অর্থ প্রেরণে বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রগণের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। প্রাতঃস্মরণীয় আর্য্য ঋষিগণের প্রাচীন পবিত্র প্রথার কিঞ্চিৎমাত্র আভাষ পাইয়া একজন বিদেশীয় ও ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী মহাপণ্ডিত ঋষিকুল-বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের সদাচার, ধর্ম্মভাব ও সুশিক্ষার প্রতি অকপট ভাবে এরূপ আস্থা ও

উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, একথা মনে হইলে হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। তখন অন্তরে এই আশা ও ভরসা জন্মে যে ঋষিকুলের পবিত্র আদর্শ অনুসারে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে, বিশেষতঃ বাঙ্গলা দেশে সদাচার ও ধর্ম্মশিক্ষার উৎকর্ষ সাধন জন্য ঐরূপ দুই একটী বিদ্যালয় সংস্থাপনে স্বধর্ম্মানুরাগী জনসাধারণ বিশেষরূপে যত্নবান হইবেন। আমরা ইহাও শুনিয়াছি যে মহাত্মা স্যাড্‌লার সাহেব তাঁহার সুযোগ্য সহযোগী স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত সংসার বিরাগী নিষ্ঠাবান সাধু-সন্ন্যাসীর দ্বারা বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদানের উপযোগীতার বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করিয়াছিলেন। মাতর্বঙ্গভূমি, তোমার কি এমন সৌভাগ্যের দিন হইবে, যেদিন তোমার উদ্‌ভ্রান্ত সন্তানগণ সাধু-সন্ন্যাসীর ন্যায় চরিত্রবান, আচারবান শক্তিমান ধর্ম্ম-উপদেশকগণের নিকট বিদ্যালয়ে ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষালাভে স্ব স্ব জীবনের প্রকৃত উন্নতি সাধনে সমর্থ হইবে? কবে মা সেই শুভদিন আসিবে, যে দিন তোমার সন্তানগণ প্রকৃত উদার ধর্ম্মশিক্ষা লাভে ধর্ম্মভাবে বিভোর হইয়া বহুবিধ সদ্‌গুণ অর্জ্জনে জাতীয় সমাজে তোমার মুখোজ্জ্বল করিতে সক্ষম হইবে?

ধর্ম্মশিক্ষাহীন ভারত ভূমির বর্ত্তমান দুরবস্থা দর্শনে অনেক সংসারত্যাগী যোগ-রত তপস্বী ও সাধু সন্ন্যাসীর প্রাণে গভীর বেদনা ও অন্তরে অতীব আকুলতা জন্মিয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে অনেক মহাত্মা অনেক সময়ের জন্য তাঁহাদের যোগাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মশিক্ষা দান ও ধর্ম্মভাব বিস্তারে ভারত মাতার প্রকৃত দৈন্য ও অভাব বিমোচনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে কৃপা-পরবশ হইয়া অনেক ধর্ম্মপিপাসু যুবককে দীক্ষাদান পূর্ব্বক তাঁহাদের মন্ত্র শিষ্য করিতেছেন। এই সকল কল্যাণকামী মহাত্মাগণের পবিত্র ইচ্ছা-শক্তির বৈদ্যুতিক প্রভাবে ভারত জননীর অনেক সহৃদয় ও শক্তিশালী সুসন্তান দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের শিক্ষা বিস্তার জন্য ব্রহ্মচর্য্য-বিদ্যালয় ও ধর্ম্মশিক্ষা মন্দির প্রতিষ্ঠায় যত্নবান হইয়াছেন। তাঁহাদের বিশুদ্ধ ও উদার সঙ্কল্পের মধুময় প্রেরণায় ও উদ্দীপনায় ভারতভূমির ভিন্ন ভিন্ন স্থানের সহৃদয় ধনশালী ভূস্বামী, বণিক, মহাজন ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ব্যক্তিগণের যত্নে নানাস্থানে সনাতন ধর্ম্ম সভা, সনাতন ধর্ম্ম কলেজ ও পাঠশালা

প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয় কমিসনের রিপোর্ট অনুসারে শিক্ষা সম্বন্ধীয় কোন আইন ও বিধান গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই অনেক ক্ষমতাশালী মহাপ্রাণ জমিদার স্ব স্ব অর্থ ও যত্নে প্রতিষ্ঠিত স্কুল ও কলেজে অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষার সহিত বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী কথঞ্চিৎ ধর্ম্মশিক্ষা দানের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। এই সকল মহাত্মা-গণের মধ্যে বঙ্গজননীর ক্ষণজন্মা সুসন্তান দানবীর ও সমস্ত ধর্ম্মানুষ্ঠানের অগ্রগণ্য প্রবর্ত্তক ও পরিপোষক কাসিম বাজারের স্বনাম ধন্য মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এক বৎসর অতীত হইল এই মহাত্মার সাদর আমন্ত্রণে পুণ্যতীর্থ বারাণসীর বিশ্ব-বিশ্রুত ভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রাণ স্বরূপ সুপ্রসিদ্ধ কর্ম্মবীর সংসার-বিরাগী যোগ-ব্রত সন্ন্যাসী শ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ স্বামীর মন্ত্রশিষ্য, সুপণ্ডিত, ধর্ম্মপ্রাণ ও মহাশক্তিশালী ধর্ম্মবক্তা শ্রীমৎ দয়ানন্দ স্বামী মুর্শিদাবাদে গমন পূর্ব্বক উক্ত মহারাজার সাহচর্য্যে বহরমপুর ও মুর্শিদাবাদের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ধর্ম্মশিক্ষার আবশ্যকতা সম্বন্ধে অনেকগুলি মর্ম্মস্পর্শী সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়া তত্রত্য জনসাধারণের অন্তরে বিপুল উৎসাহের তরঙ্গ উত্থিত করিয়াছিলেন। মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্রের সাধু দৃষ্টান্ত অনুসারে ভারতভূমির বিভিন্ন প্রদেশের ভূস্বামী ও সঙ্গতিশালী ব্যক্তিগণ নানাস্থানে ধর্ম্মশিক্ষা প্রচার ও ধর্ম্মভাব বিস্তার পক্ষে আন্তরিক সহায়তা প্রদানে কৃত-সঙ্কল্প হইলে দেশের প্রকৃত স্থায়ী কল্যাণ সংসাধিত হইবে। দেশের সমস্ত অনুষ্ঠান ও সাধনা সুদৃঢ় ধর্ম্মভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে দেশ জননীর সকল অবনতি, সকল দুরবস্থা ও সকল অভাব অশান্তি অচিরে বিলুপ্ত হইয়া চারিদিকে প্রকৃত উন্নতির স্রোত তরতর বেগে প্রবাহিত হইবে। দেশের সুকৃতিশালী সন্তানগণ জঘন্য অনুকরণ-প্রবৃত্তি দমন পূর্ব্বক জাতীয় বিশেষত্ব রক্ষণে যত্নবান হইবেন।

অতীব আনন্দের বিষয় এই যে নিখিল ভারতের স্বধর্ম্মানুরাগী হিন্দুজাতির বরেণ্য বিরাট ধর্ম্মসভা শ্রীভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডলের ঋষিকল্প পরিচালক ও পৃষ্ঠপোষকগণের যত্নে ও উদ্যোগে এবং খৈরীগড়ের স্বনামধন্যা বিদুষী ধর্ম্মপ্রাণা রাণী সুরতকুমারীর সহায়তায় পুণ্যতীর্থ কাশীধামে সমগ্র ভারতবর্ষবাসী হিন্দু সন্তানগণের ধর্ম্মশিক্ষার উদ্দেশ্যে "সারদামণ্ডল" নামে একটী সনাতন হিন্দুধর্ম্ম

বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। ধর্ম্মশিক্ষা বিস্তারে দেশের বিভিন্ন হিন্দু সম্প্রদায়ের অশেষ কল্যাণ সাধন পূর্ব্বক হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় ও বিশাল হিন্দু সমাজের পুনরভ্যুত্থান সাধন সারদামণ্ডলের প্রধানতম উদ্দেশ্য। নিখিল সাধু ও কল্যাণকর অনুষ্ঠানের নিয়ামক ও উন্নতি বিধায়ক সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা দেব উক্ত শুভ অনুষ্ঠানের প্রতি তাঁহার করুণা ও আশীর্ব্বাদ অজস্রধারে বর্ষণ করিয়া উহার পরিপুষ্টি ও মঙ্গলময় উদ্দেশ্য সংসাধনে সহায়তা দান করুন। তাঁহার কৃপায় সমগ্র স্বধর্ম্মানুরাগী হিন্দু সন্তানের আন্তরিক অনুরাগ পূর্ণ দৃষ্টি উহার উপর নিপতিত হউক। সমস্ত শিক্ষিত ও সহৃদয় নরনারীর হৃদয়ের শুভ-কামনা ও পবিত্র ইচ্ছাশক্তির প্রভাব উহার উপর পরিব্যাপ্ত হউক। ভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডলের মঙ্গলময় উদ্দেশ্য সংসাধন জন্য যাঁহারা যোগরত তপস্বীর ন্যায় সর্ব্বক্ষণ একাগ্রচিত্তে বিরাট সাধনায় নিযুক্ত রহিয়াছেন তাঁহাদের সঙ্কল্পের সফলতায় দেশ মাতৃকার অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রভাবে এ দেশের বিস্তর উদ্‌ভ্রান্ত ও বিকৃত-মস্তিষ্ক যুবক দিন দিন সনাতন ধর্ম্মভাবের পরিবর্ত্তে অসার জড়বাদের উপাসক হইতেছেন। যে জড়বাদের প্রভাবে ইয়ুরোপের সমস্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান ও মনুষ্যত্ব বিনষ্ট হইতেছে, যাহার মোহময় মদিরায় উন্মত্ত হইয়া ইয়ুরোপ বিশ্ব-বিধ্বংসী মহাসমরে রুদ্রতালে নৃত্য করিয়া ধর্ম্মের ও শান্তির নামে সমগ্র সভ্য জগতে অভূত পূর্ব্ব ও অনির্ব্বচনীয় দুঃখ কষ্ট ও অশান্তি আনয়নে ইয়ুরোপীয় সভ্যতা ও উন্নতির প্রতি চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের অবিমিশ্র অশ্রদ্ধা ও ঘৃণা উৎপাদন করিয়াছে, সেই ঘৃণিত ধর্ম্মভাব-বিহীন জড়বাদ (materialism) যাহাতে এ দেশের ধর্ম্মভাব (spiritualism) কে সমাচ্ছন্ন ও কলঙ্কিত করিতে না পারে তৎপক্ষে শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের সুবিজ্ঞ পরিচালকগণ সর্ব্বান্তঃকরণে যত্নবান রহিয়াছেন, ইহা বড়ই আশার কথা। পরম মঙ্গলময় বিশ্বনাথ তাঁহাদিগের কঠোর সাধনা জয়যুক্ত করুন। তাঁহাদের প্রচারিত উদার ধর্ম্মশিক্ষা প্রভাবে সুবিশাল ভারতের কোটি কোটি নরনারীর অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে সর্ব্বক্ষণ এই মহা সত্য সমুজ্জ্বল ভাবে পরিঘোষিত ও প্রতিধ্বনিত হউক—

**"এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি॥"**

আর্য্যজাতি।

[স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী]

আর্য্যজাতীর সর্ব্বাঙ্গীণ পুর্ণতা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

উক্ত যোগীবরের অনুমতি অনুসারে তাঁহাকে বাক্সে বন্ধ করিয়া ইয়ুরোপীয় ও এদেশীয় বহুসংখ্যক সভ্য ও মহারাজা রণজিৎসিংহের সম্মুখে ভূমধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখা হয়। উক্ত স্থানে যব গম বপন করিয়া দেওয়া হয় এবং বিশেষ পাহারার ব্যবস্থা করা হয়। ৪০ দিন পরে সর্ব্বসমক্ষে উত্তোলিত হইলে উক্ত যোগীবরকে জীবিত অবস্থায়ই পাওয়া যায়। এই দৃষ্টান্ত চক্ষের সম্মুখে প্রত্যক্ষ করিয়া উক্ত ইয়ুরোপীয় বিদ্বানগণের যোগশক্তি সম্বন্ধীয় যাবতীয় সন্দেহ বিদূরিত হইয়া যায়। উহারাই পুনরায় যখন মাদ্রাজের যোগীকে কুম্ভকদ্বারা আকাশে স্থিত দেখিলেন এবং কলিকাতার ভূকৈলাশ স্থিত যোগীকে শ্বাসরহিত সমাধি অবস্থায় দেখিলেন তখন তাহাদের চিত্তে সন্দেহের লেশ মাত্র রহিল না। তাঁহারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ পুস্তকে এই তিন দৃষ্টান্তকেই প্রমাণরূপে লিখিয়া গিয়াছেন। যদিও তাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়া লইয়াছেন তথাপি এই সকল যোগশক্তির কারণ তাঁহারা আজিও নিরূপণ করিতে পারেন নাই। যোগ ক্রিয়াতে যাহারা বালক এইরূপ ব্যক্তির বস্তি নলিক্রিয়া শঙ্খপ্রচালাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রিয়া আজ কাল প্রায় দৃষ্ট হয় তাহারও কারণ ইয়ুরোপীয় বিদ্বানগণ তাঁহাদের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি দ্বারা নিরূপণ করিতে সমর্থ হন নাই।

গণিত ও ফলিত জ্যোতিষ শাস্ত্রের আবিষ্কার প্রথমে এই ভারতবর্ষেই হইয়াছে। প্রাচীন আর্য্যেরা কেবল এই শাস্ত্রের আবিষ্কার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই কিন্তু ইহার প্রত্যেক বিভাগের এতদূর উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন যে তাহার সকল বিভাগের রহস্য এখন পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য জ্যোতিষীগণ হৃদয়ঙ্গম করিতেও সমর্থ হন নাই। যদিও তাঁহারা আজকাল যন্ত্রাদির সাহায্যে গণিত জ্যোতিষের কথঞ্চিৎ উন্নতি সাধন করিয়াছেন তথাপি ফলিত জ্যোতিষের সূক্ষ্ম বিজ্ঞান এখনও তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই। প্রাচীনকালে জ্যোতিষের পূর্ণোন্নতি সম্বন্ধে কেহ কেহ সন্দেহ করিয়া থাকেন। আর্য্য জ্যোতিষশাস্ত্র সম্যক রূপে পর্য্যালোচনা

না করাই এইরূপ সন্দেহের কারণ। গ্রহ, উপগ্রহ, সৌরজগৎ, রাশিচক্র, নক্ষত্রচক্র, অংশ, বিষুবরেখা, গোলার্দ্ধ, উদীচীনরাশি প্রভৃতি রাশিভেদ, ক্রান্তি, কেন্দ্রব্যাসনিরূপণ, সুমেরু, কুমেরু, ছায়াপথ, কক্ষ, ধূমকেতু, উল্কাপিণ্ড, নির্ঘাত, মাধ্যাকর্ষণশক্তি, সূর্য্য, মহাসূর্য্য, পৃথিবীর আকৃতি ও পরিমাণ প্রভৃতি গহন বিষয় সমূহের সিদ্ধান্ত যখন প্রাচীন আর্য্যদের গ্রন্থে দেখা যায় তখন কিরূপে বলিতে পারা যায় যে প্রাচীন আর্য্যেরা এই শাস্ত্রের পূর্ণোন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হন নাই?

বিষ্ণু পুরাণে লিখিত আছে,—

স্থালীস্থমগ্নিসংযোগাদুদ্রেকি সলিলং যথা।
তথেন্দুবৃদ্ধৌ সলিলমম্ভোধৌ মুনিসত্তমাঃ॥
ন ন্যূনা নাতিরিক্তাশ্চ বর্দ্ধন্ত্যাপো হ্রসন্তি চ।
উদয়াস্তমনেষিন্দোঃ পক্ষয়োঃ শুক্লকৃষ্ণয়োঃ॥
দশোত্তরাণি পঞ্চৈব অঙ্গুলানাং শতানি বৈ।
অপাং বৃদ্ধিক্ষয়ৌ দৃষ্টৌ সামুদ্রীণাং মহামুনে॥

জোয়ার ভাটায় যথার্থতঃ সমুদ্রের কোন প্রকার বৃদ্ধিক্ষয় হয় না। কিন্তু যেমন কোন পাত্রে জল রাখিয়া তাহার নীচে অগ্নির উত্তাপ দিলে ঐ জল উথলিয়া উঠে সেইরূপ শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষের শেষে চন্দ্রের আকর্ষণে সমুদ্রের জল উথলিয়া উঠে, তাহাকেই জলের বৃদ্ধি বলিয়া ধরা হয়। ঐ পক্ষদ্বয়ের মধ্যভাগে চন্দ্রের আকর্ষণের অল্পতায় সমুদ্রের জল হ্রাস প্রাপ্ত হয়। আর্য্যদিগের গ্রন্থে এইরূপ প্রমাণ দেখিয়া কাহার সন্দেহ থাকিতে পারে যে আর্য্যগণ গ্রহাকর্ষণশক্তি এবং জোয়ার ভাটার কারণ অবগত ছিলেন না? আর্য্যমহর্ষিগণই সর্ব্ব প্রথমে বার ও তিথি আবিষ্কার করিয়া সময়ের শৃঙ্খলা করিয়াছিলেন। বৎসরের যে দিন দিনরাত্রি সমান হয়, এই নিয়মের পাশ্চাত্য আবিষ্কারক টলেমীর (Tolemy) জন্মের বহু পূর্ব্বে আর্য্যমহর্ষিগণই তাহা নিরূপণ করিয়াছিলেন। সূর্য্যসিদ্ধান্তে লিখিত আছে—

সর্ব্বতঃ পর্ব্বতারামগ্রামচৈত্যচয়ৈশ্চিতঃ।
কদম্বকেশরগ্রন্থিকেশরপ্রসবৈরিব॥

কদম্ব যে প্রকার কেশর দ্বারা বেষ্টিত থাকে সেইরূপ পৃথিবীও গ্রাম, বৃক্ষ ও পর্ব্বত প্রভৃতি দ্বারা বেষ্টিত। নক্ষত্রকল্পে লিখিত আছে,—

কপিত্থফলবদ্বিশ্বং দক্ষিণোত্তরয়োঃ সমম্।

কপিত্থ ফলের ন্যায় পৃথিবী গোলাকার এবং উহার দক্ষিণ ও উত্তর দেশ কিঞ্চিৎ চাপা। যখন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ পৃথিবীকে কমলালেবুর সহিত উপমিত করেন তখন হিন্দু জ্যোতিষীগণকে কদম্ব ও কপিত্থের সহিত পৃথিবীর উপমা দিতে দেখিয়া কি বুঝা যায় না যে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ অপেক্ষা বহু পূর্ব্বে আর্য্য জ্যোতিষীগণ পৃথিবীর স্বরূপ অবগত ছিলেন? আজকাল ভূগোল শিক্ষার্থীদিগকে গোলক (Globe) দ্বারা শিক্ষা দেওয়া হয়, কিন্তু যখন প্রাচীন আর্য্য জ্যোতিষ শাস্ত্রে দেখিতে পাই যে আর্য্যেরা বিদ্যার্থীগণকে দারুময় ভূগোল ও খগোল রচনা করিয়া শিক্ষা দিতেন তখন কাহার অবিশ্বাস থাকিতে পারে যে প্রাচীনেরা এই আধুনিক রীতি অবগত ছিলেন না? আধুনিক শিক্ষার প্রধান দোষ এই যে, ভারতীয় শিক্ষার্থী পূর্ণ শিক্ষা প্রাপ্ত হয় না। ইংরাজী অথবা সংস্কৃত যে কোন ভাষাতেই তাহারা পরিশ্রম করুক না, কোন বিষয়েই পূর্ণ সফলতা লাভ করিতে পারে না। ইংরাজীশিক্ষার্থী বা সংস্কৃতবিদ্যার্থীর জ্ঞান একদেশ-দর্শী থাকিয়া যায়। বর্ত্তমানে শিক্ষার পূর্ণতা উভয় দেশের শাস্ত্রের সম্যক পরি-শীলনে সাধিত হইতে পারে। আর্য্যভট্ট লিখিয়াছেন,—

চলা পৃথ্বী স্থিরা ভাতি।

পৃথিবী চলিতেছে কিন্তু স্থির বলিয়া বোধ হইয়া থাকে।

ভপঞ্জরঃ স্থিরো ভূরেবাবৃত্যাবৃত্য প্রাতিদিবসিকৌ
উদয়াস্তময়ৌ সম্পাদয়তি নক্ষত্রগ্রহানাম্।

নক্ষত্রমণ্ডল স্থির, কিন্তু পৃথিবী আবর্ত্তিত হইয়া নক্ষত্রগ্রহগণের দৈনিক উদয়াস্ত সম্পাদন করে। এই সকল প্রমাণ দেখিয়া কাহার না বিশ্বাস হইবে যে আর্য্যগণ পৃথিবীর গতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ ছিলেন? যখন আচার্য্যদের গ্রন্থে দেখিতে পাই—

ভূগোলো ব্যোম্নি তিষ্ঠতি।

নান্যাধারং স্বশক্ত্যা বিয়তি চ নিয়তং তিষ্ঠতীহাস্য পৃষ্ঠে।
নিষ্ঠং বিশ্বঞ্চ শশ্বৎ সদনুজমনুজাদিত্যদৈত্যং সমন্তাৎ॥

গোলাকার পৃথিবী শূন্যমার্গে অবস্থিত; নিরাধার পৃথিবী নিজ শক্তিতে আকাশমণ্ডলে অবস্থিত এবং তাহার চতুর্দ্দিকে পৃষ্ঠোপরি দেব দানব মনুষ্যাদি বাস করিতেছে; তখন কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব আর্য্যেরা পৃথিবীর স্থিতি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ছিলেন? যখন ব্রহ্ম পুরাণে দেখিতে পাই যে,—

পর্ব্বকালে তু সম্প্রাপ্তে চন্দ্রার্কৌ ছাদয়িষ্যসি।
ভূমিচ্ছায়াগতশ্চন্দ্রং চন্দ্রগোঽর্কং কদাচন॥

পূর্ণিমাদি পর্ব্বদিনে তুমি পৃথিবীর ছায়ার মধ্যে থাকিয়া চন্দ্রকে এবং চন্দ্রের মধ্যে থাকিয়া সূর্য্যকে আচ্ছাদন করিবে; পুনরায় যখন জ্যোতিষ আচার্য্যদিগের গ্রন্থে দেখিতে পাই—

ছাদকো ভাস্করস্যেন্দুরধস্থো ঘনবদ্ভবেৎ।
ভূচ্ছায়াং প্রমুখশ্চন্দ্রো বিশত্যর্থো ভবেদসৌ॥

মেঘের ন্যায় চন্দ্র নিম্নে থাকিয়া সূর্য্যকে আচ্ছাদন করে এবং চন্দ্র পৃথিবীর ছায়ার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়; তখন কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইহা স্বীকার না করিবেন যে প্রাচীন আর্য্যগণ গ্রহণের তত্ত্ব সম্যক পরিজ্ঞাত ছিলেন? এই প্রকার যতই জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্বন্ধে বিচার করা যায় ততই এই সিদ্ধান্ত দৃঢ় হইবে যে প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে এই গভীর বিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। গণিত জ্যোতিষ ব্যতীত ফলিত জ্যোতিষ কার্য্যকারী হয় না। এই হেতু ভারতের ফলিত শাস্ত্রই গণিত শাস্ত্রের উন্নতির প্রকৃষ্টতম প্রমাণ। বর্ত্তমান কালের পাশ্চাত্য সংবাদ পাঠ করিলে জানা যায় যে ইয়ুরোপ ও আমেরিকাবাসীগণ এখন ক্রমে ক্রমে মেটিওরোলোজী (Meteorology) বিদ্যার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন পূর্ব্বক ফলিত জ্যোতিষের সত্যতায় আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছেন। আধুনিক ইয়ুরোপের এই ফলিত জ্যোতিষের প্রতি পক্ষপাতই আমাদের গণিত ও ফলিত জ্যোতিষ বিষয়ক সিদ্ধান্ত দৃঢ় করিতেছে।

পাশ্চাত্য মতে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কারক নিউটন (Newton) সাহেব। কিন্তু যখন দেখিতে পাই যে শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের উপদেশে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বিস্তৃত বিবরণ রহিয়াছে এবং ভাস্করাচার্য্য লিখিতেছেন যে—

আকৃষ্টশক্তিশ্চ মহী তয়া যৎ
খস্থো গুরুঃ স্বাভিমুখং স্বশক্ত্যা।
আকৃষ্যতে তৎ পততীতি ভাতি।
সমে সমন্তাৎ ক পতত্বিয়ং খে॥

পৃথিবী আকর্ষণ-শক্তিমতী কারণ কোন গুরু পদার্থকে উপরে নিক্ষেপ করিলে পৃথিবী আপন শক্তি দ্বারা উহাকে আকর্ষণ করিয়া লয় তাহাতেই ঐ পদার্থ পতিত হইতেছে বলিয়া বোধ হয় বাস্তবিক পক্ষে চারিদিকে অনন্ত শূন্যমার্গ সমভাবে রহিয়াছে সুতরাং কে কোথায় পতিত হইবে? পুনরায় যখন দেখি আর্য্যভট্ট বলিতেছেন—

আকৃষ্টশক্তিশ্চ মহী যত্তয়া প্রক্ষিপ্যতে তত্তয়া ধার্য্যতে।

পৃথিবী আকর্ষণশক্তিবিশিষ্ট, যেহেতু যাহা প্রক্ষিপ্ত হয় পৃথিবী তাহাকে নিজ শক্তি দ্বারা ধারণ করিয়া লয়; তখন কিরূপে বলিব যে নিউটন সাহেবই মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কারক? যখন নিউটন সাহেবের জন্মের সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বের গ্রন্থসমূহে এই বিজ্ঞানের প্রমাণ পাওয়া যায় তখন কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব যে এই নিয়ম ভারতবর্ষ হইতে আবিষ্কৃত হয় নাই; ইয়ুরোপ হইতে হইয়াছে? ইয়ুরোপের প্রসিদ্ধ বিদ্বান বেলী (Bailly) প্লেফেয়ার (Playfair) ও কেশেনী (Casseni) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে যে সকল জ্যোতিষগ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল তাহা আজিও পাওয়া যায়; ভারতবর্ষই জ্যোতিষ শাস্ত্রের আবিষ্কর্ত্তা। বর্ত্তমানকালের জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য অধ্যাপক কোলব্রুক (Colebrook) বিশিষ্ট প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন যে অতি প্রাচীন কালে জ্যোতিষগণনার প্রধান সহায়ক পৃথিবীর অয়নাংশ গতি এবং ক্রান্তিপাতের বক্রগতি প্রভৃতি নিয়ম ভরতবর্ষের পণ্ডিতগণই আবিষ্কার করিয়াছিলেন। অল্পদিন হইল ইয়ুরোপীয়গণ নানাপ্রকার যন্ত্রের সহায়তায় সৌরকলঙ্কের (Solar spots) অনুমান করিয়াছেন এবং তাঁহারা বলেন, তাঁহারাই এই নূতন সিদ্ধান্ত বাহির করিয়াছেন। কিন্তু আর্য্যশাস্ত্র পাঠ করিলে এই ভ্রম অতি সহজেই বিদূরীত হইবে। বিষ্ণু ও মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি পুরাণ এবং বরাহমিহির প্রভৃতির জ্যোতিষ সংহিতায় ইহার বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়। পুরাণে আখ্যায়িকারূপে লিখিত আছে যে, বিশ্বকর্ম্মা আপন 'ভ্রমী নামক

যন্ত্র সূর্য্যমণ্ডলে প্রয়োগ করিলে, ঐ অস্ত্র সূর্য্যমণ্ডলের যে যে অংশে স্পর্শ করিল সেই সেই স্থান কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গেল এবং ঐ সকল স্থান অতঃপর সৌরকলঙ্ক রূপে পরিগণিত হইল। প্রাচীন আর্য্যজাতিই এই শাস্ত্রের প্রধান গুরু, একথা একদেশদর্শী মুসলমানেরও সম্মত। আরবীয় "তারিকল হুক্মা" ও "খুলাশ তুল হিসাব" প্রভৃতি গ্রন্থে এই বিষয়ের প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐ সকল গ্রন্থে আর্য্য ভট্টের নাম "আজ্যভর" এবং ভাস্করাচার্য্যের নাম "বাখর" লিখিত হইয়াছে। এই সকল বিচারের দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ভারতবর্ষই এই প্রকার দুরবগাহ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তৎসম্বলিত গহন জ্যোতিষ শাস্ত্রের আদি গুরু। ভারতের এই শ্রেষ্ঠতা খ্রীষ্টান, মুসলমান সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন, সুতরাং এই মত সর্ব্ববাদী-সম্মত। গ্রীক ভাষার গ্রন্থ, রোমান ভাষার গ্রন্থ, আরবী ভাষার গ্রন্থ এবং অন্যান্য ইয়ুরোপীয় ভাষার গ্রন্থ সমূহ হইতে যখন ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে প্রাচীন আর্য্যজাতিই সমস্ত মনুষ্যজাতির পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রথম ভারতভূমিতে অসাধারণ শিল্প-নৈপুণ্য ও বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং যখন মহর্ষিগণের বিবিধ গ্রন্থে জ্যোতিষ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান ও অতুলনীয় যোগ বিজ্ঞানের বর্ণন দেখিতে পাওয়া যায় তখন নিরপেক্ষ বিদ্বান ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন যে ভারতবর্ষই বিজ্ঞানাদি বিষয়ক উন্নতির আদি গুরু।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে সামুদ্রিক কেরল স্বরোদয় ও জীবস্বর বিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্রের বিশেষরূপে উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। এতদিন পরে আজ-কাল ইয়ুরোপবাসীগণ ভারতের এই সকল শাস্ত্র দেখিয়া বিস্ময়-বিমুগ্ধ চিত্তে ইহার মহিমা প্রচার করিতেছেন। যদিও সামুদ্রিক শাস্ত্রের কিছু কিছু উন্নতি আজকাল ইয়ুরোপে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে তথাপি ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে প্রাচীনকালে এই স্থানে ইহার যতটা উন্নতি হইয়াছিল ঐ দেশে ততদূর উন্নতি হইতে এখনও যথেষ্ট বিলম্ব আছে। আজকাল ইয়ুরোপীয় বিদ্বানগণ নূতন বৈজ্ঞানিক উপায়ে মস্তিষ্কপরীক্ষা দ্বারা—অর্থাৎ মৃত মহাত্মা গণের মস্তিষ্ক বিশ্লেষণ করিয়া এই শাস্ত্রের উন্নতি করিতেছেন। কিন্তু ত্রিকাল-দর্শী মহর্ষিগণ স্বতই রেখা গণনা, মুখচিহ্ন গণনা প্রভৃতি যে সকল অতি সুগম রীতি সামুদ্রিক শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহা আজিও ইয়ুরোপ

হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় নাই। কেবল শাস্ত্রের দ্বারা নানাবিধ প্রকৃতি-ইঙ্গিত এবং জীবস্বর বিজ্ঞানের উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রকৃতিতে গুণবৈষম্য থাকায় যদিও তাহার স্বরূপে নানাপ্রকার ভেদ পরিলক্ষিত হয় তথাপি সর্ব্বব্যাপক চৈতন্য এক বলিয়া সকল বস্তুর অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে। যে প্রকার নিদ্রাবস্থায় কোন কোন সময়ে মন একাগ্র হওয়ায় ভূত, ভবিষ্যতের অদ্ভুত বিষয় স্বপ্নগোচর হয়, বিশেষ কোন কারণ ব্যতীত আপনা আপনি ভবিষ্যতের ঘটনাবলীর চিত্র নিদ্রাকালের সাম্যাবস্থায় প্রকাশিত হইয়া পড়ে সেই প্রকার জাগ্রত অবস্থায়ও জীবের মন প্রকৃত-ইঙ্গিত (হাঁচি, টিকটিকী, বাধা ও শকুনাদি) দ্বারা ভবিষ্যৎ ঘটনার অনুমান করিতে পারে। মন সূক্ষ্ম এবং ব্যাপক, এই হেতু নিদ্রাবস্থায়ই হউক কিম্বা জাগ্রত অবস্থায়ই হউক যখন সে সাম্যাবস্থায় উপনীত হয় তখন তাহার সহিত অপর জীবের বা অপর পদার্থের সম্বন্ধ হইতেই ভবিষ্যৎ ভাবের স্ফূর্ত্তি হইতে থাকে। এই সকল প্রাকৃতিক ভাব বুঝিতে এই শাস্ত্র সহায়তা করে। যোগিরাজ মহর্ষি পতঞ্জলি স্বীয় যোগসূত্রে প্রমাণিত করিয়াছেন যে, শব্দ হইতে অর্থের জ্ঞান, অর্থ হইতে ভাবের জ্ঞান এবং ভাব হইতে বোধ অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে। এই জন্য বাচ্য পদার্থ ও বাচকশব্দ এই উভয়ের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ থাকে এবং শব্দ হইতেই শব্দের উৎপত্তি-কারণ ভাবের পূর্ণ জ্ঞান হয়। এই নিমিত্ত এই বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরেই মহর্ষিগণ জীবস্বর বিজ্ঞান আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ইহার সহায়তায় তাঁহারা জীবমাত্রেরই সাম্যাবস্থার শব্দের দ্বারা ভবিষ্যৎ গণনা করিতে পারিতেন। যদিও আজকাল ইয়ুরোপ সামুদ্রিক স্বরোদয় শাস্ত্র কিয়ৎ পরিমাণে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে তথাপি জীবস্বর বিজ্ঞান এখনও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। কিন্তু ইহারই অনুরূপ "থটরিডিং" (Thought Reading) নামে অপর একটি বিজ্ঞান আবিষ্কার করিতেছে। ইহা দেখিয়া বিচক্ষণ ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন যে আমাদের আচার্য্যগণ প্রণীত জীবস্বর বিজ্ঞান শাস্ত্রে এই বিজ্ঞানের উন্নতির পরাকাষ্ঠা সাধিত হইয়াছিল। মন ও বায়ু একই পদার্থ অর্থাৎ বায়ুরূপী প্রাণকে জানিলে মনের জ্ঞান হইয়া থাকে। এই বায়ু-জ্ঞান দ্বারা মন-জ্ঞানের রীতিকে স্বরোদয় বলে। স্বরোদয় শাস্ত্র প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ। ইহা পাঠ করিলে জানা যায় যে ঋষিকালে

এই বিজ্ঞানের কতদূর উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। ইংরাজী, জার্ম্মান ও ফ্রেঞ্চ ভাষায় স্বরোদয় বিজ্ঞানের কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে উহা পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় আজকাল ইয়ুরোপবাসীগণ স্বরোদয় বিজ্ঞানের কিরূপ পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছেন। আধুনিক বহুসংখ্যক পাশ্চাত্য বিদ্বান ব্যক্তি এই শাস্ত্রের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং ইহার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি উপলব্ধি করিয়া শতমুখে ইহার প্রশংসা করিতেছেন।

প্রাচীন আর্য্যজাতির মধ্যে সঙ্গীত বিদ্যা পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। তাঁহাদের তৃতীয় উপবেদ সঙ্গীত শাস্ত্র গন্ধর্ব্ববেদ নামে খ্যাত। আধুনিক ইয়ুরোপ-বাসীগণ এই শাস্ত্রকে কেবল শিল্পরূপে মনে করেন এবং ইহা দ্বারা কেবল বৈষয়িক আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। পরন্তু প্রাচীন আর্য্যদের এই বিদ্যা সেরূপ ছিল না। সে সময় ইহার এতদূর উন্নতি হইয়াছিল যে তখন সঙ্গীতশাস্ত্র এক প্রধান বিজ্ঞান-শাস্ত্ররূপে পরিগণিত হইত এবং ইহার সহিত আধ্যাত্মিক জগতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল।

যেখানে ক্রিয়া তথায় শব্দ অবশ্য হইবে। ক্রিয়া-শক্তির ন্যূনতা বশতঃ উহার শব্দ শ্রুতি গোচর না হইতে পারে কারণ ইন্দ্রিয় সূক্ষ্মতর বিষয় গ্রহণ করিতে পারে না, তথাপি যেখানে ক্রিয়া সেখানে কম্পন এবং যেখানে কম্পন তথায় কোন না কোন প্রকার শব্দ অবশ্যই হইবে। ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ক্রিয়াও এক প্রকার কার্য্য এবং সমষ্টিরূপে ঐ ক্রিয়ার ধ্বনির নাম প্রণব বা ওঁকার। শাস্ত্রে ওঁকারের এইরূপ লক্ষণ লিখিত হইয়াছে যে,—

তৈলধারামিবাচ্ছিন্নং দীর্ঘঘণ্টানিনাদবৎ।

এই ধ্বনি যোগীগণ স্বতই শুনিতে পান। যে প্রকার সমষ্টিরূপ প্রকৃতির ধ্বনি ওঁকার সেই প্রকার ব্যষ্টিরূপ নানা প্রকৃতির ধ্বনি নানা স্বর। নানা স্বর-রূপী নানা প্রকৃতির আবির্ভাব করিবার জন্যই সঙ্গীত শাস্ত্র রচিত হইয়াছে।

বেদানাং সামবেদোঽস্মি।

এই ভগবদ্বাক্যের দ্বারা সামবেদের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই বেদ সঙ্গীত শাস্ত্রের সাহায্যে পঠিত হইয়া থাকে। সঙ্গীতের মধুরতার প্রভাবেই সাম-বেদ অন্যান্য বেদ হইতে শীঘ্র মনুষ্যের হৃদয় আকৃষ্ট করে। ইয়ুরোপ সঙ্গীত বিদ্যার পক্ষপাতী হইলেও যখন প্রোফেসর বোয়লার (Professor Boiler) প্রভৃতি পাশ্চাত্য সঙ্গীতাচার্য্যগণকে ভারতবর্ষীয় রাগরাগিণী কৌশলের প্রশংসা করিতে দেখিতে পাই তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে ইয়ুরোপের বিদ্বানগণ আমাদের সঙ্গীত বিদ্যার উন্নতি দেখিয়া মোহিত হইয়াছেন। আর্য্য-ঋষি কালে এই সঙ্গীত শাস্ত্রের দ্বারা ১৬০০০ ষোল হাজার রাগ রাগিণী গীত হইত এবং উহাদের সহিত ৩৩৬ তিন শত ছত্রিশ তাল বাজিত।

নারীধর্ম্ম।

[স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী।]

বিধবাবস্থা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এই প্রকার ইন্দ্রিয় চরিতার্থ মূলক বিবাহে জঘন্য প্রবৃত্তি পূরণ মাত্র লক্ষ্য হওয়ায় সূক্ষ্ম অপেক্ষা স্থূলেই তাহার সমধিক প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়। এই জন্য ওখানে সূক্ষ্ম গৌণ ও স্থূল মুখ্য স্থান অধিকার করে। ইহা পশু বিবাহ অথবা পশু-প্রকৃতি মনুষ্যের বিবাহ। আর্য্য জাতি যথেচ্ছাচার পরায়ণ পশু নহেন। অতএব ইন্দ্রিয় পরতন্ত্র পশুভাব কখনও আর্য্যত্বের জ্ঞাপক হইতে পারে না তাহা অনার্য্যত্বেরই জ্ঞাপক। অনাদিকাল হইতে আর্য্যগণ সুপবিত্র দেবভাবে ভাবিত হইয়া আসিতেছেন, সুতরাং কালুষ্য বিহীন দিব্য ভাবই আর্য্যের যথার্থ লক্ষণ। আর্য্য ও অনার্য্যের পার্থক্য নির্দ্ধারণ বিষয়ে যতগুলি কারণ আছে, ইহাও তাহাদের অন্যতম কারণ। এই নিমিত্ত শান্তি-কামী সংযম-পরায়ণ আর্য্যদিগের শাস্ত্রনিবহে কেবল স্থূল ভোগলক্ষ্য করিয়া বিবাহ বিহিত হয় নাই; কেননা, তাহারা জানিতেন যে ভোগ উদেশ্যে বিবাহ ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইলে বলবতী ভোগ-স্পৃহা অচিরে আর্য্যত্ব ও মনুষ্যত্বকে বিধ্বংস করিবে এবং মনুষ্যকে পশু হইতেও অধম করিয়া দিবে। অতএব আর্য্যজাতির বিবাহ-ভোগ স্পৃহা বৃদ্ধির জন্য নহে কিন্তু স্বাভাবিক ও অবৈধ ভোগেচ্ছা নিবৃত্তির নিমিত্ত। স্ত্রী তাহার স্বাভাবিক পুরুষ-সহবাসেচ্ছাকে অন্য পুরুষ হইতে ফিরাইয়া কেবল এক পতিতে কেন্দ্রীভূত করতঃ এক পতিব্রত অবলম্বনে একাগ্রতাসাধন পূর্ব্বক পতিতে তন্ময় হইয়া মুক্তিপদ প্রাপ্ত হইবে ইহাই স্ত্রীলোকের বিবাহের উদ্দেশ্য। এইরূপ পুরুষও নিজ নৈসর্গিক অনর্গল স্ত্রী-সম্ভোগ-ইচ্ছাকে এক স্ত্রীতে কেন্দ্রীভূত করিয়া সেই প্রকৃতিকে দেখিতে দেখিতে তাহা হইতে পৃথক হইয়া পরম পদ প্রাপ্ত হইবে ইহাই পুরুষের বিবাহের চরম লক্ষ্য। একমাত্র পতিকে অনবরত চিন্তা করিয়া তন্ময় হওয়া স্ত্রী জাতির ধর্ম্ম। সে স্থলে দ্বিতীয়কে গ্রহণ করিলে একাগ্রতার অভাব হেতু তন্ময় হওয়া অসম্ভব এবং মুক্তিলাভ করাও দুঃসাধ্য। এই জন্য একপতিব্রত স্ত্রীলোকের পক্ষে পরম ধর্ম্ম। যথাযথ ভাবে সৃষ্টিধারা অক্ষুন্ন রাখিয়া চলা ও বংশপরম্পরাগত সম্বন্ধ স্থায়ী করিয়া প্রকৃতিকে দেখিতে দেখিতে তাহা হইতে ভিন্ন হইয়া মুক্তিলাভ করা পুরুষের ধর্ম্ম। উক্ত উভয় উদ্দেশ্য যদি-একটী স্ত্রী হইতে সিদ্ধ হয় তবে পুরুষের পুনরায় দ্বিতীয় বিবাহ করিবার প্রয়োজন নাই। পক্ষান্তরে নিষ্প্রয়োজনে দ্বিতীয়

বিবাহ করা অধর্ম্ম ও অনার্য্যোচিত কার্য্য বলিয়া সর্ব্বথা নিন্দনীয়। আর যদি প্রবৃত্তিমার্গের উপর বিতৃষ্ণা বশতঃ চিত্তবৃত্তি স্বতঃই উহা হইতে উপরত হইয়া নিবৃত্তিমার্গাবলম্বী হয় ও চিত্তগত বাসনা সমূহ ভগবচ্চরণারবিন্দে যাইয়া বিলীন হয়, তবেও এরূপ অবস্থায় পুরুষের আবার দ্বিতীয় বিবাহ নিষ্প্রয়োজনীয়। এবং এরূপ পুরুষের প্রথম বিবাহেরও কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু বংশ রক্ষা করার প্রবৃত্তি থাকিলে ও প্রকৃতি হইতে পৃথক হইবার জন্য প্রকৃতিকে দেখিতে হইলে দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ পুরুষের কর্ত্তব্য। এথানে স্মরণ রাখা উচিত যে উক্ত বিবাহ স্ত্রী বিলাসে মত্ত থাকিবার জন্য নহে কারণ, ভোগতৃষ্ণায় যেথানে বিবাহ করা হয় সেথানে ভোগপিপাসার নিবৃত্তি না হইয়া বরং আহুতি সম্বর্দ্ধিত বহ্নির ন্যায় তাহা প্রতিনিয়ত বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। উক্ত কারনে বংশরক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বিবাহের এই লক্ষ্য হওয়া উচিত যে স্বাভাবিক ভোগ বাসনা কেন্দ্রীভূত হইয়া ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া যায় ও পরিশেষে পুরুষ প্রকৃতি হইতে পৃথক হইয়া স্বরূপে সংস্থিত হইতে সমর্থ হয়। এই প্রকার অধিকারানুসারে দ্বিতীয় বিবাহ পুরুষের পক্ষে কল্যাণকর হইয়া থাকে। কিন্তু এইরূপ দ্বিতীয় বিবাহ স্ত্রীলোকের পক্ষে ধর্ম্ম নহে, যেহেতু স্ত্রী পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া মুক্তিলাভ করিতে পারে না। অধিকন্তু পুরুষে তন্ময় ও লয় হইয়াই স্ত্রী মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। যদ্দ্বারা শীঘ্র লয়ের সাহায্য হয় স্ত্রীলোকের পক্ষে তাহাই ধর্ম্ম। এক পতিব্রত অনুষ্ঠানের ফলে একাগ্রতা লাভ করিলে স্ত্রী শীঘ্র পতির স্বরূপে লয় হইয়া যায়। অনেক পতি হইলে সেই একাগ্রতা হওয়া অসম্ভব। অতএব মুক্তির জন্য এক পতিব্রতই স্ত্রীলোকের একমাত্র ধর্ম্ম। বহু বিবাহ কথনও স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম হইতে পারে না। তাহার উপর আবার স্ত্রীলোকের বিষয় বাসনায় ও পুরুষের বিষয় বাসনায় অত্যন্ত প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। পুরুষের বিষয় বাসনার একটা সীমা আছে সেইজন্য সে শাস্ত্রোক্ত বিবাহ বিধি অনুসারে শুদ্ধভাবযুক্ত হইয়া একাধিক বিবাহ করিলেও কালে নিবৃত্তি-পথাবলম্বী হইতে পারে এবং প্রকৃতি হইতে পৃথক হইয়া নিত্যানন্দময় মুক্তি পদেরও অনায়াসে অধিকারী হইতে পারে। কিন্তু স্ত্রীলোকের বিষয়-বাসনা অসীম। তাই সেথানে বিষয় বাসনায় বৃদ্ধির সুযোগ দেওয়া কেবল আর্য্যত্বের ও শুদ্ধভাবের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া পশুত্বের

অবাধে বিস্তার করা মাত্র। যেখানে প্রবৃত্তি স্বাভাবিকরূপে সীমা-রহিত সেখানে শুদ্ধভাব যুক্ত প্রবৃত্তি কখনও হইতে পারে না, কারণ তথায় ভাবশুদ্ধি হওয়া অসম্ভব। এইহেতু সেখানে নিবৃত্তি-প্রধান অথবা তপঃপ্রধান ধর্ম্মের উপদেশ করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়, যাহাতে নৈসর্গিক অসীম প্রবৃত্তি সমূহ প্রসার লাভ করিত না পারে। এক-পতিব্রত দ্বারা তাহাই সিদ্ধ হইয়া থাকে। বহু পুরুষ গ্রহণ করিলে তাহা হইতে পারে না। এই জন্য স্ত্রীজাতির পক্ষে বহু বিবাহ কখনই উন্নতিকর নহে, পরন্তু অত্যন্ত দোষাবহ ও অধোগতি জনক।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, প্রকৃতির যে অবস্থায় পুরুষ-শক্তির সহিত স্ত্রী-শক্তির কেবল স্থূল সম্বন্ধ স্থাপিত হয় তাহা পাশবিক ও অনার্য্য ভাব বিশিষ্ট। মনুষ্য অনার্য্য ভাব পরিত্যাগ করিয়া আর্য্য ভাবের দিকে যতই অগ্রসর হয় ততই স্থূল সম্বন্ধ গৌণ হইয়া সূক্ষ্ম সম্বন্ধ মুখ্যত্ব অর্থাৎ প্রাধান্য লাভ করে। বিবাহকালে আর্য্য স্ত্রীর পতির সহিত সম্বন্ধ স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, এই ত্রিবিধ শরীর ও আত্মা লইয়া স্থাপিত হয়। এবং এইরূপ পরস্পর বিজড়িত ভাবে সম্বন্ধযুক্ত হয় বলিয়া পতি পরলোকে প্রস্থিত হইলেও স্ত্রীর সহিত তাহার সম্বন্ধ অক্ষুন্ন ভাবে থাকে। কারণ কেবল স্থূল শরীরের পরিবর্ত্তনই মৃত্যু নামে প্রসিদ্ধ। সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরে এবং আত্মায় কিঞ্চিৎমাত্রও পরিবর্ত্তন হয় না। আর্য্য-শাস্ত্রোক্ত বিবাহে কিরূপ সুদৃঢ় সম্বন্ধ হইয়া থাকে, তাহার বিশদ বর্ণনা বেদে দেখিতে পাওয়া যায় যথা—

প্রাণৈস্তে প্রাণান্ সন্দধাম্যস্থিভিরস্থীনি মাংসৈর্মাংসানি ত্বচা ত্বচমিতি।

প্রাণ প্রাণের সহিত, অস্থি অস্থির সহিত, মাংস মাংসের সহিত ও ত্বক ত্বকের সহিত সম্বন্ধ যুক্ত হইতেছে। আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে—

গৃভ্ণামি তে সৌভগত্বায় হস্তং ময়া পত্যা জরদষ্টির্যথাসঃ।
ভগোঽর্য্যমা সবিতা পুরন্ধির্ম্মহ্যং ত্বাদুর্গার্হপত্যায় দেবাঃ।
অমোহমস্মি সা ত্বং সাত্বমস্যমোহং।
সামাহমস্মি ঋক্ ত্বং দ্যৌরহং পৃথিবী ত্বং।
তাবেহি বিবহাবহৈ সহরেতো দধাবহৈ।
প্রজাং প্রজনয়াবহৈ পুত্রান্ বিন্দাবহৈ বহূন্।

তোমার সৌভাগ্যের জন্য আমি তোমার পাণি গ্রহণ করিতেছি। তুমি এইরূপে বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত পাতিব্রত্য পালন করিতে থাক। গৃহাস্থাশ্রম পালনের জন্য ভগ, অর্য্যমা, সবিতা ও পুরন্ধি নামক দেবতাগণ তোমায় আমাকে অর্পণ করিয়াছেন। আমি 'অম্' তুমি 'সা' তুমি 'সা' আমি 'অম্'। তুমি ঋগ্বেদ, আমি সামবেদ। আমি দ্যৌ, তুমি পৃথিবী। এস আমরা দুইজনে বিবাহিত হই ও ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করিয়া প্রজা উৎপন্ন করি এবং বহু পুত্র লাভ করি। নিখিল জ্ঞানাধার বেদ এইরূপে আর্য্য জাতির বিবাহে স্থূল শরীরের সহিত স্থূল শরীরের ও সূক্ষ্ম শরীরের সহিত সূক্ষ্ম শরীরের সম্বন্ধ বিধানের আজ্ঞা দিয়াছেন; তাই পতিব্রতা সতীর সম্বন্ধ পতির মৃত্যুর পরেও তাহার সূক্ষ্ম শরীর ও আত্মার সহিত বিদ্যমান থাকে। স্মৃতিশাস্ত্র প্রণেতা মহর্ষিগণও উক্ত সম্বন্ধানুযায়ী স্ত্রীর কর্ত্তব্য ও তাহার ফল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ত্রিকাল-দর্শী মনু বলিয়াছেন যে—

> কামন্তু ক্ষপয়েদ্দেহং পুষ্পমূলফলৈঃ শুভৈঃ।
> ন তু নামাপি গৃহ্লীয়াৎ পত্যৌ প্রেতে পরস্য তু॥
> আসীতামরণাৎ ক্ষান্তা নিয়তা ব্রহ্মচারিণী।
> যো ধর্ম্ম একপত্নীনাং কাঙ্ক্ষন্তী তমনুত্তমম্॥
> অনেকানি সহস্রানি কুমারব্রহ্মচারিণাম্।
> দিবং গতানি বিপ্রাণামকৃত্বা কুলসন্ততিম্॥
> মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যব্রতে স্থিতা।
> স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥

সতী স্ত্রী পতির মৃত্যুর পরে ফল, মূল, ফুল দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিবে। এবং পতি ব্যতীত অন্য পুরুষের নাম পর্য্যন্ত গ্রহণ করিবে না। আরও আজীবন ক্লেশসহিষ্ণু, নিয়মপরায়ণা ও ব্রহ্মচারিণী হইয়া পতিব্রতা স্ত্রীর ন্যায় আচরণ করিবে। বহু সহস্র আকুমার ব্রহ্মচারী পুত্র উৎপাদন না করিয়াও কেবল ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারাই স্বর্গে গমন করিয়াছেন। অতএব পতির মৃত্যুর পর যে সতী নারী কুমার ব্রহ্মচারীর সদৃশ কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করে, সে পুত্রহীনা হইলেও একমাত্র দুষ্কর ব্রহ্মচর্য্যের বলেই স্বর্গধামে গমন করিতে সমর্থ হয়। এই প্রকার বিষ্ণুসংহিতায়ও দেখিতে পাওয়া যায় যে—

> মৃতে ভর্ত্তরি ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারোহণং বা।

পতি বিয়োগ হইলে সতী নারী ব্রহ্মচারিণী হইবে অথবা পতির সহিত সহমৃতা হইবে। হারীত সংহিতায় লেখা আছে যে—

যা স্ত্রী মৃতং পরিষ্বজ্য দগ্ধা চেদ্ধব্যবাহনে।
সা ভর্তৃলোকমাপ্নোতি হরিণা কমলা যথা॥

মৃত পতির সহিত যে স্ত্রী সহমৃতা হয়, লক্ষ্মী যেমন নারায়ণের সহিত সর্ব্বদা বাস করেন, সেইরূপ উক্ত সহমৃতা সতী পতির সহিত পতিলোকে নিরন্তর বাস করেন। দক্ষসংহিতায় আছে যে—

মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী সমারোহেদ্ধুতাসনং।
সা ভবেত্তু শুভাচারা স্বর্গলোকে মহীয়তে॥

পতির মৃত্যুর পর যে নারী পতির সহিত অগ্নিতে প্রবেশ করে সে সদাচার সম্পন্না বলিয়া জগতে বিখ্যাত ও স্বর্গলোকে পূজিত হইয়া থাকে। এইরূপ মহর্ষি পরাশর লিখিয়াছেন যে—

মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্য্যব্রতে স্থিতা।
সা মৃতা লভতে স্বর্গং যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥
তিস্রঃ কোট্যর্দ্ধকোটী চ যানি লোমানি মানবে।
তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গে ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি॥

পতির মৃত্যুর পর যে স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন, ব্রহ্মচারীদিগের ন্যায় তাহার অনন্তকাল স্বর্গলোকে বাস হইয়া থাকে। আর যে স্ত্রী সহমৃতা হন তিনি মনুষ্য শরীরস্থিত সাড়ে তিন কোটী লোম পরিমিত বর্ষ স্বর্গ সুখ ভোগ করেন। এইরূপে পাতিব্রত্যের পূর্ণ অনুষ্ঠানের দ্বারা ব্রহ্মচারিণী সতী স্ত্রী কিরূপ অসাধারণ শক্তি সম্পন্না হন তাহা স্মৃতিকারগণ ভূয়ো ভূয়ো বর্ণন করিয়াছেন। মহর্ষি হারীত লিখিয়াছেন যে—

ব্রহ্মঘ্নং বা সুরাপং বা কৃতঘ্নং বাপি মানবম্।
যমাদায় মৃতা নারী তং ভর্ত্তারং পুনাতি সা॥

পতি যদি ব্রহ্মহত্যাকারী, সুরাপানকারী অথবা কৃতঘ্ন হয় তথাপি সহমৃতা সতী স্ত্রী স্বীয় সতীত্বের তীব্র তেজের দ্বারা তাহাকে পবিত্র করিয়া নরক হইতে উদ্ধার করেন। মহর্ষি পরাশর ও দক্ষ বলিয়াছেন যে—

ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বিলাদুদ্ধরতি বলাৎ।
এবমুদ্ধৃত্য ভর্ত্তারং তেনৈব সহ মোদতে॥

যেমন, সাপুড়িয়া গর্ত্ত হইতে সাপকে বলপূর্ব্বক বাহির করিয়া আনে সেই প্রকার সতী স্ত্রী আপনার পতিকে অধোগতি হইতে পরিত্রাণ করিয়া তাহার সহিত নিরুপম স্বর্গ সুখ ভোগ করিয়া থাকেন। মৎস্য পুরাণে সতীর শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে বর্ণিত আছে যে—

তত: সাধ্ব্যঃ স্ত্রিয়ঃ পূজ্যাঃ সততং দেববজ্জনৈঃ।
তাসাং রাজ্ঞা প্রসাদেন ধার্য্যতেঽপি জগত্রয়ম্॥

সতী নারীগণ দেবতার সদৃশ সকলের পূজনীয়া। কারণ, তাহাদের অনুগ্রহে রাজা ত্রিভুবন পালন করিতে সমর্থ হন। স্কন্দপুরাণে লেখা আছে যে—

পুরুষাণাং সহস্রঞ্চ সতী স্ত্রী হি সমুদ্ধরেৎ।
পতিঃ পতিব্রতানাঞ্চ মুচ্যতে সর্ব্বপাতকাৎ॥
নাস্তি তেষাং কর্ম্মভোগঃ সতীনাং ব্রততেজসা।
তয়া সার্দ্ধঞ্চ নিষ্কর্ম্মী মোদতে হরিমন্দিরে॥

সতী নারী স্বীয় পতিব্রত্যের মহিমায় সহস্র সহস্র পুরুষকে উদ্ধার করিয়াছেন। পাতিব্রতাগণের পতি সমস্ত পাপ হইতে অনায়াসে অব্যাহতি লাভ করেন। এবং তাহাদের কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয় না কারণ, সতির পাতিব্রত্যের পবিত্র তেজে তাহারা কর্ম্মবন্ধন মুক্ত হইয়া দিব্য জ্যোতির্ম্ময় দেহ ধারণ করতঃ বৈকুণ্ঠাদি লোকে গমন পূর্ব্বক সানন্দে বিহার করেন। আর্য্য শাস্ত্র সমূহে এই প্রকার ললনাকুলললামভূতা সীতা সাবিত্রী প্রভৃতি আর্য্য ললনাগণের পিতৃকুল, মাতৃকুল ও পতিকুলোদ্ধারিণী পাতিব্রত্যশক্তির ভূয়সী বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়; যাহা নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে বিখ্যাত এবং যাহার পবিত্র মহিমা অন্য দেশীয়গণের ধারণার অতীত। বেদে বর্ণিত আছে যে—

সং পত্নী পত্যা সুকৃতেন গচ্ছতাং যজ্ঞস্য যুক্তৌ ধূর্য্যাবভূতাং সংজানানে বিজিহতামরাতীর্দ্দিবি জ্যোতিরজরমারভেতাম্।

এই মন্ত্রে পতির সহিত সতী স্ত্রীর পরলোক বাসের বর্ণন দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রকার অথর্ব্ব বেদেও আছে যে—

ইয়ং নারী পতীলোকং বৃণানা......ধর্ম্মং পুরাণমনুপালয়ন্তী।

ইত্যাকার বহু মন্ত্র দ্বারা বেদ পতিলোক লিপ্সু সতীর জন্য সনাতন পাতিব্রত্য ধর্ম্ম পালনের আজ্ঞা দিয়াছেন।

এখন, এরূপ আর্য্য ভাবাপন্ন বিধবা সতী স্ত্রীর জীবন তটিনী পতি প্রেমরূপী সমুদ্রের দিকে প্রশান্ত ধীর গমনে কিরূপে অগ্রসর হয় তাহার বর্ণনা করা হইতেছে। সৃষ্টির পূর্ব্বে পরম পুরুষ পরমাত্মার হৃদয়ে সৃজন বাসনা সমুদিত হওয়া মাত্রই তাঁহা হইতে প্রকৃতি প্রকটিত হইয়াছেন। এজন্য প্রকৃতি পরমাত্মার ইচ্ছারূপিণী বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইচ্ছা মনোধর্ম্ম এবং সেই ইচ্ছারূপিণী প্রকৃতির অংশ হইতে স্ত্রীজাতি উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব পুরুষের সহিত স্ত্রীর মানসিক সম্বন্ধ অর্থাৎ সূক্ষ্ম শরীরের সম্বন্ধ স্বাভাবিক। এবং স্বাভাবিক হওয়াতেই মুক্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইহার নাশ অসম্ভব। সূক্ষ্ম ব্যতীত স্থূল শরীরের সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে না অতএব স্থূল শরীরের সম্বন্ধ সূক্ষ্ম-মূলক। এজন্য পতির মৃত্যুতে স্থূল শরীরের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলেও সূক্ষ্ম সম্বন্ধ মুক্তি পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ-ভাবে বিদ্যমান থাকে। আজ কাল পাশ্চাত্য বিদ্বানগণ বিজ্ঞান শাস্ত্রালোচনা দ্বারা স্থূল জগত হইতে অতিরিক্ত সূক্ষ্ম জগতের কিছু কিছু প্রত্যক্ষ আভাস পাইতেছেন। এক মনের সহিত অন্য মনের মনোজগতে কিরূপে সম্বন্ধ হইতে পারে, কোন এক মনে আঘাত লাগিলে মানসিক সমুদ্রে তরঙ্গ উৎপন্ন হইয়া তাহার প্রভাব বহুদূর পর্য্যন্ত যাইয়া কিরূপে ব্যাপক মনকে আলোড়িত করিতে পারে, এবং আধুনিক আবিষ্কৃত তারহীন টেলিগ্রাফ (wereless telegraphy) যন্ত্রের ন্যায় পরস্পর সম্মিলিত মনোযন্ত্র সমূহে কথোপকথন ও সুখদুঃখের অনুভব কিরূপে হইতে পারে, এই সকল বিষয়ে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎ বিদ্বানগণের চিত্ত আকৃষ্ট হওয়ায় মানসিক জগতে শত শত নবীন চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইতেছে এবং উল্লিখিত সিদ্ধান্তানুসারে টেলিপেথী (telepathy) আদি কয়েক প্রকার অত্যাশ্চর্য্যকর বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। আর্য্য মহর্ষিগণ প্রথমে সূক্ষ্মকে দেখিয়া পরে উহারই ঘনীভূত বিকাশরূপ স্থূল জগতকে দেখিতেন এজন্য তাঁহাদের সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় দৃষ্টির নিকটে উক্ত সমস্ত বিষয় করস্থিত আমলকীর ন্যায় যথাযথ ভাবে প্রকাশিত হইত। পরলোকগত পিতৃগণের সহিত মনোরাজ্যে পুত্রের সম্বন্ধ হইয়া কিরূপে মন, মন্ত্র ও দ্রব্যশক্তিদ্বারা তাঁহাদের মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইতে পারে, তাহা

মহর্ষিগণ উত্তমরূপে জানিতেন। এবং পবিত্র নিত্যানন্দপ্রদ সুবিশাল সূক্ষ্ম জগতের নিকটে স্থূল জগৎ নিতান্ত ক্ষুদ্র, দুঃখ বহুল ও অকিঞ্চিৎকর ইহাও তাঁহাদের নেত্রের নিকট নিরন্তর প্রতিভাসিত হইত। তাই তাঁহারা পশুভাব প্রধান স্থূল শরীর সম্বন্ধীয় বিবাহ বিজ্ঞান ও বহু পুরুষ সম্বন্ধকে অধর্ম্ম জানিয়া একমাত্র পাতিব্রত্যেরই মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সাধব্যাবস্থায় পতির প্রত্যক্ষ সাকার মূর্ত্তি সতত উপাস্য হওয়ায়, সধবা সতীনারীর জীবন গৃহস্থাশ্রমী পুরুষের তুল্য; এবং ত্যাগী সন্ন্যাসী যেমন নির্গুণ নিরাকার উপাসনার অধিকারী হন তদ্রূপ, বিধবার জীবনও ত্যাগময়, শান্তিময় ও স্বার্থশূন্য হওয়ায় সন্ন্যাসিনীর ন্যায় তিনিও পতির নিরাকারস্বরূপ উপাসনার অধিকার লাভ করিয়া থাকেন। অধিকার বিরুদ্ধ উপাসনা অধর্ম্ম নামে অভিহিত। মহর্ষিগণের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সংসারে ধর্ম্মের প্রচার করা, অধর্ম্মের নহে, সুতরাং তাঁহারা বিধবা স্ত্রীর ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ কামনা করিয়া তাহাদের জন্য ত্যাগময় সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

মহর্ষি হারীত বলিয়াছেন যে—

কেশরঞ্জনতাম্বুলগন্ধপুষ্পাদিসেবনম্।
ভূষণং রঙ্গবস্ত্রঞ্চ কাংস্যপাত্রেষু ভোজনম্॥
দ্বিবারভোজনং চাক্ষ্ণো রঞ্জনং বর্জয়েৎ সদা।
স্নাত্বা শুক্লাম্বরধরা জিতক্রোধা জিতেন্দ্রিয়া॥
নকল্পকুহকা সাধ্বী তন্দ্রালস্যবিবর্জ্জিতা।
সুনির্ম্মলা শুভাচারা নিত্যং সম্পূজয়েদ্ধরিম্॥
ক্ষিতিশায়ী ভবেদ্রাত্রৌ শুচৌদেশে কুশোত্তরে।
ধ্যানযোগপরা নিত্যং সতাং সঙ্গে ব্যবস্থিতা॥
তপশ্চরণসংযুক্তা যাবজ্জীবং সমাচরেৎ।
তাবত্তিষ্ঠেন্নিরাহারা ভবেদ্ যদি রজস্বলা॥

অন্য শাস্ত্রে এইরূপ বর্ণিত আছে যে—

দ্বির্ভোজনং পরান্নঞ্চ মৈথুনামিষভূষণম্।
পর্য্যঙ্কং রক্তবাসশ্চ বিধবা পরিবর্জ্জয়েৎ॥
নাঙ্গমুদ্বর্ত্তয়েদ্বাসৈ গ্রাম্যালাপমপি ত্যজেৎ।
দেবব্রতা নয়েৎ কালং বৈধব্যং ধর্ম্মমাশ্রিতা॥

কমলা কমলাসীনা ।

নব পর্য্যায়।

অকুণ্ঠং সর্ব্বকার্য্যেষু ধর্ম্ম-কার্য্যার্থমুদ্যতম্‌।
বৈকুণ্ঠস্য হি যদ্রূপং তস্মৈ কার্য্যাত্মনে নমঃ

২য় ভাগ, ৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা। আশ্বিন ও কার্ত্তিক, ১৩২৭।

প্রাচীন বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

[শ্রীরাজেন্দ্র নাথ কাঞ্জিলাল, M.A., B L.]

সুদূর অতীতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, বঙ্গভাষার শৈশবের ইতিহাস ঘোর কুহেলিকাচ্ছন্ন প্রতীয়মান হইবে। অধুনা ভাষাবিৎ পণ্ডিতগণ "বৌদ্ধ-যুগে" ইহার মূল স্থাপন পূর্ব্বক বিবিধ গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন এবং তৎকালীন বঙ্গভাষার নিদর্শনস্বরূপ কয়েকখানি বৌদ্ধগ্রন্থেরও উদ্ধার সাধন করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে এই মূল তত্ত্বানুসন্ধানে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু, রায়সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন ও বঙ্গভাষাতত্ত্বজ্ঞ শ্রীযুক্ত বিজয় চন্দ্র মজুমদার প্রমুখ পণ্ডিতগণ এক নবযুগের সূচনা করিয়াছেন। আজ আমরা পূর্ব্বোক্ত প্রথিতনামা লেখকগণের বিপুল পরিশ্রমলব্ধ ফললাভে আপনাদিগকে কৃতার্থ ও গৌরবান্বিত জ্ঞান করিতেছি। তাঁহাদেরই অনুগ্রহে একণে ডাকার্ণব, ডাকতন্ত্র, চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয়, বোধিচর্য্যাবতার, শূন্যপুরাণ, হাকন্দপুরাণ, ধর্ম্ম-মঙ্গল, শিবায়ন, পালরাজগণের গান, ময়নামতীর গান, নেপালে বাঙ্গলা নাটক প্রভৃতি গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত।

বৌদ্ধযুগের তিমিরাচ্ছন্ন কুজ্ঝটিকা ভেদ করিয়া বঙ্গভাষায় "পৌরাণিক-সংস্কারযুগের" আবির্ভাব। বৌদ্ধ ভূপতিগণের কীর্ত্তিকলাপ ঘোষণার্থে এবং বৌদ্ধধর্ম্মের সাম্যমত প্রচারার্থে বঙ্গভাষা তৎকালে প্রাকৃত-বহুল নিরাভরণ সাধারণের বোধগম্য সহজ সরল গ্রাম্য ভাষায় পরিণত হইয়াছিল, কিন্তু

হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থানকারী ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ উক্ত ভাষার প্রতি বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা বৌদ্ধ পুরোহিতবর্গের প্রবর্ত্তিত অসংস্কৃত ও অমার্জ্জিত গৌড়ীয় প্রাকৃত ঘৃণার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। সংস্কৃত-সাহিত্যানুরাগী পণ্ডিতগণ সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্র ও টীকা-টিপ্পনীর প্রতি স্বভাবতঃই একান্ত অনুরক্ত। তাঁহাদের অমূল্য গ্রন্থরাজি ব্যাকরণদুষ্ট অসংস্কৃত ভাষা রচনায় নিবদ্ধ হইয়া প্রচারিত হইবে, ইহা তাঁহাদিগের নিকট অসহনীয় হইয়া উঠিল। ইহার পরিণামে কিয়ৎকালের জন্য বঙ্গভাষার উন্নতির পথ নিরুদ্ধ হইল--বৌদ্ধ পুরোহিতবর্গের প্রভুত্বাবসানের সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতমূলক বঙ্গভাষার শোচনীয় দশা উপস্থিত হইল।

বঙ্গভাষার এই দুর্দ্দিনে বিধাতার বিধানে পাঠানগণ বঙ্গদেশ জয় করিলেন। ইতিহাস প্রসিদ্ধ বখতিয়ার খিলিজি ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশে মহম্মদীয় পতাকা উড্ডীন করিলেন। মুসলমান শাসন-কর্ত্তৃগণ বঙ্গবাসিগণের সহিত একত্র বাসহেতু ক্রমে ক্রমে বঙ্গভাষা শিক্ষা করিলেন এবং হিন্দুদিগের পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ ও মহাকাব্যসকলের সার মর্ম্ম অবগত হইবার জন্য কৌতূহলক্রান্ত হইলেন ; কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় নিতান্ত অনভিজ্ঞতাহেতু তাঁহারা হিন্দুরাজগণের ন্যায় সহিষ্ণুতা সহকারে হিন্দুকাব্য গ্রন্থাদির সংস্কৃত ব্যাখ্যা শ্রবণে পরাঙ্মুখ ছিলেন। সুতরাং তাঁহারা বঙ্গভাষাবিৎ পণ্ডিতগণকে ঐ সকল গ্রন্থ বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিবার জন্য নিযুক্ত করিতেন। তাঁহাদেরই উৎসাহে ও অনুগ্রহে বঙ্গীয় পণ্ডিতগণ রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতাদি মূল সংস্কৃত গ্রন্থ বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে হিন্দুরাজগণ মুসলমান শাসনকর্ত্তাদিগের প্রদর্শিত পন্থার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং কালে হিন্দুরাজ সভায় বঙ্গীয় কবি নিয়োগ করা একটি অভিনব প্রথা হইয়া দাঁড়াইল। এই প্রথানুসারেই মৈথিল কবি বিদ্যাপতি ঠাকুর রাজা শিবসিংহের রাজসভা অলঙ্কৃত করেন—কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম আরড়াব্রাহ্মণ ভূমিতে রাজা রঘুনাথ রায়ের আশ্রয়ে প্রসিদ্ধ চণ্ডীকাব্য প্রণয়ন করেন—রামেশ্বর কর্ণগড়ের রাজা যশোবন্ত সিংহের উৎসাহে তাঁহার শ্রেষ্ঠ কাব্য শিবায়ন রচনা করেন—ঘনরাম বর্দ্ধমানরাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের আনুকূল্যে ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য প্রচার করেন—ভারতচন্দ্র নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্ররোচনায় সুবিখ্যাত অন্নদামঙ্গল কাব্য বিরচিত করেন। ফলতঃ

বৌদ্ধযুগের অবসানে বাঙ্গলা ভাষা যে অবনতি গর্ত্তে নিমজ্জিত হইয়াছিল মুসলমান সম্রাটগণের প্রসাদে, হিন্দুরাজগণের নেতৃত্বে এবং হিন্দুধর্ম্মের সংস্কারকগণের সমবেত চেষ্টায় তাহার পুনরুদ্ধার সংসাধিত হয়।

সংস্কারযুগে বঙ্গ সাহিত্যের যে শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়, মুসলমান শাসনকর্ত্তৃগণ তাহার প্রথম পথ-প্রদর্শক, সন্দেহ নাই। তাঁহাদিগের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াই হিন্দুরাজগণ বঙ্গীয় লেখকগণকে বঙ্গভাষায় কাব্যপ্রণয়নে নিয়োজিত ও উৎসাহিত করেন। ব্রাহ্মণগণ যে গৌড়ীয় প্রাকৃতে গ্রন্থরচনা করা ঘৃণার্হ ও নিন্দনীয় জ্ঞান করিতেন, এক্ষণে রাজশক্তির সহৃদয়তায় ও আনুকূল্যে তাঁহাদিগের সে বিদ্বেষভাব তিরোহিত হইল এক্ষণে তাঁহারাই সাগ্রহে বঙ্গভাষায় কাব্য রচনা করিতে এবং সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহাদের রচনায় বঙ্গভাষায় এক নূতন স্রোত প্রবাহিত হইল! এযাবৎ বঙ্গভাষা গ্রাম্য কবিগণের গাথা, ছড়া ও গীতিকবিতায় নিবদ্ধ ছিল—উহাকে "কৃষকের গীত" বলিলেও চলিতে পারে। উহা ছন্দের বিশুদ্ধ নিয়মানুবর্ত্তী ছিল না—সরল গ্রাম্য ভাষায় উহা রচিত হইত এবং উহাতে ভাবেরও বিশেষ উৎকর্ষ ছিল না। এক্ষণে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ তাঁহাদের অনুবাদমূলক কাব্যে ও গীতিকবিতায় প্রচুর পরিমাণে সংস্কৃত শব্দ সংযোজিত করিতে আরম্ভ করিলেন—তাঁহাদের হস্তে ভাষা নূতন সাজে সজ্জিত হইল—নূতন ভূষণে ভূষিত হইল। কবিত্ব হিসাবে উহার মূল্য যত হউক বা না হউক, তাঁহারা সংস্কৃত গ্রন্থের অমূল্য ভাণ্ডার অনুবাদ-গ্রন্থে অনুপ্রবিষ্ট করিয়া বঙ্গভাষায় এক যুগান্তর উপস্থিত করিলেন। পৌরাণিক আখ্যায়িকাগুলি জনসমাজে সুপরিচিত হওয়ায়, তাহাদের চিত্ত উচ্চতর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইল। রামায়ণ ও মহাভারতোক্ত পুণ্যাত্মা মহাপুরুষগণের এবং সাধুশীলা মহিলাগণের অলৌকিক কীর্ত্তিকাহিনী পাঠে ও শ্রবণে, বঙ্গীয় সমাজ এক নূতন স্বপ্নরাজ্যে উপনীত হইল—নূতন শিক্ষায় দীক্ষিত, নূতন আদর্শে আকৃষ্ট এবং নূতন কল্পনায় বিমোহিত হইল!

পৌরাণিক সংস্কারকগণ যেমন বঙ্গভাষায় নূতন শক্তি এবং বঙ্গ সাহিত্যে নূতন ভাব সঞ্চারিত করিলেন, তেমনই হিন্দুসমাজে ও হিন্দুধর্ম্মে বিরাট আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। বৌদ্ধ তান্ত্রিকদিগের প্রভাবে বঙ্গীয় সমাজে এক

মহাবিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল তখন খাদ্যাখাদ্যের বিচার ছিল না—বিবাহবন্ধন ও জাতিভেদ প্রথা শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল--ধর্ম্মাধর্ম্মের জ্ঞান লুপ্তপ্রায় হইয়া, এমন কি ঈশ্বরের অস্তিত্বে পর্য্যন্ত অবিশ্বাস জন্মাইয়াছিল—অবিচার ও অনাচারের পঙ্কিল স্রোতে বঙ্গদেশ কলুষিত হইয়াছিল। বৌদ্ধ নাস্তিকগণ প্রচার করিলেন—"স্বর্গ ও নরক, পাপ ও পুণ্য, স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে কোন প্রভেদ নাই—তোমরা যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হও--সুখে স্বাধীন ভাবে ইন্দ্রিয়-সুখ চরিতার্থ কর--পরকালের কোন চিন্তা করিও না ইত্যাদি।" সংস্কারকগণ এই নাস্তিক মতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া দেশে আস্তিকমত প্রচার করিলেন—সদাচার ও শাস্ত্রীয় বিচারের স্রোত প্রবাহিত করিয়া যথেচ্ছাচার ও কূটতর্কের সুদীর্ঘকাল-সঞ্চিত মালিন্যরাশি বিধৌত করিলেন। স্মার্ত্ত শিরোমণি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য তাঁহার শাস্ত্রীয় বিধান "অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব" নামক স্মৃতিগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া বঙ্গে সামাজিক শাসন ও সদাচার প্রবর্ত্তিত করিলেন। নাস্তিকতার গতিরুদ্ধ হইয়া জনসাধারণের হৃদয়ে দেবদ্বিজে শ্রদ্ধাভক্তি বদ্ধমূল হইল—নিরীশ্বর বৌদ্ধমতের বিনিময়ে সাকার দেবদেবীর অর্চ্চনা ও পূজাপদ্ধতির বিপুল আয়োজন হইতে লাগিল—সমাজে ভূদেবরূপী ব্রাহ্মণগণের মাহাত্ম্য প্রচারিত হইল।

সাহিত্য সমাজের দর্পণস্বরূপ। সামাজিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের গতিও পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। পৌরাণিক-সংস্কারযুগে বঙ্গসাহিত্যের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা বুঝিতে হইলে, পূর্ব্বোক্ত সামাজিক জীবনের আলোচনা করা একান্ত আবশ্যক। আমরা এই যুগের বঙ্গসাহিত্যে পৌরাণিক ধর্ম্ম ও সমাজের প্রভাব দেখিতে পাই—দেবদেবীর প্রতি অচলা ভক্তি এবং ব্রাহ্মণগণের মাহাত্ম্য-প্রচার ইহার মূল উপকরণ ছিল। যিনি কীর্ত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশী-দাসী মহাভারত কখনও পাঠ করিয়াছেন, তিনি অনায়াসে এই কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিবেন। এই লোকপ্রিয় গ্রন্থদ্বয় সংস্কৃত মহাকাব্য হইতে বঙ্গীয় কবিতায় অনূদিত হইলেও, ইহাদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হইবে। বাল্মীকির রামায়ণে রামচন্দ্র যেরূপভাবে চিত্রিত হইয়াছেন, কীর্ত্তিবাসে তাহার ব্যতিক্রম লক্ষিত হইবে। সংস্কৃত রামায়ণে রামচন্দ্র আদর্শ মহাপুরুষরূপে বর্ণিত হইয়াছেন, কিন্তু কীর্ত্তিবাস তাঁহার দেবত্বস্থাপনে বিশেষ যত্নশীল। বাল্মীকি রাক্ষসগণকে দুর্দ্দান্তপ্রতাপ ধর্ম্মদ্বেষী দেবশত্রু অসুররূপে বর্ণন করিয়াছেন,

কিন্তু কীর্ত্তিবাসে তাহারা পরমবৈষ্ণব এবং রামচন্দ্রের পরমভক্তরূপে কীর্ত্তিত। ব্যাসের কৃষ্ণ পরম নীতিজ্ঞ ও মহাশক্তিশালী মহাপুরুষ, কিন্তু কাশীদাসের কৃষ্ণ, শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারী বিষ্ণুর অবতাররূপে বর্ণিত। পুরাণাদি ব্যতীত অন্যান্য কাব্যেও এই সংস্কারযুগের চিহ্ন দেদীপ্যমান। ধর্ম্মমঙ্গল বৌদ্ধধর্ম্মমূলক একটি মহাকাব্য—ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় ধর্ম্মঠাকুরের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন; কিন্তু ঘনরাম তাঁহার কাব্যে মৃত্যুশয্যাশায়ী আহত সৈনিক শাকার মুখে ব্যক্ত করিতেছেন—

"মরমে রহিল শেল　　হেন জন্ম বৃথা গেল
মুখে না বলিনু রামনাম।
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব দেবা　　জনক জননী সেবা
না করিনু বিধি হইল বাম॥"

বলা বাহুল্য, সংস্কারকগণ কেবল অনুবাদমূলক কাব্য লিখিয়াই ক্ষান্ত হন নাই লৌকিক শাখাতেও তাঁহারা বিবিধ কাব্য গ্রন্থ রচনা করিয়া বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। প্রাচীন কিম্বদন্তী ও প্রচলিত উপাখ্যানাদি হইতে সার সংগ্রহ করিয়া ঐ সকল গ্রন্থ বিরচিত। ইহাদের অধিকাংশই শৈব ও শাক্ত-ধর্ম্মমূলক। এই শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে চণ্ডীমঙ্গ ও মনসামঙ্গল সর্ব্বোৎকৃষ্ট। যেমন রামায়ণ ও মহাভারতের অসংখ্য অনুবাদকদিগের মধ্যে কীর্ত্তিবাস ও কাশীদাসের নাম অগ্রগণ্য, তেমনই ক্ষেমানন্দ কেতকাদাসের মনসামঙ্গল এবং কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পণ্ডিতগণ হিন্দুধর্ম্মের প্রচারার্থে ঐ সকল গ্রন্থ পাঠ করিতেন এবং সুকণ্ঠ গায়কেরা বিশুদ্ধ তানলয় সংযোগে, চামর ও মন্দিরা সহযোগে উহা গান করিতেন। ঐ সকল মঙ্গলগায়ক জনসমাজে পৌরাণিক আখ্যায়িকাগুলি প্রচারিত করিয়া ধর্ম্মসংস্কারের বীজ বপন করেন। উত্তরকালে উহাদের প্রভাবে বঙ্গসমাজে যাত্রা, পাঁচালি, কথকতা, কীর্ত্তন, কবির গান প্রভৃতির সৃষ্টি হয়। অদ্যাপি বঙ্গসমাজে ও বঙ্গসাহিত্যে পৌরাণিক সংস্কারের প্রভাব বর্ত্তমান। প্রাচীন বঙ্গভাষায় ইহাই দ্বিতীয় যুগ।

বঙ্গভাষার সংস্কারযুগের প্রারম্ভেই অন্য এক প্রকার বিচিত্র মৌলিক সাহিত্যের সূচনা হয়। বঙ্গের প্রাচীন "কৃষকের গীত" সহসা কি এক অদ্ভুত ইন্দ্রজাল প্রভাবে সরস শব্দালঙ্কারসম্পন্ন স্বর্গীয় বীণাবিনিন্দিত সুস্বরলহরীসম্বলিত প্রেমসঙ্গীতে পরিণত হইল! বীরভূমের অমর কবি জয়দেব অমৃতায়মান "গীত-

গোবিন্দের" যে সুমোহন সঙ্গীতে বঙ্গদেশ প্লাবিত করেন তাহারই প্রতিধ্বনি স্বরূপ বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাসের মধুর বৈষ্ণব পদাবলী বঙ্গের শ্যামল ক্ষেত্রে ও পল্লীগৃহে উচ্ছ্বসিত হইয়া বঙ্গভাষায় এক অপূর্ব্ব যুগের আগমনী গাহিতে লাগিল! বঙ্গদেশ চমকিত হইল! শিশু মাতৃক্রোড়ে শায়িত হইয়া সেই—সুধাবর্ষী সঙ্গীত শ্রবণে হাসিতে লাগিল! বৃক্ষে বৃক্ষে নব পল্লবরাজি বিকসিত হইল—পুষ্পরাশি প্রস্ফুটিত হইল—বিহগকুল সেই সঙ্গীতের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া পঞ্চমে তান ধরিল। ধরিত্রী দেবী নব পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া কবিদ্বয়ের সংবর্দ্ধনা করিলেন।

মৈথিল কবি বিদ্যাপতি ও বঙ্গীয় কবি চণ্ডিদাস উভয়েই সমকালবর্ত্তী। ইঁহারা খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দির শেষভাগে প্রাদুর্ভূত হইয়া কবিতা রচনায় প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বিদ্যাপতির পদাবলী মৈথিলী ভাষায় বিরচিত হইলেও, উহা বঙ্গভাষায় অনূদিত হইয়া বহুকালাবধি বঙ্গসহিত্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। বিদ্যাপতি রাজা শিব সিংহের সভায় রাজকবি ছিলেন এবং দ্বারভাঙ্গা জেলার অন্তর্গত বিসফী গ্রামে বাস করিতেন। উক্ত গ্রামখানি তিনি তাঁহার অসাধারণ কবিত্বের পুরস্কার স্বরূপ রাজা শিবসিংহের হস্তে প্রাপ্ত হন। তিনি সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং সংস্কৃত ভাষায় কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন, কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলীর রচনাতেই তাঁহার সমধিক আগ্রহ ছিল। তিনি সুন্দর ও সুপুরুষ ছিলেন এবং উৎকৃষ্ট গীতকর্ত্তা ও সুগায়ক বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার পদাবলীতে শব্দালঙ্কারের প্রাচুর্য্য দৃষ্ট হয়। সংস্কৃত সাহিত্যের অমূল্য ভাণ্ডার মন্থন করিয়া তিনি অতি দক্ষতার সহিত তাঁহার পদাবলী রচনা করেন, শব্দের ঝঙ্কার, ছন্দের উৎকর্ষ এবং অলঙ্কারের চাকচিক্যে কোন কবিই তাঁহার সমকক্ষ নহেন, কিন্তু মধুর রসের সমাবেশে এবং ভাবের উদ্দীপনায় চণ্ডিদাস শ্রেষ্ঠ কবি। চণ্ডিদাস বীরভূম জেলার অন্তর্গত বোলপুরের সমীপবর্ত্তী নান্নুর গ্রামে বাস করিতেন। তাঁহার পদাবলী সরল ভাষায় রচিত। উহাতে রচনার পারিপাট্য ও জাকজমক নাই শব্দাড়ম্বরের বাহুল্য নাই কিন্তু উহা প্রেমিকের ভাষা—স্বচ্ছসলিলা নির্ঝরিণীর ন্যায় হৃদয় হইতে স্বতঃই নিঃসৃত হয়—স্বভাবসুন্দর ভাবাবেশে হৃদয়ের অন্তস্তল ভেদ করে। এই শ্রেষ্ঠ কবিদ্বয় বঙ্গভাষায় যে অলৌকিক শক্তি সঞ্চারিত করেন —যে অসাধারণ কবিত্বে বঙ্গভাষা অলঙ্কৃত করেন, শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবে

তাহার পরিপুষ্টি সাধিত হয়। প্রাচীন বঙ্গভাষায় ইহারাই তৃতীয় যুগের প্রবর্ত্তক।

বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাস বঙ্গীয় সাহিত্যে যে নবযুগের সূচনা করেন—যে মৌলিকতার সৃষ্টি করেন—যে প্রেমের সঙ্গীতে বঙ্গীয় নরনারী-গণের হৃদয় মুগ্ধ করেন—যে ললিত রাগিণীর মোহন মূর্চ্ছনায় বঙ্গের বিশাল বক্ষ বিকম্পিত করেন, তাহা ব্যর্থ হয় নাই। কিন্তু তৎপরে সুদীর্ঘ এক শতাব্দি কাল পর্য্যন্ত আমরা সে সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই না—সে স্বরের সাড়াশব্দ পাই না—সে প্রেমের আবর্ত্তন কিংবা সে সাহিত্যের অন্য কোনরূপ বিকাশ দেখিতে পাই না। বঙ্গদেশে তখন ধীরে ধীরে পৌরাণিক-সংস্কারের প্রভাব সঞ্চারিত হইতেছিল, কিন্তু তথাপি ঘোর নাস্তিকতায় দেশ আচ্ছন্ন ছিল। শাস্ত্রীয় বিচার ও কূটতর্কের প্রভাবে ধর্ম্মে বিশ্বাস শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। লোকে কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া অদ্ভুত ও অলৌকিকে বিশ্বাস করিত, কিন্তু প্রেমভক্তির প্রকৃত রসাস্বাদনে বঞ্চিত ছিল। অকস্মাৎ বঙ্গের ভাগ্যাকাশ আলোকিত করিয়া নবদ্বীপচন্দ্রের উদয় হইল—পঞ্চদশ শতাব্দির শেষভাগে নবদ্বীপে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হইল—শ্রীচৈতন্যদেব শচীদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া বঙ্গদেশ পবিত্র করিলেন। ভক্তগণের চিরাকাঙ্ক্ষিত মনোরথ পরিপূর্ণ হইল—বঙ্গদেশ প্রেমের বন্যায় প্লাবিত হইল—অবিশ্বাসের সাহারায় শান্তিনির্ঝরিণী উৎসারিত হইল। নাস্তিকতার উত্তুঙ্গ শৈল চূর্ণ করতঃ কূটতর্ক ও কুসংস্কারের বিস্তীর্ণ প্রান্তর ভেদ করিয়া বঙ্গবাসী লক্ষ লক্ষ নরনারীগণের হৃদয়ে প্রেমমন্দাকিনীর পবিত্র স্রোত প্রবাহিত হইল।

নবদ্বীপের নিমাই পণ্ডিত কিরূপে দেশের প্রচলিত সংস্কার ও সামাজিক অবস্থা অতিক্রমপূর্ব্বক বঙ্গদেশে বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করেন, ইহা বাঙ্গলার ইতিহাসে এক প্রসিদ্ধ ঘটনা। এস্থানে তাহার সম্যক আলোচনা সম্ভবপর নহে। বাল্যে তিনি শান্তশিষ্ট ছিলেন না—পাঠাভ্যাসে অনুরক্ত হইলেও গুরুজনে শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন না—অধ্যাপনায় সুদক্ষ হইলেও, ধর্ম্মে তাদৃশ আস্থাবান্ ও বিনয়ী ছিলেন না বরং বিলক্ষণ বিদ্যাভিমানী ছিলেন। যে অন্তর্নিহিত শক্তি-বলে তিনি কালে অদ্বিতীয় ধর্ম্মসংস্কারকরূপে সুবিখ্যাত হন, বাল্যে তাহার কোন বিশেষ চিহ্ন লক্ষিত হয় না—বরং তাহার বিপরীত ভাবই পরিদৃষ্ট হয়।

তার্কিক ও ধর্ম্মদ্বেষী নিমাই পণ্ডিত গয়াক্ষেত্রে বিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শনে কিরূপে একেবারে কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইয়া মোহ প্রাপ্ত হন, ইহা বিষম সমস্যার বিষয়। পাণ্ডিত্যাভিমানী ও নাস্তিকভাবাপন্ন বিশ্বম্ভর উত্তরকালে যে কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া মধুর নর্ত্তনে নদীয়াবাসিগণকে বিমুগ্ধ করিবেন, ইহা পূর্ব্বে কে ধারণা করিতে পারিত? আমাদের অনুমান—তাঁহার বাল্যজীবনে তদানীন্তন সামাজিক প্রভাব প্রতিফলিত হইয়াছিল। দ্বাবিংশতিবর্ষ বয়ক্রম কাল পর্য্যন্ত তিনি কুলগত প্রথা ও সামাজিক শাসনের অনুবর্ত্তী হইয়া প্রাণহীন নীরস শুষ্ক শাস্ত্রালোচনায় ব্যাপৃত ছিলেন, ধর্ম্মবিদ্বেষ ও নাস্তিকতার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই; কিন্তু তৎপরে সাধু সহবাস ও স্বীয় নৈসর্গিক তেজঃ-প্রভাবে সামাজিক আচার ব্যবহার ও রীতিনীতি চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া স্বীয় গন্তব্য পথে ধাবিত হন। বঙ্গদেশের সৌভাগ্যবশতঃ শ্রীগৌরাঙ্গ চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ বয়সে সমাজের বন্ধনরজ্জু এবং সংসারের মায়াডোর ছিন্ন করিয়া, বিদ্যাভিমান ও জাত্যভিমান বিসর্জ্জন দিয়া কৌপীনধারী সন্ন্যাসী হইয়া বঙ্গে প্রেমমাহাত্ম্য প্রচার করিলেন—ধর্ম্মহীন অনাচারী শ্রদ্ধাভক্তিশূন্য শোকতাপদগ্ধ শত শত নরনারীগণের হৃদয়ে শান্তি সলিল বর্ষণ করিলেন—বঙ্গীয় সমাজে ও বঙ্গীয় সাহিত্যে এক অভিনব যুগ প্রবর্ত্তিত করিলেন।

শ্রীচৈতন্য ভক্তমণ্ডলীতে পরিবেষ্টিত হইয়া যে মধুর সংকীর্ত্তনের স্রোতে অবগাহন করিতেন, তাহা অনির্ব্বচনীয়। শ্রীবাসের আঙ্গিনায় অল্পসংখ্যক বন্ধু-বান্ধবে সম্মিলিত হইয়া, মহাপ্রভু যে প্রেম সংকীর্ত্তনের সূচনা করেন, কে জানিত যে বঙ্গসমাজে তাহা এত আধিপত্য বিস্তার করিবে? এই সংকীর্ত্তনের স্রোতে এককালে "শান্তিপুর ডুবু ডুবু, ন'দে ভেসে যায়।" পাষণ্ড-হৃদয় জগাই মাধাই এই সংকীর্ত্তনের প্রভাবে পুনর্জন্ম লাভ করে। মুসলমান শাসনকর্ত্তা গোরাই কাজি সংকীর্ত্তন শ্রবণে চিত্রার্পিতবৎ বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। উড়িষ্যার সম্রাট রাজা প্রতাপরুদ্র জগন্নাথক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যের সংকীর্ত্তন-দৃশ্য ও মধুর নর্ত্তন দর্শনে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া তাঁহার পদে আত্ম-সমর্পণ করেন ভগবৎপ্রেমে উন্মত্ত-হৃদয় চৈতন্যদেব যে প্রেমব্যাকুলতার অভিনয় করেন—যে প্রেমসঙ্গীত সৃষ্টি করেন—যে ভাবাবেশে বিভোর হইয়া মোহপ্রাপ্ত হইতেন বা দশা লাভ করিতেন এবং তৎকালে ভগবৎ সম্মিলন হেতু যে অব্যক্ত পরমানন্দ লাভ

করিতেন—তদ্দর্শনে ভক্তশিষ্য ও দর্শকাদিগের হৃদয়ে যে প্রেমস্রোত প্রবাহিত হইত তাহা কেবল বর্ণনাতীত নহে, তাহা ধারণাতীত। এরূপ অহেতুক কৃষ্ণ-প্রেম—এরূপ আশ্চর্য্য প্রেমোন্মাদ—এরূপ জ্বলন্ত বৈরাগ্য ও ভগবানে আত্ম-সমর্পণ জগতের ইতিহাসে দুর্লভ। তিনি কেবল নাম সংকীর্ত্তনেই পরিতৃপ্ত হইতেন না—নিখিল জড়জগতে তিনি সচ্চিদানন্দ প্রেমময় কৃষ্ণের সত্ত্বা উপলব্ধি করিতেন। নীল আকাশে কিংবা নীলিমাময় সমুদ্রে চৈতন্য সহাস্য কৃষ্ণমূর্ত্তি সন্দর্শনে উন্মত্তের ন্যায় ধাবিত হইতেন—স্রোতস্বিনী মাত্রেই তাঁহার কর্ণে যমুনার প্রেমধ্বনি বহন করিত—শৈলমাত্রেই গোবর্দ্ধনের ন্যায় এবং অরণ্যমাত্রেই বৃন্দাবনের ন্যায় তাঁহার নিকট পূজিত হইত—এমন কি তিনি বৃক্ষেও তাঁহার উপাস্য দেবতার দর্শন লাভ করিতেন। কথিত আছে, চৈতন্য দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণকালে চণ্ডীপুরে তমালতরু দর্শনে কৃষ্ণপ্রেমে আবিষ্ট হইয়া ঐ বৃক্ষ আলিঙ্গন পূর্ব্বক আত্মহারা হইয়া এক দিবস অতিবাহিত করেন। তাঁহার চক্ষে প্রতি মন্দিরে প্রেমময়ের মূর্ত্তি প্রতিভাত হইত—শিব, দুর্গা বা গণেশের মন্দিরেও তিনি কৃষ্ণ প্রেমের স্রোতে ভাসমান হইতেন। এরূপ তন্ময়ত্ব—প্রেমপরাকাষ্ঠা—অপরূপ কবিত্ব ও ভাবুকত্ব বুঝি কেবল প্রেমাবতার চৈতন্য দেবেই সম্ভবে!

শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস অবলম্বন পূর্ব্বক কিরূপে বঙ্গদেশে এবং বঙ্গের বাহিরে সুদূর নীলাচলে, দাক্ষিণাত্যে এবং পশ্চিমোত্তর প্রদেশে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করেন; তাহার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তৎপ্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম বঙ্গসমাজে ও বঙ্গসাহিত্যে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করাই আমাদের লক্ষ্য। প্রকৃতপক্ষে চৈতন্যদেব স্বয়ং বুদ্ধ বা মহম্মদের ন্যায় কোনরূপ ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে ব্রতী ছিলেন না কিংবা শিখগুরু নানক ও গুরুগোবিন্দের ন্যায় কোন বিশেষ ধর্ম্মসম্প্রদায় গঠিত করেন নাই—তাঁহার ভক্ত-শিষ্য ও সহচরগণই তাঁহার আচরণ ও উপদেশানুসারে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন। চৈতন্যের ভক্ত মণ্ডলীমধ্যে নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা মাননীয় ও পূজনীয়। ইঁহারা বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেও চৈতন্যের প্রতি একান্ত অনুরক্ত ছিলেন এবং তৎপ্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ পূর্ব্বক নূতন বৈষ্ণব সম্প্রদায় গঠিত করেন। তাঁহার ভক্ত

শিষ্যগণমধ্যে কেহ নবদ্বীপে, কেহ পুরীতে এবং কেহ বৃন্দাবনে বাস করিতেন। তাঁহার বাল্য সুহৃদ্‌গণের মধ্যে শ্রীবাস, গদাধর, মুরারীগুপ্ত, নরহরি সরকার, বংশীবদন, বাসুঘোষ, গৌরীদাস, বক্রেশ্বর পণ্ডিত ও লোকনাথ গোস্বামীর নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের মধ্যে গদাধর ও লোকনাথ নবদ্বীপে মহাপ্রভুর সহাধ্যায়ী ছিলেন, কিন্তু লোকনাথ চৈতন্যের অনুরোধে যাবজ্জীবন বৃন্দাবনে বাস করেন। অন্যান্য সকলে কখনও দেশে এবং কখনও পুরীতে চৈতন্যের সন্নিধানে বাস করিতেন। বলা বাহুল্য, চৈতন্য কাটোয়ায় কেশব ভারতী কর্ত্তৃক সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া কিয়ৎকাল জগন্নাথক্ষেত্রে অতিবাহিত করেন। তথায় রাজা প্রতাপরুদ্র, রাজমন্ত্রী রামানন্দ রায় এবং সভাপণ্ডিত বৃদ্ধ বাসুদেব সার্ব্বভৌম চৈতন্যের অলৌকিক পাণ্ডিত্য ও ভগবদ্‌ভক্তি দর্শনে। বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব পরিগ্রহ করেন। অনন্তর তিনি একমাত্র অনুচর গোবিন্দ কর্ম্মকার সমভিব্যবহারে দক্ষিণাত্যে সুদূর কন্যাকুমারিকা পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়া নানা দেবদেবীর মন্দির ও তীর্থাদি দর্শন করেন। এই উপলক্ষে তিনি অনেক পতিত ও ধর্ম্মভ্রষ্ট ব্যক্তির উদ্ধার সাধন করেন—অনেক নাস্তিকের ধর্ম্মসংশয় মোচন করেন এবং সর্ব্বত্র কৃষ্ণপ্রেমের মাহাত্ম্য প্রচার করেন। পুরীধামে প্রত্যাগত হইয়া চৈতন্য তথায় পাঁচ বৎসর পরমানন্দে বাস করেন এবং তৎপরে বলদেব ভট্টাচার্য্য নামক একজন সহযাত্রীর সহিত মিলিত হইয়া বৃন্দাবনে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে প্রয়াগ ও কাশীধামে তাঁহার ভক্ত শিষ্য রূপ ও সনাতনকে ভক্তি ও প্রেমধর্ম্ম সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান করেন। অনন্তর চৈতন্য বৃন্দাবনে তাঁহার ভক্ত শিষ্যগণের সহিত মিলিত হইয়া প্রণষ্ট গৌরব বৃন্দাবনের পুনরুদ্ধার কার্য্যে তাঁহাদিগকে প্রোৎসাহিত করেন। অবশেষে পুরীতে প্রত্যাগত হইয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল তথায় অতিবাহিত করেন। 'প্রেমিক' সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্য সদা প্রেমধ্যানে নিমগ্ন হইয়া একান্ত উদাসীনের ন্যায় কালযাপন করিতেন, কিন্তু তাঁহার ভক্ত সহচরগণ তাঁহার অলৌকিক কৃষ্ণপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে অবতার জ্ঞানে পূজা করিতেন এবং তাঁহার প্রেমলীলা কীর্ত্তন ও প্রচার করিয়া বৈষ্ণব সাহিত্যের উন্নতি সাধন করেন।

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে যেমন বঙ্গসমাজে নূতন ধর্ম্মস্রোত প্রবাহিত হয়—জাতিভেদ প্রথা তুচ্ছ করিয়া, পৌরোহিত্যপ্রভাব বিচূর্ণ করিয়া এবং কুসংস্কারের

আবর্জ্জনারাশি বিধৌত করিয়া যেরূপ উদার ধর্ম্মমত প্রচারিত হয়, তদ্রূপ বঙ্গসাহিত্যেও বিচিত্র মৌলিকতার সৃষ্টি হয়। সংস্কারযুগে বঙ্গসাহিত্য নির্দ্দিষ্ট সীমায় আবদ্ধ ছিল— উহা প্রধানতঃ সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যের নিকট ঋণী ছিল—পৌরাণিক ধর্ম্ম প্রচার করাই উহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—অনুবাদগ্রন্থেই উহার কৃতিত্ব প্রদর্শিত হইত। পরন্তু লৌকিক শাখায় যে সকল কাব্যগ্রন্থ বা গীতি কবিতা বিরচিত হয়, তাহারাও প্রচলিত প্রাচীন কবিতার বর্দ্ধিত সংস্করণ মাত্র—গ্রাম্য ও অমার্জ্জিত ভাষার উপরে সংস্কৃত শব্দ ও পৌরাণিক ভাবের সমাবেশে তাহারা গঠিত হইত--তাহাতে বস্তুতঃ প্রকৃত মৌলিকত্বের নাম গন্ধ ছিল না। কিন্তু বৈষ্ণব সাহিত্য স্বতন্ত্র-প্রকৃতি-সম্পন্ন ছিল। ইহাতে প্রাচীন পৌরাণিক ভাবের আধিপত্য ছিল না বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দের পরিবর্ত্তে সরল অথচ সুমধুর ভাষায় ইহা রচিত হইত—সংস্কৃত ব্যাকরণের ও সংস্কৃত ছন্দের নিয়ম ভঙ্গ করিয়া স্থল বিশেষে প্রাঞ্জল ও শ্রুতি-মধুর শব্দ ইহাতে সংযোজিত হইত—এমন কি হিন্দী, মৈথিল ও ব্রজভাষা হইতেও ইহার অনেকাংশ গঠিত—নূতন ছাঁদে, নূতন ঢঙ্গে ও নূতন ভাবে ইহার অপূর্ব্ব কবিত্ব বিকসিত হইয়াছিল। বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচার-কল্পে এই সাহিত্যের উৎপত্তি—বৈষ্ণব ধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধির সহিত ইহার বিস্তৃতি ও উন্নতি এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মের অবনতির সহিত ইহার অধোগতি হইয়াছিল। এই সাহিত্যের সহিত শ্রীচৈতন্যের জীবন বিশিষ্টভাবে সম্বদ্ধ—তাঁহারই জীবন এই সাহিত্যের প্রাণস্বরূপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহা ত্রিবিধ শাখায় বিভক্ত—যথা, চরিতশাখা, পদাবলী শাখা ও ভজন শাখা। মহাপ্রভুর জীবনী অবলম্বন করিয়া যে সব কাব্য গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহাই চরিত শাখার অন্তর্গত, তাঁহার অপূর্ব্বভাব-প্রবণতা ও প্রেম-বিকার লক্ষ্য করিয়া যে সকল বিচিত্র গীতি-কবিতা বিরচিত হয়, তাহাই পদাবলী শাখায় পল্লবিত এবং তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মসংক্রান্ত উপদেশ ও বিধিব্যবস্থাদি যে সব গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে, তাহারা ভজন শাখার অন্তর্ভুক্ত।

চরিত শাখা—চৈতন্যদেবের পূর্ব্বে বঙ্গভাষায় কোন জীবনী-গ্রন্থ ছিল না, যাহা ছিল তাহা পৌরাণিক দেবদেবী অথবা অতিপ্রাকৃত নরনারীগণের কীর্ত্তিকাহিনী মাত্র—প্রকৃত পক্ষে তৎকালে জীবিত লোকের জীবন চরিত

লিখিবার রীতি ছিল না। বঙ্গ-সাহিত্যের ঈদৃশ অবস্থায় চৈতন্যদেবের পবিত্র জীবন ও অলৌকিক প্রেমপরায়ণতা যেন শাস্ত্রের মহিমা পরাভূত করিল—মনু, যাজ্ঞবল্ক্য ও পরাশরাদির ব্যবস্থা গ্রন্থ অগ্রাহ্য করিয়া অপূর্ব্ব ভক্তি-মাহাত্ম্য প্রচারিত হইল—সামাজিক শাসন অতিক্রম করিয়া, জাতিভেদের মূল শিথিল করিয়া "জীবে দয়া ও নামে রুচি"র পবিত্র মন্ত্র উচ্চারিত হইল। শ্রীচৈতন্যের পরম পবিত্র লীলারস পানে লোক পরিতৃপ্ত হইল।

চৈতন্যদেবের জীবিতকালে যে যে চরিত-গ্রন্থ লিখিত হয়, তন্মধ্যে "গোবিন্দ-দাসের "কড়চা"ই সর্ব্বপ্রথম। ইহা তাঁহার ভৃত্য গোবিন্দ কর্ম্মকার অতি সংগোপনে লিখিয়া রাখিয়াছিল, কারণ চৈতন্য ইহা জ্ঞাত হইলে, নিশ্চয়ই তাহাকে উক্ত কার্য্য হইতে বিরত করিতেন। এই গ্রন্থে চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণান্তে পুরী প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত প্রায় তিন বৎসরের বিবরণ অতি দক্ষতার সহিত সরল বাংলা কবিতায় বর্ণিত হইয়াছে। এই কড়চা ব্যতীত মুরারী গুপ্ত ও স্বরূপ দামোদর সংস্কৃত ভাষায় শ্রীচৈতন্যচরিত লিখিয়াছিলেন বটে কিন্তু তাহা সংস্কৃতে রচিত হওয়ায় সাধারণের বোধগম্য নহে। এই তিন খানি ব্যতীত চৈতন্যের জীবিত কালে তাঁহার অন্য কোন চরিত গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায় না। বলাবাহুল্য যে চৈতন্যদেব ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দের ফাল্গুন মাসে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দের আষাঢ় মাসে পুরী ধামে তাঁহার তিরোধান হয়। তাঁহার তিরোধান হইবার কয়েক বৎসর পরে—(সম্ভবতঃ ১৫৭৩ খৃঃ)— বৃন্দাবন দাস সুবিখ্যাত "চৈতন্যভাগবত" গ্রন্থ প্রণয়ন করেন—ইহা বৈষ্ণব সম্প্রদায় মধ্যে বিশেষ প্রামাণ্য গ্রন্থ। ইহার অল্পকাল পরেই জয়ানন্দ ও লোচন দাস উভয়েই "চৈতন্যমঙ্গল" নামে দুইখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। অবশেষে বৃন্দাবনপ্রবাসী কৃষ্ণদাস কবিরাজ "চৈতন্যচরিতামৃত" নামক অমূল্য গ্রন্থ সরস বাংলা কবিতায় রচনা করিয়া বঙ্গসাহিত্য অলঙ্কৃত করেন। এই শেষোক্ত গ্রন্থই চৈতন্যের চরিতগ্রন্থ সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কথিত আছে, কৃষ্ণদাস ৮৬ বৎসর বয়সে বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবদিগের অনুরোধে সাত বৎসর পরিশ্রম করিয়া ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থ সমাপ্ত করেন।

চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণ যেমন বঙ্গদেশে একটী বিষাদপূর্ণ লোমহর্ষণ দৃশ্য,

তাঁহার তিরোভাব ততোধিক মর্ম্মান্তিক ও হৃদয়বিদারক ঘটনা, সন্দেহ নাই। তাঁহার লোকান্তর গমনে সমগ্র বৈষ্ণব সমাজ মুহ্যমান হইয়া শোকার্ণবে মগ্ন হইয়াছিল—বঙ্গদেশ সুদীর্ঘ বিষাদের ছায়ায় পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। যতদিন মহাপ্রভু নীলাচলে বাস করেন, ততদিন পুরীক্ষেত্রই বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল, কিন্তু তাঁহার তিরোধানের সহিত বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম্মের স্রোত নিরুদ্ধ হইল। তৎকালে বৃন্দাবন বঙ্গীয় বৈষ্ণবগণের প্রধান তীর্থরূপে পরিগণিত হয়। বৃন্দাবনে চৈতন্যের শিষ্যগণ-মধ্যে রূপ, সনাতন, গোপালভট্ট, রঘুনাথ দাস, রঘুনাথ ভট্ট, জীব গোস্বামী নামে ছয় জন বৈষ্ণব গোস্বামীর নাম প্রসিদ্ধ। চৈতন্যের প্রবর্ত্তনায় ইঁহারা বহুবিধ বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রণয়ন ও সুদৃশ্য মন্দিররাজি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বৃন্দাবনে বঙ্গীয় বৈষ্ণবগণের প্রাধান্য স্থাপন করেন। ইঁহারা বঙ্গীয় বৈষ্ণব সমাজে পরম পূজ্য ও শ্রদ্ধার পাত্র—ইঁহাদেরই লিখিত শাস্ত্রগ্রন্থ তাৎকালীন বৈষ্ণব সমাজে প্রামাণ্য বলিয়া পরিগৃহীত হইত—ইঁহাদের পদপ্রান্তে বসিয়া যাহারা বৈষ্ণব ধর্ম্মের উপদেশ লাভ করিত, তাহারাই বৈষ্ণব সমাজে বিশ্বাসভাজন ছিল—যদি কোন বৈষ্ণব গ্রন্থ তাঁহারা অনুমোদন না করিতেন তাহা অবিশ্বাস্য ও অশ্রদ্ধেয়-জ্ঞানে বর্জ্জিত হইত। এই হেতু "গোবিন্দদাসের কড়চা" ও জয়ানন্দের "চৈতন্যমঙ্গল" গোঁড়া বৈষ্ণবগণ অপ্রামাণ্য-জ্ঞান করিয়া থাকেন, কিন্তু "চৈতন্যভাগবত" ও "চৈতন্যচরিতামৃত" পরম সমাদরে গ্রহণ করেন। বলা বাহুল্য, কৃষ্ণদাস কবিরাজ চরিতামৃত রচনাকালে বৃন্দাবনে থাকিয়া রূপ, সনাতন, রঘুনাথ ও লোকনাথ প্রভৃতি বৈষ্ণব গুরুদিগের নিকট বিশেষ সাহায্য লাভ করেন।

চৈতন্যের তিরোধানে বঙ্গীয় বৈষ্ণব সমাজে যে অবসাদ ও নৈরাশ্যের সঞ্চার হইয়াছিল, বৃন্দাবনের বঙ্গীয় বৈষ্ণব গুরুদিগের প্রভাবে প্রায় অর্দ্ধশতাব্দি কাল পরে তাহার পুনরুদ্ধার সাধিত হয়। আবার বৈষ্ণব সমাজে তিন জন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। শ্রীনিবাস আচার্য্য, নরোত্তম ঠাকুর ও শ্যামানন্দ দাস বঙ্গদেশে পুনরায় বৈষ্ণব ধর্ম্মের মহিমা বিস্তার করেন। 'প্রেমবিলাস' নামক বৈষ্ণব গ্রন্থে এই মহাত্মাদিগের বিষয়ে এইরূপ লিখিত আছে—

"শ্রীমহাপ্রভুর শক্তি শ্রীনিবাস হয়।
নিত্যানন্দশক্তি নরোত্তমেরে কহয়॥

অদ্বৈত প্রভুর শক্তি হয় শ্যামানন্দ।
যার কৃপায় উৎকলীয়া পাইল আনন্দ ॥"

ইঁহারা তিনজনেই চৈতন্যদেবের পরম ভক্ত ছিলেন এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়া বাল্যাবস্থায় সংসার ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে বাস করেন। তথায় বৈষ্ণব গুরুদিগের অনুকম্পায় বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মশাস্ত্রে সুশিক্ষিত হইয়া বঙ্গদেশে প্রত্যাগত হন। কথিত আছে, শ্রীজীব গোস্বামী ইঁহাদিগের হস্তে বৈষ্ণব ধর্ম্মসংক্রান্ত পুঁথি সমুদয় সমর্পণ করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচারার্থে ইঁহাদিগকে স্বদেশে যাইতে অনুমতি দেন। ঘটনাচক্রে শ্রীনিবাস বিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বীরের গুরুপদে অধিষ্ঠিত হইয়া তথায় বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করেন। নরোত্তম স্বীয় জন্মভূমি খেতুরিতে প্রত্যাগত হইয়া শ্রীচৈতন্যের উদ্দেশে "গৌররায়ের মন্দির" প্রতিষ্ঠা করেন এবং তথায় একটি প্রসিদ্ধ মহোৎসবে সমগ্র বৈষ্ণব সমাজ নিমন্ত্রিত করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করেন। শ্যামানন্দ উড়িষ্যাদেশে বৈষ্ণব ধর্ম্মের স্রোত পুনঃ-প্রবাহিত করিয়া উত্তরকালে উড়িষ্যার রাজন্যবর্গের ধর্ম্মগুরুপদে প্রতিষ্ঠিত হন। এইরূপে এই মহাপুরুষত্রয় বঙ্গদেশে বৈষ্ণব ধর্ম্মের মধ্যযুগ প্রবর্ত্তিত করেন এবং ইঁহাদিগের অদ্ভুত কীর্ত্তি-কাহিনী অবলম্বন করিয়া বঙ্গসাহিত্যে বহু অভিনব বৈষ্ণব গ্রন্থ বিরচিত হয়। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে নিত্যানন্দদাস বিরচিত প্রেমবিলাস, যদুনন্দনদাস প্রণীত কর্ণানন্দ এবং নরহরিচক্রবর্ত্তীকৃত ভক্তিরত্নাকর ও নরোত্তমবিলাস সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

সমকালবর্ত্তী বৈষ্ণব সমাজে অন্য এক মহাত্মা বৈষ্ণব ধর্ম্মের জয়পতাকা উড্ডীন করেন। মহাপ্রভু নিত্যানন্দের বংশধর পুত্র বীরচন্দ্র খড়দহে থাকিয়া বৈষ্ণব সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। কথিত আছে, ইনি হিন্দুসমাজে পতিত বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুনীদিগকে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়-ভুক্ত করেন। উত্তরকালে ইহারা "নেড়ানেড়ির দল" নামে বৈষ্ণব সমাজে পরিচিত হইয়াছে। বৃন্দাবন-দাস-বিরচিত "নিত্যানন্দবংশ বিস্তার" নামক গ্রন্থে এই বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

পদাবলী শাখা—বৈষ্ণব সাহিত্যে 'পদ' বা গীতিকবিতাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা লইয়াই ইহারা রচিত। এই সকল পদ নানা অংশে বিভক্ত। কতকগুলি শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা বিষয়ক—এই গোষ্ঠ আবার দ্বিবিধ

যথা - পূর্ব্বগোষ্ঠ, উত্তরগোষ্ঠ ও দেবগোষ্ঠ। কিন্তু রাধাকৃষ্ণ সঙ্গীতেই বৈষ্ণব পদাবলী উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে—রাধাকৃষ্ণপ্রেমই বৈষ্ণব কবিগণের আদর্শ প্রেম। বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাস এই আদর্শ লক্ষ্য করিয়াই তাঁহাদের অপূর্ব্ব পদাবলী রচনা করেন। এই রাধাকৃষ্ণ সঙ্গীত আবার বিবিধ শাখায় বিভক্ত,যথা—পূর্ব্বরাগ, অভিসার, উৎকণ্ঠা, সম্ভোগ, মিলন, মান, বিরহ, মাথুর, ভাবসম্মিলন, ইত্যাদি। চৈতন্য কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া সংকীর্ত্তনের সৃষ্টি করেন। বৈষ্ণব কবিগণ তাঁহাকে আদর্শ প্রেমিক রাধার সহিত তুলনা করিয়াছেন—শুধু তাহাই নহে, রাধাকৃষ্ণ সঙ্গীতে তাঁহারই ভাবাবেশ লক্ষ্য করিয়া রাধার প্রেমাভিনয় কীর্ত্তন করিয়াছেন। নীলবর্ণ আকাশ, ঘনকৃষ্ণ মেঘরাজি, যমুনার কালজল, সুনীল অম্বুনিধি, বৃন্দাবনের শ্যামল শোভা কিংবা তমাল তরুর নীলিমা দর্শনে চৈতন্যের যে চিত্তবিকার ও প্রেমোন্মত্ততা লক্ষিত হইত, বৈষ্ণব পদাবলীতে তাহা শ্রীরাধার প্রেমাবেশের অনুরূপ ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। চৈতন্যের এই অপূর্ব্ব ভাব বিকাশ, সংকীর্ত্তন ও মধুর নর্ত্তনের দৃশ্য হইতেই বৈষ্ণব সাহিত্যে অভিনব যুগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের বৈষ্ণব কবিতায় জয়দেব বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাস যে প্রেমচিত্র বর্ণন করিয়াছেন তাহাতে এই বিচিত্র ভাবের অভিব্যক্তি লক্ষিত হয় না। গৌরচন্দ্রের এই ভাব স্রোতের উচ্ছ্বাস হইতেই "গৌরচন্দ্রিকার" অবতারণা। রাধাকৃষ্ণের প্রেম-সঙ্গীতের ভূমিকাস্বরূপ সাধারণতঃ এই গৌরচন্দ্রিকা গীত হইয়া থাকে এবং ইহাতে চৈতন্যদেবের যে প্রেমভাব ব্যক্ত হয়, তাহাই ঐ সঙ্গীতের অর্থবোধক। সর্ব্বাগ্রে চৈতন্যের সন্ন্যাস আশ্রয় করিয়া এই গৌরচন্দ্রিকার সূচনা হয়। তাঁহার ভক্ত সহচরগণ তাঁহার বিয়োগ-বেদনায় অভিভূত হইয়া যে 'মাথুর' সংঙ্গীতের রচনা করেন, তাহাই উত্তরকালে রাধাকৃষ্ণ-সঙ্গীতের পূর্ব্বাভাসরূপে গৌরচন্দ্রিকায় পরিণত হয়। চৈতন্যের ভক্তগণের মধ্যে নরহরি সরকার সর্ব্বপ্রথমে বাংলা কবিতায় এইরূপ গীত রচনা করেন, কিন্তু বাসুঘোষ গৌরচন্দ্রিকা রচনায় সর্ব্বাপেক্ষা সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

চৈতন্যের বিচিত্র প্রেমাভিনয় পদ-সাহিত্যের প্রাণ। তাঁহার মধুর সংকীর্ত্তন ও নর্ত্তনের দৃশ্য এবং অশ্রুপুলকাদি সাত্ত্বিক লক্ষণ ও পূর্ব্বরাগ, অভিসার, মান, বিরহ প্রভৃতি বিবিধ প্রেমভাবের বিকাশ লক্ষ্য করিয়া পদকর্ত্তৃগণ তাঁহাদের

সুললিত পদাবলী রচনা করেন। তাঁহার প্রেমসাগরের ভাবলহরী বৈষ্ণব সাধকদিগের সাধনার সামগ্রী। বৈষ্ণব ভক্তি গ্রন্থে এই ভাবাবলী বিশিষ্ট ভাবে বর্ণিত হইয়াছে—বিশেষতঃ শ্রীরূপ গোস্বামীর "উজ্জ্বল নীলমণি" নামক সংস্কৃত গ্রন্থে চৈতন্যদেবের প্রেমভাবরাজি বিস্তৃতভাবে আলোচিত ও ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তৎপরে নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বঙ্গভাষায় তাঁহার "ভক্তিরত্নাকর" নামক গ্রন্থে এই বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহারা এই ভাবগুলি সর্ব্বশুদ্ধ ৩৬০ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন।

মহাপ্রভুর এইরূপ কোন বিশিষ্টভাব লক্ষ্য করিয়া বিশেষ বিশেষ গৌরচন্দ্রিকার উৎপত্তি হইয়াছে। রাধাকৃষ্ণ সংগীত গাহিবার অগ্রে কীর্ত্তনগায়ক চৈতন্য-চরিত ধ্যান করিয়া অনুরূপ গৌর-চন্দ্রিকার অবতারণা করিয়া থাকেন—এই রীতি চৈতন্যযুগের বৈষ্ণব সংগীতে প্রবর্ত্তিত হইয়া অদ্যাপি চলিয়া আসিতেছে। ইহাই চৈতন্য প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব সাহিত্যের বিশেষত্ব। আপাত-দৃষ্টিতে রাধাকৃষ্ণ গীতে অশ্লীলতার গন্ধ থাকিতে পারে. কিন্তু গৌরচন্দ্রিকায় চৈতন্যের প্রেমচিত্রের বর্ণনা শুনিলে, শ্রোতার মনে বিশুদ্ধ ভগবৎ-প্রেমের উদয় হয়। তখন রাধাকৃষ্ণ-প্রেমাশ্রিত আদিরসেও চিত্তবিকার জন্মে না—পার্থিব প্রেম স্বর্গীয়ভাবে পরিণত হইয়া ভগবদ্ভক্তির উন্মেষ সাধন করে।

নব্য বৈষ্ণব সমাজ রাধাকৃষ্ণকে ঐতিহাসিক স্ত্রীপুরুষ না ভাবিয়া রূপক-ভাবে কল্পনা করেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের নিকট প্রেমাধিষ্ঠাতা দেবতা স্বরূপ এবং রাধা প্রেমপিপাসু মানবাত্মা—কায়মনোবাক্যে সেই দেবতার উপাসনায় নিরত। এই আধ্যাত্মিকতাই বৈষ্ণব কবিতার প্রাণ। যিনি এই ভাবে বৈষ্ণব কবিতার অর্থ গ্রহণ না করেন, তিনি ইহার প্রকৃত রসাস্বাদনে বিমুখ। বৈষ্ণব কবি কৃষ্ণকমল গাহিয়াছেন—" স্ফূর্ত্তিরূপে মূর্ত্তি যখন দেখেন নয়নে, তখন ভাবেন কৃষ্ণ এল বৃন্দাবনে, অদর্শনে ভাবেন কৃষ্ণ গেছে মধুপুরী।" পাঁচালি-গায়ক দাশরথি গাহিয়াছেন—

> হৃদিবৃন্দাবনে বাস কর যদি কমলাপতি।
> ওহে ভক্তি-প্রিয়, আমার ভক্তি হ'বে রাধা সতী॥
> মুক্তি-কামনা আমারি হ'বে বৃন্দা গোপনারী।
> দেহ হ'বে নন্দের পুরী, স্নেহ হ'বে মা যশোমতী॥"

বৈষ্ণব পদাবলী বঙ্গীয় প্রাচীন সাহিত্যের সমুজ্জ্বল রত্ন। উহার প্রাণস্পর্শী উচ্ছ্বাস ও ভাব-প্রবণতা কবিতা-জগতে এক অপরূপ সামগ্রী। উহার মধুর শব্দ-যোজনা ও লালিত্যপূর্ণ ভাষা সৌন্দর্য্যের খনি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভাষা ও ভাবে এই গীতি-কবিতা বঙ্গ-সাহিত্যে অদ্বিতীয়। ইহাতে সংস্কৃতের অন্ধ অনুকরণ-প্রিয়তা নাই—বরং মৌলিকতাই ইহার বিশেষত্ব। স্বভাব-সুলভ ভাব ও সুন্দর প্রাকৃতিক পদার্থ হইতেই [illegible]-সাহিত্যের উপকরণরাজি সংগৃহীত হইয়াছে। প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যের আদর্শ অবলম্বন না করিয়া বৈষ্ণব পদকর্ত্তাগণ বহুস্থনে সরল প্রাকৃত শব্দ প্রয়োগ করিয়া তাঁহাদের কবিতার মাধুর্য্য ও সরসতা সম্পাদন করিয়াছেন। তাঁহারা বিদ্যাপতির সুমধুর মৈথিলী ভাষার অনুকরণ করিয়া ব্রজবুলির সৃষ্টি করেন। উদাহরণ স্বরূপ কবি রাধামোহন প্রণীত একটি গৌরচন্দ্রিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

"আজু হাম কি পেখলু নবদ্বীপ-চন্দ।
করতলে করই বয়ান অবলম্ব ॥
পুনঃ পুনঃ গতাগতি করু ঘরপন্থ।
ক্ষণে ক্ষণে ফুলবনে চলই একান্ত ॥
ছল ছল নয়নে কমল সুবিলাস।
নব নব ভাব করত পরকাশ ॥
পুলক মুকুলবর ভরু সব দেহ।
রাধামোহন কছু না পাওল থেহ ॥"

বলাবাহুল্য, এই ব্রজবুলী কোন দেশের কথিত ভাষা নহে। প্রাচীন বাংলা ও মৈথিল ভাষার সংমিশ্রণে ইহার উৎপত্তি—কিন্তু এই সংযুক্ত ভাষার এমনই মাধুর্য্য যে বৈষ্ণব কবিগণ বহুল পরিমাণে এই ভাষায় পদাবলী রচনা করিয়াছেন। কবি গোবিন্দদাস এই ভাষার প্রবর্ত্তক এবং ইহাতে কবিতা রচনা করিয়া বিশেষ কৃতিত্ব লাভ করেন।

বৈষ্ণব পদকর্ত্তাদিগের সকলের নাম সংগ্রহ করা সহজ নহে। নিম্নে প্রধান প্রধান পদকর্ত্তাদের নাম গুণানুসারে প্রদত্ত হইল :—বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, বলরামদাস, রায় শেখর, ঘনশ্যাম, রায়বসন্ত, অনন্তদাস, যদুনন্দনদাস, বংশীবদন, বাসু ঘোষ ও নরহরি সরকার।

বিদেশী পদকর্ত্তাদিগের মধ্যে চম্পটী রায়, রামানন্দ রায় ও মাধবীর নাম উল্লেখযোগ্য।

এই সব পদাবলী সংগৃহীত হইয়া বহু গ্রন্থে নিবদ্ধ হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে পদকল্পতরু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

ভজন শাখা—বৈষ্ণব ধর্ম্মের সার তত্ত্ব আশ্রয় করিয়া ভজনশাখার উৎপত্তি। বৈষ্ণব সাধকগণ হিন্দু যোগীদের মত সংসারে নির্লিপ্ত ছিলেন না বরং পারিবারিক জীবনেই তাঁহারা ভগবানের সত্তা উপলব্ধি করিতেন। তাঁহারা ধর্ম্ম-সাধনার পাঁচটী পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য্য, এই পঞ্চবিধ ভাবে বৈষ্ণবগণ ভগবানের উপাসনা করিয়া থাকেন; কিন্তু মাধুর্য্য রসেই বৈষ্ণব ধর্ম্মের পূর্ণ বিকাশ। সর্ব্বোপরি দাম্পত্য প্রেমেই ভগবৎ প্রেমের মহিমা পরিস্ফুট—ইহাই প্রেম-সাধনের 'সহজ' বা স্বাভাবিক পন্থা। বলাবাহুল্য, সহজ পন্থাই 'সহজিয়া ধর্ম্মে' প্রথম প্রবর্ত্তিত এবং সহজিয়া-সাহিত্যে প্রচারিত হইয়াছিল। চণ্ডিদাস এই সহজিয়া ধর্ম্মোক্ত "পরকীয়'রসের মাহাত্ম্য প্রচার করেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্য ইহার পক্ষপাতী ছিলেন না। চণ্ডিদাস প্রচার করেন—স্ত্রীপুরুষের নিঃস্বার্থ প্রেমই ভগবৎ-প্রেম লাভের একমাত্র পন্থা; কিন্তু চৈতন্যদেব কৃষ্ণ-প্রেমে উন্মত্ত হইয়া মধুর রসের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেও, সহজিয়া ধর্ম্মের সমর্থন করেন নাই—কেবল ভগবৎ-প্রেমের অনুভূতির জন্য পার্থিব প্রেমের ভাষা ব্যবহার করিতেন মাত্র। রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের মাহাত্ম্য তাঁহার পবিত্র জীবনে পূর্ণভাবে প্রতিভাত—বৈষ্ণব কবিগণ রাধাকৃষ্ণ সঙ্গীতের মুখবন্ধে গৌরচন্দ্রিকার প্রবর্ত্তনে ইহা স্পষ্টতঃ প্রমাণ করিয়াছেন।

প্রেমাবতার চৈতন্যদেবের প্রেম-রহস্য পরিজ্ঞাত না হইলে যেরূপ বৈষ্ণব পদাবলীর প্রকৃত তাৎপর্য্য অনুভূত হইবার নহে—তদ্রূপ ভজন-শাখামূলক বৈষ্ণব সাহিত্যেও তাঁহার জীবনীর সম্পূর্ণ প্রভাব বর্ত্তমান। তিনি ভক্তশিষ্য রূপ-সনাতনকে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, তদনুসারে তাঁহারা বৃন্দাবনে থাকিয়া সংস্কৃত ভাষায় নানা ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন করেন—উদাহরণ স্বরূপ রূপ গোস্বামীর 'ভক্তি রত্নামৃত সিন্ধু' ও সনাতনের 'হরিভক্তি-বিলাস' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থদ্বয় উল্লেখ-যোগ্য। মহাপ্রভুর সহিত বংশীবদন ঠাকুরের যে ধর্ম্মালোচনা হয়, তাহা 'বংশীশিক্ষা' নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে। বৈষ্ণব ধর্ম্মতত্ত্ব

সম্বন্ধে রামানন্দ রায়ের সহিত চৈতন্যদেবের দশদিনব্যাপী যে সুদীর্ঘ কথোপকথন হয়, 'চৈতন্যচরিতামৃত' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে তাহা বিশদ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। লোকে কিরূপভাবে ভজনা করিলে বৈষ্ণব ধর্ম্মের অমূল্য সাধন—রাধাকৃষ্ণ প্রেমের পরাকাষ্ঠা লাভ করিতে পারে, এবং সাধ্যসাধনার বস্তু কি; এই কথোপকথন হইতে তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। এমন কি, 'গোবিন্দ দাসের কড়চায়' আমরা চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের যেরূপ আভাস পাইয়া থাকি, তাহাও কম মূল্যবান নহে। সুপ্রসিদ্ধ কবি কর্ণপূর-কৃত 'চৈতন্য চন্দ্রোদয়' নামক সংস্কৃত নাটকেও 'রাগানুগা' ও 'বৈধী-ভক্তি' প্রভৃতি বৈষ্ণব শাস্ত্রোক্ত বিবিধ সাধন মার্গের উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। যিনি অবহিতচিত্তে পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থসমূহ পাঠ করেন, তিনি এই শ্রেণীর বৈষ্ণব সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যের প্রভাব অনুভব করিতে পারেন।

বৈষ্ণব সাহিত্যের মধ্যযুগেও নরোত্তম ঠাকুর ও রামচন্দ্র কবিরাজ বৈষ্ণব ধর্ম্মের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাও প্রণিধান যোগ্য। পূর্ব্ববঙ্গে জলাপন্থ নিবাসী দস্যুসর্দ্দার হরিচন্দ্র রায়কে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া নরোত্তম ঠাকুর তাহার সহিত ভক্তি তত্ত্ব সম্বন্ধে যে আলোচনা করেন, তাহাই 'প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা' নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে। তাঁহার 'সাধ্যসাধনাতত্ত্ব' নামক অন্য গ্রন্থেও বৈষ্ণব-ধর্ম্ম সংক্রান্ত নানা উপদেশ পাওয়া যায়। বিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বীরের সহিত প্রসিদ্ধ রামচন্দ্র কবিরাজের যে কথোপকথন হয়, তাহা নিত্যানন্দদাস-বিরচিত 'কর্ণানন্দ' নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে—ঐ কথোপকথনেও বৈষ্ণব ধর্ম্মের সার তত্ত্ব নিহিত আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভজনশাখা সংক্রান্ত বৈষ্ণব গ্রন্থের অধিকাংশই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হওয়ায় সাধারণের বোধগম্য নহে। বাংলা ভাষায় যে কয়েক খানি ক্ষুদ্র গ্রন্থের নাম শুনিতে পাওয়া যায় তাহাও সহজলভ্য নহে। এজন্য তাহাদের নামোল্লেখ কবিবার আবশ্যক দেখি না।

আমরা সংক্ষিপ্তাকারে বৈষ্ণব সাহিত্যের পরিচয় দিলাম, কারণ অগাধ বৈষ্ণব কবিতা-সিন্ধু মন্থন করা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অসম্ভব এবং এই ক্ষুদ্র লেখকের পক্ষেও সাধ্যাতীত। বস্তুতঃ প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে বৈষ্ণব কবিতার স্থান অতি উচ্চ—বোধ করি আজিও ইহা বঙ্গ সাহিত্যে অতুলনীয়। বিশুদ্ধ ভগবৎ-প্রেম হইতে

উৎপন্ন অনাবিল ও স্বচ্ছ ভক্তিসলিলে অভিসিঞ্চিত, সুন্দর ভাব-লহরীতে আন্দোলিত, সুমধুর শব্দসংযোগে পল্লবিত, বিচিত্র ছন্দালঙ্কারে কুসুমিত এবং মধুময় কীর্ত্তন গানে গুঞ্জরিত হইয়া, এই বৈষ্ণব কবিতাকুঞ্জ বঙ্গীয় সাহিত্য-কানন অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে সুশোভিত করিয়াছিল! প্রাচীন বঙ্গভাষায় ও বঙ্গসমাজে এই সুশীতল কবিতা-উৎস যেমন নূতন ধারা প্রবাহিত করে এবং সংস্কৃত শব্দাড়ম্বরের সুবর্ণ শৃঙ্খল হইতে ভাষাকে বিমুক্ত করিয়া স্বভাব সুন্দর সরল মার্গে পরিচালিত করে, তেমনই ইহা বঙ্গবাসি জনগণকে শান্তিময় ধর্ম্মের আশ্রয়ে সাম্য, স্বাধীনতা ও শান্তির সুবিমল জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত করে। কিন্তু কালের কুটিল গতিতে, বৈষ্ণব ধর্ম্মের সেই পবিত্র স্রোত নিরুদ্ধ হইয়াছে। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, রূপ, সনাতন, লোকনাথ, রঘুনাথ, শ্রীজীব, শ্রীনিবাস, নরোত্তম, শ্যামানন্দ প্রভৃতি মহাসাধকগণ অলৌকিক প্রেমমাহাত্ম্য ও অসাধারণ আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্তে বঙ্গীয় সাহিত্য-ক্ষেত্রে যে সুমধুর কবিতারস সঞ্চারিত করিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে বিশুষ্ক প্রায়! শব্দে, ছন্দে, ভাষায়, ভাবে ও ভঙ্গিমায় বৈষ্ণব কবিতার সে কোমল, কোমলতর ও কোমলতম ভাবের বিকাশ এক্ষণে লুপ্তপ্রায়! পরবর্ত্তী কালে ক্রমান্বয়ে ভারতচন্দ্র, মাইকেল ও রবীন্দ্রনাথ কবিতা-রাজ্যে নূতন যুগ প্রবর্ত্তিত করিয়া স্ব স্ব আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন। আবার ভবিষ্যতে কোন মনস্বী কবি হয়ত বঙ্গসাহিত্যে কোন অচিন্ত্যপূর্ব্ব কবিতা-স্রোত প্রবাহিত করিয়া জগৎকে চমৎকৃত করিতে পারেন, কিন্তু আমরা এক্ষণে ধারণা করিতে পারি না যে বর্ত্তমান যুগে কোন কবি—বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস, গোবিন্দদাস জ্ঞানদাস, বলরামদাস, বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, নিত্যানন্দ দাস, যদুনন্দন দাস, নরহরি চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবিগণের ন্যায় সুমধুর পদাবলী ও কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন। তথাপি আমাদের আক্ষেপের কোন কারণ নাই, যেহেতু বঙ্গভাষা ও বঙ্গ-সাহিত্য প্রাচীন বৈষ্ণব কবিতারূপ যে অতুল সম্পদে গৌরবান্বিত, তজ্জন্য আজিও আমরা আনন্দ অনুভব করিতে পারি। আজিও বৈষ্ণব সঙ্গীত, কীর্ত্তন ও কথকতার সুললিত রাগে ও বিচিত্র ভাবে বঙ্গদেশ মুখরিত ও পুলকিত! বৈষ্ণব ধর্ম্মের মাহাত্ম্য ও মহিমায় আজিও হিন্দুসমাজ জাগ্রত রহিয়াছে! ফলতঃ শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের ত্রিবেণী-সঙ্গমে বঙ্গসমাজ আজ অদ্বিতীয় শক্তি-সম্পন্ন।

(আগামী বারে সমাপ্য)

আকাঙ্ক্ষা।

(শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল কুমার ভট্টাচার্য্য)

নয়ন তোমারে
চায় মা দেখিতে
　　ফুল্ল-কুসুম-কাননে,
বিশ্ব-ভূমির,
নব অতিথির
　　হাস্য-উজ্জ্বল আননে।
শ্রবণ শ্রীবাণী
চায় মা শুনিতে
　　মত্ত-কোকিল-কূজনে,
গন্ধ-যূথীর
পরশ অথির
　　সান্ধ্য-সমীর-স্বননে।
দুবাহু চরণ
চায় মা ছুঁইতে
　　রক্ত-অরুণ-কিরণে,
মুক্ত মহান্
পয়োধি-হৃদয়ে
　　সিক্ত অমল নলিনে।
পরাণ তোমারে
চায় মা রাখিতে
　　পরাণেরি মাঝে গোপনে।
জনক-জননি,
জননী-জননি,
　　নমামি জননি, শোভনে*।

---

*রাগিণী—আশা ভৈরবী, তাল—একতালা।

সদাচার শিক্ষা।

(কুমার শ্রীযুক্ত কবীন্দ্র নারায়ণ সিংহ)

শিক্ষাই মনুষ্যত্ব বিকাশের বীজমন্ত্র। শিক্ষাবিহীন মনুষ্যজীবন মনুষ্যপদ-বাচ্য নহে, কারণ মনুষ্যের মধ্যে মনুষ্যত্বের যে বীজগুলি অপরিস্ফুট আছে শিক্ষার সুমধুর সিঞ্চনে সেইগুলি অঙ্কুরিত হইয়া মনুষ্যকে ক্রমশঃ তাহার মানবীয় জীবনের উন্নত পদে প্রতিষ্ঠিত করে। এইজন্যই মহর্ষিগণ শিক্ষার এতাদৃশ মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। শিক্ষাই প্রত্যেক জাতির প্রাণ স্বরূপ।

জগতে যত প্রকার জাতি আছে জাতীয় লক্ষ্যের বিভিন্নতানুসারে তাহাদের প্রাণের গতিও ভিন্ন ভিন্ন প্রকার দেখা যায় এবং প্রাণের গতি বিভিন্ন হওয়ায় শিক্ষার আদর্শেও নানাপ্রকার ভিন্নতা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। যে সকল জাতির প্রাণ বাণিজ্য, তাহাদের শিক্ষার আদর্শও বাণিজ্য-মূলক। যে সকল জাতির প্রাণ শিল্পকলা-নৈপুণ্য, তাহাদের শিক্ষার আদর্শও তদ্রূপ। যে সকল জাতির প্রাণ রাজনীতি, তাহাদের শিক্ষাও রাজনৈতিক-ভাব-প্রধান হইয়া থাকে। এই সকল শিক্ষাই ধর্ম্মহীন ভৌতিক বিজ্ঞানোন্নতির সহিত দৃঢ় সম্বন্ধ বলিয়া ইহাদের দ্বারা আত্মার যথার্থ উন্নতি সম্ভবপর নহে। কিন্তু আর্য্য-জাতির প্রাণের ধারা সচ্চিদানন্দ মহাসমুদ্রের দিকে অবিরাম গতিতে ধাবিত হওয়ায় ধর্ম্মই আর্য্যজাতির প্রাণস্বরূপ। এজন্য যে শিক্ষার মূলে ধর্ম্ম নাই আর্য্যজাতির পক্ষে সে শিক্ষা যথার্থ কল্যাণপ্রদ হইতে পারে না। আর্য্যজাতির ব্যবহারিক শিক্ষার মূলেও ধর্ম্ম-শিক্ষা নিহিত আছে।

কালপ্রভাবে আর্য্যজাতি এই ধর্ম্ম শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইতে চলিয়াছে। ধর্ম্মহীন পাশ্চাত্য শিক্ষার বিষময় ফলে আর্য্যজীবন প্রাচীন আর্য আদর্শের দ্বারা আর অনুপ্রাণিত হইতে পারিতেছে না। স্কুল কলেজে কোমলমতি বালকগণ আজকাল যে শিক্ষা পাইয়া থাকে তাহার সহিত ধর্ম্ম শিক্ষার কোনই সম্বন্ধ না থাকায় বালকদিগের ভবিষ্যৎ জীবন আর্য্যাদর্শে গঠিত হইতে পারিতেছে না। তাহারা প্রায়ই লক্ষ্য-ভ্রষ্ট, আচার-ভ্রষ্ট এবং চরিত্র-ভ্রষ্ট হইয়া নিজ জীবন ও জাতীয় জীবনকে যথার্থ উন্নতির প্রশস্ত পথ হইতে বহুদূরে সরাইয়া ফেলিতেছে। সদাচার প্রতিপালন, পিতৃমাতৃভক্তি, সচ্চরিত্রতা, জ্ঞানার্জ্জনস্পৃহা,

আস্তিকতা, পরার্থপরতা, আধ্যাত্মিকতা আদি আর্য্যজাতি-সুলভ গুণগুলি ধর্ম্মহীন শিক্ষার প্রভাবে আর্য্য সন্তানের হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইতে চলিয়াছে অতএব আর্য্যজাতিকে এই আসন্ন বিপত্তি হইতে রক্ষা করিবার জন্য শীঘ্রই বিদ্যালয় সমূহে ধর্ম্ম শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং শিক্ষাদানোপযোগী পুস্তক প্রণয়ন ও অধ্যাপক প্রস্তুত করা আবশ্যক। হিন্দুজাতির একমাত্র বিরাট ধর্ম্মসভা শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল এইজন্য এই অতি আবশ্যক কার্য্যে বিশেষভাবে মনোযোগী হইয়াছেন। সনাতন ধর্ম্মের এবং আর্য্য বিদ্যার প্রধান কেন্দ্রস্থান বারাণসী ধামে একটি উপদেশক মহাবিদ্যালয় স্থাপন করিয়া স্কুল কলেজে ধর্ম্মশিক্ষাদান এবং জন সাধারণের ভিতরে ধর্ম্ম প্রচার করণোদ্দেশ্যে যোগ্য অধ্যাপক ও প্রচারক প্রস্তুত করিতেছেন এবং ধর্ম্ম শিক্ষোপযোগী অনেক মৌলিক গ্রন্থ সংস্কৃত, ইংরাজি ও বিবিধ প্রাদেশিক ভাষায় বিরচিত করিয়া স্কুল কলেজে ধর্ম্ম শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেছেন। স্কুল ও কলেজে ধারাবাহিক-রূপে ক্রমোচ্চ শিক্ষা দানের জন্য অনেকগুলি ধর্ম্মগ্রন্থের প্রয়োজন। শ্রীমহা-মণ্ডলের পুরুষার্থ শক্তির বলে এই গুরুতর অভাব বিদূরিত হইয়াছে। মহামণ্ডল স্কুলের কয়েক শ্রেণীর জন্য ধারাবাহিকরূপে ধর্ম্ম শিক্ষার পুস্তক প্রণয়ন করি-য়াছেন ও করিতেছেন এবং কলেজের কয়েক শ্রেণীর জন্যও ইংরাজী ভাষায় ধর্ম্ম গ্রন্থ প্রস্তুত করা হইয়াছে। সদাচার আর্য্যজাতির প্রথম ধর্ম্ম এজন্য কোমলমনা শিশুদিগের ধর্ম্ম শিক্ষোপযোগী "সদাচার সোপান" নামক সংক্ষিপ্ত পাঠ্য পুস্তক প্রকাশের পর "সদাচার শিক্ষা" নামক এই ধর্ম্ম পুস্তকখানি বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত হইতেছে। এই পুস্তক মনোযোগ পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিলে কোমলমতি হিন্দুসন্তানগণ আর্য্যজনোচিত সদাচার বিষয়ে অবশ্যই সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইবে। ধর্ম্মপরায়ণ দেশনেতাগণ স্কুলে এই গ্রন্থের যাহাতে বহুল প্রচার ও শিক্ষার ব্যবস্থা হয় তজ্জন্য বিশেষ যত্ন করিলে শ্রীমহামণ্ডল নিজের পরিশ্রম সার্থক মনে করিবে।

সংস্কৃত, ইংরাজী, হিন্দী ও অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায় যেরূপ ধর্ম্ম শিক্ষো-পযোগী পাঠ্য পুস্তক শ্রীমহামণ্ডলের দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে বঙ্গবাসিগণের উৎসাহ পাইলে বঙ্গভাষাতেও সেইরূপ পাঠ্য গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা করা হইবে।

এই গ্রন্থের সমস্ত স্বত্বাধিকার দীন, দরিদ্র ও দুঃস্থ ব্যক্তিগণের সহায়তার্থ শ্রীমহামণ্ডলের দ্বারা স্থাপিত শ্রীবিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা দানভাণ্ডারে অর্পিত হইল।

উদ্বোধন।

(শ্রীগোপালচন্দ্র বেদান্তশাস্ত্রী)

বিশ্ব যদি চাহে সুখ।
জপুক এ মন্ত্র—
দুঃখদ পরতন্ত্রতা,
সদা সুখী স্বতন্ত্র।

সাময়িকী।

মহামণ্ডল সংবাদ—মহামান্য বড় লাট সাহেব বাহাদুরের সমীপে মহামণ্ডল কাউন্সিলের সভাপতি মহোদয়ের দস্তখত যুক্ত যে আবেদন পত্র প্রেরিত হইয়াছে তাহার সারাংশ নিম্নে লিখিত হইতেছে :—

সম্রাটের পুত্র প্রিন্স-অফ-ওয়েলস্ মহোদয়ের ভারতে শুভাগমন উপলক্ষে ভারতসরকারের পক্ষ হইতে যেন এইরূপ ঘোষণা করা হয় যে বরিষ্ঠ অথবা প্রান্তীয় ব্যবস্থাপক সভা হিন্দুধর্ম্ম এবং অন্য ধর্ম্ম বা সমাজের ওয়ারিশ এবং ধার্ম্মিক ও সামাজিক রীতিনীতির উপর হস্তক্ষেপে করিবে না। যদি কোন কারণে প্রিন্স অফ ওয়েল্সের এদেশে শুভাগমন না হয় তবে যে বিশেষ অধিবেশনে ভারতবাসিকে এই নূতন শাসন সংস্কার প্রদত্ত হইবে সেই দরবারে যেন বড় লাট সাহেব স্বয়ং অনুগ্রহ পূর্ব্বক ঐরূপ ঘোষণাবাণী প্রচার করেন। এতদ্ভিন্ন বড় লাট সাহেব বাহাদুরের নিকট আমাদের আর একটি নিবেদন এই যে তিনি যেন অখিল ভারতবর্ষীয় সনাতন ধর্ম্মাবলম্বিদিগের প্রতিনিধিভূত এই বিরাট ধর্ম্ম সভার এই আবেদন সম্রাট মহোদয়ের নিকট পাঠাইয়া ইহাতে তাঁহার সম্মতি আনাইয়া লন। এবিষয়ে ভাইসরয় মহোদয়ের সুবিচার প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে আমাদের নিবেদন এই যে গভর্ণমেণ্ট যেন হিন্দুধর্ম্মের প্রধান প্রধান নেতাদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করেন এবং অপরিণতবুদ্ধি যুবকগণের অন্তঃকরণে বলশেভিজমের প্রভাব না পড়ে তাহার জন্য যে সকল ধার্ম্মিক নেতা উৎসাহের সহিত কার্য্য করেন গভর্ণমেণ্ট যেন তাঁহাদের সহায়তা করেন। এই উচ্ছৃঙ্খল মতের প্রচার যাহাতে না হয় তজ্জন্য স্কুল কলেজে ধার্ম্মিক শিক্ষা প্রদান করিয়া বিদ্যার্থীদের হৃদয় হইতে অজ্ঞান অন্ধকার বিদূরীত করিবার ব্যবস্থা করা হউক এবং এইরূপ শিক্ষার ভার কোন দায়িত্বপূর্ণ সভার উপর ন্যস্ত করা হউক।

নারীধর্ম্ম।

[স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী।]

বিধবাবস্থা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ভগবান বেদব্যাস আজ্ঞা করিয়াছেন যে—

অনুযাতি ন ভর্ত্তারং যদি দৈবাৎ কথঞ্চন।
তত্রাপি শীলং সংরক্ষ্যং শীলভঙ্গাৎ পতত্যধঃ॥
বিধবাকবরিবন্ধো ভর্তৃবন্ধায় জায়তে।
শিরসো বপনং কার্য্যং তস্মাদ্বিধবয়া সদা॥
একাহারঃ সদা কার্য্যো ন দ্বিতীয়ঃ কদাচন।
পর্য্যঙ্কশায়িনী নারী বিধবা পাতয়েৎ পতিং।
তস্মাদ্ ভূশয়নং কার্য্যং পতিসৌখ্যসমীহয়া।
নৈবাঙ্গোদ্বর্ত্তনং কার্য্যং ন তাম্বুলস্য ভক্ষণং॥
গন্ধদ্রব্যস্য সম্ভোগো নৈব কার্য্যস্তয়া ক্বচিৎ।
শ্বেতবস্ত্রং সদা ধার্য্যমন্যথা রৌরবং ব্রজেৎ॥
ইত্যেবং নিয়মৈর্যুক্তা বিধবাঽপি পতিব্রতা॥

বিধবা স্ত্রী কেশবিন্যাস, তাম্বুল ও গন্ধপুষ্পাদি সেবন, রঞ্জিত বস্ত্র পরিধান, কাংস্যপাত্রে ভোজন ও দুইবার ভোজন করিবেন না এবং চক্ষে কাজল দিবেন না। স্নানানন্তর বিধবার শ্বেত বস্ত্র পরিধান করা উচিত। বিধবা ক্রোধ ও ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিবেন, পাপ ও ছল পরিত্যাগ করিবেন, আলস্য তন্দ্রাদিকে আশ্রয় দিবেন না, পবিত্র ও শুদ্ধাচার যুক্ত হইয়া ভগবানের পূজা করিবেন, কুশাস্তৃত পবিত্র স্থানে অথবা কেবল ভূমিতে শয়ন করিবেন, সর্ব্বদা ধ্যান রতা ও সৎসঙ্গিনী হইবেন, তপস্বিনী হইয়া জীবন যাপন করিবেন, এবং রজস্বলা হইলে ভোজন ত্যাগ করিবেন অথবা দেশ, কাল ও স্বাস্থ্য বিচার করিয়া অল্পাহার করিবেন। দুইবার আহার, পরান্ন ভোজন, মৈথুন, আমিষ, ভূষণ, পর্য্যঙ্কশয়ন ও রঞ্জিত বস্ত্রধারণ বিধবা স্ত্রী ত্যাগ করিবেন ও কদাপি বস্ত্রদ্বারা দেহ মার্জ্জন অথবা অসৎ কথোপকথন করিবেন না এবং বৈধব্য ধর্ম্মাবলম্বন পূর্ব্বক দেবতার পূজা ও ব্রতাদির দ্বারা কালযাপন করিবেন। পতির সহিত যদি দৈববশতঃ সহমৃতা হইতে না পারেন তবে বিধবা স্ত্রী নিজ চরিত্র রক্ষা অবশ্য করিবেন। কারণ চরিত্র ভ্রষ্ট হইলেই পতন হয়। বিধবার কেশ বন্ধন পতির বন্ধনের কারণ হয় অতএব বিধবার মুণ্ডন করা কর্ত্তব্য। বিধবা একাহার করিবেন এবং পর্য্যঙ্কে কখনও শয়ন করিবেন না কারণ উহাতে

পতির অধোগতি হইয়া থাকে। শরীর মার্জ্জন, তাম্বূল সেবন ও গন্ধ লেপন করা বিধবার অনুচিত এবং সর্ব্বদা শ্বেত বস্ত্র পরিধান করা উচিত। নচেৎ পাপ ভাগিনী হইবেন। এইপ্রকার নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া চলিলে বিধবা আপনার পাতিব্রত্য পূর্ণরূপে পালন করিতে সমর্থ হন।

এইরূপে সংযমশীলা তপস্বিনী বিধবা সতী মৃত পতির আত্মার সহিত নিজ আত্মাকে সম্মিলিত করিয়া অনুপম স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করেন। পতির আত্মা ইন্দ্রলোক, চন্দ্রলোক অথবা অন্য যে কোন লোকে বিদ্যমান থাকুক না কেন সাধ্বীর অলৌকিক প্রেমশক্তি সংযোগশূন্য বৈদ্যুতিক শক্তির ন্যায় স্বীয় মনোযন্ত্র হইতে বিনিঃসৃত হইয়া পতির হৃদয় যন্ত্রকে স্পর্শ করতঃ তাহার অন্তঃকরণে অপার আনন্দের অমৃতধারা সিঞ্চন করিয়া থাকে এবং সংসারে পবিত্র সতীত্ব ও দাম্পত্য প্রেমের আদর্শ স্থাপন করে। ইহাই আর্য্য জাতির যথার্থ বিবাহ-বিজ্ঞান। প্রেম সূক্ষ্ম জগতের বস্তু, পতির জীবদ্দশায় তাহা স্থূল ও সূক্ষ্মে বিভক্ত ভাবে থাকে এবং স্থূল সম্বন্ধ নিবন্ধন তাহাতে কিঞ্চিৎ তারল্যও বিদ্যমান থাকে; পরে পতির স্থূল শরীর বিনষ্ট হইলে কেবল মাত্র সূক্ষ্ম দেহ ও আত্মার সহিত প্রেমের পবিত্র সম্বন্ধ থাকার দরুণ উহার তারল্য দূরীভূত হইয়া গাম্ভীর্য্য সমধিক বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। যেমন, সমাধিস্থ পুরুষ মায়িক স্থূল পদার্থ পরিহার করতঃ পরমাত্মার সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় স্বরূপে সতত রমণ করেন; সেখানে স্থূল জগতের মালিন্য লেশ মাত্র দৃষ্ট হয় না; ঠিক সেইরূপ, সাধ্বী স্ত্রী পরলোক-গত প্রাণেশের হৃদয়ের সহিত সূক্ষ্ম জগতে সম্বন্ধ স্থাপন করতঃ তাহারই চরণারবিন্দে তন্ময় হইয়া দিবারাত্র অপার আনন্দ অনুভব করিতে থাকেন। যেমন জীবন্মুক্ত পুরুষ উল্লিখিত ভাবে যাবজ্জীবন অতিবাহিত করিয়া শরীর ত্যাগানন্তর পরব্রহ্মে বিলীন হইয়া বিদেহ মুক্তিলাভ করেন, তেমনি বিধবা সতী দেহান্তে পতির স্বরূপে লয় হইয়া পঞ্চম লোকে গমন পূর্ব্বক স্বকীয় স্ত্রীযোনী হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। অনার্য্য জাতি হইতে আর্য্য জাতির যতগুলি বিশেষত্ব আছে তাহাদের মধ্যে ইহা এক অপূর্ব্ব বিশেষত্ব।

উপর্য্যুক্ত সূক্ষ্ম বিজ্ঞানের উপর সংযম করিলে বিচারবান পুরুষ মাত্রই ইহা অবশ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবেন যে, আধুনিক প্রধান আলোচ্য

বিষয় নিয়োগ অর্থাৎ অন্যের দ্বারা পুত্র উৎপাদন করা ও বিধবা-বিবাহ আর্য্য শাস্ত্রানুসারে কখনই ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। কোন কোন অদূরদর্শী পুরুষ নিয়োগ-বিধিকে সর্ব্বসাধারণ ধর্ম্মরূপে প্রমাণিত করিবার জন্য অনেক কষ্ট-কল্পনা স্বীকার করিয়াছেন এবং বেদ ও স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্র হইতে প্রমাণ দেখাইয়া তাহার অযৌক্তিক মিথ্যা অর্থ করিয়াছেন। যদি তাঁহারা এইরূপ বিচার করিতেন যে "স্মৃতি শাস্ত্রাদির আজ্ঞা দেশ, কাল ও পাত্র ভেদে লক্ষ্য স্থির করিয়া সামঞ্জস্যের সহিত মানা যাইতে পারে এবং আজ্ঞা যথার্থ হইলেও দেশ, কাল, পাত্রোপযোগী না হইলে তাহার উপযোগ করা যাইতে পারে না" তবে তাঁহাদিগকে আর ভ্রান্ত হইয়া মিথ্যা কল্পনা করিতে হইত না।

এখন স্মৃতি শাস্ত্রোক্ত নিয়োগ-বিধির পালন বর্ত্তমান যুগে হইতে পারে কিনা তাহা বিচার করা যাইতেছে। নিয়োগ বিষয়ে মনু বলিয়াছেন যে—

দেবরাদ্বা সপিণ্ডাদ্বা স্ত্রিয়া সম্যঙ্‌ নিযুক্তয়া।
প্রজেপ্সিতাধিগন্তব্যা সন্তানস্য পরিক্ষয়ে॥
বিধবায়াং নিযুক্তস্তু ঘৃতাক্তো বাগ্‌যতো নিশি।
একমুৎপাদয়েৎ পুত্রং ন দ্বিতীয়ং কথঞ্চন॥

যদি নিজ পতির দ্বারা সন্তানোৎপত্তি না হয় তবে স্ত্রী সন্তান কামনায় দেবর অথবা অন্য কোন সপিণ্ড পুরুষ নিয়োগ করিয়া সন্তান লাভ করিবে। রাত্রিতে সর্ব্বাঙ্গে ঘৃত লেপন করিয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক সগোত্র নিযুক্ত পুরুষ পুত্রকামা বিধবা স্ত্রীতে একটি মাত্র পুত্রোৎপাদন করিবে। কদাচ দুইটি করিবে না। এইরূপে নিয়োগ বিধির উপদেশ করিয়া মনু আবার পশুধর্ম্ম বলিয়া ইহার অত্যন্ত নিন্দা করিয়াছেন। যথা—

নান্যস্মিন্‌ বিধবা নারী নিযোক্তব্যা দ্বিজাতিভিঃ।
অন্যস্মিন্‌ হি নিযুঞ্জানা ধর্ম্মং হন্যুঃ সনাতনং॥
নোদ্বাহিকেষু মন্ত্রেষু নিয়োগঃ কীর্ত্ত্যতে কচিৎ।
ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ॥
অয়ং দ্বিজৈর্হি বিদ্বদ্ভিঃ পশুধর্ম্মো বিগর্হিতঃ।
মনুষ্যাণামপি প্রোক্তো বেনে রাজ্যং প্রশাসতি॥

স মহীমখিলাং ভুঞ্জন্ রাজর্ষিপ্রবরঃ পুরা।
বর্ণানাং সঙ্করঞ্চক্রে কামোপহতচেতনঃ॥
ততঃ প্রভৃতি যো মোহাৎ প্রমৃতপতিকাং স্ত্রিয়ং।
নিযোজয়ত্যপত্যার্থং তং বিগর্হন্তি সাধবঃ॥

দ্বিজগণ বিধবা স্ত্রীকে কখনও নিয়োগ করাইবেন না। কারণ পতি ব্যতীত অন্য পুরুষে নিযুক্তা স্ত্রীর একপতিব্রত ধর্ম্মের হানি হইয়া থাকে। বিবাহ সংস্কারের বৈদিক মন্ত্র সমূহে নিয়োগ-বিধির অথবা বিধবা-বিবাহ বিধির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। শাস্ত্রজ্ঞ দ্বিজগণ নিয়োগকে পশুধর্ম্ম বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। পাপাত্মা বেন রাজার রাজ্যকালে এই বিধি মনুষ্যের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছিল। রাজা বেন সসাগরা ধরার অধীশ্বর ও রাজর্ষি বরেণ্য হইয়াও পাপযুক্তবুদ্ধিবসে কামোন্মত্ত হইয়া এইরূপ গর্হিত বিধির প্রচার দ্বারা বর্ণসঙ্কর প্রজা উৎপাদন করাইয়াছিলেন। সেই হইতে যে ব্যক্তি পুত্রোৎপাদনের নিমিত্ত বিধবাকে নিয়োগের আজ্ঞা দেন সাধুগণ তাহাকে অত্যন্ত নিন্দা করিয়া থাকেন। এইপ্রকার অন্যান্য স্মৃতিতেও বিধবা বিবাহের ও নিয়োগের অত্যন্ত নিন্দা দেখিতে পাওয়া যায়। মনুষ্য পশু নহে, অতএব পশুধর্ম্ম মনুষ্যের পক্ষে বিহিত হইতে পারে না। তাহাতে আবার আর্য্য জাতি মনুষ্য জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত, সেই জাতিকে যে অল্পবুদ্ধি ব্যক্তি পশুধর্ম্মের বিধান দেয়, তাহার মত পাপী এজগতে কে হইতে পারে? এই সকল বিচার ছাড়া নিয়োগ বিধি বর্ত্তমান দেশ, কাল ও পাত্রের সম্পূর্ণ অনুপযোগী বলিয়া সর্ব্বথাই হেয়। মনু নিয়োগে ঘৃতাক্ত হইয়া সম্বন্ধ করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন, তাহার কারণ এই যে, নিয়োগ সাধারণ স্ত্রী পুরুষ সম্বন্ধের ন্যায় কামোপভোগের জন্য সম্বন্ধ নহে। এজন্য গর্ভাধানার্থ ইন্দ্রিয়-স্পর্শ ব্যতীত অন্য অঙ্গ স্পর্শ যাহাতে না হয় সেই কারণে ঘৃত লেপনের বিধি দেখিতে পাওয়া যায়।

নিখিল বেদার্থ-বোদ্ধা ভগবান মনু বলিয়াছেন যে—

ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য ভার্য্যা যা গুরুপত্ন্যনুজস্য সা।
যবীয়সস্তু যা ভার্য্যা স্নুষা জ্যেষ্ঠস্য সা স্মৃতা॥

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নী কনিষ্ঠের পক্ষে গুরুপত্নী তুল্য পূজনীয়া এবং কনিষ্ঠ

ভ্রাতার পত্নী জ্যেষ্ঠের পক্ষে পুত্রবধূর তুল্য। অতএব মনুর আজ্ঞানুসারে ইহাতে কামজ সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া নিতান্ত নিন্দনীয় ও পাপজনক। এইহেতু সন্তানোৎপাদন করতঃ বংশ রক্ষার জন্য শাস্ত্রে নিয়োগের নির্দেশ থাকিলেও কামজ সম্বন্ধ সর্ব্বথা হেয়। মনু আরও বলিয়াছেন যে—

বিধবায়াং নিয়োগার্থে নিবৃত্তে তু যথাবিধি।
গুরুবচ্চ স্নুষাবচ্চ বর্ত্তেয়াতাং পরস্পরম্॥
নিযুক্তৌ যৌ বিধিং হিত্বা বর্ত্তেয়াতান্তু কামতঃ।
তাবুভৌ পতিতৌ স্যাতাং স্নুষাগ-গুরুতল্পগৌ॥

যথাবিধি নিয়োগরূপ প্রয়োজন নিষ্পন্ন হইলে ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূ পুনরায় পূর্ব্ব সম্বন্ধানুসারে আচরণ করিবে। নিযুক্ত জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিয়োগ বিধি পরিত্যাগ করিয়া যদি ভ্রাতৃবধূর সহিত কামজন্য নিকৃষ্ট সম্বন্ধ স্থাপন করে তবে পুত্রবধূ গমন ও গুরুপত্নী গমন পাপহেতু উভয়েই পতিত হয়। সম্প্রতি ইহাই বিচার্য্য যে, কথিতরূপে স্ত্রীর সহিত ঐন্দ্রিয়িক সম্বন্ধ-যুক্ত হইয়াও পুরুষের চিত্ত বিচলিত ও কামমুগ্ধ না হওয়া এবং এরূপ নিয়োগবিধি এই ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্রতার যুগে বিষয়লোলুপ মনুষ্য কর্ত্তৃক যথাযথভাবে প্রতিপালিত হওয়া সম্ভবপর কিনা? কারণ, মনু বলিয়াছেন যে—

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥

মাতা, ভগিনী ও কন্যার সহিতও নির্জ্জনস্থানে থাকা উচিত নহে যেহেতু, দুর্দ্ধর্ষ ইন্দ্রিয়নিচয় বিদ্বান ব্যক্তির মনকেও বিচলিত করিয়া থাকে। এইরূপ সর্ব্বভূতহিত-কামী ত্রিকালদর্শী মনু ইন্দ্রিয়ের চিত্তোন্মাদকারিণী ভীষণ শক্তির বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। যখন বিষয় নিকটে থাকাতেই এত ভয় ও প্রমাদের সম্ভাবনা তখন সেই বিষয় ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া এই তমঃপ্রধান কলিযুগে তামসিক সংস্কারযুক্ত বিষয়াসক্ত-চিত্ত মনুষ্য ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক হার্দ্দিক সংযমের পরিচয় দিবে ইহা কল্পনারও অতীত। দেশকাল অপকৃষ্ট হওয়ায়, গর্ভাধান আদি সংস্কার সমূহ বিনষ্ট হওয়ায় এবং স্থূল সুখাভিলাষী পিতা মাতার জঘন্য কাম-বৃত্তি দ্বারা সন্তান উৎপন্ন হওয়ায় কলিযুগে মনুষ্যগণের শরীর প্রায় কামজ। অতএব এই প্রকার নিকৃষ্ট শরীরে অন্য স্ত্রীতে উপগত হইয়া নিয়োগ বিধির

অনুকূল ধৈর্য্য ধারণ করা এবং কামোপভোগ বুদ্ধির অভাব হওয়া কলি-কলুষিত মানবের পক্ষে অত্যন্ত অসম্ভব। এজন্য অপরাপর যুগে নিয়োগ বিধির প্রচলন শাস্ত্রে দৃষ্ট হইলেও কলিযুগে নিয়োগ চলিতে পারে না এবং উক্ত কারণে মহর্ষিগণও নিয়োগের নিন্দা পূর্ব্বক কলিযুগে ইহার নিষেধ করিয়াছেন। সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী দেবর্ষি বৃহস্পতি বলিয়াছেন যে—

উক্তো নিয়োগো মনুনা নিষিদ্ধঃ স্বয়মেব তু।
যুগক্রমাদশক্যোঽয়ং কর্ত্তুমন্যৈর্বিধানতঃ॥
তপোজ্ঞানসমাযুক্তা কৃতে ত্রেতাযুগে নরাঃ।
দ্বাপরে চ কলৌযুগে শক্তিহানির্হি নির্ম্মিতা॥
অনেকধা কৃতাঃ পুত্রা ঋষিভিশ্চ পুরাতনৈঃ।
ন শক্যন্তেঽধুনা কর্ত্তুং শক্তিহীনৈরিদন্তনৈঃ॥

মনু নিয়োগের আদেশ করিয়া পরে নিজেই আবার উহা নিষেধ করিয়াছেন, কেননা যুগানুসারে ক্রমশঃ শক্তিহ্রাস হওয়ায় মনুষ্যগণ এখন পূর্ব্বের ন্যায় নিয়োগবিধি পালন করিতে সক্ষম হইবে না। সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে লোক সকল তপস্বী ও জ্ঞানী ছিলেন কিন্তু কলিযুগে মানুষের আর সে শক্তি নাই, এই কারণে প্রাচীন ঋষিগণ যেরূপ নিয়োগাদি দ্বারা সন্তানোৎপাদন করিতেন ও করাইতেন কলিযুগের শক্তিহীন মনুষ্য এখন আর সে রকম করিতে পারিবে না। পুরাণেও দেখিতে পাওয়া যায় যে—

দেবরেণ সুতোৎপত্তিঃ...............বিবর্জয়েৎ।

কলিযুগে দেবরের দ্বারা পুত্রোৎপাদন বর্জ্জন করিবে। এই প্রকার আরও কতিপয় কার্য্য কলিযুগে নিষিদ্ধ বলিয়া শাস্ত্রে অভিহিত আছে। আদি পুরাণে লিখিত আছে যে—

এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ।
নিবর্ত্তিতানি কার্য্যানি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ॥

মহাত্মাগণ সংসারের রক্ষার নিমিত্ত কলিযুগের আদিতে ব্যবস্থা পূর্ব্বক কতকগুলি কার্য্য করিতে নিষেধ করিয়াছেন। অতএব কথিত যুক্তি ও প্রমাণ সমূহ দ্বারা কলিযুগে নিয়োগ নিষিদ্ধ ও অসম্ভব প্রতিপন্ন হওয়ায় উহা সর্ব্বথা হেয়। কোন কোন অদূরদর্শী আধুনিক ব্যক্তি এরূপ লিখিয়াছেন "যদি বিধবা স্ত্রী ও বিপত্নীক

পুরুষ সংযম করিতে অপারগ হয় তবে নিয়োগ করিবে" এইরূপে নিয়োগের প্রতি কামকেই কারণ বলিয়াছেন। ইহা তাঁহাদের অতীব অযৌক্তিক ও অশাস্ত্রীয় ভ্রান্ত কপোল কল্পনা মাত্র। তাহারা মনুর আজ্ঞা ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। পূর্ব্বকালে এই পশুধর্ম্ম নিয়োগ নিন্দনীয় ও মনুষ্যের অযোগ্য ছিল এখন এই ঘোরতমোময় কলিকালে দেশ, কাল ও পাত্রাভাবে ইহা সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য।

এখন বিধবা বিবাহ বিষয়ে বিচার করা যাইতেছে। পুরুষপ্রকৃতি ও স্ত্রী-প্রকৃতির পার্থক্য এবং প্রকৃতিরাজ্যে উভয়ের উন্নতি ও মুক্তির প্রভেদ প্রভৃতি যাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে সেই সব বিষয়ে বিচার করিলে স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে স্ত্রীর উন্নতি ও মুক্তি পুরুষে তন্ময়তা দ্বারাই লাভ হইয়া থাকে। এই তন্ময়তা আবার একপতিব্রত দ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহাই একমাত্র ধর্ম্ম। স্ত্রীলোকদিগকে কন্যাবস্থা হইতে এরূপ শিক্ষা দেওয়া উচিত যাহাতে তাহার চিত্তে পাতিব্রত্যের অঙ্কুর উৎপন্ন হয় এবং ভবিষ্যতে সে পূর্ণ পাতিব্রত্য পালন করিয়া নিজের ও সংসারের কল্যাণ সাধন করিতে সমর্থ হয়। আজকাল বিধবা বিবাহ বিষয়ে বহুলোকের চিত্তে বহুবিধ ভ্রান্তি জন্মিতেছে। তাহারা স্ত্রী ও পুরুষের প্রকৃতিগত কি পার্থক্য আছে তাহা বিচার না করিয়া উভয় প্রকৃতি একই প্রকার মনে করিয়া তাহাদের উন্নতির জন্য একই ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং স্ত্রীর মৃত্যু হইলে যেমন পুরুষের বিবাহে অধিকার আছে সেইরূপ পতির মৃত্যু হইলে পত্নীও পত্যন্তর গ্রহণে অধিকারিণী হইতে পারে—এই স্ত্রী পুরুষে সাম্যবাদ প্রচার দ্বারা সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ইহাদের মধ্যে আবার কেহ মানস নেত্রে বিধবার ভ্রূণহত্যাজনিত পাপের বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া ভয়ে আড়ষ্ঠ হইয়া উহার করাল কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য নানাবিধ গবেষণাপূর্ণ সূক্ষ্ম চিন্তায় মস্তিষ্ক পরিচালনা করিয়াছেন। কেহ বা বিধবার সন্তান জন্মাইয়া হিন্দু সমাজের সংখ্যাবৃদ্ধি করিবার জন্য উন্মত্ত-প্রায় হইয়াছেন। শাস্ত্রেও আছে যে—যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে।

যে যেমন তাঁকে তেমনই মিলিয়া থাকে। যখন আস্তিকতা-বিহীন জড়বাদপূর্ণ পাশ্চাত্যবিদ্যা-মদে মত্ত হইয়া ভারতধুরন্ধরগণ স্ত্রী-পুরুষ-সম্যবাদে নৈপুণ্য লাভ করিলেন এবং ভাবিলেন যে নারী সমাজ সংস্কার ব্যতীত দেশের

উন্নতি কখনও সম্ভবপর নহে অতএব স্ত্রীলোকদিগকে ঘরের কোণে অধীনতা-শৃঙ্খলে বদ্ধ না রাখিয়া তাহাদিগকে মুক্ত প্রাঙ্গণে আলুলায়িত কুন্তলে সুগোল কোমল ফুটবলের (Foot ball) পশ্চাতে লাফাইতে দেওয়া, মল্লবেশে রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ করাইয়া জিমনাষ্টিক্ (Gymnastic) আদি মল্লবিদ্যা শিখান ও পত্যন্তর গ্রহণের স্বাধীনতা দেওয়া আবশ্যক। ঠিক সেই সময় তাহাদের নিকট প্রতিপত্তিলাভের আশায় কতিপয় ধর্ম্মধ্বজী অদূরদর্শী পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তি বেদ ও পুরাণাদি শাস্ত্রের মধ্যে বিধবা বিবাহের অনুকূল মন্ত্র ও শ্লোক অন্বেষণে ব্যতিব্যস্ত হইলেন এবং মন্ত্রাদির কষ্ট-কল্পনা পূর্ব্বক কদর্থ করিয়া ধর্ম্মের নামে স্বার্থ সাধন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কেহ ইহা একবারও চিন্তা করিল না যে, ধর্ম্মের লক্ষণ কি? বেদ ও বেদানুযায়ী সমস্ত শাস্ত্র ধর্ম্মকেই প্রতিপাদন করিয়াছেন অধর্ম্ম নহে। ধর্ম্মের উদ্দেশ্য জীবকে প্রবৃত্তি পথ হইতে নিবৃত্তির দিকে লইয়া যাওয়া; বেদ ও শাস্ত্র সমূহ ভূয়োভূয়ঃ সেই ধর্ম্মই যখন নানা প্রকারে প্রতিপাদন করিয়াছেন তখন সেই বেদ ও শাস্ত্রের মধ্যে, নিবৃত্তিভাবকে নিষ্কাশিত করিয়া প্রবৃত্তির পাপময় পঙ্কে নিমগ্ন হইবার আজ্ঞা কিরূপে পাওয়া যাইতে পারে? যদি তাহাই হয় তবে এরূপ বেদ ও শাস্ত্র বিচারবান বিদ্বান-গণের কিরূপে মাননীয় হইবে? যখন কেবলমাত্র এক-পতিব্রত ধর্ম্ম দ্বারাই নারী-জাতির উন্নতি ও মুক্তি লাভ হইয়া থাকে তখন ধর্ম্ম-প্রতিপাদক বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্রে কিরূপে বহু বিবাহের আজ্ঞা পাওয়া যাইতে পারে? অতএব ইদানীন্তন পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তিগণের কল্পনা কেবল অযথা জল্পনা মাত্র। ঐরূপ মন্ত্র ও শ্লোকের অর্থ অন্যবিধ, তাহা নিম্নে বিশদরূপে বিবৃত করা যাইতেছে।

ধর্ম্ম প্রকৃতির অনুকূল হইয়া থাকে, তাই স্ত্রীপ্রকৃতি ও পুরুষপ্রকৃতির পার্থক্য হেতু স্ত্রী ও পুরুষের ধর্ম্ম এক হইতে পারে না। প্রথমে এ বিষয়ে অনেক সূক্ষ্ম বিচার প্রদর্শিত হইয়াছে, সুতরাং এখন যৎসামান্য স্থূল বিচার প্রদর্শন করা যাইতেছে। সাধারণতঃ স্ত্রীশরীর ও পুরুষশরীরে আকাশ পাতাল প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, রজঃ-প্রাধান্যে স্ত্রীশরীর এবং বীর্য্য-প্রাধান্যে পুরুষ-শরীর উৎপন্ন হওয়ায় সৃষ্টির মূলেই পার্থক্য বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং কারণে ভেদ থাকায় কার্য্যেও ভিন্নতা অনিবার্য্য। উক্তপ্রকার ধাতুগত বিভিন্নতা-হেতু

ধর্ম্ম ও সৃষ্টি সম্বন্ধেও বিশেষ বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়। সৃষ্টি বিষয়ে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর দায়িত্ব অনেক অধিক। যদি কোন পুরুষ বীর্য্যাধানের পরে মরিয়া যায় তবে সন্তানোৎপত্তিতে কোন বাধা হয় না, কিন্তু দশমাস যাবৎ গর্ভে ধারণ করিবার নিমিত্ত মাতার জীবিত থাকা চাই এবং প্রসবের পরেও কিছুদিন মাতা জীবিত না থাকিলে সন্তান প্রায়ই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। যখন দেখা যাইতেছে সৃষ্টিকার্য্যে একজনের দুই মিনিটের এবং আর একজনের বর্ষাধিক সময়ের দায়িত্ব তখন উভয়ের সমান ধর্ম্ম কদাপি হইতে পারে না, প্রকৃতিরও ইহা অভিমত নহে। দ্বিতীয়তঃ ইহাও প্রত্যক্ষ দেখা যায় যে যদি এক পুরুষের অনেক স্ত্রী থাকে এবং তাহারা সতী হয় তবে ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ ধার্ম্মিক ঋতুকালাভিগামী পুরুষ কর্ত্তৃক ঋতুকালানুসারে সকল স্ত্রীর গর্ভ উৎপন্ন হইয়া থাকে, যেহেতু একবার গর্ভাধান হইলে পর স্ত্রীর পুনরায় পতির সহিত কামসম্বন্ধ করিবার আবশ্যক হয় না। কিন্তু স্ত্রীশরীর প্রাকৃতিক কারণে এরূপভাবে গঠিত যে এক স্ত্রী নিজক্ষেত্রে দুই পুরুষ হইতে শক্তি গ্রহণ করিয়া সৃষ্টি বিস্তার করিতে পারে না। তাহারা একমাত্র শক্তিই ধারণ করিতে সমর্থ দ্বিতীয় কাম বেগ উৎপন্ন হইলেও তাহাতে গর্ভ ধারণের উপকার হয় না। অতএব উভয়ের প্রকৃতিগত বিশেষত্ব থাকায় ধর্ম্মের বিশেষত্ব অবশ্যই হইবে তাই উভয়ের পক্ষে একধর্ম্ম কখনও হওয়া সম্ভবপর নহে। তৃতীয়তঃ একপতিব্রত বা একপত্নীব্রত পালন না করিয়া যদি স্ত্রী ও পুরুষ ব্যভিচার করে তথাপি উভয়ের ব্যভিচারে অনেক পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। ব্যভিচারী পুরুষ নিজে পশুত্ব প্রাপ্ত হয় এবং তাহার নিজের শরীর নষ্ট হয়; তাহার দ্বারা অন্যের অনিষ্ট হয় না, কিন্তু স্ত্রীর ব্যভিচারের প্রভাব সমস্ত কুল, সমাজ, জাতি ও দেশের উপর পড়িয়া থাকে। যদি কোন স্ত্রী পাঁচ মিনিটের জন্য ব্যভিচারিণী হইয়া অনার্য্য অথবা নীচ বর্ণের বীর্য্য গ্রহণ করে তবে সেরূপ গর্ভাধান দ্বারা অনার্য্য বা বর্ণসঙ্কর সন্তান উৎপন্ন হইয়া কুল, সমাজ, জাতি ও দেশ—সকলের মূলচ্ছেদ করিয়া থাকে। সুতরাং শুদ্ধ সৃষ্টির জন্য পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীর দায়িত্ব যখন অধিক তখন ধর্ম্মও যে উহাদের পৃথক পৃথক হওয়া উচিত ও যুক্তিযুক্ত তাহা বলাই বাহুল্য। এতদতিরিক্ত ইহাও বিচার্য্য যে পুরুষের সপ্ত ধাতু হইতে অধিক অষ্টমধাতু রজঃ স্ত্রীলোকের মধ্যে

বিদ্যমান থাকায় উহার উগ্রতা নিবন্ধন পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর স্বভাবতঃ কাম-ভাবের প্রাবল্য রহিয়াছে। এজন্য শাস্ত্রে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর কামভাব আঠগুণ অধিক অভিহিত হইয়াছে। পুরুষ ব্যভিচার করিলেও অধিক করিতে সমর্থ হয় না কারণ, শুক্রনাশ হওয়ায় পুরুষ অধিকতর উক্ত পাপাচরণ করিতে অসমর্থ হয়। প্রকৃতি তাহাকে প্রতিরোধ করে। কিন্তু স্ত্রী-প্রকৃতি এরূপ যে অবিদ্যাভাবে উহাদের ব্যভিচার বাসনার সীমা নাই। মহাভারতে আছে যে—

নাগ্নিস্তৃপ্যতি কাষ্ঠানাং নাপগানাং মহোদধিঃ।
নান্তকঃ সর্ব্বভূতানাং ন পুংসাং বামলোচনাঃ॥

বহু কাষ্ঠ ভস্মসাৎ করিয়াও অগ্নি, সমস্ত নদী আসিয়া মিলিত হইলেও সমুদ্র, এবং জীবনিচয় গ্রাস করিয়াও মৃত্যু যেমন পরিতৃপ্ত হয় না, তেমনই অবিদ্যাভাব যুক্তা স্ত্রী বহু-পুরুষসঙ্গতা হইয়াও কদাপি পরিতুষ্ট হয় না। অন্যান্য শাস্ত্রে এবিষয়ে আরও অনেক প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। যখন পুরুষের ব্যভিচারের একটা সীমা আছে কিন্তু স্ত্রীর উহা অসীম, তখন উভয়ের ধর্ম্ম ও অধিকার একই প্রকার, ইহা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, স্ত্রীজাতি প্রকৃতির অংশ হইতে উৎপন্ন হওয়ায় উহাতে বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয় ভাবই বর্ত্তমান। অবিদ্যা ভাব থাকায় পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীতে আঠগুণ অধিক কাম হইলেও বিদ্যাভাব বিদ্যমান হেতু তাহাদের ধৈর্য্যও অত্যধিক। এখন মনে করুণ যদি কোন ব্যক্তির প্রকৃতি এরূপ হয় যে সে ছটাক পরিমিতি আহার করিয়া স্বচ্ছেন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে কিন্তু আবার সেই ব্যক্তি লোভের বশবর্ত্তী হইলে এক সময়ে মন পরিমিত আহার করিয়াও তৃপ্ত হয় না, এরূপ স্থলে সে স্বল্পে সন্তুষ্ট থাকিবে না অধিক আহার অভ্যাস করিবে? এস্থলে যেমন স্বল্পাহারে সন্তুষ্ট থাকাই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক; ঠিক সেই প্রকার যখন স্ত্রীজাতির প্রকৃতিই এইরূপ যে, সে বিদ্যাভাব বশে একপতিব্রতা হইয়া তপোধর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা ইহলোকে অনুপম আনন্দ ও দিগন্তবিশ্রুত কীর্ত্তি লাভ করতঃ পারলৌকিক উন্নতির সহিত মুক্তিপদ প্রাপ্ত হইতে পারে, আর যদি তাহাদিগকে বহু পুরুষ সহবাসের স্বতন্ত্রতা দেওয়া যায় তবে অবিদ্যাভাবে অজস্র কামোপ-

ভোগের দ্বারা সংসারকে কলুষিত ও স্বয়ং উন্নতি মার্গ হইতে অধঃপতিত হইয়া থাকে, তখন স্ত্রীলোকের পক্ষে তাহাই ধর্ম্ম ও সুচিন্তিত কর্ত্তব্য হইবে যদ্দারা তাহার অন্তঃকরণে পাতিব্রত্য সংস্কার গভীররূপে অঙ্কিত হইয়া যায় এবং বহু পুরুষ সম্ভোগের বাসনা বিন্দু মাত্রও উদয় না হয়। বিষয় সুখ চিত্তগত এক প্রকার অভিমান মাত্র, তাই পুরাতন অপেক্ষা নবীন পদার্থে অধিকতর সুখানুভব হইয়া থাকে, কারণ পুরাতন বস্তু নিরন্তর ব্যবহৃত হওয়ায় তাহাতে ক্রমশঃ অভিমান হ্রাস হইয়া যায়। অননুভূতপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যাদির অভিমান-হেতু নবীন পদার্থে অভিনব আনন্দ ও সমধিক অনুরাগ জন্মিয়া থাকে। এ সকল সেই জগন্মোহিনী মায়ার লীলা মাত্র। অতএব উক্ত সিদ্ধান্তানুসারে যাহার যে পরিমাণে কাম বাসনা আছে তাহার তদনুপাতে নূতন নূতন ভোগলালসাও হইয়া থাকে। বিচার ও শাস্ত্র দ্বারা যখন উত্তম রূপে বুঝা যাইতেছে যে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর কাম আটগুণ অধিক, তখন নিত্য নূতন পুরুষ-সম্ভোগ-লালসাও যে স্ত্রীর অধিকতর তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। মহাভারতে ইহার অনুকূল প্রমাণ পরিদৃষ্ট হয় যে—

> ন চাসাং মুচ্যতে কশ্চিৎ পুরুষো হস্তমাগতঃ।
> গাবো নবতৃণানেব গৃহ্নন্ত্যেতা নবং নবম্॥

যেমন গো সমূহ ভুক্তাবশিষ্ট স্বাদু তৃণ ত্যাগ করিয়াও নবীন তৃণের জন্য লালায়িত হয় সেইরূপ অবিদ্যা বশে ইহারাও নবীন পুরুষে আসক্ত হইয়া থাকে এবং সুযোগ হইলে স্ব-বশীভূত কোনও পুরুষ গ্রহণে পরাঙ্মুখ হয় না। এই নবীন নবীন ভোগ স্পৃহাই স্ত্রীলোকদিগের অবিদ্যাভাব। পাতিব্রত্যের দ্বারা উক্ত নৈসর্গিক অবিদ্যাভাব বিদূরিত হইয়া বিদ্যাভাব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু বিধবা বিবাহ প্রচলিত হইলে বিদ্যাভাব বিলুপ্ত হইয়া অবিদ্যাভাবের আধিক্য-হেতু স্ত্রীজাতির সত্তা অচিরে উচ্ছন্ন হইয়া যাইবে। যেদিন স্বর্গীয় প্রেমের ও পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তি স্ত্রীজাতিকে, পতি পরলোকগত হইলে ঘৃণ্য বিষয়-বাসনা চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে পুনরায় পত্যন্তর গ্রহণের বিধান দেওয়া হইবে সেদিন হইতে তাহারা শরবিদ্ধ কুরঙ্গীর ন্যায় কুবাসনা-কলুষিত হৃদয়ে অতৃপ্ত অদম্য ভোগলালসায় অধৈর্য্য হইয়া সুপবিত্র গৃহস্থাশ্রমকে কিরূপ অচিন্তনীয় কদর্য্য অবস্থায় পরিণত করিবে তাহা বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ

ধীর চিত্তে বিচার করিয়া দেখিবেন। ধর্ম্মের লক্ষ্য কামাদি জঘন্য প্রবৃত্তি-নিচয়কে পদদলিত করিয়া নিবৃত্তির দিকে অগ্রসর হওয়া, কিন্তু যদি স্বেচ্ছানুরূপ কামোপভোগ করিয়াও স্ত্রী পতিব্রতা ও ধার্ম্মিকা বলিয়া জন-সমাজে প্রসিদ্ধ ও পূজিত হয় তাহা হইলে কে আর কৃচ্ছ্রসাধ্য তপস্যার দ্বারা শরীর ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিয়া পাতিব্রত্য প্রতিপালনে যত্নপর হইবে? শুধু তাহাই নহে সনাতন হিন্দুসমাজ হইতে জগদ্বরেণ্যা সতীলক্ষ্মীদিগের অপূর্ব্ব সুষমাময়ী স্নিগ্ধোজ্জ্বল পবিত্র মাধুর্য্য-পূর্ণ মাতৃ মূর্ত্তি চিরতরে অন্তর্হিত হইয়া তৎপরিবর্ত্তে ঘরে ঘরে স্বার্থসাধননিরতা কামবিহ্বলা পিশাচী আবির্ভূত হইবে এবং চির শান্তিময় হিন্দুসমাজে বীভৎস পিশাচ লীলার অভিনয় হইবে। দয়া, প্রেম, স্নেহ, শান্তি, বাৎসল্যাদি সদ্‌গুণাবলী সেই স্বৈরচারিণী পিশাচীদের প্রচণ্ড কামানলে ভস্মীভূত হইয়া সংসারকে শ্মশান হইতেও ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিবে।

এইরূপে বিধবা-বিবাহরূপী শাণিত কুঠার দ্বারা সতীত্ব কল্পতরু, যাহার অমৃতময় ফল শ্রীকৃষ্ণ, রামচন্দ্র প্রভৃতি অবতার, বশিষ্ঠ, বাল্মীকি আদি ঋষি, ধ্রুব প্রহ্লাদ সদৃশ ভক্ত এবং আচার্য্য শঙ্কর তুল্য জ্ঞানী ও মহারাণা প্রতাপের ন্যায় দৃঢ়চেতা বীরনিচয়, চিরদিনের জন্য তাহার মূলচ্ছেদ করা হইবে। বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষ নিতান্ত হীন দশাপন্ন হইলেও যে গৌরবে সে জগতের নিকট চিরকাল গৌরবান্বিত ও জগতের জ্ঞানদাতা গুরু স্থানীয় এবং বহু বিপ্লব সহ্য করিয়া আজিও নিজসত্তায় প্রতিষ্ঠিত সেই সুপবিত্র সতীধর্ম্মরূপী ভারত-গৌরবরবি অস্তমিত হইলে জগৎপূজ্য ভারত নিবিড় অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন হইয়া যে অসহ্য দুঃখানুভব করিবে ইহাতে আর সন্দেহ নাই। সমুদ্রে বুদ্বুদের ন্যায় সংসারে কত জাতির উত্থান ও পতন হইতেছে তাহার সীমা নাই। কিন্তু একমাত্র ভারতবর্ষই কেবল সতী মাতৃগণের অনুকম্পায় ও তাঁহাদের সতীধর্ম্মের তেজে পূত আর্য্যজাতিকে চিরজীবী করিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। পাতিব্রত্য বিনষ্ট হইলে আর্য্যজাতির মহত্ত্ব, চিরজীবিত্ব ও বিশেষত্ব চিরতরে কাল সমুদ্রে বিলীন হইয়া যাইবে। আর্য্য শাস্ত্রে চারি প্রকার সতীর বর্ণন দেখিতে পাওয়া যায়। যে স্ত্রী নিজ পতি ব্যতীত অন্য পুরুষকে পুরুষ জ্ঞান না করেন তিনি উত্তম সতী বলিয়া গণ্য, কারণ তাঁহার সতীত্ব ভাব এত উচ্চ ও ধারণা এত দৃঢ় যে, পতি ভিন্ন অন্য পুরুষে পুরুষভাবের উদয়ই হয় না।

যিনি নিজ পতিকে পরম দেবতা জ্ঞান করিয়া আপন হইতে অধিক বয়স্ক পুরুষকে পিতা, সমবয়স্ককে ভ্রাতা ও অল্পবয়স্ককে পুত্র জ্ঞান করেন তিনি মধ্যম সতী বলিয়া অভিহিত হন। তৃতীয় শ্রেণীর সতী তাঁহাকে বলা যায় যিনি কথিত রূপ ধারণা দৃঢ় না হইলেও ধর্ম্ম ও কুলমর্য্যাদা প্রভৃতি বিচার করিয়া শরীর ও অন্তঃকরণকে পবিত্র রাখেন। তিনি অধম সতী বলিয়া পরিগণিত যিনি মন হইতে পরপুরুষ চিন্তা ত্যাগ করিতে না পারিলেও স্থূল শরীরকে পবিত্র রাখেন। উক্তবিধ পাতিব্রত্যের প্রভাব হেতু শাস্ত্র-প্রণেতৃগণ বলিয়াছেন যে—

অর্দ্ধং ভার্য্যা মনুষ্যস্য ভার্য্যা শ্রেষ্ঠতমঃ সখা।
ভার্য্যাবন্তো ক্রিয়াবন্তো ভার্য্যাবন্তঃ শ্রিয়ান্বিতাঃ॥
সখায়ঃ প্রবিবিক্তেষু ভবন্ত্যেতাঃ প্রিয়ম্বদাঃ।
পিতরো ধর্ম্মকার্য্যেষু ভবন্ত্যার্ত্তস্য মাতরঃ॥

স্ত্রী পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গ-স্বরূপিণী ও পরম মিত্ররূপিণী। জগতে ভার্য্যাবান পুরুষ ক্রিয়াবান এবং ভার্য্যাবানই শ্রীমান। প্রিয়বাদিনী স্ত্রী বন্ধুহীন প্রদেশে সখা, ধর্ম্মকার্য্যে পিতা ও পীড়িতাবস্থায় মাতার ন্যায় পতির সহায়তা করিয়া থাকেন। এই দুঃখময় সংসারে মনুষ্যের গার্হস্থ্য জীবনে যদি কোন সুখ ও শান্তিপ্রদ বস্তু থাকে তবে সে তাহার সম্পদে সমধিক সুখদাত্রী ও বিপদে অর্দ্ধাংশভাগিনীরূপে বিপদভার লঘু করতঃ দুঃখাগ্নিদগ্ধ নিরাশ হৃদয়ে আশামৃত সেচনকারিণী পতিব্রতা সহধর্ম্মিণী, যে ভ্রমেও কখন নিজ পতি ব্যতীত অন্য পুরুষকে মনে স্থান দেয় না, কিন্তু, বিধবা বিবাহ বিহিত হইলে পুরুষের হৃদয়ে দৃঢ়মূল এই আশালতিকা নিরাশাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া হৃদয়কে ভীষণ মরুভূমিতে পরিণত করিবে কারণ, পুরুষের চিত্ত সর্ব্বদা এরূপ সন্দিহান হইতে পারে যে, "আমার স্ত্রী হয়ত কোন দিন আমা হইতে গুণবান নবীন পুরুষের সহিত বিবাহের লালসায় আমাকে সংহার করিবে, কেননা স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতই নবীন নবীন পুরুষ প্রার্থিনী হইয়া থাকে এবং ইহা এখন নারীধর্ম্মের অবিরোধী বলিয়া সমাজে প্রচলিত হইয়াছে; তাহার উপর আমি এখন তাহার চক্ষে প্রাচীন হইয়াছি তাহার পূর্ণ তৃপ্তিসাধনও করিতে পারি না" ইত্যাদি। অতএব বিধবা বিবাহের বিধান ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইলে স্ত্রীজাতির চিত্ত হইতে সতীত্ব সংস্কার অপগত হইবে; তাহাতে তাহারা আর এক পতিতে সংযম করিয়া

থাকিবার কোন আবশ্যকতা বোধ করিবে না, ফলে এই হইবে যে স্ত্রীজাতির স্বাভাবিক কাম-বাসনা ও নূতন নূতন পুরুষ ভোগ প্রবৃত্তি অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া তাহাদের প্রেমার্দ্র কোমল অন্তঃকরণকে কুলিশোপম কর্কশ ও কলুষিত করিয়া দিবে। এইরূপে একবার সতীত্ব বন্ধন ছিন্ন হইলে তখন কেহই উহাদিগকে সংযত রাখিতে সমর্থ হইবে না। শোণিত-লোলুপ ব্যাঘ্রীর ন্যায় উহারা অত্যন্ত দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিবে। অতএব এরূপ বিধান দেওয়ার এই ফল ফলিবে যে রমনীর গৃহস্থাশ্রম অশান্তি-নিকেতনে পরিণত হইবে। এবং সেই অশান্তি-পূর্ণ শ্মশানসদৃশ গৃহস্থাশ্রমে গৃহলক্ষ্মী স্বস্বরূপ ত্যাগ করিয়া পিশাচীরূপে উদ্দাম নৃত্যাভিনয় করিবে, প্রেম মন্দাকিনী পরিশুষ্ক হইয়া যাইবে ও কামানল প্রচণ্ডরূপে প্রজ্বলিত হইয়া অচিরে পতির পবিত্র দেহকে ভস্মসাৎ করিবে। এতদ্ব্যতীত সংসারে সুষমাময় সুপবিত্র দাম্পত্য-প্রেমের ছবি আর পরিলক্ষিত হইবে না, কারণ স্ত্রী স্বতন্ত্র ও প্রবল হইবে সুতরাং কথায় কথায় সে সাধারণ বিষয় লইয়া স্পর্দ্ধা পূর্ব্বক পুরুষের সহিত কলহে প্রবৃত্ত হইবে। পুরুষ নিরন্তর তাহা হইতে ভীত ও চিন্তাগ্রস্ত থাকিবে, যেহেতু স্ত্রী মনে করিলেই সামান্য কারণে পূর্ব্ব পতির প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক তাহার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া অন্যের অঙ্কলক্ষ্মী হইতে পারে। অতএব দম্পতী-সুলভ বিশ্বাস, প্রেম ও এক-প্রাণতার লেশ মাত্র নয়নগোচর হইবে না। এইরূপে স্ত্রী স্বেচ্ছাচারিণী হইলে পুরুষ সাধারণ রোগগ্রস্ত হইয়াও দুশ্চিন্তায় শীঘ্র প্রাণত্যাগ করিবে কেননা পীড়িতের সম্ভোগশক্তি হ্রাস হইয়া যায় এবং এদিকে স্ত্রীর দুষ্পূরনীয় কামবাসনা; অতএব হতভাগ্য রুগ্ন পুরুষ অন্যাসক্তচিত্ত কামুকী স্ত্রী কর্ত্তৃক স্বীয় অপমৃত্যু সঙ্কায় অধীর হইয়া আরোগ্য লাভের বিনিময়ে অবিলম্বে ইহলোক পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে। অনবরত এইরূপ বহু অনর্থ সংঘটিত হইবে, পুরুষকে ক্রীতদাসের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে স্ত্রীর অনুগত ও আজ্ঞাবহ হইয়া চলিতে হইবে; অণুমাত্র ত্রুটি হইলেই অপরাধ অমার্জ্জনীয় বোধে স্ত্রী তাহাকে এজগৎ হইতে বিদায় করিয়া দিবে কারণ সে তখন ন্যায় ও ধর্ম্ম অনুসারে অন্য একজন সুযোগ্য পতিরূপ ভৃত্য রাখিতে সমর্থ। এইরূপে বিধবা বিবাহ প্রচার দ্বারা জ্ঞানগরিমায় ও তপোমহিমায় সমুন্নত সুরকিন্নর-

বাঞ্ছিত ভারত অচিরে নারকীয় জীবের লীলাভূমি হইবে। ইহাই বিধবা বিবাহের বিষময় ফল। এখন দূরদর্শী বিবেকী ব্যক্তিগণ বিচার করিয়া দেখুন ইহাই কি ভারতবর্ষের প্রকৃত উন্নতির লক্ষণ? না এইরূপ করিলে ক্রমে ভারত উন্নত হইবে? অথবা ইহাই কি আর্য্যত্বের লক্ষণ? যদি তাহাই হয় তবে ভারতের নিতান্ত দুর্দ্দিন বুঝিতে হইবে কারণ যে জাতি সমুচিত যুক্তিযুক্ত আপন মৌলিক ভাব ও সজ্জনসম্মত শাস্ত্রীয় স্বীয় আচার ব্যবহার পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজ স্বত্ব বিধ্বস্ত করিয়া পরের অনুকরণ করাকে নিজের উৎকর্ষ বলিয়া বিবেচনা করে তাহারা বিশেষ রূপে বিচার করিলে বুঝিতে পারিবে যে অনুকরণ করিয়া ও স্বত্ব অর্থাৎ নিজ ভাব হারাইয়া জীব জাতিগত অথবা সমাজগত যে কোন প্রকার উন্নতি করুক না কেন সে তাহার প্রকৃত উন্নতি নহে, সে তাহার জীবনের অবসাদ বা মৃত্যু এবং এই মৃত্যুকে যে উন্নতি মনে করে তাহার অপেক্ষা আর ভ্রান্ত কে হইতে পারে। জাতীয় জীবনের উন্নতি সেই জাতির জাতিগত সংস্কারের উন্নতি হইতে হইয়া থাকে, কিন্তু নিজ সত্তা নষ্ট করিয়া কখনও তাহা হইতে পারে না। ভারত ইয়ুরোপ হইয়া উন্নত হইতে পারে না এই প্রকার আর্য্য অনার্য্য ভাবাপন্ন হইলে উন্নতি হয় না এবং আর্য্য সতী স্ত্রী বিলাতী বিবি হইলে তাহাকে উন্নত বলা যায় না কিন্তু সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী হইয়াই সে উন্নতি লাভ করিতে পারে ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। এই সকল কারণে মনু স্ত্রীলোকদিগের দ্বিতীয়বার বিবাহ নিষেধ করিয়াছেন। যথা—

সকৃদংশো নিপততি সকৃৎ কন্যা প্রদীয়তে।
সকৃদাহ দদামীতি ত্রীণ্যেতানি সতাং সকৃৎ॥

পৈতৃক সম্পত্তি একইবার বিভক্ত হইয়া থাকে, কন্যা একইবার বরকে সম্প্রদান করা হয় এবং সকল পদার্থকে দান একইবার করা যায়, এইজন্য সজ্জনগণ এই তিনকার্য্য একইবার করিয়া থাকেন। পুর্ব্বেও বিধবা বিবাহ বিষয়ে মনুর মত দেখান হইয়াছে যে—

ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ।

বিবাহ-বিধিতে বিধবার পুনরায় বিবাহের উল্লেখ নাই। মনু এই বলিয়া পরে বেদে বিধবা বিবাহের মন্ত্র আছে কি না তাহার মীমাংসা

করিয়াছেন। যথা—

পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রাঃ কন্যাস্বেব প্রতিষ্ঠিতাঃ।
নাকন্যাসু কচিন্নৃণাং লুপ্তধর্ম্মক্রিয়া হি তাঃ।
পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রা নিয়তং দারলক্ষণং।
তেষাং নিষ্ঠা তু বিজ্ঞেয়া বিদ্বদ্ভিঃ সপ্তমে পদে॥

বিবাহের যত বৈদিক মন্ত্র আছে, সে সমস্ত অবিবাহিতা কন্যার বিবাহে প্রযোজ্য, বিবাহিতার পক্ষে নহে, কারণ তাহারা বিবাহ সংস্কারের বহির্ভূত হইয়াছে। বৈবাহিক মন্ত্র সমূহ ভার্য্যাত্ব-নিশ্চয়-সূচক এবং এই নিশ্চয় সপ্তপদীগমনের পরে হইয়া থাকে। মনুর কথিত সিদ্ধান্ত হইতে ইহা প্রমাণিত হইতেছে যে বেদের কোন অংশে বিধবা বিবাহের আজ্ঞা নাই। বেদে ধর্ম্মের উপদেশ রহিয়াছে অধর্ম্মের নহে, সুতরাং বেদে কখনও এরূপ আজ্ঞা থাকিতেই পারে না। অন্যান্য সকল ঋষি এবং মনুও এবিষয়ে সহমত।

কোন বস্তুকে দান একবার মাত্র করা হয়। দত্ত বস্তুকে পুনরায় দান করা ধর্ম্ম ও বিচার বিরুদ্ধ। মনু ও অন্যান্য সকল স্মৃতিকার একবাক্যে ইহাই বলিয়াছেন এবং গৃহস্থ মাত্রেই জানেন যে বিবাহের পরে হিন্দুজাতির স্ত্রীর গোত্র পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া পতির গোত্র প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তদন্তর স্ত্রীর শ্রাদ্ধ, তর্পণ, ব্রত, উপবাসাদি দেবকার্য্য পতির গোত্রে উচ্চারণ পুরঃসর হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় দত্তা স্ত্রীর পুনর্দান কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? বেদেও বা কিরূপে ঈদৃশ উচ্ছৃঙ্খলভাবাপন্ন কর্ম্মের আদেশ থাকা সম্ভব; তাহা বুদ্ধিমান ব্যক্তি স্বয়ং চিন্তা করুন। আধুনিক ব্যক্তিগণ মন্ত্রসমূহের অপব্যাখ্যা করিয়া ঐরূপ কল্পনা করিয়াছেন। বেদে তাহা থাকিতেই পারে না কারণ, মনুসংহিতায় আছে যে—

যঃ কশ্চিৎ কস্যচিদ্ধর্ম্মো মনুনা পরিকীর্ত্তিতঃ।
স সর্ব্বোঽভিহিতো বেদে সর্ব্বজ্ঞানময়ো হি সঃ।

ভগবান মনু যে ধর্ম্ম প্রতিপাদন করিয়াছেন তাহা বেদানুকূল কারণ, মনু সর্ব্বজ্ঞ ছিলেন; সুতরাং দত্তা কন্যার পুনর্দান ও বিধবা বিবাহ যখন মনু নিষেধ করিয়াছেন তখন বেদে ঐরূপ বিধান থাকা কখনই সম্ভব নহে।

আর্য্যজাতি।

ইহা দেখিয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন, প্রাচীন ভারতবর্ষের সঙ্গীত বিদ্যা যতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিল ইয়ুরোপীয়েরা এখনও তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতেও সমর্থ হয় নাই। নানাবিধ প্রকৃতির আবির্ভাবের নিমিত্ত বিবিধ রাগরাগিণী গঠিত হইয়াছিল। মানব হৃদয়ে যে প্রকৃতির আবির্ভাব করিবার আবশ্যক হইত সেই প্রকার রাগরাগিণীদ্বারা (যেমন ভৈরব রাগের রূপ বৈরাগ্যময়, হিন্দোল রাগের রূপ বিলাসময় ইত্যাদি) কোন মন্ত্র অথবা গান বিশেষ গীত হইলে তাহার হৃদয়ে সেই প্রকার ভাবের স্ফূর্ত্তি হইতে থাকিত। যে প্রকার যুদ্ধশাস্ত্র প্রভৃতি ক্রিয়াসিদ্ধ বিদ্যা ক্রিয়াসিদ্ধ আচার্য্যের অভাবে লোপ পাইয়াছে সেই প্রকার প্রাচীন মার্গসঙ্গীত (বেদ গান করিবার রীতি) ও দেশী সঙ্গীত (ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ধ্রুবপদ গান করিবার রীতি) বিদ্যা ক্রিয়াসিদ্ধ উপদেশকের অভাবে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আজকাল যে সঙ্গীত বিদ্যা ভারতবর্ষে প্রচলিত রহিয়াছে তাহা বাস্তবিক প্রাচীন সঙ্গীত বিদ্যা নহে। ইহা প্রাচীন সঙ্গীত শাস্ত্রের জীর্ণ কঙ্কাল মাত্র। মুসলমান সম্রাটগণের সময়ে প্রাচীন সঙ্গীতের অনুকরণে যে সঙ্গীতবিদ্যা প্রচলিত হইয়াছিল তাহাই বর্ত্তমান হিন্দু সঙ্গীত বিদ্যারূপে পরিগণিত হইতেছে। এই সকল সাধারণ বিচার দ্বারাই বিচক্ষণগণ বুঝিতে পারিবেন যে পূজ্যপাদ আর্য্য ঋষিগণ প্রণীত সঙ্গীত শাস্ত্রের কিরূপ গভীরতা ছিল এবং তাঁহারা কিরূপ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থিত ছিলেন।

জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতি সম্বন্ধে প্রাচীন আর্য্যজাতি কিরূপ অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ছিলেন তাহা, প্রাচীন ইতিহাস পাঠ করিলে জানিতে পারা যায়। মৃত ব্যক্তির পুনর্জ্জীবন লাভ—যাহা আজকাল কল্পনারও অতীত—প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য মৃতসঞ্জীবনীবিদ্যার প্রভাব যুদ্ধে মৃত দৈত্যসৈন্যগণকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছিলেন।

অতিবৃদ্ধ কঙ্কালমাত্র সার চ্যবন ঋষির নব যৌবন প্রাপ্তি প্রভৃতি দৃষ্টান্ত প্রাচীন অলৌকিক জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতির অপূর্ব্ব পরিচায়ক। যে জীবনে কখনও রেলগাড়ী দেখে নাই এমন কোন পার্ব্বতীয়কে যদি বলা যায় যে ঘণ্টায় ৬০ মাইল যাইতে পারে এমন পদার্থও পৃথিবীতে আছে তবে সে

যে প্রকার উহা হাসিয়া উড়াইয়া দিবে, কিন্তু উহার এইরূপ উপহাস কেবল নিজ অজ্ঞতা ও মূর্খতার পরিচায়ক মাত্র; সেইরূপ, আজ আমাদের শক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহা স্বীকার না করিয়া যে সকল প্রাচীন বিষয় আমাদের বুদ্ধির অগম্য তাহাকে গল্প মনে করিয়া উড়াইয়া দেওয়া বৃথা অহঙ্কার, অজ্ঞান ও মূর্খতার পরিচায়ক। ধীর ও নিষ্পক্ষ বিচারশীল ব্যক্তি এরূপ কদাপি করিতে পারেন না। জ্ঞানসমুদ্র অনন্ত, তাহার তলদেশে গমন করিয়া উহার যাবতীয় রত্নরাজি আয়ত্ত করা মানব সামর্থ্যের অতীত। আজকাল পাশ্চাত্য জগতে কতই নবীন বিজ্ঞানের আবিষ্কার হইতেছে। যে সকল বিষয় পূর্ব্বে লোকে অসম্ভব মনে করিত তাহাই এখন সত্যরূপে প্রত্যক্ষ হইতেছে। ইহাদ্বারা কি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না যে, যাহারা ঐসকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পূর্ব্বে উহাদিগকে অসম্ভব মনে করিত তাহারা ভ্রান্ত ছিল? যদি আজ হইতে ৪০০ বৎসর পরে এই সকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারক সবংশে নিধন প্রাপ্ত হন এবং এমন একজন ব্যক্তিও জীবিত না থাকে যাহাদ্বারা এই বিজ্ঞান রক্ষিত হইতে পারে। সুতরাং এই বিদ্যা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়া গেলে ৪০০ বৎসরের পরে যে সকল লোক উৎপন্ন হইবে তাহারাও কি এই সকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কথা পুস্তকে পাঠ করিয়া উহাকে গল্প বা উপকথা মনে করিবে না? কালের রহস্যময়ী গতি কে সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ? এ বিষয়ে সাহঙ্কার স্পর্দ্ধা অপেক্ষা ধীরভাবে এই সকল বিষয় সত্য বলিয়া স্বীকার করা এবং মানবীয় বুদ্ধিকে পরিচ্ছিন্ন মনে করাই যুক্তিযুক্ত। প্রাচীন আর্য্যজাতি আপন কর্ম্মসংস্কার অপরের উপর সঞ্চালিত করিতে পারিতেন। যযাতি রাজা স্বীয় বার্দ্ধক্য যুবক পুত্র পুরুকে সমর্পণ করিয়া তাহার যৌবন স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের বয়স ১৬ বৎসর ছিল, কিন্তু মহর্ষি বেদব্যাস আপন আয়ু হইতে আরও ১৬ বৎসর প্রদান করিয়া তাঁহার আয়ু ৩২ বৎসর করিয়া দিয়াছিলেন। এইপ্রকার পরীক্ষিতের বহুবর্ষের আয়ু এক ঋষি বালক সাতদিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। এইরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্ত প্রাচীন আর্য্যজাতির ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়।

চিকিৎসা শাস্ত্রেও প্রাচীন আর্য্যজাতি যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। চিকিৎসাবিদ্যায় যে যে বিষয় বিদ্যমান থাকিলে উহার পূর্ণ উন্নতি অবগত হওয়া

যায় সে সমস্তই আয়ুর্ব্বেদে রহিয়াছে। শস্ত্রবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, ধাতুপ্রয়োগ বিদ্যা এবং কাষ্ঠাদি ভেষজ প্রয়োগ বিদ্যা, সমস্তই আয়ুর্ব্বেদে পাওয়া যায়। আয়ুর্ব্বেদ আঠ তন্ত্রে বিভক্ত, যথা,—শল্য, শালাক্য, কায়চিকিৎসা, ভূতবিদ্যা, কৌমারভৃত্য, অগদ, রসায়ন ও বাজীকরণ। এই আঠ প্রকার চিকিৎসাতত্ত্বে শরীরবিজ্ঞান, দেহবিজ্ঞান, শস্ত্রবিজ্ঞান, ধাত্রীবিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, ভেষজবিজ্ঞান এবং রোগনিদান সকল বিষয়ই বর্ণিত হইয়াছে। কেবল মনুষ্যের চিকিৎসাই নহে পশ্বাদির চিকিৎসাপ্রণালীও আয়ুর্ব্বেদে বর্ণিত আছে। চরক, সুশ্রুত ও বাগ্‌ভট্ট প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ পাঠ করিলে সর্ব্বব্যাধিবিনাশনোপায় অবগত হওয়া যায়। কক্ষীবানের কন্যা ঘোষা কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হইয়াছিল। অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাহাকে রোগমুক্ত করিলে তাহার বিবাহ হইয়াছিল। কণ্বঋষি অন্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন, নিষধপুত্র বধির হইয়াছিলেন, বধ্রিমতীর পতি নপুংসক হইয়া গিয়াছিলেন, প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের মহিমায় ইঁহারা সকলেই এই সকল দুরারোগ্য রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। আর্য্যচিকিৎসা বিদ্যার আর একটি বিশেষত্ব এই যে উহাতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্ররূপে কাষ্ঠাদি এবং ধাতুজ ঔষধের উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। কোন আচার্য্য কেবল কাষ্ঠাদি ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, কেহ বা ধাতুজ ঔষধেরই মহিমা বর্ণন করিয়াছেন। নাড়ীজ্ঞান-শাস্ত্র পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়—আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসা শাস্ত্রের কতদূর উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র অনুসারে নাড়ী পরীক্ষা দ্বারা সকল প্রকার রোগের নিদান অবগত হওয়া যায়। এই নাড়ীজ্ঞান দ্বারা তিন মাস, ছয়মাস বা তাহারও অধিককাল পূর্ব্বে ভবিষ্যৎ রোগ এবং মৃত্যু জানিতে পারা যায়। এই নাড়ী জ্ঞান শাস্ত্র এতই গহন ও সূক্ষ্ম যে পাশ্চাত্য বিদ্বানগণ এখনও উহার স্বরূপ সম্যক উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন নাই। এতদ্ভিন্ন শস্ত্র-চিকিৎসায়ও প্রাচীন আর্য্যগণ আশাতীত উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। ডাক্তার রেলী সাহেব বিশেষ প্রশংসার সহিত মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন,—"প্রাচীন ভারতবাসীদের গ্রন্থ দেখিলে বোধ হয় যে তাহারা শস্ত্র-চিকিৎসায় পারদর্শী ছিলেন। তাহারা প্রায় ১২৭ প্রকার অস্ত্র শরীরে প্রয়োগ করিতেন এবং শস্ত্রব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার ঔষধও প্রয়োগ করিতেন।" ওয়েবর সাহেব বলিয়াছেন—"শস্ত্রচিকিৎসায় (Surgery)

প্রাচীন আর্য্যগণ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং এই বিদ্যার অনেক বিষয় পাশ্চাত্যেরা ভারতবাসীদের নিকট শিক্ষা করিতে পারেন। বিকৃত নাক ও কান নূতন-শক্তি-সম্পন্ন করিবার চিকিৎসা পাশ্চাত্য চিকিৎসকেরা প্রাচীন হিন্দুদের কাছেই শিখিয়াছিলেন।" ডাক্তার হাণ্টার সাহেবও এইরূপ আর্য্য শস্ত্র-চিকিৎসার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। মিস্ ম্যানিঙ্গ বলিয়াছেন,—"প্রাচীন হিন্দুদের শস্ত্রচিকিৎসা-যন্ত্র এত সূক্ষ্ম ও উত্তম হইত যে উহা দ্বারা চুল পর্য্যন্ত লম্বালম্বি চিরিয়া ফেলা যাইত।" এই প্রকার পাশ্চাত্য ও এতদ্দেশীয় অনেক মনীষাসম্পন্ন পুরুষই প্রাচীন আর্য্যজাতির চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রশংসা করিয়াছেন।

জাতীয় বুদ্ধিবিকাশের প্রথম লক্ষণ শিল্পনৈপুণ্য। বুদ্ধি যখন সূক্ষ্ম অবস্থা ধারণ করে, যদিও ঐ সূক্ষ্মতার পূর্ণতায় বুদ্ধি আধ্যাত্মিক রাজ্যে উপনীত হয় তথাপি ঐ সূক্ষ্মতার প্রথম অবস্থায় সে এই স্থূল জগতেই বিচরণ করিয়া উহার নানা বিভাগের সুচারু বিচিত্রতা প্রকাশিত করে। বহির্জগত সম্বন্ধীয় এই বিচিত্রতা প্রকাশই শিল্পনৈপুণ্য। প্রাচীন ভারতে এই শিল্পবিদ্যার পূর্ণ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। আর্য্যশাস্ত্রের চতুর্থ উপবেদ স্থাপত্যবেদ আজিও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। আজকালকার মত কাপড় বুনিবার কল, ময়দা পিসিবার কল, সেলাই করিবার কল, সূতা কাটিবার কল প্রভৃতি দেশে ভিখারী উৎপন্ন করিবার যন্ত্র প্রাচীনকালে ছিল না বটে কিন্তু প্রাচীন ভারতে দেশোন্নতি ও ধনোন্নতি করিবার নিমিত্ত শিল্পবিদ্যা ও বিজ্ঞানবিদ্যা দ্বারা যাবতীয় বৈধ উপায়ই আবিষ্কৃত হইয়াছিল। আর্য্যশিল্পের চমৎকারিত্ব সম্বন্ধে বেদেও বিশেষ বর্ণন রহিয়াছে। সহস্র দ্বার ও সহস্র স্তম্ভযুক্ত অট্টালিকা, লৌহনির্ম্মিত নগর ও প্রস্তর নির্ম্মিত পুরীর বর্ণন ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। বৈদেশিক বীরগণ ভারতবর্ষের অপূর্ব্ব শিল্পকলা ও অসাধারণ ধনৈশ্বর্য্যের লোভেই বহুবার ভারত আক্রমণ করিয়া ক্রমশঃ ভারতে আপনাদের অধিকার বিস্তার করিয়া লইয়াছেন। ময়-দানব নির্ম্মিত যুধিষ্ঠিরের রাজসভার অপূর্ব্ব বর্ণন মহাভারতে পাঠ করিয়া কাহার না চিত্তে লোভ ও দর্শনাকাঙ্ক্ষা বলবতী হয়? রাজসূয় যজ্ঞের সময় ময়দানব যে সভাগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিল সমগ্র পৃথিবীতে তাহার তুলনা পাওয়া যায় না। ঐ সভায় ময়-দানব এক রমণীয় সরোবর চিত্রিত করিয়াছিল। তাহাতে মণিময় মৃণাল ও বৈদুর্য্যময় পত্রযুক্ত শতদল কমল এবং কাঞ্চনময় কুমুদকদম্ব সুশোভিত

ছিল। অনেক চিত্র বিচিত্র বিহঙ্গম কেলি করিতেছিল। প্রফুল্ল পঙ্কজও সুবর্ণ নির্ম্মিত মৎস্য কূর্ম্মাদি বিদ্যমান ছিল। চতুর্দ্দিকে বিচিত্র স্ফটিক সোপানযুক্ত ঐ নির্ম্মল সরোবরের চিত্রকে যথার্থ সরোবর মনে করিয়া অনেক রাজপুরুষ মুগ্ধ ও ভ্রান্ত হইয়া উহার উপরে পতিত হইয়াছিলেন। এই প্রকার শিল্প-বৈচিত্র জগতে একান্ত দুর্লভ।

আজকাল রেলগাড়ী দেখিয়া লোকে আশ্চর্য্য হয়, পরন্তু ভারতবর্ষের প্রাচীন বিমান, অস্ত্র, শস্ত্র ও নানাবিধ যানাদির বর্ণন পাঠ করিলে জানা যায় যে যদিও আধুনিক ইয়ুরোপ শিল্পবিদ্যায় অনেক উন্নতি করিয়াছে তথাপি ভারতবর্ষে ঐ সকল যানাদি কি উপায়ে আবিষ্কৃত হইয়াছিল তাহা তাহারা এখনও হৃদয়ঙ্গম করিতেও সমর্থ হয় নাই। অল্পদিন পূর্ব্বেও এই অধঃপতিত ভারতের যে শিল্পবিদ্যা ছিল, দীনহীন ভারতবাসী যে কাশ্মীরী শাল, ঢাকার মসলীন, কাশী প্রভৃতি স্থানের পট্টবস্ত্র এবং নানাবিধ স্বর্ণ, রোপ্য ও রত্নজড়িত আভূষণ নির্ম্মাণ করিত সুসভ্য ইয়ুরোপ আজিও তাহার সমকক্ষতা লাভ করিতে পারে নাই। মিস্ ম্যানিঙ্গ বলিয়াছেন, "প্রাচীন আর্য্যজাতির শিল্পকলা এরূপ অপূর্ব্ব ছিল যে ইয়ুরোপের দর্শকগণের উহার প্রশংসা করিবার নিমিত্ত যোগ্য শব্দই যোগাইত না। তাঁহারা ইহার সৌন্দর্য্য ও কারুকার্য্য দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পাড়তেন।" প্রাচীন গ্রীস ও মিসরের শিল্পের সহিত তুলনা করিয়া প্রোফেসর হীরেন সাহেব বলিয়াছেন যে,—"মূর্ত্তি নির্ম্মাণ ও মন্দিরাদির কারুকার্য্যে আর্য্যশিল্প গ্রীস ও মিসরের শিল্প অপেক্ষা বহুলাংশে উন্নত ছিল।" কর্ণেল টড সাহেব বলিয়াছেন, "ভারতের প্রাচীন স্তম্ভ ও মূর্ত্তি প্রভৃতি দেখিলে বোধ হয় যেন কলাসুন্দরী নিজের সমস্ত সুষমা প্রাণ খুলিয়া ভারতবর্ষেই প্রকাশিত করিয়া দিয়াছেন। এখানে সমস্ত শিল্প কৌশলই পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল।" ব্যারন্ ডালবর্গ সাহেব দ্বারকাপুরীর শিল্পকলা দেখিয়া উহাকে "আশ্চর্য্য নগর" বলিয়া বর্ণন করিয়াছিলেন। এবং বলিয়াছিলেন, "প্রাচীন আর্য্যজাতি এই স্থানে পৃথিবীর অন্যান্য জাতি অপেক্ষা শিল্পবিদ্যার পূর্ণতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।" ইলোরা প্রভৃতি স্থানের গিরিগুহা, পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দির, চিতোরাদির গিরিদুর্গ, কটক প্রভৃতি স্থানের নদীর বাঁধ এবং আগরার তাজমহল প্রভৃতি প্রাচীন দৃশ্যাবলী দর্শন করিলে প্রাচীন ভারতের শিল্পোন্নতির দৃঢ় প্রমাণ

পাওয়া যায়। ইলোরার গুহামন্দির দেখিয়া পাশ্চাত্য ভ্রমণকারী দর্শকেরা বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছেন। তাহারা হৃদয়ঙ্গম করিতেই সমর্থ হন নাই যে কেমন করিয়া—পাহাড় খুঁড়িয়া এত মূর্ত্তি ও এই প্রকার বিশাল ভবন নির্ম্মিত হইতে পারে? প্রোফেসর হীরেন এসম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"ইলোরার গুহাদ্বারে প্রবেশ করিবার সময় হৃৎকম্প উপস্থিত হয় যে এই প্রকার পাতলা স্তম্ভের উপর এইরূপ বিশাল ছাত কি প্রকারে রাখা হইয়াছে এবং উভয়ের ওজন ও শক্তির অনুপাতের হিসাবই বা কিরূপে করা হইয়াছে? ইহা দ্বারা প্রাচীন আর্য্যশিল্পের অপূর্ব্বতা অনুমান করা যায়। পাহাড়ের গায়ে খোদা এই প্রকার শিল্পকলাযুক্ত মন্দির পৃথিবীর আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। প্রাচীন আর্য্যজাতির শিল্পোন্নতির ইহা অদ্বিতীয় প্রমাণ!" এই প্রকার পুণার নিকটে করোলির গিরিগুহা, সালসত্তী গুহা, অযন্তা গিরিগুহা প্রভৃতি সমস্তই প্রাচীন আর্য্যশিল্পের পরাকাষ্ঠার পরিচায়ক। উদয় গিরি ও গণ্ডগিরিতে যে শিলামন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে, ভুবনেশ্বরে যে অপূর্ব্ব মন্দির বিরাজমান রহিয়াছে পৃথিবীতে তাহার তুলনা পাওয়া যায় না। ফার্গুসন সাহেব বলিয়াছেন, "খিলান (Arch) নির্ম্মাণের কৌশল প্রাচীন আর্য্যজাতিই জানিতেন এবং এই কৌশল ভারতবর্ষ হইতেই অন্য দেশে প্রচারিত হইয়াছিল।" অধ্যাপক ওয়েবর সাহেব বলিয়াছেন,—"পশ্চিম দেশে ধর্ম্মালয়াদির শিখর ভারতবর্ষের বৌদ্ধমন্দিরের শিখরের অনুকরণে নির্ম্মিত হইয়াছে।" হাণ্টার সাহেব বলিয়াছেন যে,—"বর্ত্তমান সময়ে ইংরেজ শিল্পিগণ যে শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দিতেছেন তাহার অধিকাংশই ভারতীয় আর্য্যশিল্পের অনুকরণ মাত্র।" কাহারও মতে সারাসেন জাতিই প্রথম খিলান নির্ম্মাণ আবিষ্কার করিয়াছিল। কিন্তু কর্ণেল টড সাহেব স্বপ্রণীত রাজস্থানে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে সারাসেন জাতি প্রাচীন আর্য্যজাতির কাছে খিলান নির্ম্মাণের কৌশল শিক্ষা করিয়াছিল।" এই প্রকার অনুসন্ধানের দ্বারা সিদ্ধ হয় যে প্রাচীন আর্য্যজাতি স্থাপত্য বিদ্যা ও শিল্পকলার বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, তাহার কঙ্কালসার আজিও স্থানে স্থানে প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে।

এই প্রকার সর্ব্বতোমুখী উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আর্য্যজাতির সর্ব্বতোগামী ব্যাপকতারও ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে আর্য্যজাতি দেশবিজয়, রাজ্যবিস্তার, দেশ পর্য্যটন, উপনিবেশ স্থাপন ও বাণিজ্যবৃদ্ধির নিমিত্ত পৃথিবীর

অন্যান্য সকল দেশে গমন করিতেন—একথা আজকাল পাশ্চাত্য ও এতদ্দেশীয় সকল প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতই একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে রাজা সুদাসের সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, তিনি সসাগরা পৃথিবী জয় করিয়া সকল স্থানেই নিজের অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন।" এলফিনষ্টোন ও ষ্ট্রোন সাহেব বলিয়াছেন,—"পারস্য দেশের তিন ভাগ প্রাচীন কালে হিন্দুদের অধীন ছিল।" কর্ণেল টড সাহেব বলিয়াছেন,—"মুসলমান রাজত্বের পূর্ব্বে মধ্য এশিয়ার অনেক স্থানে হিন্দুদের অধিকার ছিল।" ওয়েবর সাহেব স্বপ্রণীত Indian Literature নামক গ্রন্থে অনেক প্রমাণ দিয়া বলিয়াছেন যে,—"প্রাচীনকালে গ্রীস ও রোমের সঙ্গে আর্য্যজাতির বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। হিন্দু রাজাদের প্রাসাদে গ্রীক স্ত্রীরা দাসীরূপে বাস করিত এবং সেখানকার দূত এখানে ও এখানকার দূত সেখানে প্রায়শঃ যাতায়াত করিত।" ভারতবর্ষের প্রকৃতি পূর্ণ বলিয়া আদি সৃষ্টি এখানেই হইয়াছিল, একথা বহুতর যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা পূর্ব্বে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। পৃথিবীর আদি জাতি আর্য্যগণ "পৃথিবীপাল" ছিলেন, তাহারও প্রমাণ পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই পৃথিবী পালক আর্য্য জাতিই প্রাচীনকালে পৃথিবীর সর্ব্বত্র গমন করিয়া রাজ্যবিস্তার ও উপনিবেশ স্থাপন করিতেন, তাহার চিহ্ন আজ পর্য্যন্তও সর্ব্বত্র বিদ্যমান। দৃষ্টান্তরূপে নিম্নে তাহার কিঞ্চিৎ বর্ণনা করা যাইতেছে।

পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কলম্বসের দ্বারা আমেরিকা আবিষ্কৃত হইয়াছিল, আধুনিক ভারতীয় বিদ্যার্থী এই কথা পাঠ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হয়। কিন্তু তাহারা জানে না যে তাহাদেরই পূর্ব্বপুরুষগণ পঞ্চদশ শতাব্দির কত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। অনুসন্ধিৎসু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এসংবাদ অবগত আছেন। তাহারা তাহাদের গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"যে সময় ইয়ুরোপীয় জাতিবৃন্দ আমেরিকায় প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন যে সময় পর্য্যন্ত তথায় প্রাচীন হিন্দুদের আচার ব্যবহার বিদ্যমান ছিল। যদিও ভারতের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় তথাকার ভারতবাসিদিগের আচারাদিতে অনেক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছিল তথাপি আর্য্য আচারাদির চিহ্ন একেবারেই লুপ্ত হইয়া যায় নাই।" জার্ম্মণীর প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও ভ্রমণকারী ব্যারন হাম্বোল্ট সাহেব বলিয়াছেন যে,—"আমেরিকায় আজিও হিন্দুদের পরিচয় চিহ্ন বিদ্যমান।"

পেরুদেশের লোকের আচারাদি সম্বন্ধে চর্চ্চা করিতে সময় মিঃ পোলক বলিয়াছেন,—"পেরুবাসিদের পূর্ব্বপুরুষগণ কোন সময় ভারতবাসিদের সহিত সম্বন্ধযুক্ত ছিলেন।" মিঃ হার্ডী বলিয়াছেন,—"আমেরিকায় যে প্রাচীন প্রাসাদ সমূহ দেখিতে পাওয়া যায় সে সমস্ত ভারতবর্ষের মন্দির শিখরের অনুরূপ।" মিঃ স্কয়াট সাহেব বলিয়াছেন, "দক্ষিণ ভারত ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে যে সকল বৌদ্ধ মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়, মধ্য আমেরিকার অনেক অট্টালিকা তাহারই অনুকরণে নির্ম্মিত হইয়াছিল।" প্রেস্কট ও হেল্প সাহেব আপনাদের বহুগ্রন্থে লিখিয়াছেন,—ভারতীয় দেবদেবীগণের মূর্ত্তির অনুকরণে আমেরিকায় দেবদেবীর মূর্ত্তি গঠিত হইত এবং পূজাদিও তাহাদেরই অনুকরণে হইত। ভারতবর্ষের ন্যায় পৃথিবী পূজা সেখানে প্রচলিত ছিল। ভারতে যেমন শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ বা দত্তাত্রেয়ের পদচিহ্নের পূজা হইয়া থাকে মেক্সিকোতে সেই প্রকার 'কোয়েটজালকোটাল' নামক দেবতার পদচিহ্নের পূজা হইত। ভারতবর্ষের ন্যায় আমেরিকাতেও সূর্য্য ও চন্দ্র গ্রহণের সময় উৎসব হইত। এদেশে যেমন রাহুদ্বারা চন্দ্র সূর্য্য গ্রাসের প্রবাদ প্রচলিত সেখানেও এইরূপ মালা নামক দৈত্যদ্বারা সূর্য্যচন্দ্রের গ্রাসের কিম্বদন্তী প্রচলিত ছিল। মেক্সিকো দেশে হাতীর মস্তকযুক্ত এক নরদেবের পূজা হইত। ব্যারন হম্বোল্ট সাহেব বলেন "ঐ দেবতার সহিত হিন্দু দেবতা গণেশের সম্পূর্ণ সাদৃশ ছিল। ভারতে দশহরা উৎসবের ন্যায় মেক্সিকোতেও প্রতিবৎসর রাম সীতার নামে উৎসব হইত।" সার উইলিয়ম জোন্স বলেন—"ইহা এখন সর্ব্ববাদী সম্মত বিষয় যে, পেরুদেশের ইন্‌সেস জাতীয় লোকেরা নিজেদের সূর্য্যবংশীয় বলিতে গৌরব মনে করিত এবং রামসীতার পূর্ব্বোৎসবই তাহাদের প্রধান উৎসব ছিল। ইহা দ্বারা সিদ্ধ হয়, যে হিন্দুজাতি এসিয়ার দেশ দেশান্তরে যাইয়া রাম সীতার ইতিহাস ও আর্য্য আচার ব্যবহার প্রচার করিয়াছিলেন তাঁহারাই দক্ষিণ আমেরিকায় যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন।" এতদ্ভিন্ন যুগান্তর, খণ্ড প্রলয়, কূর্ম্মপৃষ্ঠে পৃথিবীর অবস্থান, সূর্য্যপূজা প্রভৃতি আরও কয়েকটী বিষয়ে ভারতের সহিত আমেরিকার সাদৃশ্য ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতে আর্য্যজাতি হইতেই পৃথিবীর প্রধান প্রধান জাতি সমূহের উৎপত্তি হইয়াছে।
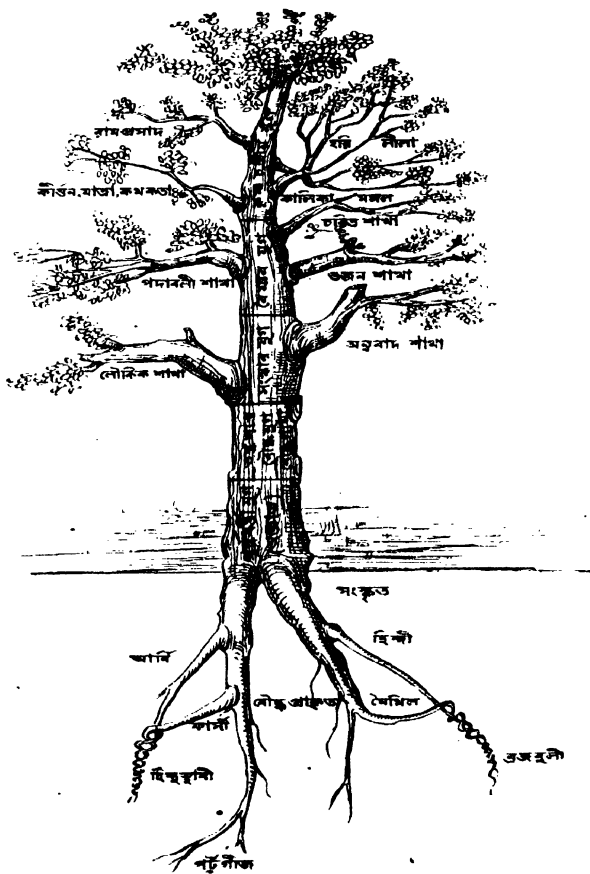
ক্রমশঃ

ধর্ম্মপ্রচারক

প্রাচীন বঙ্গভাষারূপী বৃক্ষ।

ধর্ম্ম-প্রচারক

নব পর্য্যায়।

অকুণ্ঠং সর্ব্বকার্য্যেষু ধর্ম্ম-কার্য্যার্থমুদ্যতম্।
বৈকুণ্ঠস্য হি যদ্রূপং তস্মৈ কার্য্যাত্মনে নমঃ॥

২য় ভাগ] অগ্রহায়ণ, সন ১৩২৭। ইং নভেম্বর ১৯২০। [৮ম সংখ্যা।

প্রাচীন বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

(শ্রীরাজেন্দ্র নাথ কাঞ্জিলাল এম, এ, বি, এল,)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আবার বঙ্গসাহিত্যে নূতন রচনার ধারা প্রবাহিত হইল—নূতন আদর্শের সঞ্চার হইল—নূতন ভাবের বিকাশ হইল। বৈষ্ণব কবিতার কাল্পনিকতায় এবং প্রেম-প্রবণতায় লোকের হৃদয় অতিমাত্র ভারাক্রান্ত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহারা শ্রবণেন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার জন্য সমুৎসুক হইল—আধ্যাত্মিক জগৎ হইতে অবতীর্ণ হইয়া আধি-ভৌতিক জগতে উপনীত হইল—কল্পনা ও ভাবের রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়-সুখ-লালসায় আসক্ত হইল—ভাবের বিনিময়ে ভাষায় আকৃষ্ট হইল। সংস্কার যুগের বঙ্গ-সাহিত্যে সংস্কৃতের প্রভাব প্রথম পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু বৈষ্ণব যুগের সাহিত্য সংস্কৃত-নিরপেক্ষ হইয়া স্বাধীন মার্গে বিচরণ করে—একথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এক্ষণে পুনরায় বঙ্গসাহিত্যে সংস্কৃত ভাষার দ্বার উন্মুক্ত হইল—সংস্কৃত শব্দ, অলঙ্কার ও ছন্দে বঙ্গভাষা পরিপুষ্ট হইল। যেমন বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাসের বৈষ্ণব কবিতা শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ সংস্কারযুগের বঙ্গভাষা ভারতচন্দ্রের নিপুণ হস্তে পরিমার্জ্জিত হইল। "কবিকঙ্কণের চণ্ডী" পরিশুদ্ধ হইয়া রায়গুণাকরের "অন্নদা মঙ্গলে" পরিণত হইল। আমরা প্রাচীন বঙ্গ-ভাষার এই চতুর্থ যুগকে "কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগ" নামে অভিহিত করিলাম।

পৌরাণিক সংস্কারযুগে কবিগণ দেব-দেবীর মাহাত্ম্য প্রচারার্থে এবং স্থলবিশেষে ইষ্ট দেবতার প্রত্যাদেশে কবিতা-রচনা করেন। এই উদ্দেশ্যে

প্রণোদিত হইয়া কবিগণ ধর্ম্মমঙ্গল, মনসা মঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলাদি কাব্য প্রণয়ন করেন। বৈষ্ণব যুগে কবিগণ কৃষ্ণলীলা লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন—"কানুছাড়া গীত নাই" এই প্রবাদবাক্য ইহার সাক্ষ্য প্রদান করে। এক্ষণে কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগে কবিগণ রাজ-প্রসাদ লাভের জন্য কবিতা রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। দেবদেবীর উদ্দেশে উহা বিরচিত হইলেও, রাজা অথবা রাজসভাসদ্-গণের আদেশ-পালন ও মনোরঞ্জন করাই কবিগণের উদ্দেশ্য ছিল। ইহাই কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগের একটি বিশেষত্ব।

আমরা এই যুগের নাম 'কৃষ্ণ চন্দ্রীয় যুগ' রাখিলাম, কারণ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে এই যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্য 'অন্নদামঙ্গল' রচিত হয়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহার প্রায় এক শতাব্দি পূর্ব্বে বঙ্গসাহিত্যে এই যুগের প্রথম সূচনা হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে একজন মুসলমান কবি এই যুগের প্রবর্ত্তক। ইহার নাম সৈয়দ আলাওল। ইনি আরাকান রাজ্যের প্রধান রাজমন্ত্রী মগন ঠাকুরের অনুমতিক্রমে "পদ্মাবতী" নামে বিখ্যাত কাব্য প্রণয়ন করেন। ইহা মিরমহম্মদ-প্রণীত হিন্দী 'পদ্মাবৎ' কাব্যের বঙ্গানুবাদ হইলেও, ইহাতে মৌলিকতার অভাব নাই। মূলগ্রন্থ অপেক্ষা ইহা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট। ইহার রচনা আদ্যোপান্ত বিশুদ্ধ সংস্কৃতমূলক এবং শব্দবিন্যাসনৈপুণ্যে ও পারিপাট্যে এই কাব্য ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল ভিন্ন বাংলা ভাষার অন্য কোন কাব্য অপেক্ষা ন্যূন নহে। এই মুসলমান কবি হিন্দুদিগের পূজাপার্ব্বণ, সামাজিক রীতি-নীতি, হিন্দুজ্যোতিষ ও আয়ুর্ব্বেদ সংক্রান্ত তথ্য এবং সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রোক্ত স্ত্রীলোকদিগের প্রেমভাবতত্ত্ব তাঁহার গ্রন্থে এমন সুন্দরভাবে বর্ণন করিয়াছেন যে, তাহা পাঠ করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। গল্পাংশে ও চরিত্রচিত্রণে এই কাব্য বিশেষ প্রশংসার্হ না হইলেও, ইহাতে কবির অগাধ পাণ্ডিত্য, সংস্কৃতানুরাগ, ভাষার পারিপাট্য ও রচনার মনোহারিত্ব বিশেষ চিত্তাকর্ষক, সন্দেহ নাই। আজিও চট্টগ্রামের মুসলমানগণ ইহা সাগ্রহে পাঠ করিয়া থাকেন।

বাঙ্গলা সাহিত্য যে কেবল হিন্দুর নিকটেই ঋণী তাহা নহে। মুসলমান লেখকেরাও ইহার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছেন। করমআলি নামক একজন মুসলমান বৈষ্ণব কবি রাধার বিরহসূচক পদাবলী রচনা করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। পূর্ব্ববঙ্গে অনেক মুসলমান কবিকৃত শিবঠাকুর, সরস্বতী দেবী ও

রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় কবিতাপুস্তকের নাম শুনিতে পাওয়া যায়। সঙ্গীত শাস্ত্র সম্বন্ধীয় পুস্তকের মধ্যে মুসলমান লেখক রচিত রাগমালা, তালনামা, সৃষ্টিপত্তন, ধ্যানমালা প্রভৃতি কয়েকটী পুস্তকের নাম উল্লেখযোগ্য। দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধীয় পুস্তকের মধ্যে সৈয়দ সুলতানের জ্ঞানপ্রদীপ, তনুসাধন ও জ্ঞান-চৌতিশা প্রধান গ্রন্থ। উপন্যাস পুস্তকের মধ্যে দৌলৎ কাজি ও আলাওল সাহেবের 'সতী ময়নাবতী' ও 'লোর চন্দ্রাণী', মহম্মদ খাঁর 'ইমাম চুরি', কবির মামুদের 'রঙ্গমালা', আব্ দুল হাকিমের 'ইউসুফ জেলেখা' এবং দৌলৎ উজিরের 'লয়লী মজনু, প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ প্রসিদ্ধ। বলাবাহুল্য এই সকল গ্রন্থের অধিকাংশই অনুবাদপুস্তক এবং ইহারা পদ্যে রচিত, কারণ প্রাচীন বাংলা ভাষায় গদ্যগ্রন্থ নিতান্ত বিরল। এতদ্ভিন্ন সত্যনারয়ণের কথা, কবির লড়াই ইত্যাদিতেও মুসলমানগণ বাঙ্গলা সাহিত্যকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।

সৈয়দ আলাওল সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পদ্মাবতী কাব্য রচনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ইহার প্রায় একশতাব্দী কাল পরে রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভা অলঙ্কৃত করেন। তৎকালে কৃষ্ণচন্দ্র হিন্দুসমাজের অগ্রণী ছিলেন এবং তাঁহার রাজসভা বিদ্বজ্জন সমাগমে পরিপূর্ণ ছিল। তিনি নিজে যেমন সংস্কৃত কাব্য, ন্যায় ও দর্শনাদি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, তেমনই গুণগ্রাহী ও শিল্প সাহিত্যের উৎসাহদাতা ছিলেন, কিন্তু তিনি চৈতন্য সম্প্রদায়ের বিরোধী ছিলেন এবং রাজা রাজবল্লভের অনুমোদিত বাল-বিধবা বিবাহ প্রথা সমর্থন করেন নাই। তিনি ইংরাজ-দিগের মিত্র ছিলেন এবং সিরাজউদ্দৌলাকে পদচ্যুত করিবার জন্য মন্ত্রণা দান করেন। দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা তখন অতি শোচনীয় ছিল। মুসলমান শক্তি ধ্বংসোন্মুখ হওয়ায়, দস্যুতস্করের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। রাজসভা স্বার্থান্ধ নীচ চাটুকারগণে পরিবৃত ছিল এবং দেশ কুমন্ত্রণা ও ষড়-যন্ত্রকারীদিগের প্রভাবে প্রপীড়িত হইয়াছিল। এরূপ ক্ষেত্রে সাহিত্যে উচ্চ ভাব বা কল্পনার আশা সুদূরপরাহত। যে সাহিত্য রাজা অথবা রাজকর্ম্ম-চারিগণের রুচির উপর নির্ভর করে, তাহা সীমাবদ্ধ ও মৌলিকত্বহীন বাগাড়ম্বরে পরিণত হইবে, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। তথাপি গুণগ্রাহী ও রসজ্ঞ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় কবিবর রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র যে সাহিত্যরসের সৃষ্টি করেন, তাহা বাঙ্গলাভাষায় বিশেষ আদরের সামগ্রী।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ ও রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র উভয়েই আলাওলী ভাষায় 'কালিকা মঙ্গল' কাব্য রচনা করিয়া কৃষ্ণচন্দ্রের কৃপাদৃষ্টি লাভ করেন কিন্তু রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল অপেক্ষা অনেকাংশে নিকৃষ্ট। ভারতচন্দ্র রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর হইতেই তাঁহার কাব্যের উপকরণ রাজি সংগ্রহ করেন—বস্তুতঃ তিনি পদে পদে রামপ্রসাদের নিকট ঋণী ; কিন্তু শব্দের মাধুর্য্যে এবং ছন্দের লালিত্যে ভারতচন্দ্রের কবিতা বঙ্গসাহিত্যে অদ্বিতীয়। বাস্তবিক রামপ্রসাদ আদিরসাত্মক কাব্য রচনায় সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিলেন এবং সংস্কৃত মিশ্রিত বাঙ্গলা রচনায় সুদক্ষ ছিলেন না। তিনি মহাসাধক ছিলেন এবং সঙ্গীতরচনায় পারদর্শিতা লাভ করেন। তাঁহার প্রাণস্পর্শী শ্যামাসঙ্গীত মধুর মালশ্রী রাগিণী সংযোগে গীত হইয়া অদ্যাপি বঙ্গদেশে ধর্ম্মস্রোত প্রবাহিত করিতেছে। ভারত চন্দ্র ধর্ম্মসংস্কারক ছিলেন না—তিনি কবিতা-রাজ্যে নূতন স্রোত প্রবাহিত করেন। তিনি প্রসিদ্ধ শব্দ-শিল্পী ছিলেন এবং বঙ্গসাহিত্যে নূতন আদর্শের প্রতিষ্ঠা করেন। কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগে তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি।

বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান সর্ব্বলোকবিখ্যাত। উহা অবলম্বন করিয়া অনেক যাত্রা, নাচ গান ও থিয়েটার আদি হইয়া গিয়াছে—বিশেষতঃ গোপাল উড়ে বিদ্যাসুন্দর যাত্রায় প্রসিদ্ধি লাভ করেন। সুতরাং জনসাধারণের নিকট বিদ্যাসুন্দর কিংবা অন্নদামঙ্গলের উপাখ্যানভাগ অবিদিত নহে, কিন্তু গুণাকর উহাকে এমনই মধুর করিয়া গিয়াছেন যে একবার পড়িলে, কেহই আর ভুলিতে পারে না। ইহা আদিরসপ্রধান কাব্য। ইহার কয়েকস্থলে শিক্ষিত সমাজের রুচি বিরুদ্ধ অশ্লীল বর্ণনা আছে বটে, কিন্তু ঐ সকল অংশ ছাড়িয়া দিলে, ইহা আগাগোড়া মধুর ও মনোহর। অনেকে মনে করেন, ভারতচন্দ্র বিদ্বেষ বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া বর্দ্ধমান রাজবংশে কলঙ্কারোপ করিবার বাসনায় সর্ব্বপ্রথমে বর্দ্ধমানেই এই উপন্যাসের ঘটনাস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু এরূপ ধারণা অমূলক, কারণ ইতিপূর্ব্বে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরে এবং ভবিষ্যপুরাণের ব্রহ্মখণ্ডেও বর্দ্ধমানরাজ বীরসিংহের নামোল্লেখ আছে এবং আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যেও সুন্দর প্রোথিত সুড়ঙ্গের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। ফলতঃ বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান রামপ্রসাদ বা ভারতচন্দ্র কাহারও স্বকপোল-কল্পিত নহে। অবশ্যই ইহার কোন প্রাচীন মূল ছিল, কিন্তু সেই মূল গ্রন্থখানি কি তাহা স্থির

করিয়া বলিতে পারা যায় না। রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন যে কয়েকখানি বাংলা বিদ্যাসুন্দর কাব্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন তন্মধ্যে গোবিন্দ দাসের কাব্য প্রাচীনতম; কিন্তু তিনি অনুমান করেন গোবিন্দদাস পূর্ব্ববর্ত্তী অন্য কোন গ্রন্থ হইতে তাহার কাব্যের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া থাকিবেন। ভারতচন্দ্রের পরেও প্রাণরাম চক্রবর্ত্তী অপর একখানি বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করেন।

পশ্চিমবঙ্গে ভারতচন্দ্র বঙ্গসাহিত্যে অসীম আধিপত্য বিস্তার করেন। নবদ্বীপে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভা তদানীন্তন হিন্দু সভ্যতার কেন্দ্রস্থান ছিল। সমকালবর্ত্তী সাহিত্যের ইতিহাসে পূর্ব্ববঙ্গের কবি জয়নারায়ণ সেন ও আনন্দময়ী দেবী রাজা রাজবল্লভের সভায় বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। রাজবল্লভ বিক্রমপুরের রাজধানীতে বাস করিয়া সর্ব্ববিষয়ে কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হন। তিনি পাণ্ডিত্যে কৃষ্ণচন্দ্রের সমকক্ষ না হইলেও ভূসম্পত্তি ও অর্থসম্পদে তাঁহাকে অতিক্রম করেন। কৃষ্ণচন্দ্র যেমন "শিবনিবাস" নামে নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিয়া তথায় কারুকার্য্যময় প্রাসাদ ও মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করান, রাজবল্লভও তদ্রূপ "রাজনগরে" নূতন রাজধানী স্থাপিত করিয়া শিবনিবাসের গর্ব্ব খর্ব্ব করেন। রাজনগরের সুবিখ্যাত সপ্তরত্ন, নবরত্ন ও একুশরত্ন নামে মন্দিরত্রয় ও অভ্রভেদী দোলমঞ্চ শিল্পনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠ প্রদর্শন করে এবং তত্রত্য অত্যুচ্চ প্রাসাদাবলী এরূপ বিচিত্র কারুকার্য্য পূর্ণ ও এরূপ অগাধ ধনৈশ্বর্য্যের পরিচায়ক ছিল যে তাহার সহিত তুলনায় শিবনিবাসের শোভা প্রভাহীন হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু বিধাতার কি নিগ্রহ! ১৮৭১ সালের ভীষণ বন্যায় এই অমরাবতীতুল্য রাজনগর পুরী কীর্ত্তিনাশার অতলগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া ইহ সংসার হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে!

কালবশে রাজনগরের কীর্ত্তিচিহ্ন অন্তর্হিত হইলেও, রাজবল্লভের সভাকবি জয়নারায়ণের অসাধারণ কবিত্বে আজিও পূর্ব্ববঙ্গ গৌরবান্বিত। ইনি কবিত্বে ভারতচন্দ্রের সমকক্ষ ছিলেন এবং সংস্কৃত শব্দ-বিন্যাসে ও রচনার মাধুর্য্যে অসামান্য শক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি সাহিত্য-সৌন্দর্য্যে, ছন্দ বৈভবে ও অশ্লীলতায় ভারতচন্দ্র অধিকতর সমৃদ্ধিশালী ছিলেন, সন্দেহ নাই। কবি জয়নারায়ণ ও তাঁহার প্রতিভাময়ী ভ্রাতুষ্পুত্রী আনন্দময়ী উভয়ে মিলিয়া "হরিলীলা" নামক উৎকৃষ্ট কাব্য প্রণয়ন করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ইহা ভারত-

চন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের ন্যায় জনসমাজে প্রচারিত ও সমাদৃত হইবার সুযোগ পায় নাই। এই কাব্যে যেমন ভাষার উপর কবিদ্বয়ের বিশিষ্ট অধিকার প্রকাশ পায়, তেমনই ইহা নানা উৎকৃষ্ট কবিত্বপূর্ণ পদে পরিপূর্ণ। আনন্দময়ী এই কাব্যে তাঁহার অসামান্য পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। নিম্নোদ্ধৃত কয়েক পংক্তি কবিতা পাঠ করিলে, বঙ্গভাষার উপর তিনি সংস্কৃতের কিরূপ অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন, তাহা সহজে অনুমিত হইবে—

"হের চৌদিকে কামিনী লক্ষে লক্ষে।
সমক্ষে, পরক্ষে, গবাক্ষে, কটাক্ষে ॥
কতি প্রৌঢ়ারূপা ওরূপে মজন্তি।
হসন্তি, স্খলন্তি, দ্রবন্তি, পতন্তি ॥
কত চারুবক্ত্রা, সুবেশা, সুকেশা।
সুনাসা, সুহাসা, সুবাসা, সুভাষা ॥
কত ক্ষীণমধ্যা, সুভঙ্গা, সুযোগ্যা।
রতিজ্ঞা, বশীজ্ঞা, মনোজ্ঞা, মদজ্ঞা ॥
দেখি চন্দ্রভাগে কত চিত্তহারা।
নিকারা, বিকারা, বিহারা, বিভোরা ॥"

ভারতচন্দ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর বঙ্গ-সাহিত্যে শ্রেষ্ঠকবি, সন্দেহ নাই। বঙ্গভাষায় এরূপ সুনিপুণ শিল্পী জন্মগ্রহণ করেন নাই—ধ্বন্যাত্মক শব্দ প্রয়োগে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন—ভুজঙ্গ-প্রয়াত ও তোটকাদি কঠিন সংস্কৃত ছন্দ তিনি বাঙ্গলা কবিতায় অতি দক্ষতার সহিত প্রয়োগ করিয়াছেন—তাঁহার হস্তে বাঙ্গলা পদ্যসাহিত্য শব্দ-মাধুর্য্যে ও ছন্দ-নৈপুণ্যে অসামান্য সমৃদ্ধি সম্পন্ন হইয়াছে। এই সকল অসাধারণ ক্ষমতা সত্ত্বেও ভারতচন্দ্রের প্রকৃত কবিত্ব-শক্তি সম্বন্ধে অনেকে সন্দিহান। ভারতচন্দ্রের কবিতায় প্রাণ-স্পর্শী ভাবের বিকাশ নাই—স্বাভাবিকতার বিনিময়ে কৃত্রিমতার আবরণে উহা পরিপূর্ণ—উহাতে প্রকৃত জীবনের রহস্য চিত্রিত না হইয়া কাল্পনিক অতিরঞ্জন-প্রিয়তার প্রাদুর্ভাব —পবিত্র ঐশ্বরিক ভাবের পরিবর্ত্তে উহাতে ইতর ও জঘন্য পাশবিক ভাবের প্রাধান্য—মৌলিকতার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া তিনি অন্যান্য কবির নিকট বহুল পরিমাণে ঋণী—শব্দের ঝঙ্কারে, ছন্দের নৈপুণ্যে ও অলঙ্কারের চাক্‌চিক্যে

তাঁহার ভাষা যেরূপ মার্জ্জিত, স্বাভাবিক ভাবের বিকাশে ও চরিত্র-চিত্রণে এবং মৌলিক কল্পনায় তিনি তাদৃশ সুনিপুণ ছিলেন না। তাঁহার কাব্যে অশ্লীলতার মাত্রা অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া সমাজ কলুষিত করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং সাহিত্যে মৌলিক ও স্বাভাবিক চিন্তার স্রোত নিরুদ্ধ হইয়া শব্দাড়ম্বরপূর্ণ প্রাণ হীন কৃত্রিমতার আধিপত্য লক্ষিত হয়। কিন্তু প্রাচীন সম্প্রদায় ভুক্ত অনেকেই ভারতচন্দ্রের নিতান্ত ভক্ত এবং তাঁহাকে বঙ্গীয় কবিসমাজে উচ্চাসনে বসাইতে ইচ্ছুক। আমরা এই প্রসঙ্গে চণ্ডীকাব্য প্রণেতা কবিবর মুকুন্দরামের সহিত ভারতচন্দ্রের তুলনা করিয়া কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি।

ভাষাসম্পদে ভারতচন্দ্র বঙ্গসাহিত্যে অতুলনীয়—মুকুন্দরাম শব্দবৈভবে ও রচনা-নৈপুণ্যে ভারতচন্দ্র অপেক্ষা নিকৃষ্ট, সন্দেহ নাই; কিন্তু তিনি স্বভাব সৌন্দর্য্যে শ্রেষ্ঠ কবি। মুকুন্দরামে স্বাভাবিকতা এবং ভারতচন্দ্রে কৃত্রিমতার প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। ভারতের অসামান্য কৃতিত্ব সত্ত্বেও তিনি মুকুন্দরামের অনুকরণকারী। মুকুন্দরামের ভাষা পরিমার্জ্জিত করিয়া তিনি উহাকে সৌষ্ঠব সম্পন্ন করিলেও, তিনি তাঁহার কাব্যে জীবনের প্রকৃত চিত্র অঙ্কিত না করিয়া কাল্পনিক ও অস্বাভাবিক বিষয় লইয়াই ব্যস্ত, মুকুন্দের ন্যায় সমাজ ও মানব চরিত্রের নিখুঁত ছবি আঁকিতে পারেন নাই। লহনা ও খুল্লনা দুইটী বিভিন্ন প্রকৃতির স্ত্রীলোক—প্রাচীন হিন্দুসমাজের জীবন্ত চিত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কিন্তু বিদ্যায় ইন্দ্রিয়-সুখলালসা ও কামোন্মত্ততা ভিন্ন চরিত্রের অন্য কোনরূপ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় না; দুর্ব্বলা ও হীরা মালিনী একই স্বভাবের স্ত্রীলোক হইলেও একটি সমাজের যথার্থ প্রতিকৃতি—অপরটী অতিরঞ্জিত চিত্র। আরও বিশেষ পার্থক্য এই যে, দুর্ব্বলা মন্থরার ন্যায় দুষ্টস্বভাবা দাসী মাত্র—হীরা পারস্য সাহিত্যের কুট্নী শ্রেণীয়া স্ত্রীলোক। বৈষ্ণব সাহিত্যের দূতী অন্নদামঙ্গলে কুট্নীরূপে পরিণতা। স্ত্রীচরিত্রবর্ণনে এইরূপ অশ্লীল ভাবের পরিচয় বিদ্যাসুন্দরের বিশেষত্ব। সুন্দরের রূপদর্শনে নাগরিকা স্ত্রীগণের উক্তি হিন্দুসমাজের রীতি-নীতি-বিগর্হিত—এই সব স্থানে ভারত বিদেশী-সাহিত্যের প্রভাবে বিমোহিত হইয়া তাহার কাব্য কলুষিত করিয়াছেন। ভারত মুকুন্দের কাব্য হইতে বহুস্থানে ভাব সংগ্রহ করিয়াছেন—কোন কোন অংশ অবিকল অনুলিপি বলা যাইতে পারে। শিবের বিবাহ, ঈশ্বরী পাটনীর নিকট ভগবতীর

পরিচয় দান, হীরা মালিনীর চরিত্র বর্ণন প্রভৃতি স্থানে উভয় গ্রন্থে বিশেষ সাদৃশ্য আছে। ভারত সুনিপুণ চিত্রকরের ন্যায় মুকুন্দের অস্পষ্ট চিত্রে বিচিত্র রং ফলাইয়া উহা উজ্জল করিয়া তুলিয়াছেন বটে কিন্তু মুকুন্দের স্বভাবসুন্দর সরল বর্ণনার নিকট তাঁহার চাক্‌চিক্যময় ভাষার পারিপাট্য নিষ্প্রভ প্রতীয়মান হইবে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, মুকুন্দরাম স্বভাব-কবি, ভারতচন্দ্র শাব্দিক কবি এবং বৈষ্ণব কবিগণ ভাবের কবি।

সুন্দরী স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য বর্ণন করিতে গিয়া ভারতচন্দ্র সংস্কৃত ও পারস্য সাহিত্যের কৃত্রিম পরিচ্ছদে তাঁহার ভাষা আবৃত করিয়া স্বাভাবিক ভাবের স্ফুরণ করিতে পারেন নাই, কিন্তু সামান্য নারী চরিত্র চিত্রণে তিনি সুসঙ্গত ও স্বাভাবিক বর্ণনায় প্রকৃত কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। হীরা-মালিনীর চরিত্র কবি কি অপূর্ব্ব তুলিকায় চিত্রিত করিয়াছেন—

"কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম।
দাঁত ছোলা মাজা দোলা হাস্য অবিরাম॥
আছিল বিস্তর ঠাঠ প্রথম বয়সে।
এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে॥"

এইরূপ অসংখ্য সুন্দর চিত্র বাক্যবিন্যাসের ছটায় তাঁহার কাব্যখানি আলোকিত এবং ঐ কথাগুলি লোকে মুখে মুখে আবৃত্তি করিয়া আজিও আনন্দানুভব করেন। একজন বিখ্যাত সমালোচক বলিয়াছেন—"ভারতচন্দ্রের কবিতা বাঙ্গালার তাজমহল—মার্ব্বেল পাথরের বদলে শব্দ দিয়া গাঁথা।"

এই যুগে হিন্দুরাজসভায় সংস্কৃতের ন্যায় আর্বী, ফার্সী ও হিন্দুস্থানী ভাষারও বিলক্ষণ সমাদর ছিল এবং তাঁহার কাব্যে উহার প্রভাব লক্ষিত হয়। মুসলমান রাজসভা ও অন্তঃপুরের বর্ণনকালে তিনি আর্বী ও ফার্সী শব্দ বহুল পরিমাণে ব্যবহার করিয়াছেন। আমরা কবিকঙ্কণেও যবনী মিশাল বাঙ্গলা ভাষার নমুনা দেখিতে পাই। কিন্তু সংস্কৃত ছন্দ নিপুণভাবে বাঙ্গলায় প্রবর্ত্তিত করাই এই যুগের বাংলা সাহিত্যের বিশেষ লক্ষণ। রামপ্রসাদ সর্ব্বপ্রথমে সংস্কৃত ছন্দে বাংলা কবিতা লিখিতে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু তাঁহার উদ্যম সম্পূর্ণরূপে সফল হয় নাই। ভারতচন্দ্র এই বিষয়ে অদ্বিতীয় ছিলেন এবং ভুজঙ্গপ্রয়াত, তোটক প্রভৃতি নানা কঠিন সংস্কৃত ছন্দে বাংলা কবিতা রচনা করিবার রীতি প্রবর্ত্তিত করিয়া

আমাদের সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। সংস্কৃত ছন্দের মাত্রা পদ্ধতির সহিত বাঙ্গলা ছন্দের মিত্রাক্ষর রচনা সংযুক্ত করিয়া তিনি কবিতা শিল্পের যে উৎকর্ষ সাধিত করিয়াছেন, তাহা অনির্ব্বচনীয়। কিন্তু তাঁহার অনুকরণকারীগণ ভারতের সদ্‌গুণের মর্য্যাদারক্ষণে অসমর্থ হইয়া তাঁহার অসদ্‌গুণের অনুকরণে কৃতিত্ব লাভ করেন এবং বাঙ্গলা ভাষায় এরূপ অশ্লীল কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন যে, দণ্ডবিধি আইনের দ্বারা ঐ সকল পুস্তক মুদ্রিত বা প্রকাশিত করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ভারতচন্দ্রের পর প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যের ক্রমিক অবনতি হইতে আরম্ভ হয় এবং সুদীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত অন্য কোন কবি বাঙ্গলা কবিতারাজ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন নাই।

বঙ্গদেশের সমকালীন ইতিহাসে অন্য এক প্রকার সাহিত্যের স্রোত প্রবাহিত হয়। রাজসভায় কৃত্রিমতার আড়ম্বরপূর্ণ বিলাস বিভ্রমের সঙ্গে সঙ্গে শান্তিময় গ্রাম্যজীবনের পবিত্র চিত্র প্রতিভাত হয়। আর্বি, ফার্সি ও সংস্কৃতের চর্চ্চা এবং অগাধ পাণ্ডিত্যপূর্ণ শাস্ত্রীয় আলাপ ও জনকোলাহলের বহুদূরে নিভৃত স্নিগ্ধ বৃক্ষচ্ছায়ায় ভাগবতাদি ধর্ম্মগ্রন্থ পঠিত হইত। বিচিত্র ছন্দোবদ্ধ শ্রুতিমধুর শব্দচাতুর্য্যপূর্ণ কবিতা-তরঙ্গের ঘূর্ণিপাক অতিক্রম করিয়া যাত্রা, কীর্ত্তন ও কবিওয়ালাদিগের চিত্ত-বিমোহন কারুণ্যপূর্ণ সরস সঙ্গীত-স্রোত প্রবাহিত হইত। এই সকল স্বভাব-সুন্দর সুমধুর সরল সঙ্গীত বহুদিন বঙ্গ-সমাজে ও বঙ্গ-সাহিত্যে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে এবং অদ্যাপি ইহাদের সুললিত তানে বঙ্গদেশ মুখরিত। ইহাদের উৎপত্তি নির্ণয় করা সহজ নহে; কিন্তু আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে পৌরাণিক যুগের "মঙ্গল গান" হইতেই ইহাদের সৃষ্টি ও ক্রমিক উন্নতি হইয়াছে। অন্তঃসলিলা ফল্গু নদীর ন্যায় ইহারা বঙ্গ-সমাজের স্তরে স্তরে প্রবাহিত হইয়া গ্রাম্য সাহিত্য সজীব রাখিয়াছে এবং যুগে যুগে বঙ্গবাসীগণের হৃদয়ে ধর্ম্মবল সঞ্চারিত করিয়াছে। বাহুল্যভয়ে আমরা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে ইহাদের বিবরণ লিখিতে বিরত হইলাম।

কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগেই বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের অবসান হয়। এই যুগে মুসলমানরাজত্বের ধ্বংস হইয়া ইংরাজ রাজত্বের সূত্রপাত হয়। ইংরাজি শাসন ও শিক্ষার বলে দেশে নূতন ভাবের সঞ্চার হয়—সমাজে ও সাহিত্যে নূতন

আদর্শের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু এই পরিবর্ত্তন সহসা ঘটে নাই, ইংরাজ বিজয়ের প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দি কাল পরে আমরা বঙ্গসাহিত্যে ইংরাজি প্রভাব দেখিতে পাই। ভারতচন্দ্র ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন, কিন্তু তৎপরে ১৮০০ সাল পর্য্যন্ত বাঙ্গলা ভাষায় কোন নূতন ধরণের গ্রন্থ রচিত হয় নাই। এই সুদীর্ঘ ৪০ বৎসর বাংলা দেশে ঘোর অরাজকতা বিরাজ করে—রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লবে দেশ সমাচ্ছন্ন হয়। ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভে দেশ সুশাসিত ছিল না—দস্যু তস্করের ভয়ে লোকের মন সদাই সশঙ্কিত ছিল। ইংরাজ শাসনে দেশের ভূম্যধিকারী ও জমিদারবৃন্দের উচ্ছেদ সাধন হয় এবং সমাজনেতা ব্রাহ্মণগণের অধঃপতন হয়—ইহার ফলে দেশে হাহাকার পড়িয়া যায়। এইরূপ দুর্দ্দিনে দীর্ঘকাল বঙ্গভাষায় সাহিত্য স্রোত নিরুদ্ধ হয়। যেমন একদিকে প্রাচীন সাহিত্যের অবনতি হয়; তেমনি অন্যদিকে নূতন সাহিত্য গঠিত হইবার জন্য বহুকাল অপেক্ষা করিতে হয়।

অনেকে অনুমান করিতে পারেন যে, পলাসি ক্ষেত্রে ইংরাজবিজয়ই প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যের বিলোপ সাধনের মূলীভূত কারণ—বস্তুতঃ তাহা নহে। ইহার নিধনের বীজ এই যুগের সাহিত্যের মধ্যেই নিহিত ছিল। প্রাচীন সাহিত্যের এতাদৃশ শোচনীয় পরিণাম সংঘটিত হইবার প্রধান কারণ এই যুগের সাহিত্যের প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিলেই অনুভূত হইবে। ভারতচন্দ্র ও জয়নারায়ণাদি কবিগণের কৃত্রিম ও প্রাণহীন ভাষা এবং অশ্লীলতাপূর্ণ রুচির প্রবর্ত্তনা হইতেই প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের অধঃপতন সূচিত হয়। এই অবনতির অন্যতম কারণ এই সাহিত্যের স্বাভাবিক অসঙ্গতি ও অপূর্ণতা। প্রাচীন সাহিত্য কেবল ধর্ম্মশিক্ষামূলক—দেবদেবতার মাহাত্ম্য বর্ণন করাই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। অন্য কোন বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করা প্রচলিত নিয়মের বহির্ভূত ছিল। এই সংকীর্ণ ভাব ও সংস্কার হইতেই মৌলিকতার বীজ নষ্ট হয়—প্রভু-ভৃত্যের চিরাগত সংস্কার হইতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বিনষ্ট হয়। পুনশ্চ পয়ারাদি ছন্দের একঘেয়ে গান গাওয়া সুরে ও যতিপতনে লেকের রুচিবিকার জন্মিতে পারে, কারণ ইহা সাহিত্যের উচ্চ শিল্পের পরিচারক নহে। সর্ব্বশেষে প্রাচীন সাহিত্য যুগের বিশেষ দুর্ভাগ্য এই যে তৎকালে গদ্যরচনার রীতি আদৌ প্রচলিত ছিল না—সাহিত্য কেবল মাত্র কবিতা রচনায় নিবদ্ধ ছিল, কিন্তু

গদ্যসাহিত্যের একান্ত অভাব ছিল। এই অভাব পরিপূরণ করাই পরবর্ত্তী সাহিত্যযুগের বিশেষত্ব।

বঙ্গদেশে কবিতা রচনার তিনটী কেন্দ্রস্থান ছিল। রাঢ়দেশই বৈষ্ণব ধর্ম্মের উৎপত্তিস্থান—বিশেষতঃ বীরভূম বৈষ্ণব কবিতার আদিভূমি। এই দেশেই জয়দেব, চণ্ডিদাস ও জ্ঞানদাস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবিগণ বৈষ্ণব কবিতারূপী পীযুষ আহরণ করিয়া প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের মধুচক্র নির্ম্মাণ করেন। এই দেশে মালাধর বসু গৌড়েশ্বর হুসেন সাহের অনুরোধে সংস্কৃত ভাগবত গ্রন্থ বাংলা কবিতায় সর্ব্বাগে অনুবাদ করিয়া গুণরাজ খাঁ উপাধি লাভ করেন।

পূর্ব্ববঙ্গ পৌরাণিক-সংস্কারের প্রসূতি। এই দেশেই সর্ব্বপ্রথমে মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলের গান রচিত ও গীত হয় এবং কবিগণ আদি কাব্য রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মনসামঙ্গলের আদি কবি 'কাণা হরিদত্ত' ময়মনসিংহের অধিবাসী ছিলেন এবং তৎপরে ক্রমে ক্রমে নারায়ণ দেব ও বিজয় গুপ্ত, ষষ্ঠীবর ও গঙ্গাদাস প্রভৃতি কবিগণ উক্ত কাব্যরচনায় উৎকর্ষ লাভ করেন —ইহারা সকলেই পূর্ব্ববঙ্গবাসী। পরবর্ত্তি যুগে ক্ষেমানন্দ কেতকাদাস প্রভৃতি রাঢ়দেশীয় কবিগণ পূর্ব্বোক্ত কবিগণের ভাষা ও ভাবের পরিশোধণ করিয়া নূতন কাব্য রচনা করেন। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আদি কবি দ্বিজ জনার্দ্দন এবং অন্যতম কবি মাধবাচার্য্য পূর্ব্ববঙ্গবাসী ছিলেন—সম্ভবতঃ মুকুন্দরাম পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদ্বয়ের লিখিত গ্রন্থ হইতে মূল সংগ্রহ করিয়া তাঁহার উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করেন, মহাভারতের প্রচীনতম অনুবাদক সঞ্জয় বিক্রমপুর-নিবাসী ছিলেন—'পরাগলী' মহাভারত প্রণেতা কবীন্দ্র পরমেশ্বর এবং 'ছুটী খাঁর' মহাভারতলেখক শ্রীকরণ নন্দী উভয়েই চট্টগ্রামনিবাসী ছিলেন। রাঢ়দেশীয় পরবর্ত্তী কবি নিত্যানন্দ ঘোষের ও কাশীরাম দাসের মহাভারতে পূর্ব্ববঙ্গীয় কবিগণের প্রভাব লক্ষিত হয়। রামায়ণের আদি অনুবাদক কীর্ত্তিবাস ফুলিয়া নিবাসী হইলেও, পূর্ব্ববঙ্গে পদ্মাতীরস্থ কোন গ্রামে শিক্ষা লাভ করেন। এইরূপে আলোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে পূর্ব্ববঙ্গ পৌরাণিক ধর্ম্ম প্রচার ও সংস্কৃত চর্চ্চার আদিস্থান। আজিও পূর্ব্ববঙ্গের ভাষায় ও সাহিত্যে সংস্কৃত-প্রভাব পরিস্ফুট।

উত্তর বঙ্গ বৌদ্ধধর্ম্মের কেন্দ্রস্থান ছিল। এই দেশেই পালরাজগণের গান ও আদি ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য রচিত ও প্রচারিত হয়। এই কাব্যের নায়ক

লাউসেন গৌড়েশ্বরের ভাগিনেয় এবং গৌড়নগরই এই কাব্যের উৎপত্তিস্থান। সম্প্রতি নেপালে ও চট্টগ্রামে বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত অনেক বাংলা পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ত্রিপুরা ও রংপুর অঞ্চলেও "মানিকচাঁদ রাজার গান" ও "ময়নামতীর গান" প্রভৃতি ধর্ম্মমাহাত্ম্যজ্ঞাপক প্রাচীন গীতিকবিতা প্রচারিত আছে। সম্ভবতঃ এই সকল স্থানেই বাংলা ভাষায় প্রচীনতম যুগের নিদর্শন পাওয়া যায়।

প্রচীন বঙ্গসাহিত্যের এই তিনটী বিভিন্ন কেন্দ্রস্থান ছিল কিন্তু চৈতন্য দেবের আবির্ভাবে ষোড়শ শতাব্দিতে ধর্ম্মের অভ্যুদয় হইতেই নবদ্বীপ বৈষ্ণব সাহিত্যের কেন্দ্রস্থানরূপে পরিণত হয়। পরবর্ত্তী কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগেও নবদ্বীপ বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে শীর্ষস্থান অধিকার করে। সুতরাং খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দির প্রারম্ভ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দির শেষভাগ পর্য্যন্ত প্রায় ৩০০ বৎসর কাল নবদ্বীপ বঙ্গীয় সাহিত্য রাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করে।

আমরা ক্রমান্বয়ে প্রাচীন বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের যুগচতুষ্টয়ের* পরিচয় দিলাম। বৌদ্ধযুগের পরে পৌরাণিক সংস্কারযুগ তৎপরে বৈষ্ণবযুগ এবং সর্ব্বশেষে কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগ। ইহাদিগের পৌর্ব্বাপর্য্য কোন স্বতন্ত্র নিয়মাধীন কিংবা নির্দ্দিষ্ট কাল-পরিমাপক নহে—ধর্ম্ম ও সমাজের স্বাভাবিক স্ফুরণ হইতেই প্রত্যেক যুগের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিলয় হইয়াছে। প্রথম যুগত্রয়ের নামকরণ হইতেই প্রতীতি হইবে যে ধর্ম্মসংস্কার হইতে ইহাদিগের উৎপত্তি হইয়াছে। বৌদ্ধযুগে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব—পৌরাণিক সংস্কারযুগে পৌরাণিক ধর্ম্মের প্রচার—বৈষ্ণবযুগে বৈষ্ণবধর্ম্মের বিকাশ, কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগে কোন বিশেষ ধর্ম্মস্রোত প্রবাহিত হয় না। বৌদ্ধযুগে জ্ঞানের

*কোন কোন লেখক বঙ্গভাষার আদি, মধ্য ও বর্ত্তমান যুগ নির্দ্দেশ করেন। তাঁহাদের মতে চৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী কাল বঙ্গভাষার আদিযুগ, বৈষ্ণব ধর্ম্মের অভ্যুদয় হইতে ইংরাজ শাসনকাল পর্য্যন্ত বঙ্গভাষার মধ্যযুগ এবং তৎপরে অদ্যাবধি বর্ত্তমানযুগ চলিতেছে। আমরা এই প্রবন্ধে সঙ্গত কারণ প্রদর্শন পূর্ব্বক বঙ্গভাষার পূর্ব্বোক্ত আদি ও মধ্য যুগকে প্রাচীন যুগের অন্তর্ভুক্ত করিয়া বৌদ্ধ, পৌরাণিক, বৈষ্ণব ও কৃষ্ণচন্দ্রীয় যথাক্রমে এই চারিযুগে বিভক্ত করিলাম। যাঁহারা এই বিষয়ে সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা রায়সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের "History of Bengali Language and Literature" নামক উপাদেয় গ্রন্থ পাঠ করিতে পারেন।

প্রাধান্য—পৌরাণিক যুগে জ্ঞানের সহিত ভক্তির সংযোগ—বৈষ্ণবযুগে ভক্তির সহিত প্রেমের সংমিশ্রণ, কিন্তু শেষোক্ত যুগে কোন বিশেষ ধর্ম্ম-লক্ষণ লক্ষিত হয় না। ভারতবর্ষে চিরকাল ধর্ম্মান্দোলন ও ধর্ম্মবিরোধ হইতেই সমাজ ও সাহিত্যের অভ্যুদয় হইয়া আসিতেছে—বৌদ্ধ, শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ ও ঘাত প্রতিঘাত হইতেই প্রাচীন হিন্দু সমাজ ও হিন্দুধর্ম্মের বিকাশ হইয়াছিল। কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগে কোন ধর্ম্মান্দোলন হয় নাই, বরং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবনতির পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং এই যুগে সাহিত্যের যে অধোগেতি হইবে, ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে।

যদি কেহ "প্রচীন বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের" সজীব চিত্র অঙ্কিত করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি ইহাকে একটি মহাবৃক্ষস্বরূপ* অনুমান করুন। ইহার পাচীন ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে তিনি দেখিতে পাইবেন যে বৌদ্ধযুগে ইহার মূল প্রোথিত—বৌদ্ধ প্রাকৃত হইতেই এই মূলের সৃষ্টি এবং ক্ষুদ্র গ্রাম্য কবিতা ও তন্ত্র শাস্ত্র হইতে এই মূল ক্ষুদ্র-কাণ্ডে পরিণত হয়। পৌরাণিক সংস্কার যুগে সংস্কৃত শব্দের সংযোগে এই মূল পরিপুষ্ট হইয়া বঙ্গদেশের উর্ব্বর ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হয় এবং কাণ্ডটী ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া পৌরাণিক সাহিত্যের অনুপম "অনুবাদ" শাখা ও মঙ্গলময় "লৌকিক" শাখায় বিভক্ত ও বিস্তৃত হয়। বৈষ্ণব যুগে হিন্দী, মৈথিলী ও ব্রজবুলীর সুললিত শব্দের সম্মিলনে এই মহাবৃক্ষের মূল ক্রমিক পরিপুষ্টি—লাভ করে এবং বৈষ্ণব সাহিত্যের "চরিত"-শাখা, "পদাবলী"-শাখা ও "ভজন"-শাখা এই রমণীয় শাখাত্রয় এই প্রকাণ্ড বৃক্ষের সুবিস্তৃত স্কন্ধদেশে প্রলম্বিত এবং মনোরম পল্লব-রাজিতে সুশোভিত হইয়া ভক্তবৃন্দ ও সাহিত্যসেবিগণের চিত্ত হরণ করে। কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগে আর্বী, ফার্সী ও হিন্দুস্থানী-ভাষার সংমিশ্রণে এই পাদপমূলে জটিলতা সঞ্চারিত হয় এবং সুনিপুণ শব্দবিন্যাস ও বিচিত্র ছন্দালঙ্কারের নবীন কিশলয় ও পুষ্পরাজি বিকসিত ও সুসজ্জিত হইয়া সৌখীন রাজন্যসমাজ ও রাজ-পারিষদবর্গের মনস্তুষ্টি সাধন করে, কিন্তু জন সাধারণ ঐ বিশাল বৃক্ষের সুস্নিগ্ধ ছায়ায় উপবেশন পূর্ব্বক যাত্রা ও কবিওয়ালাদিগের সুমধুর সঙ্গীতধ্বনি এবং কথক ঠাকুরদিগের বিবিধ রাগ-রাগিণী-সম্বলিত কথালাপ শ্রবণ করিয়া আনন্দনীরে অভিষিক্ত হন। বলাবাহুল্য,

*এই মহাবৃক্ষের চিত্র এই সংখ্যার প্রথমে দেওয়া হইল।

ধর্ম্মবীজ হইতে এই সাহিত্যতরু অঙ্কুরিত হয় এবং ইহার অমৃতময় ফলের রসাস্বাদনে রসিক সুজন চিরকাল অনির্ব্বচনীয় প্রীতি লাভ করেন। হিন্দু ও মুসলমান রাজত্বকালে এই প্রাচীন বৃক্ষের শৈশব ও কৈশোর কাল অতিবাহিত হইয়াছে, কিন্তু ইংরাজরাজত্বে ইহার কীদৃশী পরিণতি হয়, তাহা পরবর্ত্তী সাহিত্যযুগের বিষয়ীভূত।

সাময়িকী।

ধর্ম্ম প্রচার— বর্দ্ধমানের সন্নিহিত পান্নিতপুর গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে, ঐ গ্রামের ভূস্বামী শ্রীযুক্ত বাবু ধর্ম্মদাস মণ্ডল ও শ্রীযুক্ত বাবু ভূতনাথ তা বেদান্ত প্রতিপাদ্য অদ্বৈততত্ত্বে শ্রদ্ধাবান হইয়া উক্ত তত্ত্ব প্রচারের কেন্দ্র স্বরূপ "প্রজ্ঞামন্দির" নামে একটি আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আপাততঃ যে অলৌকিক প্রজ্ঞাসম্পন্ন মহাপুরুষ পরমহংস তিব্বতী বাবার অবস্থানের জন্য এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তিনি ২৭শে অগ্রহায়ণ আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে কলিকাতা, ঢাকা, চাঁদপুর, কুমিল্লা, কাশী প্রভৃতি স্থান হইতে বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল। শ্রীবঙ্গধর্ম্ম মণ্ডলের ধর্ম্মবক্তা মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র বেদান্তশাস্ত্রী সনাতনধর্ম্ম সম্বন্ধে ঐ দিন উপস্থিত জনমণ্ডলীর সম্মুখে বক্তৃতা করেন। চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহের প্রায় দুই সহস্রাধিক লোক সভায় উপস্থিত ছিলেন।

দরিদ্রে দান—ফরিদপুর জেলার খান্দারপাড় গ্রামে স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় দ্বারকানাথ সেন ও স্বর্গীয় গঙ্গাচরণ সেন মহাশয়দ্বয়ের সুযোগ্য বংশধরগণ খান্দারপাড় ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের দরিদ্র স্ত্রী-পুরুষগণকে গত ৺শারদীয়া পূজার নবমীর দিনে ২০ মণ চাউল ও ২৩৫ খানা নূতন বস্ত্র বিতরণ করিয়াছেন। দাতাগণের এই সদুদ্দেশ্যে উপযুক্ত সময়ে দান বিশেষ প্রশংসনীয়। শুনা যায় এই জেলার আরও ২।১টি স্থানে এইরূপ দানশীল ব্যক্তিদ্বারা বস্ত্র ও অর্থ দান করা হইয়াছে। কোথাও বা চারি পাঁচ শত লোককে এক বেলা পেট ভরিয়া আহার করান হইয়াছে। ভগবান এই সকল দানশীল ব্যক্তিবর্গকে দীর্ঘজিবী করুন।

সৎকার্য্য—হুগলী জেলার বিলসরা গ্রামের শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ঘোষ

স্বগ্রামে একটী দাতব্য ঔষধালয় প্রতিষ্ঠার জন্য গবর্ণমেণ্টের হস্তে ষাট হাজার টাকা এবং ময়মনসিংহ নাগরপুরের শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চৌধুরী স্বগ্রামে একটী হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার জন্য গবর্ণমেণ্টের হস্তে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ইহারা উভয়েই গবর্ণমেণ্টের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। দেশের লোকের নিকটও ইহাঁরা সবিশেষ ধন্যবাদভাজন। মানভূম-পুরুলিয়ার সংবাদে প্রকাশ,—পঞ্চকোটের রাজা শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ পুরুলিয়ার হাসপাতাল বাড়ী তৈয়ারির সাহায্যের জন্য এক লক্ষ টাকা দিয়াছেন। ইনি ইতিপূর্ব্বে এই হাসপাতালের ফিমেল বা রোগিণী ওয়ার্ডের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রদান করিয়াছিলেন।

সৎকার্য্যে সর্ব্বস্ব দান—খুলনা পাইকগাছার গদাইপুর গ্রামের মেহের বেহারা তাহার আজীবনের উপার্জ্জন চারি হাজার টাকা একখানি দানপত্র রেজেষ্টারী দ্বারা রাড়ুলী নিবাসী রায় সাহেব নলিনীকান্ত রায়চৌধুরী, তত্রত্য সবরেজেষ্ট্রার ও হেডমাষ্টার বাবু জ্যোতিষচন্দ্র বসু বি, এ, মহোদয়গণকে ট্রাষ্টি ও জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও বিভাগীয় স্কুল ইন্‌স্পেক্টর মহোদয়দ্বয়কে পরিদর্শক নিযুক্ত করিয়া দরিদ্র হিন্দু মুসলমান ছাত্রদিগের শিক্ষার সাহায্যার্থে ও মুসলমান ধর্ম্মের উন্নতি কল্পে দান করিয়াছেন।

নারী-শিক্ষায় দান—রায় বাহাদুর লালা গঙ্গারাম লাহোরে একখানি প্রকাণ্ড বাটী এবং তৎসংলগ্ন ভূ-সম্পত্তি গভর্ণমেণ্টের হাতে দিয়াছেন। এই দানে সর্ত্ত হইতেছে এখানে হিন্দু বিধবাদের অবস্থানের জন্য একটি আশ্রম এবং শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। রমণীদিগকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে একটি স্কুলও থাকা চাই। ইহার সম্পূর্ণ ভার গভর্ণমেণ্টের হাতে থাকিবে। কেবল মাত্র বিধবাদের আশ্রম এবং বালিকাদের শিক্ষা সম্বন্ধে পরিদর্শন করিবার জন্য একটি ছোট কমিটি নিযুক্ত হইবে। শিল্প বিদ্যালয়টীতে হিন্দু এবং শিখ বিধবা ছাড়া আর কাহারও প্রবেশের অধিকার থাকিবে না। সম্প্রতি আশ্রমে ৮০ জন বিধবার স্থান হইবে, এরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। স্কুলে বিধবা ছাড়া সমস্ত জাতির হিন্দু এবং শিখদের বালিকারাও লেখাপড়া শিক্ষার জন্য প্রবেশ করিতে পারিবে। ধন্য লালা গঙ্গারাম।

গীত।

রাগিণী পিলু, তাল—একতালা।

(শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দ স্বরস্বতী।)

এস গো হৃদয়-নাথ তুমি সদানন্দ-দাতা।
নির্জ্জনে অন্তরে বস আমি কব দুটি কথা॥
জনম জনম ধরে' আসিতেছি ফিরে ঘুরে,
তুমিত দেখনা ফিরে মোর কত মর্ম্মব্যথা॥
আমার দুঃখ কাহিনী তুমি কি কভু শোন নি,
কেমনে থাক না জানি জেনে শুনে বসে কোথা॥
কহে গো সচ্চিদানন্দ ভুলাও এ ভবানন্দ,
চল তথা চির বিরাম ব্রহ্মানন্দ পাব যথা॥

আকার।

(শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।)

এ জগতে চিরদিন আকারের জয়
আছে তার বড় বেশী মান,
আকার যে ভালবাসা সুধাহাসি ময়
দয়াময় বিধাতার দান।

কাজেতে আকার পেতে চায় অভিলাষ,
প্রাণ যে আকার কাছে চাবে,
আকারের মাঝে শুধু বাস করে বাস
আকার আঁকড়ি রয় ভাবে।

চাঁদ আর দিবাকর আকারের বলে
হয়েছে কেবল দোহে ভাই
নিরাকার রয়ে যান আকারের তলে
ধ্যানে জ্ঞানে তাই শুধু পাই।

অকারের চাপে পড়ে থাকে কোথা গুণ
আকারেই টানে কাগে আঁখি
আকারেই খালি করে ফুলবন তুণ
ঈশানেও বাদ নাহি রাখি।

ব্রহ্মা যে আকার দিয়া সৃজিলেন ধরা
নারায়ণ পালিছেন তারে,
মহাকালে ভার আছে নাশ তার করা
ভরা ধরা আকারের ভারে।

আর্য্যজাতি।

আর্য্যজাতিই বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর সকল দেশে যাইয়া নিবাস করিয়াছেন। দেশ, কাল ও আচারের ভেদ অনুসারে আজকাল তাহাদিগের মধ্যে নানারূপ বৈষম্য উপস্থিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী কালে আর্য্য-আচারাদি হইতে ভ্রষ্ট হওয়ায় তাহারা আর্য্য-পদবী হইতে চ্যুত হইয়া অন্য জাতিরূপে আখ্যাত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। মিঃ পোলক সাহেব বলিয়াছেন যে "পাঞ্জাবের রাস্তায় অসংখ্য হিন্দু ইয়ুরোপ ও এসিয়ার অনেক স্থানে গমন করিয়াছিলেন এবং তাহারা সেই সকল দেশেরই অধিবাসী হইয়া গিয়াছিলেন।" প্রোফেসর হীরেন সাহেব বলেন,—"অন্তর্ব্বিবাদ অর্থাৎ আপনাদের সমাজের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ ও যুদ্ধবিগ্রহাদির জন্য আর্য্যেরা অন্যান্য দেশে যাইয়া বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।" কি প্রকারে ক্রিয়ালোপ ও বেদপাঠের অভাবে বহু ক্ষত্রিয় জাতি পতিত হইয়া কাম্বোজ, শক, যবন, খস, পারদ প্রভৃতি নীচ জাতিরূপে পরিণত হইয়াছিল তাহা পূর্ব্বে মনু সংহিতার প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়াছে। মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে ও শান্তিপর্ব্বেও এইরূপ অনেক জাতির বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। যথা—

শকা যবনকাম্বোজাস্তাস্তাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং পরিগতা ব্রাহ্মণানামদর্শনাৎ॥
দ্রাবিড়াশ্চ কলিন্দাশ্চ পুলিন্দাশ্চাপ্যুশীনরাঃ।
কোলিসর্পা মাহিষকাস্তাস্তাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ॥
মেকলা দ্রবিড়া লাটা পৌণ্ড্রা কোন্বশিরাস্তথা।
শৌণ্ডিকা দরদা দর্ব্বাশ্চৌরা শর্ব্বরবর্ব্বরাঃ॥
কিরাতা যবনাশ্চৈব তাস্তাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বমনুপ্রাপ্তা ব্রাহ্মণানামদর্শনাৎ॥

বেদাচার খণ্ডিত হওয়ায় শক, যবনাদি জাতি ক্ষত্রিয় জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। শান্তিপর্ব্বেও এই প্রকার লিখিত আছে যে,—

যবনাঃ কিরাতা গান্ধারাশ্চীনাঃ শর্ব্বরবর্ব্বরাঃ।
শকাস্তুষারা কঙ্কাশ্চ পহ্লবাশ্চান্ধ্রমদ্রকাঃ॥
পৌণ্ড্রাঃ পুলিন্দা রমঠা কাম্বোজাশ্চৈব সর্ব্বশঃ।
ব্রহ্মক্ষত্রপ্রসূতাশ্চ বৈশ্যা শূদ্রাশ্চ মানবাঃ॥

কথং ধর্ম্মাংশ্চরিষ্যন্তি সর্ব্বে বিষয়বাসিনঃ।
মদ্বিধৈশ্চ কথং স্থাপ্যা সর্ব্বে বৈ দস্যুজীবিনঃ॥

যবন, কিরাত, গান্ধার প্রভৃতি যে সমস্ত জাতি চতুর্ব্বর্ণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহাদের কি ধর্ম্ম হইবে এবং তাহাদের উপর শাসনই বা কি প্রকারে হইবে মহাভারতে এই সব প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে প্রাচীনকালে আর্য্যজাতি পৃথিবীস্থ অন্যান্য জাতিবৃন্দের উপরেও আধিপত্য করিতেন। মনসিয়র ডেলবো সাহেব বলিয়াছেন, "সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে সভ্যতা গঙ্গার তটে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল আমেরিকা ও ইয়ুরোপ আজিও তাহার ফল ভোগ করিতেছে এবং সমস্ত সভ্য জগতে সেই প্রাচীন আর্য্য সভ্যতাই বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে।" প্রাচীন আর্য্যগণ এইরূপ বিভিন্ন দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিবার জন্য জলপথ ও স্থলপথ উভয় মার্গেই গমনাগমন করিতেন। যবদ্বীপ, বোর্ণিও প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করিয়া প্রাচীন হিন্দুগণ আমেরিকায় যাইতেন এইরূপ প্রমাণ অনেক স্থানে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের আলোচনা দ্বারা সিদ্ধ হয় যে পূর্ব্বে বেরিং প্রণালী (Baring Strait) বিদ্যমান ছিল না। তখনকার দিনে রুস দেশের উত্তর পূর্ব্ব স্থানের সহিত আমেরিকার আলাস্কা দেশের সংযোগ ছিল। প্রাচীন ভারতবাসীগণ চীন, মঙ্গোলিয়া ও সাইবেরিয়া হইয়া স্থলপথেই আমেরিকায় যাইতেন। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবের সময় বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারকগণ আমেরিকায় যাতায়াত করিতেন, চীন দেশের ইতিহাসে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাচীন মিসর বা বর্ত্তমান আফ্রিকা দেশে প্রাচীন আর্য্যজাতি যে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন তাহার বৃত্তান্ত পূর্ব্বে বর্ণন করা হইয়াছে। কয়েকজন আচারভ্রষ্ট ক্ষত্রিয়কে রাজা সগর সমাজচ্যুত করিয়াছিলেন। তাহারাই শক, যবর্ন, পারদ বলিয়া কথিত হইত। ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া ইহারা নানা দেশে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন।

কাহারও কাহারও মতে এই সকল ভ্রষ্ট জাতির মধ্যে পারদ জাতির দ্বারাই 'পারস্য' দেশের নামকরণ হইয়াছিল। এবং কাহারও মতে পরশুরামের অনুচরগণের দ্বারা পারস্য দেশের নামকরণ হইয়াছিল। শ্রীরামচন্দ্রের কোন বংশধরের দ্বারা রোম রাজ্যের প্রতিষ্ঠা এবং মগধ রাজগণের দ্বারা গ্রীস রাজ্যের প্রতিষ্ঠা—এই মত অনেক

পাশ্চাত্য পণ্ডিতের গবেষণার দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীসের নাম যবনরাজ্য ছিল। জার্ম্মাণ রাজ্যে মনুর বংশধরেরা উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। তুরস্ক ও উত্তর এশিয়ায় হিন্দুদেরই আধিপত্য ছিল। এই সকল কথার অনেক প্রমাণ রহিয়াছে। চীন দেশে আর্য্যদের আধিপত্য ছিল তাহার বৃত্তান্ত চীনের ধর্ম্ম ও জাতিতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করিলে জানিতে পারা যায়। এখনও চীন দেশের লোকেরা নিজেদের আর্য্যবংশীয় বলিয়া পরিচয় দেয়। প্রাচীন ব্রিটেন দ্বীপও কোন সময় আর্য্যদের অধিকারভুক্ত ছিল। আজকাল অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত গবেষণা দ্বারা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন। উহারা বলেন প্রাচীন 'ড্রুইদ' পুরোহিতদের উৎপত্তির মূলে আর্য্য ব্রাহ্মণগণ অথবা বৌদ্ধ ধর্ম্মের যাজকগণের প্রাধান্য অবশ্যই বিদ্যমান ছিল। জম্বু, প্লক্ষ, পুষ্কর, ক্রৌঞ্চ, শক, শাল্মলী ও কুশ এই সাত দ্বীপের সম্বন্ধে বিচার করিতে যাইয়া কর্ণেল উইলফোর্ড প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তদ্দ্বারা প্রমাণিত হয় যে প্রাচীনকালে সমস্ত পৃথিবীই আর্য্যজাতির অধিকারভুক্ত ছিল। কালের কুটিল গতিপ্রভাবে প্রাচীন আর্য্যদের অনেক স্থানের নাম পরিবর্ত্তন হওয়ায় আর্য্যজাতির অধিকারের সীমা নিরূপণ করা দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু সামান্য বিচার করিলেই আর্য্যজাতির 'পৃথিবী পাল' লক্ষণের সার্থকতা প্রমাণিত হইয়া যাইবে। আর্য্যজাতির অধিকারভুক্ত প্রাচীন গান্ধারই বর্ত্তমান কান্দাহার, প্রাচীন কাম্বোজই বর্ত্তমান কাম্বোডিয়া, প্রাচীন পহ্লব বা পারদই বর্ত্তমান পারস্য, প্রাচীন যবনই আধুনিক গ্রীস, প্রাচীন দরদই অধুনিক চীন এবং প্রাচীন খসই অধুনিক পূর্ব্ব ইয়ুরোপ। এইরূপে আর্য্যজাতির অধিকারভুক্ত প্রাচীন দেশ সমূহের নামাবলী অবগত হওয়া যায়। এখনও যব ও বালী দ্বীপের অসংখ্য হিন্দু অধিবাসী, কাম্বোডিয়ার অপূর্ব্ব মন্দিররাজির ধ্বংসাবশেষ এবং পৃথিবীর প্রধান প্রধান অংশে বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তার আর্য্যজাতির সর্ব্বত্র ব্যাপকতা সিদ্ধ করিতেছে।

প্রাচীনকালে এইরূপে পৃথিবীর সর্ব্বত্র গমনাগমন করিবার নিমিত্ত আর্য্যদিগের নিকট যানাদিরও অপ্রাচুর্য্য ছিল না। প্রাচীন ইতিহাস পুরাণাদিতে যে সকল দ্রুতগামী রথ ও পোতের প্রমাণ পাওয়া যায় তাহাতে আরোহণ করিয়া অতি অল্প কালের মধ্যে জল, স্থল অথবা আকাশ পথে বহুদূর দেশে যাওয়া যাইতে পারিত। ইহা দ্বারা প্রাচীনকালে জাহাজ, বেলুন ও এ্যারোপ্লেনাদির

অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়; ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ৩৭ সুক্তের প্রথম ঋক এইরূপ :—

ক্রীলং শর্দ্ধোমারুতমনর্ব্বাণং রথে শুভম্।
কন্বা অভিপ্রগায়ত।

এই মন্ত্রের 'অনর্ব্বাণ' শব্দের অর্থ 'অশ্বরহিত' এবং 'মারুত' শব্দের অর্থ 'মরুৎ-দত্ত' বা 'বাষ্প-দত্ত' বল দ্বারা। সুতরাং সম্পূর্ণ ঋকের অর্থ এইরূপ —হে কন্বগোত্রোৎপন্ন মহর্ষিগণ, বাষ্প-প্রভাবে অশ্বরহিত রথ যে প্রকারে চলিতে পারে আমাদিগকে তাহার শিক্ষা দিন। অতএব এই ঋক মন্ত্রের দ্বারা অশ্বরহিত বাষ্পীয় রথ প্রাচীন কালে ছিল তাহা প্রমাণিত হয়। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ৯৭ সুক্তে লিখিত আছে,—

দ্বিষো নো বিশ্বতোমুখাতি নাবেব পারয়।
স নঃ সিন্ধুমিব নাবয়াতি পর্ষা স্বস্তয়ে॥

হে বিশ্বতোমুখ দেব! তুমি আমাদের শত্রুগণকে জাহাজের দ্বারা পার করার ন্যায় দূরে প্রেরণ কর এবং আমাদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত জাহাজের দ্বারা সমুদ্রের পর পারে লইয়া চল। এই প্রকার আরও অনেক মন্ত্র-দ্বারা প্রাচীন কালে অর্ণবপোত প্রভৃতি বিদ্যমান ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। কেবল সমগ্র পৃথিবীতে আপনাদের অধিকার বিস্তার করিবার জন্যই নহে, প্রত্যুত বাণিজ্যাদি ব্যপদেশেও তাঁহারা পৃথিবীর সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতেন। ঋগ্বেদের ৪র্থ মণ্ডলের ৫৫ সুক্তে ধনলাভেচ্ছু বণিকগণের সমুদ্র যাত্রার বৃত্তান্ত লিখিত আছে। প্রোফেসার ম্যাক্স ডঙ্কার সাহেব বলিয়াছেন, "খ্রীষ্টজন্মের ২০০০ দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যজাতি জাহাজ প্রস্তুত করিতে জানিতেন এবং সমস্ত পৃথিবীর সহিত তাহাদের বাণিজ্য কার্য্য চলিত।" প্রোফেসার হীরেন সাহেব বলেন, "প্রাচীন হিন্দুগণ এক প্রকার জলযান প্রস্তুত করিতে জানিতেন, তাহাতে চড়িয়া তাহারা করমণ্ডল তট, গঙ্গা তটস্থ প্রদেশ, এবং গ্রীস ও মছলি-পট্টনের অনেক স্থানের সহিত বাণিজ্য করিতেন।" হিন্দুশাস্ত্রেও এমন অনেক প্রমাণ পাওয়া যায় যদ্বারা সিদ্ধ হয় যে প্রাচীন আর্য্যজাতি দারুবিজ্ঞানের তত্ত্ব সম্যক অবগত ছিলেন এবং সেই বিদ্যার সহায়তায় তাঁহারা উত্তম ও দৃঢ় জাহাজ

প্রস্তুত করিয়া দেশবিদেশে গমনাগমন করিতেন। বৃক্ষ-আয়ুর্ব্বেদের মতানুসারে কাষ্ঠেরও চারি বর্ণ বিভাগ আছে। যথা,

লঘু যৎ কোমলং কাষ্ঠং সুঘটং ব্রহ্মজাতি তৎ।
দৃঢ়াঙ্গং লঘু যৎ কাষ্ঠমঘটং ক্ষত্রজাতি তৎ॥
কোমলং গুরু যৎ কাষ্ঠং বৈশ্যজাতি তদুচ্যতে।
দৃঢ়াঙ্গং গুরু যৎ কাষ্ঠং শূদ্রজাতি তদুচ্যতে॥
লক্ষণদ্বয়যোগেন দ্বিজাতিকাষ্ঠসংগ্রহঃ॥

যে কাঠ হাল্কা নরম ও অপর কাঠের সঙ্গে সুন্দররূপে মিলিত হইতে পারে তাহাকে ব্রাহ্মণ জাতীয় কাঠ বলে। যে কাঠ হাল্কা ও দৃঢ় এবং অপর কাঠের সঙ্গে মিলিত হয় না তাহা ক্ষত্রিয় জাতীয় কাঠ। নরম ও ভারী কাঠ বৈশ্যজাতিয় এবং দৃঢ় ও ভারী কাঠ শূদ্রজাতীয়। যে কাঠে দুই জাতির লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা ঐ উভয় জাতির সম্মিলনে উৎপন্ন বর্ণসঙ্কর কাঠ। এই লক্ষণযুক্ত চতুর্ব্বিধ কাষ্ঠই জলযান নির্ম্মাণ করিতে প্রয়োজন হইত। ভোজরাজ উল্লিখিত চতুর্ব্বর্ণের কাষ্ঠের মধ্যে জাহাজ প্রস্তুত করিতে কোন কোন কাঠ কি প্রকারে প্রযুক্ত হইতে পারে এবং কাষ্ঠ দ্বারা জাহাজ কি প্রকারে নির্ম্মিত হওয়া উচিত তাহা বর্ণন করিয়াছেন। যথা,—

ক্ষত্রিয়কাষ্ঠৈর্ঘটিতা ভোজমতে সুখসম্পদং নৌকা।
অন্যে লঘুভিঃ সুদৃঢ়ৈর্দধতি জলদুস্পদে নৌকাম্॥
বিভিন্নজাতিদ্বয়কাষ্ঠজাতা ন শ্রেয়সে নাপি সুখায় নৌকা।
নৈষা চিরং তিষ্ঠতি পচ্যতে চ বিভিদ্যতে সরিতি মজ্জতে চ॥

ভোজরাজের মতানুসারে ক্ষত্রিয়কাষ্ঠ-নির্ম্মিত জলযানই সুখ ও ধন দান করে। অধিক জলে চলিবার নিমিত্ত এই প্রকার লঘু ও দৃঢ় কাষ্ঠযুক্ত যানই আবশ্যক। বিভিন্ন জাতীয় কাষ্ঠদ্বয় দ্বারা নির্ম্মিত জলযান কদাপি কল্যাণদায়ক বা সুখকর নহে কারণ এরূপ যান অধিক দিন স্থায়ী হয় না, অল্প কালের মধ্যে পচিয়া যায়, সামান্য আঘাত লাগিলে ফাটিয়া যায় এবং সমুদ্রে ডুবিয়া যায়।

যুক্তিকল্পতরু গ্রন্থে আকার ভেদে দশ প্রকার জাহাজের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে যথা,—

ক্ষুদ্রাথ মধ্যমা ভীমা চপলা পটলা ভয়া।
দীর্ঘা পত্রপুটা চৈব গর্ভরা মন্থরা তথা ॥

ক্ষুদ্রা, মধ্যমা, ভীমা, চপলা, পটলা, ভয়া, দীর্ঘা, পত্রপুটা, গর্ভরা, ও মন্থরা। কেবল নদীতে চলাচলের নিমিত্তই এই দশ প্রকার জলযান ব্যবহৃত হইত। এতদ্ভিন্ন সমুদ্রে গমনাগমনের নিমিত্ত বৃহৎ জলযানও দশ প্রকার। যথা,—

দীর্ঘিকা তরণি লোলা গত্বরা গামিনী তরিঃ।
জঙ্ঘালা প্লাবিনী চৈব ধারিণী বেগিনী তথা ॥

দীর্ঘিকা, তরণি, লোলা, গত্বরা, গামিনী, তরি, জঙ্ঘালা, প্লাবিনী, ধারিণী ও বেগিনী। মহাভারতের আদিপর্ব্বে লিখিত আছে,—

ততঃ প্রবাসিতো বিদ্বান্ বিদুরেণ নরস্তদা।
পার্থানাং দর্শয়ামাস মনোমারুত-গামিনীম্ ॥
সর্ব্ববাতসহাং নাবং যন্ত্রযুক্তাং পতাকিনীম্।
শিবে ভাগীরথীতীরে নরৈর্বিশ্রম্ভিভিঃ কৃতাম্ ॥

মহাত্মা বিদুর পাণ্ডবদিগের রক্ষার নিমিত্ত কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তি কর্তৃক পরিচালিত এরূপ একখানি জাহাজ গঙ্গাতীরে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন যাহাতে সকল প্রকার যন্ত্র, নিশান এবং দুঃসহ পবনবেগ সহ্য করিবার শক্তি ছিল। রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে লিখিত আছে,—

নাবাং শতানাং পঞ্চানাং কৈবর্ত্তানাং শতং শতম্।
সন্নদ্ধানাং তথা যূনাস্তিষ্ঠন্ত্বিত্যভ্যচোদয়ৎ ॥

শত্রুদের পথ রোধ করিবার জন্য দশ সহস্র যুদ্ধার্থী কৈবর্ত্ত যুবক ৫০০ জলযানে নানাস্থানে লুক্কাইত রহিল। এইরূপ অনেক প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয় যে প্রাচীন কালে আর্য্যগণ জাহাজাদি জলযান নির্ম্মাণ-কৌশল অবগত ছিলেন এবং এই প্রকার অর্ণবপোতাদিতে চড়িয়া তাঁহারা দিগ্বিজয় ও বাণিজ্য করিবার নিমিত্ত বহু দূর দূর দেশে গমনাগমন করিতেন।

বাণিজ্য সম্বন্ধে প্রাচীন আর্য্য-ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে আজকালের ন্যায় প্রাচীন হিন্দুজাতি বিদেশীয়দিগের হস্তে সমস্ত

বাণিজ্যের ধন অর্পণ করিয়া দীন হীন ভিখারী ও পরমুখাপেক্ষী হইয়াছিলেন না, প্রত্যুত আপনাদের অনুপম বাণিজ্য-সমৃদ্ধির দ্বারা সমগ্র পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। প্রাচীন কালে ভারত অতুল ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ছিল বলিয়াই স্বর্ণভূমি নামে অভিহিত হইত, আর্য্যজাতির বাণিজ্যই ইহার প্রধান কারণ। মিস্ ম্যানিং বলিয়াছেন,—"ভারতবর্ষের অনেক বস্তু দেশান্তরে দেখিয়া এবং সংস্কৃত-গ্রন্থের প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয় যে প্রাচীন আর্য্যেরা বাণিজ্যপরায়ণ জাতি ছিলেন।" মিঃ এলফিন্‌ষ্টোন সাহেব বলিয়াছেন,—"মহর্ষি মনুর সময়ে আর্য্যেরা সমুদ্র পথে বাণিজ্য করিতেন, কারণ তাঁহার গ্রন্থ পাড়িলে এইরূপ জানিতে পারা যায়।" ম্যাক্স ডঙ্কার সাহেব বলিয়াছেন,—"খ্রীষ্টজন্মের দশ শতাব্দি পূর্ব্বে ফিনিশিয়ান্ জাতির সহিত ভারতবাসির হস্তিদন্ত, চন্দনকাষ্ঠ, স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি ও ময়ুরাদির বাণিজ্য চলিত। গ্রীক জাতি ভারতবাসিদের নিকট হইতেই চিনির ব্যবহার শিখিয়াছে। ইংরাজী সুগার (Sugar) শব্দ সংস্কৃত 'শর্করা' হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। পরে আরব পারস্য ও ইয়ুরোপের অনেক প্রদেশে ইহার প্রচলন হইয়াছে।" মিঃ মণ্ডার সাহেব বলিয়াছেন,—"সেলুসিডির রাজত্বকালেও সিরিয়ার সহিত আর্য্যজাতির বাণিজ্য চলিতেছিল। ভারতবর্ষের লৌহ, অলঙ্কার ও বহুমূল্য বস্ত্র জাহাজে করিয়া তথা হইতে বেবিলোন ও টায়ার্ দেশে যাইত।" মিশরদেশের সহিত বাণিজ্যের বিষয় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। রেশম, প্রবাল, মুক্তা, হীরা প্রভৃতি বহুমূল্য বস্তুর ব্যবসায় মিসর ও তদন্তর্গত অলগজেন্ড্রিয়ার সহিত ছিল। হস্তিদন্ত ও নীলের বাণিজ্য গ্রীসের সহিত ছিল। রোমের সহিত ভারতবাসিদিগের নানা প্রকার সুগন্ধ দ্রব্য ও মসল্লার ব্যবসায় চলিত, এইরূপ হীরেন সাহেবের অভিমত। প্রাচীন রোম দেশের স্ত্রীলোকেরা ভারতীয় রেশম ও সুগন্ধ দ্রব্য এত ভালবাসিত যে সোনার দামে তাহারা ভারতীয় ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে ঐ সকল বস্তু ক্রয় করিত। প্লৈনী-সাহেব আক্ষেপের সহিত বলিয়াছেন যে,—"এই প্রকারে রোমের সকল প্রদেশ হইতে প্রতিবৎসর ভারতবর্ষে ৪০ চল্লিশ লক্ষ টাকা চলিয়া যাইত।" এইরূপ বাণিজ্য সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মত ভিন্ন হিন্দু-শাস্ত্রের প্রাচীন ও আধুনিক গ্রন্থ সমূহেও ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে এই প্রকার আর্য্য-বণিকগণের সমুদ্র যাত্রার সম্বন্ধে

যে বর্ণন আছে তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার একস্থানে লিখিত আছে—

যে সমুদ্রগা বৃদ্ধ্যা ধনং গৃহীত্বা অধিকলাভার্থং
প্রাণধনবিনাশশঙ্কাস্থানং সমুদ্রং গচ্ছন্তি তে
বিংশং শতকং মাসি মাসি দদ্যুঃ।

যাহারা চক্রবৃদ্ধি হারে অর্থ ঋণ লইয়া অত্যধিক লাভের জন্য সমুদ্র পথে গমন করে তাহাদিগকে মাসে মাসে দুই হাজার টাকা করিয়া রাজকর দিতে হইবে। এইরূপ অধিক কর স্থাপন করিলে তাহার ভয়ে অনেকে সমুদ্র গমনে প্রতিনিবৃত্ত হইবে, কারণ সমুদ্রে প্রাণ ও ধন সমূলে বিনষ্ট হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। বৃহৎ সংহিতার লিখিত আছে,—

স্বাতৌ প্রভূতবৃষ্টির্দূতবণিঙ্নাবিকান্ স্পৃশত্যনয়ঃ।
ঐন্দ্রাগ্নেঽপি সুবৃষ্টির্বণিজাঞ্চ ভয়ং বিজানীয়াৎ॥
অথবা সমুদ্রতীরে কুশলাগতরত্নপোতসম্বন্ধে।
ধননিচুললীনজলচরসিতখগশবলীকৃতোপান্তে॥

ইহার প্রথম শ্লোকে স্বাতি নক্ষত্রের সহিত বৃষ্টির সম্বন্ধ দেখাইয়া সমুদ্রে গমনেচ্ছু বণিকগণকে সাবধান করা হইয়াছে এবং দ্বিতীয় শ্লোকে—ধনরত্নপূর্ণ জলযান সমূহ বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া যে সমুদ্রতীরে সংলগ্ন হয় তথায় স্নানের মাহাত্ম্য লিখিত হইয়াছে। বায়ু পুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ ও ভাগবতে আর্য্য বণিক গণের জলপথে বাণিজ্য করিবার বিষয়ে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। বারাহ-পুরাণে গোকর্ণ নামক এক বণিকের বিষয়ে লিখিত আছে যে, সে বাণিজ্য করিবার মানসে সমুদ্রে যাইয়া ঝড়ে বিপন্ন হইয়াছিল এবং অতি কষ্টে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। ঐ পুরাণেরই অন্য একস্থানে লিখিত আছে,—

পুনস্তত্রৈব গমনে বণিগ্ভাবে মতির্গতা।
সমুদ্রযানে রত্নানি মহাস্থৌল্যানি সাধুভিঃ॥
রত্নপরীক্ষকৈঃ সার্দ্ধমানয়িষ্যে বহূনি চ।
এবং নিশ্চিত্য মনসা মহাস্বার্থপুরঃসরঃ॥

নারীধর্ম্ম।

[স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী।]

বিধবাবস্থা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পাতিব্রত্যের মহিমা অথর্ব্বাদি বেদে কিরূপ বর্ণিত আছে তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শন করা হইয়াছে সুতরাং পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

বাগ্দত্তা কন্যার পুনর্ব্বিবাহ উচিত কি না?

বাগদত্তা কন্যার বিবাহের বিষয়েও মনু স্পষ্টরূপে বিবাহের কথা লিখেন নাই। যথা—

যস্যা ম্রিয়েত কন্যায়া বাচা সত্যে কৃতে পতিঃ।
তামনেন বিধানেন নিজো বিন্দেত দেবরঃ।
যথাবিধ্যধিগম্যৈনাং শুক্লবস্ত্রাং শুচিব্রতাম্।
মিথো ভজেতাপ্রসবাৎ সকৃৎ সকৃদৃতাবৃতৌ॥

যদি বাগ্দত্তা কন্যার পতি বিবাহের পূর্ব্বে মরিয়া যায় তবে নিয়োগ বিধি অনুসারে দেবরের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ হইতে পারে এবং সন্তান উৎপত্তি পর্য্যন্ত প্রতি ঋতুকালে উভয়ে এক একবার সহবাস করিতে পারে। কিন্তু সেই স্ত্রী শুক্লবস্ত্র পরিধান করিয়া পবিত্র ভাবে থাকিবেন। ইহাদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে শ্বেতবস্ত্র পরিধান করা ও শুচিব্রত হওয়া বিধবার ধর্ম্ম সধবার ধর্ম্ম নহে, অতএব উক্ত শ্লোকের দ্বারা মনু বাগ্দত্তার বিবাহের বিধান দেন নাই কেবল-মাত্র সন্তানোৎপত্তির জন্যই বলিয়াছেন। তথাপি যদি কেহ সন্দিগ্ধ হইয়া উপর্য্যুক্ত বচন হইতে বাগ্দত্তার বিবাহই বুঝেন তাই মনু আবার তৃতীয় শ্লোকে বলিয়াছেন যে—

ন দত্ত্বা কস্যচিৎ কন্যাং পুনর্দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ।
দত্ত্বা পুনঃ প্রযচ্ছন্ হি প্রাপ্নোতি পুরুষানৃতম্॥

বাগদত্তা কন্যাকে অন্য পাত্রে প্রদান করা বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের কর্ত্তব্য নহে। কারণ একজনকে দান করিবার আশা দিয়া তাহা অন্যকে দান করিলে সমস্ত সংসারকে বঞ্চনা করার পাপ হয়। সুতরাং উক্ত সংশয়ের কোন কারণ নাই। শাস্ত্রেও আছে যে——

যদ্যন্মনুরবদত্তত্তদেব ভেষজং।

মনু যাহা বলিয়াছেন মনুষ্যের পক্ষে তাহা সর্ব্বাংশে শ্রেয়স্কর। এজন্য মনুর আদেশ বেদের অনুকূল ও সর্ব্বথা আর্য্যভাব যুক্ত। কিন্তু দেশকালের বিভিন্নতা হেতু অন্যান্য স্মৃতিতে অনুকল্প বিধানও দেখিতে পাওয়া যায়। সে সকল মধ্যম ও অধম শ্রেণীর বিধান এবং তদনুসারে

বাগ্দত্তা কন্যাকে অন্যপাত্রে অর্পণ করা যাইতে পারে। তাহাদের সিদ্ধান্ত এই যে মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক সপ্তপদী গমন করিলে কন্যার উপর বরের পূর্ণ অধিকার হয় কেবল বাগ্দান হইলে কন্যাদান সিদ্ধ হয় না, অতএব তাহাকে অন্যপাত্রে সমর্পণ করা যাইতে পারে। এই বিচার অপেক্ষাকৃত স্থূলভাব মূলক। মনু স্থূল সূক্ষ্ম উভয় ভাবের সামঞ্জস্য করিয়া বাগ্দত্তার বিবাহ নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু অন্য মহর্ষিগণ বাগ্দত্তার অন্য পাত্রের সহিত বিবাহের বিধান দিয়াছেন। বশিষ্ট সংহিতায় দেখিতে পাওয়া যায় যে,

অদ্ভির্বাচা চ দত্তায়াং ম্রিয়েতাথো বরো যদি।
ন চ মন্ত্রোপনীতা স্যাৎ কুমারী পিতুরেব সা॥
যাবচ্চেদাহৃতা কন্যা মন্ত্রৈর্যদি ন সংস্কৃতাঃ।
অন্যস্মৈ বিধিবদ্দেয়া যথা কন্যা তথৈব সা॥

মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক সংস্কার ব্যতীত কেবল জল অথবা বাক্য দ্বারা দত্তাকন্যা বরের মৃত্যু হইলে পিতারই থাকে এবং মন্ত্রসংস্কৃত না হওয়ায় তাহাকে যথাবিধি অন্য বরে সম্প্রদান করা যাইতে পারে কারণ, মন্ত্র সংস্কার না হওয়া পর্য্যন্ত বাগ্দত্তা ও অবাগ্দত্তা উভয়েই কন্যা বলিয়া পরিগণিত হয়। এইরূপে বশিষ্টাদি ঋষিগণ বাগ্দত্তাকন্যার বিবাহের বিধান দিয়াছেন এবং মনু তাহা নিষেধ করিয়াছেন এস্থলে উত্তমকল্প ও অনুকল্পের বিচার করা হইয়াছে। উদাহরণের দ্বারা তাহা হৃদয়ঙ্গম করান যাইতেছে। মনে করুন যদি কোন ব্যক্তি কাহাকেও ধনদানের অঙ্গীকার করে এবং দানের পূর্ব্বেই গ্রহীতার মৃত্যু হয় তবে সর্ব্বোত্তম দাতা বলিয়া তিনিই গণ্য হন যিনি উক্ত সংকল্পিত অর্থকে নিজ প্রয়োজনে ব্যয়িত না করেন, কিন্তু এরূপ উচ্চাশয় ব্যক্তি সংসারে অত্যন্ত অল্প সংখ্যকই দেখিতে পাওয়া যায়; সাধারণতঃ লোকে এইরূপই করিয়া থাকে যে, গ্রহীতার মৃত্যু হইলে দাতা দেয় দ্রব্যকে অন্যপাত্রে অর্পণ করেন। বাগ্দত্তা কন্যার সম্প্রদান বিষয়ে মত ভেদ হওয়াতেই মনু ও মহর্ষিগণ বিভিন্ন বিধান বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু উক্ত স্থলে মতানৈক্য হইলে ও মন্ত্রসংস্কৃতা বিধবার বিবাহ বিষয়ে সকলেই একবাক্যে বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়াছেন। এক-পতিব্রতের বিষয়ে পূর্ব্বে অনেক বর্ণন করা হইয়াছে সুতরাং নিষ্প্রয়োজন বোধে এখানে আর বলা হইল না।

কোন কোন আধুনিক ব্যক্তি এরূপ বিচার প্রকট করিয়া বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয় যে, পাশ্চাত্য জাতি সমূহের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকাতেও যখন তাহারা উন্নতির উচ্চ সীমায় সমুপস্থিত—অথচ বড় বড় বীরও জন্মাইতেছে তখন পুরুষ-প্রাধান্য-মূলক পাতিব্রত্য উচ্ছন্ন হইলে ভারতের উন্নতি কেন না হইবে? এই প্রশ্নের উত্তর বর্ণ ধর্ম্ম নামক পুস্তকে বিশদরূপে লিখিত হইয়াছে। এস্থলে প্রয়োজনীয় বোধে সংক্ষেপে তাহার সার সঙ্কলন করা হইতেছে। প্রত্যেক জাতি নিজ সংস্কারকে ভিত্তি করিয়াই জগতে উন্নত হইয়া থাকে। সংস্কারকে সংহার করিয়া উন্নতি উচ্ছৃঙ্খলতা মাত্র। কোন নূতন সংস্কারাপন্ন নূতন জাতিকে উন্নত করা এক কথা এবং কোন পুরাতন সংস্কার সংযুক্ত ধ্বংসোন্মুখ জাতি, যাহার পূর্ব্ব সংস্কার মলিনীভূত হইয়াছে তাহাকে সমুন্নত করা অন্য কথা। নবীন জাতি নবীন সংস্কারের সহিত উন্নতি লাভ করে কিন্তু প্রাচীন সংস্কার বিশিষ্ট জাতি প্রাচীন বিকৃত সংস্কারকে পরিমার্জ্জিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়াই মনুষ্যসমাজের মধ্যে অভ্যুত্থিত হয়। উক্ত সংস্কারকে ধ্বংস করিলে সে জাতিরও ধ্বংসই বুঝিতে হইবে; ধ্বংস উন্নতি নহে। অতএব যে দেশের স্ত্রীজাতির মধ্যে পাতিব্রত্য সংস্কার নাই তদ্দেশীয় স্ত্রী অন্য প্রকারে ও অন্যবিধ সংস্কার দ্বারা ক্রমশঃ উন্নত হইয়া থাকে। কিন্তু যে জাতির স্ত্রী সমূহের মধ্যে পাতিব্রত্য সংস্কার অনাদিকাল হইতে এরূপ ভাবে ব্যাপ্ত ও দৃঢ় হইয়াছে যে তাহার অভাবে স্ত্রীর স্ত্রীত্বই ব্যর্থ হইয়া যায়। সে জাতির স্ত্রী স্বীয় সংস্কারভ্রষ্ট হইলে তাহার সত্তাও অচিরে বিনষ্ট হইবে যাহাতে সে জাতিও অধোগতি প্রাপ্ত হইবে।

প্রণিহিত হইয়া বিচার করিলে ইহা অতীব যুক্তিযুক্ত ও বিজ্ঞান সিদ্ধ সুদৃঢ় সত্য বলিয়া অবধারিত হয় যে—ক্রিয়া হইলেই প্রতিক্রিয়াও অবশ্যম্ভাবী কিন্তু, যেখানে ক্রিয়া হয় না তথায় প্রতিক্রিয়া হওয়াও সম্ভব নহে; এবং কথিত প্রতিক্রিয়া আবার প্রাকৃতিক সূক্ষ্মতার তারতম্যানুসারে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর ও অধিক হইয়া থাকে। জড় প্রকৃতি ও স্থূল প্রকৃতিতে প্রতিক্রিয়া স্বল্প ও স্থূল হইতে দেখা যায়। পাতিব্রত্য সূক্ষ্ম প্রকৃতির বিষয়। যেখানে সেই সূক্ষ্ম প্রকৃতি সম্যক্‌রূপে বিকশিত হইয়াছে সেখানে প্রকৃতি বিরুদ্ধ ক্রিয়া জনিত প্রতিক্রিয়ার আঘাত গভীর ভাবে

লাগিয়া থাকে। কিন্তু এখনও যেখানে উক্ত প্রকৃতি পরিস্ফুট হয় নাই সেখানে প্রতিক্রিয়া হওয়া কিম্বা আঘাত লাগা সম্ভব নহে। আর্য্য জাতি ব্যতীত অন্য জাতি নিচয়ের মধ্যে এখনও পাতিব্রত্য সম্বন্ধীয় সূক্ষ্ম প্রকৃতির অঙ্কুরোদ্গম পর্য্যন্ত হয় নাই সুতরাং তথায় প্রতিক্রিয়া না হওয়ায় কোন প্রকার ক্ষতিও হয় না। আর্য্য জাতীয় স্ত্রীগণের মধ্যে সেই সূক্ষ্ম প্রকৃতির পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে বলিয়াই প্রতিক্রিয়া জনিত আঘাত তাহাদিগকে লাগিলে তাহার ফল সমগ্র আর্য্য জাতিকে ভোগ করিতে হইবে; যাঁহাতে সে নিজের বিশেষত্ব ও স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া চিরকালের জন্য অধঃপতিত জাতি সমূহের মধ্যে পরিগণিত হইবে। এ বিষয়ে আরও সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিচার করিলে বিষয়টি নিতান্ত দুর্বোধ্য ও জটিল হইয়া পড়ে, তবে আপাততঃ ইহা জানা আবশ্যক যে সতীত্বের পূর্ণ আদর্শ-শূন্য ধর্ম্ম মত জগতে আর্য্যেতর জাতি সমূহের মধ্যে প্রচলিত থাকায় উহারা কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত নিজদিগকে সুরক্ষিত রাখিতে ও জাতীয় জীবনে সাধারণ ভাবে উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হয় বটে, কিন্তু উহাদিগের নারী জাতির মধ্যে আদর্শ সতীধর্ম্ম বিকাশ প্রাপ্ত না হওয়ায় তথাকথিত জাতি নিচয় সংসারে কদাপি আর্য্য বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারে না এবং তাহাদের মধ্যে কোন পূর্ণজ্ঞানী মহাপুরুষের জন্ম হওয়া কিম্বা তাহাদের চিরস্থায়িত্ব সম্ভবপর নহে। এই বিজ্ঞানটি গ্রন্থান্তরে বিস্তৃতরূপে বর্ণন করা যাইবে।

প্রত্যেক জাতির উন্নতি নিজ নিজ পিতামাতার উন্নতি হইতেই হইয়া থাকে। পিতা মাতা যেরূপ সংস্কারাপন্ন তদনুরূপ সেই জাতির জীবনও গঠিত হয় অন্যথা জাতীয় জীবনের কোনই মূল্য নাই; সুতরাং আর্য্য পিতা মাতার সংস্কার ও ভাব লইয়া আর্য্য জাতি গঠিত হইয়াছে বলিয়াই তাহার উন্নতি ও তদনুসারে হওয়া উচিত। আর্য্য পিতার আর্য্যত্ব, আদি পুরুষ মহর্ষিগণের জ্ঞানের প্রভাবে এবং আর্য্য জাতির মাতার আর্য্যত্ব একপতিব্রতা ধর্ম্মের পূর্ণতায়, এই উভয় ভাবকে, জলাঞ্জলি দিয়া আর্য্যজাতি কখনও উন্নতি লাভ করিতে পারে না। আর্য্য অনার্য্য হইলে অথবা ভারতবর্ষ, ইউরোপ হইলে তাহাকে উন্নতি বলা যায় না। আর্য্য মাতা সীতা, সাবিত্রী হইয়াই বীরপ্রসূ হইতে পারেন মেম হইয়া তাহা হইতে পারে না। যদি

উহাদিগকে মেম বানাইবার চেষ্টা করা যায় তবে পাতিব্রত্য সংস্কার বিলুপ্ত হওয়ায় উহাদের সত্তা বিনষ্ট হইয়া যাইবে। ফলে উহাদের গর্ভজাত সন্তান অকর্ম্মণ্য, ভীরু, দুশ্চরিত্র, দুর্ব্বল ও নীচাশয় হইবে, ইহা অবধারিত সিদ্ধান্ত। অতএব আর্য্যজাতির মৌলিক ভাবকে ভুলিয়া নব্য মহোদয়গণের উক্ত ভ্রম জালে জড়িত হওয়া অথবা অজ্ঞতার বশবর্ত্তী হইয়া সংসারে অনর্থ প্রচার করা বিধেয় নহে। হায়! আমাদের কি ভীষণ শোচনীয় অবস্থা, যাহা ব্যক্ত করিতে লজ্জায় জিহ্বা জড়ীভূত হয় এবং স্মরণ হইলে হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইয়া যায়। এক সময়ে, যে দেশের কুললনাগণ বিধবার শরীর ধারণ অকারণ বোধে হাসিতে হাসিতে মৃতপতির সহিত জলন্ত চিতায় প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেন, আজ সেই দেশের স্ত্রীলোকদিগকে পতির মৃত্যুর পর ব্রহ্মচারিণী হওয়াত দূরের কথা, নিকৃষ্ট কামবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য অন্য পুরুষের আশ্রয় গ্রহণের বিধান দেওয়া হয় এবং তজ্জন্য আবার বেদ ও স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণ সংগ্রহের প্রচেষ্টা হইয়া থাকে ইহার চেয়ে আর আর্য্য জাতির ঘোর অধঃপতনের প্রমাণ কি হইতে পারে? তাহাদের বুদ্ধি ও বিচারে ধিক্, যাহারা ঈদৃশ অধঃপতিত হইয়াও আর্য্যত্বের ভেরী বাজাইতে কুণ্ঠিত হয় না।

চিকিৎসাশাস্ত্রের ইহা অতি তথ্য-পূর্ণ সিদ্ধান্ত যে, স্ত্রীলোক গর্ভাবস্থায় কামাতুরা হইলে তাহার স্তন্যদুগ্ধ বিকৃত হইয়া যায় এবং তাহা পান করিলে পুত্র সুশীল ও সদ্‌গুণ সম্পন্ন হয় না। গর্ভবতী মাতার চিত্তে যে ভাব বিদ্যমান থাকে, তাহার প্রভাব কি পরিমাণে সন্তানের উপর পড়িতে পারে, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে এবং তদনুকূল প্রমাণ পুরাণাদি শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত করা গিয়াছে। বিধবা বিবাহের প্রচার হইলে পাতিব্রত্য ধর্ম্মের বিনাশ হেতু স্ত্রীলোকদিগের অন্তঃকরণে কামাগ্নি ভীষণ রূপে প্রজ্জলিত হইবে, ফলে তাহারা গর্ভাবস্থায়ও পুরুষ সহবাস ত্যাগ করিতে সমর্থ হইবে না এবং সেই কালে রজোধর্ম্ম নিরুদ্ধ হওয়ায় প্রাকৃতিক প্রেরণা স্বল্প হইলেও অভ্যাস ও সংস্কারের বৈলক্ষণ্য প্রযুক্ত মনের মধ্যে কামসংকল্প অবশ্যই জাগরূক থাকিবে তাহার পরিণামে অযোগ্য ও অনার্য্য সন্তান উৎপন্ন হইয়া ভারতের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিয়া দিবে। ভারতের প্রকৃতি পূর্ণ, তাই প্রকৃতির অংশরূপিণী নারীগণের পাতিব্রত্যের পূর্ণতা পরিলক্ষিত হয় এবং সেই জন্য পরমাত্মার পূর্ণাবতার

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ও রামচন্দ্র আদি এখানে আবির্ভূত হইয়া বিবিধ লীলা ও ধর্ম্মের উদ্ধার সাধন করিয়াছেন। কিন্তু বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইলে ভারতবর্ষে রাম ও কৃষ্ণ লীলার বিনিময়ে ভূত, প্রেত, পিশাচ লীলার অভিনয় আরম্ভ হইবে এবং নন্দন বিনিন্দিত ভারত গহন কানন অথবা শ্মশান তুল্য হইয়া যাইবে ইহাতে কিছু মাত্র সংশয় নাই। কেবল ইহাই নহে বর্ণ সঙ্কর সন্তান বহুল পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া সমগ্র ভারতবর্ষে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে; কারণ, বিধবা বিবাহ প্রচলনের ফলে নারীগণের ধৈর্য্যগুণ অন্তর্হিত হওয়ায় পুরুষ অপেক্ষা আঠগুণ কামাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে যাহাতে এক পুরুষ কর্ত্তৃক তাহার কামানল নির্ব্বাপিত হওয়া অসম্ভব হইবে। এইরূপে অতৃপ্তা রমণী পরপুরুষ সংসর্গ অবশ্য করিবে যাহা হইতে ভারত কেবল মাত্র বর্ণ সঙ্কর জাতির জন্মভূমি রূপে পরিগণিত হইবে। মনু বলিয়াছেন যে—

অন্নাদে ভ্রূণহা মার্ষ্টি পত্যৌ ভার্য্যাপচারিণী।
গুরৌ শিষ্যশ্চ যাজ্যশ্চ স্তেনো রাজনি কিল্বিসং।

যে ব্যক্তি ভ্রূণহত্যাকারীর অন্ন ভোজন করে তাহাকে উক্ত পাপ স্পর্শ করে। ব্যভিচারিণী স্ত্রীর পাপ পতিকে স্পর্শ করে এবং শিষ্য ও যজমানের পাপ গুরুকে ও চোরের পাপ রাজাকে লাগিয়া থাকে। অতএব বিধবা বিবাহ প্রচলিত হইলে পাপের আতিশয্য নিবন্ধন সংসার ছারখার হইয়া যাইবে। দ্বিতীয়তঃ এইরূপ বর্ণসঙ্কর সন্তান উৎপন্ন হওয়ায় পিতৃগণের পিণ্ড লোপ হইবে এবং তাহারা অধঃপতিত হইবে, একথা গীতায় লিখিত আছে। তর্পণ আদি লুপ্ত হইলে পিতৃগণের দৈনন্দিন সম্বর্দ্ধনা রহিত হইয়া যাইবে সুতরাং যথোক্ত অসম্বর্দ্ধনার ফলে পিতৃগণ-নিয়ন্ত্রিত জাগতিক স্থূল উন্নত বাধা প্রাপ্ত হইবে। দুর্ভিক্ষ, মহামারী আদি অশেষ অনর্থ সংঘটিত হইয়া মনুষ্যকে আধিভৌতিক শক্তিলাভে বঞ্চিত করিবে। রত্ন প্রসূ ভারত মাতা আজ যে দারিদ্র্য প্রপীড়িত রুগ্ন ও দীন সন্তানগণের আর্ত্তনাদে সন্ত্রস্ত, তাহার এক মাত্র মুখ্য কারণ নব্য সভ্য মহোদয়গণের প্ররোচনায় রমণীদিগের সেই স্বভাব সুলভ পাতিব্রত্যের অভাব। আজ আমরা চিতোরের সেই জলন্ত দৃষ্টান্ত বিস্মৃত হইয়াছি। একদিন ভারতীয় সতীগণ দেশ ও ধর্ম্ম রক্ষার জন্য,

স্বহস্তে বীর সজ্জায় সজ্জিত করিয়া সদর্পে রণাগ্নিতে শরীর আহুতি দিতে কিরূপে নিজ নিজ পতিকে প্রেরণ করিতেন এবং পতির শরীরাবসানে স্বীয় অমূল্য সতীত্ব রত্ন অপহৃত হইবার আশঙ্কায় প্রজ্বলিত অগ্নিতে নশ্বর দেহ বিসর্জ্জন দিয়া পতিলোকে গমন করতঃ কিরূপ অবিনশ্বর অনুপম আনন্দ অনুভব করিতেন; তাহা পাশ্চাত্য বিদ্যাবিষ-জর্জ্জরিত-হৃদয় পরলোকে অবিশ্বাসী ব্যক্তিগণের মস্তিষ্কে কাল্পনিক বলিয়া প্রতিভাত হইবে। বিচার করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে ভারতবর্ষে প্রকৃত গার্হস্থ্য সুখ ও উন্নতি তখনই ছিল যে দিন ভারতীয় সাধ্বীগণের গৌরব-পতাকা ভারতের চারিদিকে উড্ডীয়মান হইত। ভারত স্বীয় প্রাচীন মৌলিক গৌরবকে আশ্রয় করিয়াই পুনরায় পূর্ব্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে সমর্থ হইবে নতুবা যদি সে অন্য আদর্শ গ্রহণ করিয়া অন্য আকারে অভ্যুত্থিত হয় তবে সে তাহার প্রতিষ্ঠা নহে—প্রাণান্ত।

কোন কোন অদূরদর্শী ব্যক্তি দয়ার পক্ষপাতী হইয়া এবং কেহ আবার হিন্দু সমাজের সংখ্যা বৃদ্ধির পক্ষ লইয়া বিধবা বিবাহ সমর্থন করিতেছেন। দয়াবাদীগণের সিদ্ধান্ত এই যে বিধবারা পতি-প্রেমে বঞ্চিত হইয়া বড়ই কষ্ট ভোগ করে এই জন্য আমাদের কর্ত্তব্য তাহাদের দুঃখ মোচন করা, এবং তাহা বিধবা বিবাহ প্রচলিত হইলেই সিদ্ধ হইবে। এইরূপ ভ্রমপূর্ণ সিদ্ধান্ত বুদ্ধিমানের নিকট নিতান্তই হেয়। কারণ প্রারব্ধ ও ভবিষ্যৎ কর্ম্মের উপর সংযম না করিয়াই উক্ত সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হইয়াছে। প্রকৃতির রাজ্যে ধর্ম্মের নিয়ামিকা শক্তি দ্বারা সকল কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে অনিয়ন্ত্রিত কোন কার্য্য হয় না; অধিক কি, নিয়ম্ ব্যতীত গাছের পাতাটি পর্য্যন্ত নড়ে না। এইরূপে সংসারে কার্য্য কারণের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রতিনিয়তই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সুতরাং স্ত্রী-পুরুষের সাংসারিক ভোগ যে সম্পূর্ণ কার্য্য কারণ সম্বন্ধ বিরহিত ইহা কিরূপে প্রতীত হইতে পারে? যোগদর্শনে আছে যে—

সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ।

দৃষ্ট ও অদৃষ্ট কর্ম্ম মূলে বর্ত্তমান থাকিলে তাহার ফল স্বরূপ, জীবের জাতি, আয়ু ও ভোগ হইয়া থাকে। মূলে কর্ম্ম না থাকিলে কিছুই হইতে পারে না। অতএব রমণীগণের বৈধব্য ও সাধব্যের মূলে প্রাক্তন কর্ম্ম

বিদ্যমান থাকায় পুনর্ব্বার বিবাহের প্রচলন দ্বারা বিধবা নারীদের বৈধব্য-দায়ক কর্ম্মের উপর বলপূর্ব্বক হস্তক্ষেপ করা কোন ক্রমেই যুক্তি সঙ্গত নহে বরং, এরূপ করা সমুচিত যে যাহাতে তাহাদিগকে আবার না বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। প্রকৃত সুখ ও দুঃখ কাহাকে বলা যায় এবং বিষয়-নিরতা সধবা স্ত্রী অপেক্ষা বিষয় সম্পর্ক হীন বিধবার জীবন বাস্তবিক দুঃখময় কি না এই সকল বিচার ক্রমে করা যাইতেছে। কিন্তু সম্প্রতি বিচার্য্য এই যে, যদি দয়ার বশবর্ত্তী হইয়া, পতির অভাবে বিধবা অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করে অতএব তাহার বিবাহ দেওয়া উচিত, এই বিধির প্রচলন করা হয় তাহা হইলেও দুঃখ নিবৃত্তির সম্ভাবনা কোথায়? করুণা সদ্বৃত্তি হইলেও বিচার শূন্য করুণা প্রায় অনর্থ উৎপাদন করে, এইজন্য যাবতীয় বৃত্তিকে বিচার পূর্ব্বক প্রয়োগ করার নামই ধর্ম্ম। গীতায় সুখ দুঃখের লক্ষণ অভিহিত হইয়াছে যে—

> যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমং।
> তৎসুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজং।
> বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমং।
> পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসং স্মৃতং।

যাহা প্রথমে সুখদ প্রতীত হইয়া পরে মহান্ দুঃখ প্রদান করে তাহাই দুঃখকর এবং যে বস্তু আপাততঃ দুঃখকর প্রতীত হইলেও পরিণামে সুধাময় সুখ উৎপাদন করে উহাই যথার্থ সুখপদ বাচ্য। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞানুসারে ইহাই সুখ দুঃখের লক্ষণ। বিধবার বিবাহ করাইলে যদি প্রকৃত পক্ষে বিধবা পারত্রিক সুখলাভ করে তবে দয়া-পক্ষপাতী ব্যক্তিগণের মত মানা যাইতে পারে। কিন্তু বিচারের চক্ষে দেখা যাইতেছে যে উক্ত বিবাহ ইহলোকে কথঞ্চিৎ সুখপ্রদ হইলেও উহার পরিণামে পরলোকে ও পর জন্মে দুঃসহ দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং গীতা প্রতিপাদিত সিদ্ধান্তানুসারে বিধবা বিবাহকে দুঃখস্বরূপই বলিতে হইবে, সুখ কখনও বলা যাইতে পারে না। ভগবান মনু অন্য-পুরুষ-সঙ্গতা বিধবার ভীষণ পরলোক-দুঃখ বর্ণন করিয়াছেন যথা—

> ব্যভিচারত্তু ভর্ত্তুঃ স্ত্রী লোকে প্রাপ্নোতি নিন্দ্যতাং।
> শৃগালযোনিং প্রাপ্নোতি পাপরোগৈশ্চ পীড্যতে॥
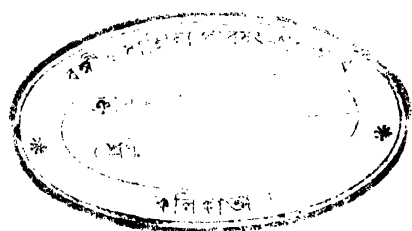
ধর্ম্মপ্রচারক

ভারতী।
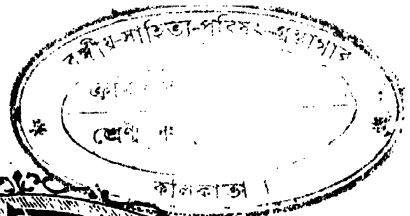
নব পর্য্যায়।

অকুণ্ঠং সর্ব্বকার্য্যেষু ধর্ম্ম-কার্য্যার্থমুদ্যতম্।
বৈকুণ্ঠস্য হি যদ্রূপং তস্মৈ কার্য্যাত্মনে নমঃ॥

২য় ভাগ { পৌষ, ১৩২৭। ইং ডিসেম্বর, ১৯২০ } ৯ম সংখ্যা।

স্বর্গীয় ৺ভুবনমোহন রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক বিরচিত

সিদ্ধান্ত সার।

[ব্রহ্ম-খণ্ড]

প্রথম অধ্যায়।

(মঙ্গলাচরণ)

ব্রহ্মস্তোত্র।

নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্ম

যিনি অখিল ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী ও নিখিল বিশ্বের আধার হইয়াও সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতম এবং বাক্য ও মনের অগোচর;—যিনি নিরাকার হইয়াও বহুরূপ ও বিশ্বমূর্ত্তি; যিনি অপ্রত্যক্ষ হইয়াও উপলব্ধি-স্বরূপে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষবৎ বিদ্যমান রহিয়াছেন;—যিনি সত্ত্ব রজ তম এই তিন গুণের অতীত হইয়াও সৃষ্টিকালে স্বীয় ইচ্ছাশক্তির সহিত সমন্বিত বা সগুণ হন;—যিনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই কালত্রয় ব্যাপী নিত্য হইয়াও কালাতীত অথচ কালরূপী;—যিনি স্ত্রী পুরুষ ক্লীব এই তিন লিঙ্গের বিশেষ্য না হইয়াও সৃষ্টিকালে সর্ব্বলিঙ্গীরূপে প্রকটিত হইয়া থাকেন;—যিনি স্বয়ং অগমনশীল হইয়াও সর্ব্বজীবের গতি ও বায়ুমূর্ত্তিতে সদাগতি আখ্যায় আখ্যাত হইয়া থাকেন;—যিনি স্বয়ং নির্লেপ ও নিষ্ক্রিয় হইয়াও সর্ব্বদা সকল পদার্থে লিপ্ত এবং স্বীয় শক্তি দ্বারা সৃষ্টি স্থিতি সংহারাদি সকল ক্রিয়াই করিয়া থাকেন;—যিনি লোকাতীত অথচ লোকসাক্ষী অর্থাৎ আদিত্য, চন্দ্র, অনিল,

অনল, আকাশ, ভূমি, জল, হৃদয়, যম, দিবা, রাত্রি, প্রভাত, প্রদোষ ও ধর্ম্মরূপে লোকের পুণ্য পাপঘটিত সদসৎ ক্রিয়াকলাপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন ;—যিনি স্বয়ং নিরিন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়াতীত হইয়াও ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাক্, পাণি পাদ, পায়ু, উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং সেই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধিপতি বুদ্ধির নিয়ন্তা বা পরিচালক স্বরূপে রূপাদি বিষয়ের গ্রহণ ও উচ্চারণাদি কর্ম্ম করিতেছেন, যিনি নিরুপাধি অথচ নামরূপাত্মা ও বিশেষণ বিহীন হইয়াও ব্যবহারার্থে বেদাদি বিবিধ শাস্ত্রে বিবিধ ক্রিয়া উপলক্ষে নানা নামে অভিহিত ও নানারূপে বিশেষিত হইয়া সোপাধিস্বরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন ;—অর্থাৎ সর্ব্বত্র ব্যাপনশীল বলিয়া যিনি "ব্রহ্ম", সচরাচর সকল বস্তু তাঁহাতে ও তিনি সচরাচর সকল বস্তুতে বাস করেন এই অর্থে যিনি "বাসুদেব" এবং ভক্তেরা যাঁহাকে বসুদেবের পুত্র এই অর্থেও "বাসুদেব" বলিয়া থাকেন ; সর্ব্ব পদার্থ তাঁহাতে ও তিনি সর্ব্ব পদার্থে সন্নিবিষ্ট ও পরিব্যাপ্ত থাকায় যিনি "বিষ্ণু", গুণত্রয়ের অতীত ও জিতেন্দ্রিয় বলিয়া অথবা আত্মারূপে সর্ব্বজীবের হৃদয়পুরে প্রবিষ্ট বলিয়া যিনি "পুরুষ", সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব নিবন্ধন যিনি "প্রধান" এবং কর্ম্মকরী শক্তির দ্বারা জগৎ সৃষ্টিকার্য্যে প্রকৃষ্টরূপে "কৃতি", অর্থাৎ যোগ্যতা থাকায় যিনি "প্রকৃতি" এবং মধু, কৈটভ, মুর, কংস ও কেশী প্রমুখ বহু দৈত্যের ও রাবণাদি রাক্ষসের নিধন সাধন করায় যিনি "মধুসূদন" "কৈটভজিৎ" "মুরারি", "কেশিমথন" "দৈত্যারি" "রাবণারি" প্রভৃতি বহুবিধ কর্ম্মাশ্রিত, লীলাশ্রিত ও প্রভাবাশ্রিত নামসমূহে অভিহিত ও আহূত হইয়া থাকেন ;—আরও যিনি সমস্ত শক্তির আধার বলিয়া "সর্ব্বশক্তিমান্" ; সকল ঐশ্বর্য্যের আকর বলিয়া "ভগবান্" ও উৎপত্তিনাশের নিদান বা নিয়ামক বলিয়া "ঈশ্বর" আখ্যায় আখ্যাত হন সেই নির্ব্বিকার নিরঞ্জন সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরমাত্মা পরব্রহ্মের উদ্দেশে ঐকান্তিকী শ্রদ্ধাভক্তি ও বিশ্বাস সহকারে ভূরি ভূরি প্রণাম করিতেছি এবং তাঁহারই প্রসাদে তন্ময়ভাবে তাদৃশ প্রণাম প্রসঙ্গে অনির্ব্বচনীয় আত্ম-প্রসাদ ও সহৃদয় পাঠকবর্গের কথঞ্চিৎ চিত্তপ্রসাদ সংসাধনের প্রয়াসী হইতেছি।

প্রকৃতি-পুরুষ বা সগুণ ব্রহ্ম

যে অমোঘ শক্তিশালী পরম পুরুষের অতুলনীয়া ইচ্ছাশক্তি বা মায়া

তাঁহা হইতে অভিন্না থাকিয়া ব্রহ্মস্বরূপা ত্রিগুণাত্মিকা মহাশক্তি মহামায়া বা পরমা প্রকৃতিরূপে যাবতীয় মূর্ত্তি, যাবতীয় প্রাণী এবং যাবতীয় প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ পদার্থের প্রসূতিত্ব নিবন্ধন আদ্যা, অনাদ্যা, অম্বিকা ও জগদম্বা নামে অভিহিতা হইয়াছেন এবং যাঁহার সেই ত্রিগুণাত্মিকা মহাশক্তি মহামায়া বা মহাবিদ্যাই স্বরূপভূত সত্ব রজস্তমো নামক গুণত্রয় হইতে যথাক্রমে বিষ্ণু ব্রহ্মা মহেশ্বর এই দেবত্রয়কে উৎপন্ন করিয়া এবং স্বয়ং বৈষ্ণবী ব্রহ্মাণী ও মহেশ্বরীরূপে আপনাকে ত্রিধা সংবিভক্ত করিয়া সকল পদার্থের মূলীভূতা পরমা প্রকৃতিরূপে অভিহিতা হইয়াছেন এবং শুম্ভ, নিশুম্ভ, রক্তবীজ, চণ্ড, মুণ্ড, দুর্গাসুর, মহিষাসুর প্রমুখ দানব দলকে দলন করায় শুম্ভঘাতিনী, নিশুম্ভদলনী, চণ্ডমুণ্ডবিঘাতিনী, রক্তবীজবিনাশিনী, মহিষমর্দ্দিনী, দুর্গা, দানবদলনী, দৈত্যনিকৃন্তিনী, চণ্ডী, চামুণ্ডা ও উগ্রচণ্ডা আখ্যায় সর্ব্বশাস্ত্রে আখ্যাতা হইয়াছেন সেই ব্রহ্মশক্তি স্বরূপিণী মহামায়া বা জগৎপ্রসূতি পরমা প্রকৃতিও যে এক অখণ্ড অদ্বিতীয় ব্রহ্মেরই রূপান্তর ও নামান্তর মাত্র সেই সত্য সনাতন সারাৎসার সর্ব্বাতীত ও সর্ব্বময় সর্ব্বজ্যোতির উদ্দেশে সর্ব্বান্তঃকরণে ও সর্ব্বতোভাবে ভূয়োভূয়ঃ প্রণিপাত করিতেছি।

ব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তি বা মহামায়া

যিনি স্বয়ং নিশ্চল হইলেও ইন্দ্রিয়গণকে পরিচালন করিবার নিমিত্ত মনো নাম পরিগ্রহপূর্ব্বক অত্যন্ত চঞ্চল হন, যিনি সুখ দুঃখাদি ভোগের নিমিত্ত জীবাত্মা উপাধিধারণ পূর্ব্বক বিবিধ কর্ম্মজ নানাজাতীয় ভৌতিক দেহে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া স্বর্গ নরক ও সুখ দুঃখাদি ভোগে হৃষ্টক্লিষ্টাদি নানাভাবে ও স্ত্রী পুরুষ ক্লীবরূপ লিঙ্গত্রয়ে এবং বাল্য কৈশোর যৌবন প্রৌঢ় স্থাবিরাদি নানা অবস্থায় অবস্থিত থাকিয়া হর্ষ বিষাদাদি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া হাস্য রোদনাদি লীলাবিলাস ও পুনঃপুনঃ জন্ম মরণাদি ভোগ করিয়া থাকেন অথচ জন্ম মরণাদি হীন বলিয়া যিনি "অক্ষর" ও "অচ্যুত"; আদি অন্তবিহীন বলিয়া যিনি "অনাদি" ও "অনন্ত" সর্ব্বাদৌ প্রকাশমান হেতু যিনি "আদিম" এবং জীবসমূহের হর্ষোৎপাদকতা প্রযুক্ত হৃষীকনামে অভিহিত; ইন্দ্রিয়বর্গের পরিচালক প্রভু বা অধীশ্বর বলিয়া যিনি "হৃষীকেশ" ইত্যাকার কার্য্যানুযায়ী বহুরূপে ও বহুনামে ব্যবহৃত সেই

সগুণ বা সমায় ব্রহ্মের ক্রিয়া

অরূপ অদ্বিতীয় নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত ও উপলব্ধি স্বরূপে স্বপ্রকাশ প্রকৃতি পুরুষরূপী সারাৎসার পরাৎপর পরব্রহ্মের উদ্দেশে কোটি কোটি নমস্কার করিতেছি।

যিনি সর্ব্বব্যাপী সম্পূর্ণ অখণ্ড নিষ্কল ও নিষ্ক্রিয় হইয়াও জগৎ সৃষ্টির উপক্রমে ভাগ কল্পনার সাহায্যে নিষ্ক্রিয় ভাগে পুরুষ ও সক্রিয় ভাগে তদীয় ইচ্ছাশক্তি মায়া বা প্রকৃতি নামে অভিহিত হইয়াছেন—অর্থাৎ যিনি স্বয়ং নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় থাকিয়াও যখন "অহং বহু স্যাম্" "আমি বহু হই" এই ইচ্ছা বা মায়া শক্তিকে উদ্বুদ্ধ ও বিস্তৃত করেন তখনই সেই নিরাকারা ব্রহ্মময়ী ইচ্ছাশক্তি মায়া বা আদ্যাপ্রকৃতির প্রকৃতিসিদ্ধ গুণত্রয়ের প্রভাবে "হরিবিরিঞ্চি হর" নামধারী শরীরবান্ এক পুরুষ সগুণ ব্রহ্মরূপে প্রথম প্রকাশিত হন এবং পরে যিনি ঐ ত্রিগুণাত্মক শরীরে বিজড়িতা ব্রহ্মশক্তি মায়া বা প্রকৃতির প্রভাবে ঐ এক শরীরকে ত্রিধা বিভক্ত করিয়া তাহারই একভাগ রজো-গুণাবতার ব্রহ্মারূপে সৃষ্টিকার্য্য, অন্য ভাগ সত্ত্বগুণাবতার হরিরূপে পালন কার্য্য ও অপরভাগ তমোগুণাবতার হররূপে সংহার কার্য্য সংসাধন করিয়া থাকেন এবং যাঁহার শরীর-সম্বদ্ধা সেই মায়াশক্তিও স্বয়ং ত্রিধা বিভক্ত হইয়া উক্ত প্রকারে উদ্ভূত বা সংবিভক্ত দেবত্রয়ের অর্দ্ধাঙ্গহারিণী সহধর্ম্মিণীভাবে ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী ও ভবানীরূপে বিরাজ করেন বলিয়া নানাশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে সেই নির্গুণ ও সগুণ, নিরাকার ও সাকার, নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয় অমায় ও সমায় অপ্রকৃতিক ও সপ্রকৃতিক পরম কারুণিক পরমেশ্বরের উদ্দেশে ভূয়োভূয়ঃ প্রভূত প্রণাম করিতেছি।

সৃষ্টি-প্রকার, ব্রহ্মাদি ত্রিদেব ও ত্রিদেবীর উৎপত্তি।

প্রসঙ্গক্রমে ইহাও অবশ্য বক্তব্য যে ঃ—শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণে উক্ত হইয়াছে, সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতের্গুণাস্তৈর্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধাত। স্থিত্যা-দয়ে হরিবিরিঞ্চি হরেতি সংজ্ঞাং শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ॥ অর্থাৎ সত্ত্ব রজস্তমঃ ইহা প্রকৃতিরই গুণ, সেই গুণত্রয়যুক্ত একমাত্র পরম পুরুষ স্থিত্যাদি ব্যাপারে*হরিবিরিঞ্চি হর এই সংজ্ঞা ধারণ করেন তন্মধ্যে সত্ত্ব মূর্ত্তি হইতেই মানবগণের শ্রেয়োলাভ হইয়া থাকে। শ্রীবিষ্ণু পুরাণের প্রথমাংশে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ের বর্ণনা হইতেও স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে একই ব্রহ্ম

সগুণ হইয়া ব্রহ্মরূপে সৃষ্টি, বিষ্ণুরূপে পালন ও হররূপে সংহার করিয়া থাকেন। এই উভয় শাস্ত্র অবলম্বনে এস্থলে সৃষ্টি-প্রকার বর্ণিত হইতেছে কিন্তু নানা মুনি কর্ত্তৃক বিরচিত নানা শাস্ত্র, পুরাণ ও তন্ত্রাদিতে যদিও এবম্বিধ নানাবিষয়ে বিশেষত জগৎ সৃষ্টি প্রকরণে নানাবিধ মত ও পরস্পরের মধ্যে অল্প বিস্তর অনৈক্য, অসামঞ্জস্য ও বিরোধ আপাততঃ পরিলক্ষিত হয় তথাপি বিভিন্ন বক্তা বা বিভিন্ন লেখকের বক্তৃতা ও বর্ণনার সংক্ষেপ ও বিস্তার এবং উদ্দিষ্ট কথার তারতম্য ও কল্পকল্পান্তর-বাদ পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক সকল শাস্ত্রের স্থূল তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলে বিচার বুদ্ধির পর্য্যবসানে পূর্ব্ববর্ণিত মূলবিধানের কোনই বৈষম্য বা বৈলক্ষণ্য পরিলক্ষিত হইবে না। কারণ সেই নিত্য বুদ্ধ শুদ্ধ মুক্ত স্বভাব পরমাত্মা পরব্রহ্ম বা পরপুরুষ যখন স্বীয় ইচ্ছাশক্তি মায়া বা প্রকৃতির সহিত সংবদ্ধভাবে উদ্বুদ্ধ অথবা সগুণ সমায় বা ঈশ্বররূপী হইলেন এবং "অহং বহু স্যাম্" "আমি বহু হই" এই বেদ বাক্যের সাফল্য সাধন করিলেন তখন সেই স্বভাবসিদ্ধ ত্রিগুণাত্মিকা ব্রহ্মশক্তির সহিত সম্পৃক্ত একই পুরুষ সৃষ্টি স্থিতি লয় এই তিনটি স্থূল কার্য্য সাধনের নিমিত্ত তিনটি বিভিন্ন স্থূল মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবেন ইহাতে আর বিচিত্রতা কি? আর সেই আদি পুরুষে তদীয় শক্তি বিজড়িত থাকায় কোন শাস্ত্রে তাঁহাকে বিরাট্ পুরুষ ও পরমাপ্রকৃতি কোন শাস্ত্রে পুরুষ, প্রকৃতি ও ঈশ্বর, কোন শাস্ত্রে অর্দ্ধ নারীশ্বর, কোন শাস্ত্রে এক ত্বকের মধ্যস্থিত চনকাকার বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। আবার কোন শাস্ত্রে প্রকৃতির প্রাধান্য, কোন শাস্ত্রে পুরুষের প্রাধান্য এবং কোন শাস্ত্রে উভয়কেই তুল্য বলা হইয়াছে। কোন পুরাণ ও কোন তন্ত্রের মতে মহামায়া ভগবতী আদ্যাশক্তি ব্রহ্মা বিষ্ণু হর এই ত্রিদেবকে প্রসব করিয়া স্বয়ং শবরূপা ও কারণ সলিলে ভাসমানা হইয়া পরে হরের গৃহিণী হইয়াছিলেন আবার কোন পুরাণের মতে গোলোকবিহারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শরীর হইতে উক্ত দেবত্রয় ও মহাশক্তির উৎপত্তি হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে এই সকল ঋষিবাক্যের কোনই অসামঞ্জস্য বা অনৈক্য নাই, অথবা ইহার মধ্যে কোন উক্তি বা কোন বর্ণনা কপোলকল্পিত বা মিথ্যা নহে। সমস্তেরই মূলে ঐক্য আছে কেবল কল্পকল্পান্তরে সেই লীলাময়ের লীলাবৈচিত্র্যে সৃষ্টি প্রকরণ সংক্রান্ত ঘটনাবলীর যথাকথিত কথঞ্চিৎ পার্থক্য ও তারতম্য ঘটিয়াছে মাত্র।

শ্রুতি স্মৃত্যাদি শাস্ত্রে ও পুরাণেতিহাস তন্ত্রমন্ত্রাদিতে বর্ণিত মত সমূহের সমষ্টি করিয়া অনায়াসে বা স্বল্পায়াসেই অনুকূল যুক্তি তর্কের সাহায্যে এই একমাত্র সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে সেই পরাৎপর পরব্রহ্ম যখন কোন লিঙ্গেরই বিশেষ্য নহেন তখন তাঁহাকে স্ত্রী পুরুষ ক্লীব কিছুই বলা যায় না। তাঁহার ইচ্ছাশক্তি মহামায়া বা আদ্যা প্রকৃতিই যখন জগৎ সৃষ্টির আদি কারণ এবং সেই শক্তির ত্রিগুণাত্মিকা এক মূর্ত্তিই যখন উক্ত তিনগুণের উপযুক্ত তিনটি কার্য্য করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এই তিনটি বিভিন্ন দেব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন এবং সেই আদ্যাশক্তি পরমাপ্রকৃতিও যখন পূর্ব্বোক্তরূপে উদ্ভূত পুরুষ শরীরত্রয়ের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধক্রমে ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী ও শিবানীরূপে ত্রিধা বিভক্ত হইয়া ত্রিমূর্ত্তিশালিনী হইলেন, আর সাধারণ ও অসাধারণ সমস্ত মূর্ত্তিই যখন মায়ার দ্বারা সৃষ্ট হয়, মায়া বা ত্রিগুণা প্রকৃতি ব্যতীত কোন মূর্ত্তিরই উৎপত্তি হইতে পারে না ইহা যখন সর্ব্ববাদি-সম্মত ও বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্র-সঙ্গত মত তখন সেই আদ্যাশক্তি মহামায়া মহাশক্তি বা আদ্যাপ্রকৃতিকেই সৃষ্টিস্থিতিলয়ের মূল কারণ বলিয়া ব্যাখ্যা করা কখনই অসঙ্গত বা অসম্বদ্ধ হইতে পারে না। পক্ষান্তরে আবার সেই আদ্যাশক্তি মহামায়া বা পরমাপ্রকৃতির স্বরূপ যখন সেই পরাৎপর পরব্রহ্মেরই স্বোদ্বুদ্ধ ইচ্ছামাত্র ব্যতীত আর কিছুই নহে এবং সেই ইচ্ছা বা শক্তি যখন সেই অদ্বিতীয় চৈতন্যময়ের ন্যায় কোন এক চেতনের অবলম্বন ব্যতীত স্বতন্ত্রভাবে থাকিতে অথবা উদ্ভূত ও উদ্বুদ্ধ হইতে পারে না তখন তাদৃশ ইচ্ছাশক্তি বা মায়ার একমাত্র অবলম্বন স্বরূপ সেই সচ্চিদানন্দ চৈতন্যময় পরম পুরুষকে সৃষ্টিস্থিতিলয় কার্য্যের মূল নিদান বলিয়া ব্যাখ্যা করাকেও কোনক্রমেই অসমীচীন মনে করা যাইতে পারে না। অতঃপর সহৃদয় পাঠক নিবিষ্টচিত্তে

শাস্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা ও ভেদ বুদ্ধির পরিহার।

বিচার বিবেচনা করিয়া দেখুন উল্লিখিত মতে যাঁহারা পুরুষের প্রাধান্যবাদী তাঁহারা পরব্রহ্মের ব্যক্ত মূর্ত্তিকেই আদি পুরুষ ও জগদাদি বলেন আর যাঁহারা প্রকৃতির প্রাধান্যবাদী তাঁহারাও সেই ব্রহ্মময়ী মায়াকেই আদ্যাশক্তি আদ্যাপ্রকৃতি বা জগজ্জননী বলেন আবার কেহ বা পুরুষ ও প্রকৃতি, ঈশ্বর ও ঐশ্বরিক শক্তি, ব্রহ্ম ও তদীয় ইচ্ছা বা মায়াকে তুল্যজ্ঞানে চনকাকারে ব্যাখ্যা

করেন। কিন্তু এই তিন শ্রেণীর শাস্ত্রকর্ত্তা ত্রিকালজ্ঞ তত্ত্বদর্শী ঋষিদিগের মধ্যে কোন শ্রেণীর কাহাকেও ভ্রান্ত বিমূঢ় কপোলকল্পিতভাষী অসমঞ্জস-বাদী বা অলীকবাদ প্রচারক বলিয়া অবজ্ঞা করা চলে না। অথবা শাস্ত্র সমূহের মধ্যে পরস্পর বিরোধ ও অসামঞ্জস্য কল্পনা করিয়া কোন শাস্ত্রের প্রতিই অবিশ্বাসী হওয়া যায় না। কিম্বা ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি, পুরুষ ও প্রকৃতি এবং ত্রিদেব ও ত্রিদেবের শক্তি ইঁহাদের মধ্যে কোন ধার্ম্মিক উপাসকের পক্ষেই ভেদবুদ্ধি পোষণ করার কোন কারণ দেখা যায় না। আমি আমার ইচ্ছাকে যেমন কখনই আত্মা হইতে বিচ্যুত করিতে পারি না, অথবা আমি শব্দের অভিধেয় আত্মা যেমন স্বীয় ইচ্ছা বাসনা ও শক্তি হইতে বিভিন্ন নহেন সেইরূপ সেই পরমাত্মাও কখনই তদীয় শক্তি ইচ্ছা মায়া বা প্রকৃতি হইতে পৃথক্ নহেন। তবে প্রভেদের মধ্যে এই যে আমাদের ন্যায় ব্রহ্মাদি কীট পর্য্যন্ত প্রত্যেক সৃষ্ট জীবের আত্মাই সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে বাসনা কামনা শক্তি ইচ্ছা বা মায়া দ্বারা বিজড়িত ক্রিয়াবান্ ও সুখ দুঃখাদি সমন্বিত থাকে, এইজন্য ইহার সহিত ঈশ্বরের সকল ও নিষ্কলভাবের তুলনা হইতে পারে না। সগুণ সাকার ইচ্ছাময় শক্তিশালী মায়াবিজড়িত ঐশ্বরিক ভাবের সহিত জীবভাবের কথঞ্চিৎ তুলনা সম্ভব হইলেও নির্গুণ নিরাকার নির্ব্বিকার সচ্চিদানন্দ স্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মের তুলনা অপর কোথাও নাই। কেবল তদীয়া ইচ্ছাশক্তি বা তদাশ্রিতা মায়া নানামূর্ত্তিতে অথবা স্বীয় ইচ্ছাশক্তি সমন্বিত মায়াময় সগুণব্রহ্ম বিবিধ আকার পরিগ্রহ পূর্ব্বক বিবিধ কার্য্য করিয়া থাকেন। এই নিমিত্তই ব্রহ্মের প্রাধান্য কি, ব্রহ্মমায়ার প্রাধান্য কি, উভয়ের সাম্য অর্থাৎ সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্যের মূল নিদান মায়া কি, ঈশ্বর কি, এই সকল বিষয় লইয়া তর্ক বিতর্ক বাদ বিতণ্ডা এবং বিভিন্ন মুনির বিভিন্ন মত ও বিভিন্ন শাস্ত্রের বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও বিভিন্ন সিদ্ধান্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

এস্থলে ব্রাহ্মী মায়া সহকৃত ব্রহ্মের ক্রিয়াপ্রসঙ্গ সম্পূর্ণ করিতে হইলে উল্লিখিত মতে ত্রিদেব ও ত্রিশক্তির আবির্ভাবের পর অপর সৃষ্টি কার্য্য যে ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে সংক্ষেপে তাহার মর্ম্মমাত্রের আলোচনা নিতান্ত অসঙ্গত বা অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া মনে হয় না। উক্ত ত্রিদেব ও ত্রিদেবীর আবির্ভাবের পর সেই

ব্রহ্মার কৃত নবধা সৃষ্টি।

সগুণ ব্রহ্মের রজোগুণাংশ সমুদ্ভূত ব্রহ্মা ব্রহ্মশক্তি মায়া কর্তৃক প্রসূত ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরে প্রবৃষ্ট হইয়া সেই অণ্ডকে দ্বিখণ্ডিত করিলেন এবং দ্বিধা বিভক্ত ঐ খণ্ডের ঊর্দ্ধভাগে সপ্তস্বর্গের ও অধোভাগে সপ্ত পাতালের উদ্ভব হইল। ব্রহ্মা তদভ্যন্তরে বুদ্ধি পূর্ব্বক প্রথমে মহত্তত্ত্ব সৃষ্টি, দ্বিতীয় বারে পঞ্চভূত সৃষ্টি তৃতীয়বারে বৈকারিক ইন্দ্রিয় সৃষ্টি সম্পাদন করিলেন। পরে চতুর্থ উদ্যমে ব্রহ্মা উদ্ভিজ্জ বৃক্ষলতা গুল্মাদি স্থাবর জীব সৃষ্টি করিয়া দেখিলেন উহারা তমঃস্বভাব সম্পন্ন হেতু জ্ঞান বিরহিত জড় হইল, তখন তিনি পঞ্চম উদ্যমে তীর্য্যক্-স্রোতোজাতীয় পশুপক্ষী প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া দেখিলেন ইহারাও হিতাহিত বিবেক-বিরহিত মূঢ়প্রকৃতি অথচ বিপরীত জ্ঞানে সম্যক্ জ্ঞানাভিমানী ও অহঙ্কার-মত্ত হইল। এই দুই প্রকার সৃষ্ট জীবকেই অসাধক বুঝিয়া ব্রহ্মা ষষ্ঠ উদ্যমে সাধক সত্তম জীব সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে সত্ত্বাধিক্য বিস্তার পূর্ব্বক সত্ত্বগুণ বহুল ঊর্দ্ধস্রোতা দেবগণকে সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু তাঁহারাও অন্তর্বহির্বিমুক্ত অনাবৃত হৃদয় সুখপ্রীতি-বহুল সরল স্বভাব তেজঃ-প্রজ্ঞাসম্পন্ন তৈজস-দেহশালী অসাধক হইলেন দেখিয়া পুনর্ব্বার ব্রহ্মা স্বীয় উদ্দেশ্য সফল করিবার নিমিত্ত সপ্তম উদ্যমে রজস্তমোগুণাধিক্যে অর্ব্বাক্ স্রোতা মানুষ সৃষ্টি করিলেন এবং ইহাদিগকে সুখ দুঃখ সমন্বিত কর্ম্মক্ষম ও সাধক হইতে দেখিয়া সন্তোষ-লাভ করিলেন অতঃপর ব্রহ্মা নানা প্রয়োজনে নানা ঘটনাবশে রুদ্র প্রজাপতি গ্রহ নক্ষত্র ভূত প্রেত পিশাচাদি ভৌতিক সৃষ্টি ও নবম উদ্যমে কৌমার সৃষ্টি করিলেন এই শেষোক্ত সৃষ্টির ফলে অশ্বিনীকুমার দ্বয়ের উৎপত্তি হইল। এই সৃষ্টি বিবরণ শ্রীবিষ্ণু পুরাণের প্রথমাংশে পঞ্চম হইতে অষ্টম অধ্যায় ও শ্রীমদ্ভাবত পুরাণ অবলম্বনে লিখিত অন্যান্য নানাশাস্ত্রে ও নানা পুরাণে ইহার অনুরূপ ও বিরূপ নানাবিধ সৃষ্টি প্রকার পরিলক্ষিত হইবে সেই সকলের সমাধান ও সামঞ্জস্য বিধানের উপায় ইতঃপূর্ব্বেই অভিহিত হইয়াছে বলিয়া তাহার পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

এতদবলম্বনে আমি ইতঃপূর্ব্বে যে একটি পদ্যপ্রবন্ধ রচনা করিয়া অসম্পূর্ণ-ভাবে দুইখানি পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলাম তাহার কিয়দংশ প্রাসঙ্গিক বোধে এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

ব্রহ্মস্তুতি।

কোথা ব্রহ্ম সনাতন, কোথা ব্রহ্ম সনাতন।
তোমার নিগূঢ় তত্ত্ব জানে কোন্ জন॥

তুমি অনাদি অনন্ত, তুমি অনাদি অনন্ত।
নিরাকার সাকার নির্গুণ গুণবন্ত॥
তুমি বিশ্বের আধার, তুমি বিশ্বের আধার।
পুনশ্চ আধার তব সকল সংসার॥
ধর বিশ্বরূপ কায়া, ধর বিশ্বরূপ কায়া।
সৃষ্টি করণেচ্ছাশক্তি হইল তব জায়া॥
তাঁর নাম মহামায়া, তাঁর নাম মহামায়া।
পরমা প্রকৃতি শক্তি তব অর্দ্ধ কায়া॥
এই সংসার বন্ধন, এই সংসার বন্ধন।
তব ইচ্ছাশক্তি হইতে তব নির্বন্ধন॥
আছ আপনি নির্গুণ, আছ আপনি নির্গুণ।
তব ইচ্ছা-শক্তি মায়া ধরেন ত্রিগুণ॥
তিনি প্রসবি ব্রহ্মাণ্ড, তিনি প্রসবি ব্রহ্মাণ্ড।
সত্ত্ব রজ স্তমো গুণে কৈলা সৃষ্টি কাণ্ড॥
হইল ত্রিগুণাবতার, হইল ত্রিগুণাবতার।
হরি বিধি হর যথাক্রমে সংজ্ঞা চার॥
সেই সত্ত্বগুণে হরি, সেই সত্ত্বগুণে হরি।
পালন করেন সৃষ্টি নানারূপ ধরি॥
বিধি রজোগুণ বলে, বিধি রজোগুণ বলে।
নানা জীব সৃজে তব মায়ার কৌশলে॥
হর তমোগুণ ধ'রে, হর তমোগুণ ধ'রে।
লয় কালে সকলের জীবন সংহারে॥
তাহে আদ্যা মহামায়া, তাহে আদ্যা মহামায়া
তিন নামে তিন ভাগ করিলেন কায়া॥
তাঁরা সবে মহামায়া, তাঁরা সবে মহামায়া।
কমলা, সাবিত্রী, সতী, ভিন্ন মাত্র কায়া॥
গুণ অবতার ত্রয়, গুণ অবতার ত্রয়।
যথাক্রমে শক্তিত্রয়ে করিলা আশ্রয়॥

সবে শক্তির প্রভাবে, সবে শক্তির প্রভাবে।
স্ব স্ব অধিকার রক্ষা করেন স্বভাবে ॥
পরে বহু দেবগণ, পরে বহু দেবগণ।
তব ইচ্ছা-শক্তিবলে করেন সৃজন ॥
সূর্য্য গণপতি ইন্দ্র প্রভৃতি দিক্‌পাল।
গন্ধর্ব কিন্নর যক্ষ রক্ষঃ প্রজাপাল ॥
এইরূপে পরমাত্মা ব্রহ্ম সনাতন।
সর্ব্ব জীবে সংবিভক্ত হৈলা নারায়ণ ॥

জগৎ ব্রহ্মময়।

হে সচ্চিদানন্দ! পরাৎপর! পরব্রহ্ম! তুমি অবাঙ্মনস-গোচর এযাবৎ বেদাদি কোন শাস্ত্র বা ব্রহ্মবাদী কোন ঋষিই তোমার স্বরূপ সম্পূর্ণভাবে বর্ণনা করিতে পারেন নাই। আমি অজ্ঞানান্ধ ক্ষুদ্র জীব, তোমার সেই অজ্ঞেয় অচিন্ত্য ও অনির্ব্বচনীয় স্বরূপের কি বর্ণনা করিব? তবে কেবল আমি তোমার সর্ব্বতোমুখ মহিমা দেখিয়া যতটুকু বুঝিয়াছি ও যতটুকু চিন্তা করিয়াছি তাহাতে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, দুগ্ধ মধ্যে অতি প্রচ্ছন্ন অথচ অবিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত ঘৃতের ন্যায়, ইক্ষুরস বা খর্জ্জুররসের মধ্যে নিগূঢ়ভাবে সন্নিবিষ্ট গুড়ের ন্যায়, পুষ্পপরাগাভ্যন্তরনিলীন মনোহর সৌরভের ন্যায়, কটু তিক্ত কষায় মধুরাম্ললবণ রসোদ্ভূত আস্বাদনের ন্যায়, যে তুমি ব্রহ্মাদি দেবগণ হইতে কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত স্থাবর জঙ্গম সমস্ত জীবের মধ্যে এবং পরমাণু হইতে আলোকাকাশাদি পর্য্যন্ত দৃশ্য অদৃশ্য যাবতীয় পদার্থের মধ্যে নিয়ত নিগূঢ় ও পরিব্যাপ্ত রহিয়াছ সেই তুমিই যে কোন আকারে ও যে কোন প্রকারে প্রতিনিয়ত আমাদের শ্রোতব্য, মন্তব্য, নিদিধ্যাসিতব্য এবং নমস্য ও উপাস্য। যে তুমি নির্ব্বিকার, নির্লেপ, নিষ্ক্রিয় ও নিরঞ্জন হইয়াও স্বীয় মায়াশক্তির প্রভাবে শিব, বিষ্ণু, শক্তি, গণপতি ও সূর্য্য নামক উপাস্য দেবদেবীর মূর্ত্তিতে সাকাররূপে নানা জাতীয় নানা প্রকৃতি বা উপাসকবর্গের চিত্তে শ্রদ্ধা ভক্তি বিশ্বাস ও জ্ঞানমূলক আনন্দ ধারা প্রবাহিত করিতেছ, সেই তুমিই আমাদের ধ্যেয় জ্ঞেয় ও শরণ্য। আবার যে তুমি দেবতারূপে উপাস্য ও মনুষ্যরূপে উপাসক, যে তুমি ক্ষিতি জল অনল অনিল আকাশ এই পঞ্চভূতরূপে স্থাবর জঙ্গম জীবদেহ মাত্রেরই উপাদান ও দেহরূপ

উপাদেয় অথচ ইন্দ্রিয়রূপে বিষয়গ্রহণ ও জীবাত্মারূপে চৈতন্যাধান পূর্ব্বক সেই দেহ গেহে বিরাজ করিয়া থাক, যে তুমি ঐ ভাবে সর্ব্ব পদার্থ ও সর্ব্ব প্রাণীর স্রষ্টা ও পরিপালক হইয়াও পরিশেষে অন্তকরূপে সেই সকলের সংহার সাধন করিয়া থাক, যে তুমি তৃণ শস্য ফল মূল মৎস্য মাংসাদিরূপে ভোগ্য, মৃগ, শলভ, বানর, বরাহ, গৃধ্র, বরাহ, রাক্ষস, মানুষাদিরূপে ভোক্তা এবং জঠরানলরূপে ঈদৃশ ভোক্তাগণের উদরে তাদৃশ ভোজ্য বস্তু সকলের পাচক বলিয়া খ্যাত আছ; যে তুমি স্বয়ং যজ্ঞরূপী অর্থাৎ ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ ও নৃযজ্ঞ এই পঞ্চ যজ্ঞস্বরূপ অথবা দ্রব্যযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, যোগযজ্ঞ, স্বাধ্যায়যজ্ঞ ও জ্ঞানযজ্ঞ এই পঞ্চ যজ্ঞস্বরূপ কিংবা জ্যোতিষ্টোম, বহ্নিষ্টোম, রাজসূয়, বাজ-পেয়াদি অষ্টোত্তর সহস্রবিধ স্বরূপ হইয়াও যজমান মূর্ত্তিতে সেই সকল যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা এবং ঘৃত সমিৎ কুশ কুসুম চরু পায়স ফল পত্রাদি রূপে হব্য ও কব্য, শস্য পশ্বাদি রূপে বলি হইয়াও ঋত্বিকরূপে হোতা ও বলিদাতা অথচ গার্হপত্য আহবনীয় দক্ষিণ এই যজ্ঞাগ্নিত্রয়রূপে হব্য কব্য বলির বাহক এবং অভীষ্ট দেবতা, যজ্ঞেশ্বর, অগ্নিস্বাত্তাদি পিতৃগণ, ভূতগণ, ঋষিগণ ও অতিথিরূপে সেই সকল হব্য কব্যের ভোক্তা বলিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে; যেরূপে রাজ-রূপে প্রজাগণের শাসন পালন ও প্রজারূপে রাজসেবা ও রাজানুগত্য করিয়া থাক, যে তুমি ভর্ত্তারূপে ভার্য্যার ভরণ পোষণ প্রেম স্নেহ বিতরণ ও তাঁহাতে পুত্রোৎপাদন এবং পত্নীরূপে একান্ত অন্তঃকরণে পতিসেবা ও তাঁহার উৎপাদিত পুত্রের প্রসব পোষণ পালনাদি করিয়া থাক অথচ স্বয়ং সেই পতিপত্নীর সংযোগজাত পুত্ররূপে উৎপন্ন ও জন্মগ্রহণ কর, যে তুমি জলধিরূপে কূর্ম্মের, কূর্ম্মরূপে বাসুকির বাসুকিরূপে পৃথিবীর ও পৃথিবীরূপে নদনদী সাগর ভূধরাদি সমস্ত লোকের আধার ও আশ্রয় হইয়া রহিয়াছ, সেই আদ্যন্তবিহীন অনন্ত শক্তিশালী অনন্তরূপ অনন্তগুণাধার অনন্ত বিভূতি বিক্রমাক্রান্ত তুমিই আমার একমাত্র ধ্যেয় জ্ঞেয় নমস্য উপাস্য শরণ্য বরণ্য ও অভীষ্ট। আবার যে তুমি বিশ্বমূর্ত্তি অথচ অমূর্ত্তি, গুণাতীত অথচ নিখিল গুণধাম, অচিন্ত্য অথচ চিন্ত্য, স্তবাতীত অথচ স্তব্য জ্ঞানাতীত অথচ অবশ্য জ্ঞেয়, বাক্মনোঽতীত অথচ প্রতিনিয়ত বন্দ্য ও মন্তব্য, নিষ্ক্রিয় অথচ সর্ব্বকর্ম্মকারী ও অলৌকিক রূপ-শক্তি-স্বভাববিভবশালীরূপে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সর্ব্বতোভাবে বিরাজ করিতেছ সেই

তোমার স্বরূপ নিরূপণ সেই আমার ইষ্ট দেবতা রূপী পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের যশোবর্ণন প্রসঙ্গে স্তুতিবাদ করিয়া কৃতকার্য্য হওয়া মাদৃশ ক্ষুদ্র শক্তি সম্পন্ন মানবের পক্ষে দূরে থাকুক ত্রিকালদর্শী যোগী ঋষিদিগের এমন কি ইন্দ্রাদি দেবগণের পক্ষেও অসাধ্য ও অসম্ভব। অতএব হে ভগবন্! হে পুরাতন পরম পুরুষ! তোমাকে কেবল পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি।

হে বিধাতঃ! হে বিধাতারও বিধাতঃ! তুমি আস্তিকগণের হৃদয়ে "অস্তি" অর্থাৎ বিদ্যমান রূপে এবং নাস্তিকগণের হৃদয়ে "নাস্তি" অর্থাৎ অবিদ্যমানরূপে সমুদিত হও; তুমিই ভক্তি ও অভক্তি, অনুরক্তি ও বিরক্তি, বিশ্বাস ও অবিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও অশ্রদ্ধা, আচার ও অনাচার, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, সত্য ও মিথ্যা, দয়া ও অদয়ারূপে এই সমগ্র জীবলোকের হৃদয়-কন্দর উদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়াছ। হে অনাদি আদি পুরুষ! তুমিই তপস্বীর তপস্যা, বিদ্বানের বিদ্যা ও সর্ব্বসাধারণের চিত্ত-বৃত্তি স্বরূপে প্রতিভাত হইয়া থাক। হে প্রাণময় পরমাত্মন্! তুমিই প্রাণি-গণের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্রোধ, ক্ষমা, শান্তি, অশান্তি, মেধা, জড়তা, লজ্জা, অলজ্জা, নিদ্রা, অনিদ্রা, ভয় অভয়, প্রমুখ ভাব নিচয় স্বরূপে এবং সর্ব্বোপরি জীব বা আত্মা স্বরূপে স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয়বিধ দেহে অধিষ্ঠিত রহিয়াছ সেই নিমিত্ত তুমি অপ্রত্যক্ষ হইলেও সতত আমাদের সকলেরই সমক্ষে প্রত্যক্ষবৎ ভাসমান হইতেছ অতএব হে পরমারাধ্য পরম পিতঃ! এ ক্ষেত্রে তোমাকে প্রত্যক্ষ সম্বোধন সূচক পদবন্ধে আহ্বান করিয়া বিবেক দৃষ্টির সাহায্যে দর্শন পূর্ব্বক মনোরূপ চিরাবনত মস্তকের দ্বারা সেই তোমাকেই নিরন্তর প্রণাম করিয়া যথেষ্ট আনন্দ অনুভব করিতেছি, কিন্তু পরিতৃপ্ত হইতে পারিতেছি না।

জাগতিক কর্ম্ম, ভাব ও চেষ্টাও ব্রহ্মময়।

হে প্রভো! হে ঈশ্বর! হে বেদবেদ্য বেদময়! অপৌরুষেয় বেদ চতুষ্টয় ও পৌরুষেয় শাস্ত্রনিচয় যে তোমার অপরূপ স্বরূপ অসীম মহিমা ও অনন্ত গুণ-রাশির কথঞ্চিন্মাত্র কীর্ত্তন করিতেও সমর্থ হইয়াছেন কিনা সন্দেহ স্থল, আমি তপঃস্বাধ্যায়হীন অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন সংসার কূপ পতিত মণ্ডূক বা অতি ক্ষুদ্র নগণ্য কীটানু-কীট অথবা পরমাণুরও পরমাণু সদৃশ ক্ষুদ্রাৎ ক্ষুদ্রতম মানব হইয়া তোমার সেই অনিরূপ্য স্বরূপ ও অপার গুণমহিমাদির কতটুকু কীর্ত্তন বা কতটুকু বর্ণন

জীব ও ব্রহ্মের অভেদ-বুদ্ধি বা সোহংজ্ঞান।

করিতে পারি? তুমিই তোমার রূপ ও মাহাত্ম্য সম্পূর্ণ অবগত আছ সুতরাং তোমার স্বরূপ না হইতে পারিলে তাহা জানিবার বুঝিবার বা বর্ণনা করিবার সম্ভাবনা নাই। অতএব আমি এইমাত্র বলিয়াই ক্ষান্ত হইব যে, হে ভগবন্! আমি এই পরিচ্ছেদে তোমার রূপ গুণ মহিমা ও কার্য্য-কলাপের বর্ণনা প্রসঙ্গে যাহা কিছু বলিয়াছি যাহা কিছু বলিতেছি যাহা কিছু বলিব ও যাহা কিছু বলিতে অবশিষ্ট রহিল সে সমস্তই তুমি। আমার সেই সকল উক্তিও তুমি সেই উক্তির মূলীভূত যুক্তিও তুমি এবং সেই উক্তি ও যুক্তির উপাদান উপকরণ স্বরূপ আমার বিদ্যা বুদ্ধি ভাব ভাষা পদ পদার্থ বাক্য বাক্যার্থ যোগ্যতা আকাঙ্ক্ষা আসত্তি প্রবৃত্তি স্মৃতি তাৎপর্য্য গুরূপদেশ শাস্ত্রদর্শন প্রভৃতি যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু ছিল বা যাহা কিছু হইবে সে সমস্তই তুমি এবং উল্লিখিত বর্ত্তমান ভূত ভবিষ্যৎ কালত্রয়ও তুমি। ফলতঃ তুমি যখন সর্ব্বময় সর্ব্বেশ্বর ও সর্ব্বকর্ত্তা তখন বলিয়া দেও প্রভু আমি কে? তুমি আমিতে পার্থক্যই বা কি? আমার এই নশ্বর পাঞ্চভৌতিক শরীরও ত তুমি, আমার এই ইন্দ্রিয় গ্রাম ও মন বুদ্ধি অহংকার তত্ত্ব নিচয় সমস্তই ত তুমি, আমার এই শরীরস্থিত রসরক্তমেদমজ্জা শুক্র অস্থি প্রভৃতি ধাতু সমূহ ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্নানাম্নী নাড়ীত্রয় ও অন্যান্য অবান্তর নাড়ী ও শিরা সকল বায়ু পিত্ত কফ এই মলত্রিতয় ও তাহার সাম্যবৈষম্য ক্রমজাত অবস্থা নিচয় এবং প্রাণ অপান সমান উদান ব্যান নামক শরীরস্থ বায়ু পঞ্চক এ সকলই ত তুমি, সর্ব্বোপরি আমার এই দেহ গেহের অভ্যন্তরে গৃহস্বামীরূপে যে দেহী বা আত্মা বাস করিতেছেন এবং যিনি এ যাবৎ অহংকার বিমূঢ়ভাবে তোমার ও আমার মধ্যে কি যেন একটা বিরাট অন্তরালের উপন্যাস করিয়া আসিতেছেন, সেই দেহী সেই আত্মা অথবা সেই আমিও তোমারই স্বরূপ তোমারই প্রতিবিম্ব তোমারই প্রতিকৃতি কিম্বা তুমি ব্যতীত আর কিছুই নহে সুতরাং সেই আমিও তুমি এবং তুমিই আমি অতঃপর "আমি" ও "তুমি" এই উভয়পদ ও উভয় পদার্থের বিলোপ করিয়া যে এক অখণ্ড নিষ্কল নিষ্কলঙ্ক "আত্মতত্ত্ব" মাত্র জ্ঞাপক আমি অবশিষ্ট থাকেন সেই আমিকেই আমি অশেষ শ্রদ্ধা বিশেষ বিশ্বাস ও পরমা ভক্তি সহকারে ভূরি ভূরি প্রণাম করিয়া এই অধ্যায়ের উপসংহার করিতেছি।

সাময়িক

মহামণ্ডল সম্বাদ—পঞ্চকোটাধিপতি ধর্ম্মভূষণ রাজা শ্রীযুক্ত জ্যোতিপ্রসাদ সিংহ দেব বাহাদুর শীঘ্রই কাশীধামে একটি সুবৃহৎ ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম খুলিতে মনস্থ করিয়াছেন। এতদুদ্দেশ্যে কাশীর শিবালয় ঘাটে মুসলমান বাদশাহদিগের যে বিশাল জমি পড়িয়াছিল তাহা সোয়া লক্ষ টাকায় ক্রীত হইবে। উহার বায়না দেওয়া হইয়া গিয়াছে। উহারই সঙ্গে সংলগ্ন কাশীনরেশ মহোদয়েরও কিছু জমি লওয়া হইবে। এই সৎকার্য্যের জন্য উক্ত জমি প্রদান করিতে কাশীরাজের স্বীকৃতি পাওয়া গিয়াছে। আশ্রমের কার্য্য নিয়মিতরূপে সঞ্চালিত হইলে উক্ত ধর্ম্মভূষণ রাজা বাহাদুর আশ্রমে নিয়মিত মাসিক সাহায্য প্রদান করিবেন। এই কার্য্য চিরস্থায়ী করিবার জন্য শীঘ্রই এক ট্রষ্ট বানান হইবে এবং তাহার পরিচালনের ভার শ্রীভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডলের উপর প্রদত্ত হইবে। রাজা বাহাদুরের এই প্রকার ধর্ম্মবুদ্ধি এবং উদারতা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। আমরা জগদম্বার চরণে তাঁহার দীর্ঘজীবন ও অভ্যুদয় কামনা করি।

গোবধ বন্ধ—হায়দরাবাদের নিজাম বাহাদুর ইদ পর্ব্বোপলক্ষে তাঁহার রাজ্য মধ্যে গোহত্যা বন্ধ করিবার জন্য আদেশ প্রচারিত করিয়া বিশেষ দূরদর্শিতা ও উদার মতবাদিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার এই ন্যায় পরায়ণতার পরিচয় পাইয়া শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের সভাপতি দারভাঙ্গার মহারাজাধিরাজ বাহাদুর তার দ্বারা তাঁহার অভিনন্দন করিয়া বলিয়াছেন,—হিন্দু মুসলমানের একতার নিমিত্ত অত্যন্ত উপযোগী আপনার এই আদেশের ফল বিশেষ মঙ্গলজনক হইবে এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। ভগবান নিজাম বাহাদুরকে দীর্ঘায়ু করুন।

ভারত-ধর্ম্ম প্রেস—এই নামে কাশীতে শ্রীভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডল একটি প্রেস স্থাপন করিয়াছেন। পূর্ব্বে স্থির হইয়াছিল যে ব্রহ্মভূত পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীর "ধর্ম্মামৃত প্রেসের" পুনরুদ্ধার করা হইবে। কিন্তু স্বামীজীর পূর্ব্বাশ্রমের বন্ধুবান্ধবগণ আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভা ও উহার ভবনাদি সম্বন্ধে

স্বার্থ বশতঃ নানা প্রকার বিঘ্ন উৎপাদন করায় ঐ প্রেসের পুনরুদ্ধার সাধন করা গেল না। উক্ত ধর্ম্মামৃত প্রেসের কোনই সম্পত্তি ছিল না, কেবল স্বামীজীর নামের স্মারকরূপে প্রেসের পূর্ব্বতন নাম মাত্রই মহামণ্ডল চালাইতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু তাহা হইতে পারিল না। সুতরাং মহামণ্ডলের কর্তৃপক্ষ এই প্রেসের নাম "ভারতধর্ম্ম প্রেস" রাখিলেন। কাশীর প্রসিদ্ধ জমিদার মহামণ্ডলের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামচন্দ্র নায়ক কালিয়া মহোদয় স্বহস্তে এই প্রেসের উদ্বোধন কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। প্রথম পুণ্যাহ বাচন, গ্রহ শান্তি, বেদ পাঠ ও হোম প্রভৃতি সনাতন ধর্ম্মোক্ত বিধি সমাপ্ত হইলে সংস্কৃত, হিন্দী ও ইংরাজীতে মঙ্গলাচরণ ছাপা হইল। উৎসবে ধর্ম্মভূষণ অনারেবল শ্রীযুক্ত কে, ভি, রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার (চীফ সেক্রেটারী) শ্রীযুক্ত বাবু বটুকপ্রসাদ ক্ষত্রী, পূজ্যপাদ শ্রী১০৮ স্বামী জ্ঞানানন্দজী মহারাজ, শ্রীমৎ স্বামী দয়ানন্দজী মহারাজ এবং শ্রীমৎ স্বামী বিবেকনান্দজী মহারাজ প্রভৃতি মহামণ্ডলের সঞ্চালকবর্গ উপস্থিত ছিলেন। অবশেষে গান এবং মিষ্টান্ন বিতরণ হইল। এখনও প্রেস শৈশব অবস্থা উত্তীর্ণ হয় নাই। স্বতন্ত্র স্থানাদির ব্যবস্থা হইলেই একটী লিমিটেড কোম্পানী গঠন করিয়া তাহার হাতে এই প্রেস সমর্পণ করা হইবে। যাহাতে এই প্রেস সনাতন ধর্ম্মাবলম্বিগণের একটী সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর প্রেসরূপে পরিণত হয় তাহার চেষ্টা হইতেছে।

ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়—মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের রাঁচির ব্রহ্মচর্য্য-বিদ্যালয়ের কতকগুলি ছাত্র কলিকাতা আসিয়াছিল। এই আগমন উপলক্ষে রামমোহন লাইব্রেরী হলে এক সভা হয়। ছাত্রবৃন্দের সুগঠিত সুস্থ দেহ—প্রোজ্জ্বল চক্ষু সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল! মাত্র ১১৲ টাকা মাসিক ব্যয়ে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহারা মেট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিতে পারে। প্রাচীন গুরুগৃহের অনুরূপ শিক্ষা প্রদত্ত হয়। আশা করি দলে দলে ছাত্র এই স্কুলে প্রেরিত হইবে অথবা প্রতি জিলায় এরূপ একটি স্কুল স্থাপন করা হইবে।

গীত।

রাগিণী পূরবী, তাল ঢিমে তেতালা।

[শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী।]

মন কেন মিছে ফিরে ফিরে চাও।
পিছু পানে নাহি চেয়ে আগে চলে যাও

আপন ভাবিয়া যাদের লইয়া,
এতদিন গেল বৃথায় কাটিয়া
এখনও সে মোহ গেল না টুটিয়া,
আর কবে কিবা হবে, সাবধান হও॥

কি আছে তোমার কে আছে তোমার,
কারে হেরে বল তোমার আমার,
এ বিশ্ব সংসার সকলি তাঁহার,
তুমিও যে তাঁর তাঁরেই সঁপে দেও॥

মায়া মোহ যারা অবিদ্যার ধারা,
সদাই ছুটিছে সঙ্গে সাথী তারা,
চিনেও চেন না হ'লে বুঝি সারা,
ছুটে প্রাণপণে তাঁর চরণে লুটাও॥

শ্রীগুরুর বাণী দৃঢ় করি মানি',
ছলনার কথা কানে নাহি শুনি'
সচ্চিদানন্দ চল নির্ভয়ে আপনি,
বসি' ব্রহ্মানন্দ ধামে দ্বন্দ্ব শূন্য হও॥

বেঙ্গল আর্ট প্রিন্টিং হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত,
বেঙ্গল আর্ট ষ্টুডিও বিল্ডিং,

নারীধর্ম্ম।

[শ্রীমৎ স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী।]

বিধবাবস্থা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

স্ত্রী পরপুরুষাসক্তা হইলে ইহলোকে নিন্দিত এবং পর জন্মে শৃগাল যোনি প্রাপ্ত হয় ও গলিতকুষ্ঠ প্রভৃতি বহুবিধ পাপরোগাক্রান্ত হইয়া থাকে। শিব পুরাণে আস্তিক ও নাস্তিকের লক্ষন এইরূপ কথিত হইয়াছে যে—

যথেহাস্তি সুখং দুঃখং সুকৃতৈর্দুস্কৃতৈরপি।
তথা পরত্র চাস্তীতি মতিরাস্তিক্যমুচ্যতে॥

যে প্রকার পুণ্য এবং পাপ হইতে এই লৌকিক সুখ, দুঃখ হইয়া থাকে তদ্রূপ পারলৌকিক সুখ দুঃখও পুণ্য পাপনিবন্ধন ইত্যাকার বিশ্বাস থাকার নামই আস্তিকতা। কৈয়ট বলিয়াছেন যে—

পরলোকোঽস্তীতি মতির্যস্য স আস্তিকস্তদ্বিপরীতো নাস্তিকঃ।

পরলোক বিশ্বাসী আস্তিক এবং তদবিশ্বাসী নাস্তিক। অতএব মনুর পূর্ব্বোক্ত আজ্ঞা আস্তিক আর্য্যজাতির অবশ্য মাননীয়। সুতরাং বিধবার পুরুষান্তর গ্রহণ ইহলোকে নগণ্য কামসুখপ্রদ হইলেও পরলোকে দুঃসহ দুঃখ দায়ী হয়; এইজন্য ইহাকে দুঃখই বলা উচিত। অতএব করুণাপক্ষপাতী স্থূলদর্শীগণের যুক্তি সর্ব্বথা ভ্রমাত্মক। আরও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে পুরুষান্তর সংসক্ত হইলে পরজন্মে যে কেবল পাপরোগগ্রস্ত হইতে হইবে তাহা নহে অধিকন্তু ঐরূপ বিধবাকে জন্ম জন্ম বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। ইহার প্রমাণও দেখিতে পাওয়া যায়। সতী অনসূয়া সীতার নিকটে পাতিব্রত্য মহিমা কীর্ত্তন করিতে সময় এইরূপই বলিয়াছিলেন। এবং ইহা অক্ষরীশঃ সত্য, যেহেতু প্রকৃতির রাজ্যে যেরূপ ক্রিয়া হয় প্রতিক্রিয়াও তদনুরূপই হইয়া থাকে। যেমন—বাক্‌সংযম করিলে মনুষ্য পরজন্মে উত্তম বক্তা হয়, বৃথা ধনব্যয় করিলে পরজন্মে দরিদ্র হয়, এবং জলের অপব্যয়কারী জন্মান্তরে মরুদেশে জন্ম গ্রহণ করে; এ সকল প্রকৃতিরাজ্যে ক্রিয়ার অনুকূল প্রতিক্রিয়ার দৃষ্টান্ত। এইরূপ, প্রারব্ধ কর্ম্ম-ফলে যে বৈধব্য সমুপগত হইয়াছে সেই অবস্থায় থাকিয়া ব্রতপালন পূর্ব্বক তাহাকে অতি-বাহিত করাই প্রকৃতির অনুকূল ও পরলোকে কল্যাণপ্রদ এবং ইহাকেই পাতিব্রত্য ধর্ম্ম বলা হয়। কিন্তু প্রাক্তন কর্ম্ম জনিত সেই প্রাকৃতিক অবস্থায় অসন্তুষ্ট হইয়া পুনরায় বিবাহ করিলে প্রকৃতির উপর বিরুদ্ধ

ক্রিয়া ও তদনুরূপ প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন হইবে; এবং তাহার ফলে পুনঃ পুনঃ উক্ত অবস্থা সমুপস্থিত হইবে ও অনন্ত জীবন অপরিসীম অসহ্য দুঃখ ভোগ করিতে হইবে, ইহা বিজ্ঞান সিদ্ধ সত্য। সুতরাং বিশেষরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে বিধবার বিবাহ দেওয়া যথার্থ দয়া নহে কিন্তু উহা মূঢ়তা ও অদূরদর্শিতা এবং প্রকৃতির উপর বলাৎকার জন্য মহাপাপ।

বিধবা-বিবাহ সমর্থনকারীদের দ্বিতীয় যুক্তি এই যে হিন্দুজাতির সংখ্যা ক্রমশঃ অল্পতর হইয়া আসিতেছে সুতরাং বিধবাদের অনর্থক জীবন যাপন করা অপেক্ষা বিবাহ করিয়া পুত্র কন্যা প্রসব করিলে সমাজের কল্যাণ হইবে অর্থাৎ সংখ্যা বাড়িবে। অত্যন্ত দুঃখ ও বিস্ময়ের কথা এই যে আর্য্যজাতি নিজ জাতিগত অন্যান্য উৎকর্ষ বিস্মৃত হইয়া কেবল সংখ্যা বৃদ্ধি করাই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়াছে, সংখ্যার অল্পতা ও আধিক্য জাতির লক্ষণ নহে কিন্তু জাতীয় ভাবের পরিপোষণই জাতির লক্ষণ বা প্রাণ। যদি সংখ্যাবাহুল্য হইয়া জাতীয়তা প্রণষ্ট হয় কিম্বা জাতি হীনবল হয় তাহা হইলে জাতির উন্নতি বলা যাইতে পারে না; প্রত্যুত সংখ্যার ন্যূনতা হইয়াও যদি জাতীয়তার বীজ বিদ্যমান থাকে তাহা হইতেও কালে জাতির উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। এ বিষয়ের যুক্তিপূর্ণ মীমাংসা গ্রন্থান্তরে বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করা হইবে। আর্য্য জাতি সংখ্যায় অপরিমিত হয়, ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় কিন্তু, এইরূপ সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে যদি আর্য্যত্বই উন্মূলিত হয়, আর্য্য অনার্য্য হয়, তবে উক্ত সংখ্যাবৃদ্ধি কেবল মাত্র জাতির অবনতি নহে ঘোর অবসাদ অর্থাৎ মৃত্যু। পুষ্ট হইতে গিয়া যদি প্রাণান্ত হয় তবে সে পুষ্টতায় প্রয়োজন কি? অতএব কেবল সংখ্যাবৃদ্ধি দ্বারা জাতি পুষ্ট করা জাতীয় উন্নতি নহে। ছাগল ভেড়ার সংখ্যা বাড়িলে ভারতের উন্নতি সম্ভবপর নহে, প্রকৃত আর্য্যভাবাপন্ন সন্তান দ্বারাই আর্য্য জাতির ও ভারতের উন্নতি হইবে, অন্যথা হইতেই পারে না। দ্বিতীয় সরল যুক্তি এই যে, যে দেশ কেবল মাত্র বর্ণ সঙ্কর খচ্চর (অশ্বতরী) প্রধান, কালে সেই দেশ খচ্চরের বংশ বৃদ্ধি না হওয়ায় খচ্চর শূন্য হইয়া যায় কিন্তু, দেশে অল্প সংখ্যক ঘোড়া থাকিলে এক-

সময়ে তাহা হইতে দেশ ঘোড়ায় পরিপূর্ণ হইয়া যায়। ভারতবর্ষ ইউরোপ নহে এবং ভারতীয় রমণী পাশ্চাত্য নহে যে, যে কোনরূপে সন্তান জন্মাইয়া জাতির উন্নতি সাধন করা যাইবে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে প্রত্যেক জাতি নিজ জাতিগত সংস্কারের উন্নতি দ্বারাই উন্নত হইতে পারে অন্যথা নহে। আর্য্য সতী নারীদিগের যে পাতিব্রত্য সংস্কার আছে তাহাকে নষ্ট করিয়া কেবল মাত্র সংখ্যা বৃদ্ধির দ্বারা আর্য্য জাতির উন্নতি কদাপি হইতে পারে না। এই নিগূঢ় বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে দূরদর্শী বিচারবান পুরুষ হৃদয়ঙ্গম করুন। পাতিব্রত্য পালন না করিয়া অন্য জাতি অন্য প্রকার উন্নতি করুক কিন্তু আর্য্যজাতির মধ্যে পাতিব্রত্য বিনা কখনই সুসন্তান লাভ করিতে পারা যায় না কেন না, এ দেশের সংস্কার অন্যরূপ হওয়ায় প্রতিক্রিয়াও অন্য প্রকার হইয়া থাকে। রাজপুতনা আদি দেশের ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যায় যে যতদিন আর্য্য রমণীগণের মধ্যে পাতিব্রত্যের গৌরব ছিল সে পর্য্যন্ত ভারতে মহারাণা প্রতাপের মত বীর পুত্র জন্মিয়াছিল এবং পাতিব্রত্যের গৌরব হ্রাস হওয়াতেই ভারত মাতা "বীরজননী" হওয়ার সৌভাগ্যে বঞ্চিত হইয়াছেন। এক সিংহ হুঙ্কারের দ্বারা হাজার হাজার ভেড়ার প্রাণ নাশ করিতে পারে, কিন্তু লক্ষ লক্ষ ভেড়া জন্মিয়া দেশকে কেবল জঙ্গলে পরিণত করে মাত্র। আর্য্য সতী মাতৃগণের সতীত্ব নাশ করিয়া বিধবা বিবাহ দ্বারা সংখ্যা বাড়াইবার প্রয়াস করিলে ঐরূপ ভেড়ায় দেশ ভরিয়া যাইবে; পুরুষসিংহ কখনও জন্মিবে না। অতি ক্ষুদ্রবুদ্ধি মনুষ্যও ইহা অনায়াসে বুঝিতে পারে যে সংখ্যা বৃদ্ধিই যদি মনুষ্য জাতির উন্নতির মুখ্যতম কারণ হয় তবে পঙ্গপালের মত অসংখ্য ভারতবাসী আজ আত্মোন্নতির জন্য স্বল্পসংখ্যক, শিক্ষিত, কর্ত্তব্যপরায়ণ, স্বদেশহিতৈষী ও স্বজাতি-প্রিয় ইংরাজ জাতীর মুখপ্রেক্ষী কেন?

দ্বিতীয়তঃ প্রকৃতির কোন অঙ্গে আঘাত করিয়া অন্য অঙ্গের উন্নতি কখন হইতে পারে না, কেন না প্রকৃতির অনুকূলে চলাই ধর্ম্ম; প্রকৃতি প্রবাহ অথবা প্রাকৃতিক নিয়মকে উল্লঙ্ঘন করা ধর্ম্ম নহে—পাপ। স্ত্রীজাতির উন্নতি ও মুক্তি যখন এক-পতিব্রত দ্বারাই অবধারিত এবং বহু

পুরুষ সংসর্গ তাহার প্রতিবন্ধক তখন সেই প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিলে তাহার প্রতিক্রিয়া সমগ্র হিন্দুজাতির উপর পড়িবে ; ফলে সমষ্টীভূত পাপ উৎপন্ন হইয়া হিন্দু জাতিকে বিধ্বংস করিয়া দিবে। আমরা কোন অধিকারে জাতির সংখ্যা বাড়াইবার জন্য স্ত্রীজাতিকে ইহলোকে নিন্দনীয়, পরলোকে দুর্দ্দশাগ্রস্ত ও বারংবার বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করাইব ? বিচারশীল ব্যক্তি ইহা বিবেচনা করুন। স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে অন্যকে ক্লেশিত করা কি পাপ নহে ? এবং এই পাপে হিন্দুজাতি কি অধঃপতিত হইবে না ? আমরা জ্ঞানী ও Enlightened বলিয়া গর্ব্ব করি কিন্তু স্ত্রীজাতির সদ্‌গতির উপায় করিতে আমরা সমর্থ হই না ইহার চেয়ে আমাদের পক্ষে আর লজ্জার কথা কি হইতে পারে ? যাহারা বিধবা অনেক বাড়িয়াছে অতএব বিধবা বিবাহ দিয়া তাহাদের সংখ্যা অল্প করিবার চেষ্টা করিতেছেন তাহারাও ভ্রান্ত কারণ বিবাহ করাইলে বিধবার সংখ্যা ন্যূন না হইয়া বরং তৎপরিবর্ত্তে জন্ম জন্ম বিধবা হওয়ার পথ পরিষ্কার করা হইবে এবং পৃথিবীতে অনাচার, ব্যভিচার, রোগ, শোক, দুঃখ, দারিদ্র্য বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত হইবে। এই সকল কারণে মনু বলিয়াছেন যে—

অপত্যলোভাদ্ যা হি স্ত্রী ভর্ত্তারমতিবর্ত্ততে।
সেহ নিন্দামবাপ্নোতি পতিলোকাচ্চ হীয়তে॥
নান্যোৎপন্না প্রজাস্তীহ নচাপ্যন্যপরিগ্রহে।
ন দ্বিতীয়শ্চ সাধ্বীনাং কচিদ্ ভর্ত্তোপদিশ্যতে॥

যে স্ত্রী সন্তানের লোভে পরপুরুষগামিনী হয় সে ইহলোকে নিন্দনীয়া ও পতিলোক হইতে পরিভ্রষ্ট হয়। অন্য পুরুষের ঔরসজাত পুত্র হইতে, স্ত্রীলোকদিগের কোন কার্য্য হইতে পারে না। এই প্রকার সহধর্ম্মিণী ব্যতীত অন্য স্ত্রীর গর্ভোৎপন্ন পুত্র দ্বারা পুরুষের কোন কার্য্য হয় না এবং কোন শাস্ত্রে সতী স্ত্রীর পক্ষে দ্বিতীয় পতির বিধান দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব সংখ্যা বৃদ্ধির অভিপ্রায়ে বিধবা বিবাহ প্রচলিত করা সর্ব্বথা শাস্ত্র ও যুক্তি বিরুদ্ধ। যদি সংখ্যা বৃদ্ধিই একান্ত অভিপ্রেত হয় তবে আর্য্য মাতৃগণকে পূর্ণ পতিব্রতা প্রস্তুত করিলে এবং স্বয়ং ব্রহ্মচারী ও চরিত্রবান হইলেই তাহা সহজ-সাধ্য হইবে। ইহার দ্বারাই ভারতের যথার্থ উন্নতি এবং

আর্য্য ভাব প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুজাতির সংখ্যা ও জাতীয়তা বৃদ্ধি হইবে।

বিধবা বিবাহ মণ্ডন বিষয়ে আধুনিক ব্যক্তিগণের তৃতীয় যুক্তি এই যে বিধবা স্ত্রী ব্যভিচারিণী হইয়া ভ্রূণহত্যা করিবে এই জন্য বিবাহ করানই উত্তম কল্প এ যুক্তিও নিতান্ত ভ্রমাত্মক ও অদূরদর্শীতা-পূর্ণ। আধুনিক মহোদয়গণের ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে আদর্শ শ্রেষ্ঠ হইলে জাতি উন্নত হয়; ক্ষুদ্র আদর্শ বিশিষ্ট জাতি মহত্ত্ব লাভ করিতে পারে না। যে জাতি প্রথম হইতেই রমণীগণকে ব্যভিচারিণী ও ভ্রূণহত্যাকারিণী বিবেচনা করিয়া থাকে এবং উক্ত কল্পনাকে আদর্শ করিয়া তদনুসারে ধর্ম্ম কর্ম্ম ব্যবস্থাপিত করে সে জাতি কখনও উন্নত হইতে পারে না; অতএব আদর্শানুরূপ উন্নতি লাভ করিতে না পারিলেও আদর্শ সর্ব্বদা মহান হওয়া আবশ্যক। আর্য্য রমণীগণ বিধবা হইলেই ভ্রূণহত্যা করিবে, সুতরাং বিবাহ ব্যতিরেকে ভ্রূণহত্যা হইতে তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার আর উপায়ান্তর নাই এরূপ ভাবনা অনুচিত ও লজ্জাজনক। কিন্তু যাহাতে বিধবার জীবন আদর্শ সতীত্ব পূর্ণ হয় তজ্জন্য প্রাণপণে উদ্যোগ করা সর্ব্বথা বিধেয়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে স্ত্রী জাতির মধ্যে অবিদ্যা ভাবের প্রাবল্য নিবন্ধন পুরুষ অপেক্ষা আঠগুণ অধিক কাম হইলেও আবার বিদ্যার অংশ থাকায় লজ্জা ও ধৈর্য্যের প্রাচুর্য্যও পরিলক্ষিত হয়।

বৈধব্য জীবন কিরূপে ধর্ম্মময় হইতে পারে।

অতএব বিধবার জীবন এরূপভাবে গঠিত করা উচিত যাহাতে তাহার অবিদ্যাভাব বিদূরিত হইয়া বিদ্যাভাব সম্যক্ রূপে প্রস্ফুটিত হইতে পারে। বর্ত্তমান সময়ে বিধবা রমণীগণ যে প্রায় উন্মার্গগামিনী হইয়া থাকে তাহার মুখ্য কারণ উহাদের শিক্ষার অভাব ও উহাদের সহিত ব্যবহার করিতে না জানা। বিধবা হওয়ার দিন থেকেই গৃহস্থেরা উহাদের মধ্যে এইভাব উৎপন্ন করিতে থাকে যে, সংসারে তাহার মত দুঃখী ও হতভাগ্য কেহ নাই। এরূপ করা নিতান্ত অন্যায় ও ভ্রম। ইহা যে কেবল বিদ্যার বিরুদ্ধ তাহাই নহে অপিচ শাস্ত্রেরও প্রতিকূল। আর্য্য শাস্ত্র অনুসারে ভোগ অপেক্ষা ত্যাগের মহিমা অধিক। মহাভারতে আছে যে—

যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখং।
তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাম্॥

ইহলোকে অভিলষিত বস্তু প্রাপ্তি জন্য যে সুখ এবং স্বর্গাদিলোকে যে অনুপম দিব্য সুখ এই উভয় সুখই বাসনা ক্ষয় জনিত সুখের ষোড়শাংশের একাংশও নহে। আরও গীতায় দেখিতে পাওয়া যায় যে—

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ॥
শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ॥

বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগ জন্য যে সুখ উৎপন্ন হয় তাহা পরিণামে দুঃখোৎপাদক বলিয়া দুঃখস্বরূপই এবং উক্ত সুখ আদি ও অন্তযুক্ত অর্থাৎ উৎপত্তি বিনাশশীল ক্ষণিক, সুতরাং বিবেকী পুরুষ তথা-কথিত সুখ লালসায় প্রধাবিত হন না। জগতে সেই ব্যক্তিই যথার্থ যোগী ও সুখী যে আজন্ম কাম ও ক্রোধের বেগ সম্বরণ করিয়াছে। মহর্ষি পতঞ্জলিও পরিণাম, তাপ প্রভৃতি দুঃখ সংমিশ্রিত হেতু বৈষয়িক সুখকে দুঃখময় এবং নিবৃত্তিকে সুখ ও শান্তিপ্রদ বলিয়াছেন। বিধবার জীবন সন্ন্যাসী সদৃশ; ইহাতে নিবৃত্তির শান্তি ও ত্যাগের বিমল আনন্দ বিদ্যমান রহিয়াছে সুতরাং কিজন্য বিধবা হতভাগিনী? জগতে ত্যাগী কি হতভাগ্য? তবে ত্যাগী সন্ন্যাসী কিরূপে গৃহস্থের গুরু এবং "আনন্দ" পদযুক্ত হইতে পারেন? যতদিন তিনি গৃহস্থ ছিলেন সে পর্য্যন্ত "আনন্দ" পদ পান নাই পরে ত্যাগময় সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া কেন তিনি আনন্দ পদের অধিকারী হন? বিচার করিলে বুঝা যায় যে, নিবৃত্তিই আনন্দদায়ক প্রবৃত্তি নহে; ত্যাগে আনন্দ ভোগে নয় এবং বাসনাক্ষয়ে আনন্দ বাসনায় অধীনতায় নহে। গৃহস্থ বিষয়ী তাই দুঃখী ও সন্ন্যাসী বিষয় ত্যাগ করিয়া সুখী। সুতরাং ঈদৃশ অবস্থাপন্না বিধবা বাস্তবিক হতভাগিনী অথবা ভাগ্যবতী তাহা বিবেচকগণ বিচার করুন। বিধবার পুরুষের সহিত জঘন্য কামোপভোগ বন্ধ হইয়া গেল এই জন্য বিধবা দুঃখিনী ইহা অত্যন্ত বিস্ময়ের কথা। যথেচ্ছ কমোপভোগের দ্বারা কি কাহারও সুখ হয়, না হইয়াছে? না কোন শাস্ত্রেই এরূপ প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়? গীতায় কামকে নরকের দ্বার বলা হইয়াছে আনন্দের নহে। কাম চিত্তের উন্মাদনা মাত্র। মানুষ তাহাতে মুগ্ধ হইয়া যায়; অতএব মুগ্ধতা নিবন্ধন

সুখ প্রতীতি হওয়া এবং যথার্থ সুখানুভব হওয়া এতদুভয়ের মধ্যে অত্যন্ত পার্থক্য। কামের দ্বারা কেহ সুখানুভব করে না, ইহা বিষয় মুগ্ধ গৃহস্থও স্বীকার করিবে, কারণ তাহারাও কামনা করে যে কাম বাসনা নিবৃত্ত হইয়া শান্তি প্রাপ্তি হউক। কিন্তু পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার দৃঢ় হওয়ার বাসনা নিবৃত্ত হয় না ও তজ্জন্য বিষয়ে লিপ্ত থাকে। তথাপি চিত্তের দৌর্ব্বল্য প্রযুক্ত বিষয়ে ব্যাপৃত থাকিলেও বিষয় সুখকর ইহা কেহই বলিবে না। কিন্তু বিষয় বাসনার নিবৃত্তি হইলেই প্রকৃত সুখানুভব হইবে একথা সকলেই মুক্তকণ্ঠে বলিবে। অতএব, যখন বিধবা বিষয় ত্যাগ পূর্ব্বক নিবৃত্তির পরমানন্দ লাভের সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছে তখন সে দুঃখিনী নহে সুখশালিনী, হতভাগিনী নহে কিন্তু পরম ভাগ্যবতী এবং সধবা স্ত্রী অপেক্ষা অধম নহে কিন্তু তাহাদের গুরুস্থানীয়া ও পূজ্যা, যেহেতু সন্ন্যাসী গৃহস্থের গুরু ও পূজ্য। আহার, নিদ্রা, মৈথুন, পশু ও মনুষ্য উভয়ের সাধারণ কার্য্য ও অনন্ত জন্মাচরিত ইহার দ্বারা ব্যক্তিগত বিশেষত্ব প্রাপ্তির সম্ভাবনা কোথায়? যদি বিধবা সংসার ধর্ম্মে থাকিয়া পুত্র কন্যা প্রসব করিত তাহা হইলে অনন্ত জন্মানুষ্ঠিত কর্ম্ম আরও একবার করা হইত; ইহাতে বিশেষ লাভ কি? এই জন্য অসংখ্য জন্ম, সাংসারিক দুঃখ ভোগ করিলেও বিষয়-বিষ-জর্জ্জরিত-হৃদয় জীব শ্রীভগবানের দুর্লভ চরণ কমল লাভে বঞ্চিত হয় এবং যাহা পাইবার নিমিত্ত সমস্ত জীব লালয়িত হইয়া ঘটিযন্ত্রের ন্যায় সংসারচক্রে নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহা আশু প্রদান করিতে যদি ভগবান সংসার বন্ধন মুক্ত করতঃ আহ্বান করেন ও নিবৃত্তি জনিত নিত্যানন্দ লাভের সুযোগ দেন তবে ইহার চেয়ে আর অধিক সৌভাগ্যের বিষয় কি হইতে পারে?

গৃহস্থের ঘরে কোন স্ত্রী বিধবা হইলে সকল লোকের ইহা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য যে, তাহাকে বিধবাবস্থার গৌরব বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিবে, তাহার প্রতি শ্রদ্ধার সহিত পূজ্য ভাবে ব্যবহার করিবে, তাহার নিকটে গৃহস্থাশ্রমের দুঃখ বহুলতা ও বিষয় সুখের পরিণাম-দুঃখতার বর্ণন করিবে এবং সঙ্গে সঙ্গেই নিবৃত্তি-মার্গ-পারায়ণ হওয়ায় তাহার কত আনন্দ, শান্তি ও গৌরব লাভ হইতে পারে, তদ্বিষয়ে আকৃষ্ট করিবে। অপিচ তাহার হৃদয়ে এরূপ ভাবনা উৎপাদন করিবে যে তাহার অদৃষ্ট অতি অপূর্ব্ব, যেহেতু

সে সংসার বন্ধন মোচনের সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছে, যাহা তাহার সঙ্গিনী সধবা স্ত্রীরা কোটি জন্মেও পাইবে কি না সন্দেহ। এই জন্য সে ধন্যা ও বরেণ্যা এইরূপ বুঝাইবার ফলে বিধবা আর নিজের অবস্থার জন্য দুঃখ করিবে না। বরং সুখী হইবে, ভোগের অভাবেও দুঃখ হইবে না সন্ন্যাসীর মত ত্যাগেই শক্তি ও গৌরব বোধ করিবে; শমদমাদি সাধনকে ক্লেশ-দায়ক ও দৈব-পীড়ন মনে না করিয়া সংযম ও সুখের সহায় বিবেচনা করিবে। ইহাই বৈধব্যাবস্থায় পাতিব্রত্য পালন করিবার ও অবিদ্যা ভাব বিদূরিত করিয়া বিদ্যা ভাব বাড়াইবার প্রথম উপায়। সংসারে সুখ দুঃখ বলিয়া কোন বস্তু নাই। ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় চিত্তের ভিন্ন ভিন্ন ভাবানুরূপ সুখ দুঃখের প্রতীতি হইয়া থাকে। একই পদার্থ এক ভাবে সুখদ ও অন্যভাবে দুঃখদ বলিয়া বোধ হয়; যে কামিনী কাঞ্চন সংসারীর নিকট অত্যন্ত আনন্দপ্রদ সন্ন্যাসাবস্থায় উহাই আবার তাহার পক্ষে দুঃখের কারণ হয় এবং সন্ন্যাসীর পক্ষে যাহা সুখকর গৃহস্থের তাহাতে দুঃখ হইয়া থাকে। প্রবৃত্তির চক্ষে ভোগ্য পদার্থ নিচয় আনন্দ-প্রদ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু উহাই নিবৃত্তির দৃষ্টিতে নিতান্ত জঘন্য, এই জন্য বিধবার ভিতরে এরূপ ধারণা উৎপন্ন করা উচিত যে, সে সাংসারিক ভোগ্য বস্তু সমূহকে দৃঢ় জ্ঞানের দ্বারা অতি অকিঞ্চিৎকর ও দুঃখ-পরিণামী বলিয়া বিবেচনা করে। ইহাই বৈধব্য অবস্থায় পাতিব্রত্য পালনের দ্বিতীয় উপায়। বিধবার হৃদয় নিহিত পবিত্র প্রেম প্রস্রবণকে হৃদয়েই আবদ্ধ রাখিয়া আবিল করিতে দেওয়া উচিত নহে কিন্তু সন্ন্যাসীর ন্যায় উহাকে "বসুধৈব কুটুম্বকং" ভাবে প্রবাহিত হইতে দেওয়া উচিত; যাহাতে সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নিঃস্বার্থ প্রেম ও পরোপকারাদি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে নিরত হয়। ইহাই বৈধব্য অবস্থায় পাতিব্রত্য রক্ষার তৃতীয় উপায়। ইহার চতুর্থ উপায় সর্ব্বাপেক্ষা সরল হইলেও সংসারাসক্তের পক্ষে কঠিনতর, তাহা এই যে, বিধবা যদি পিতার গৃহে থাকে তবে তাহার পিতা মাতা এবং শ্বশুর বাটীতে থাকিলে শ্বশুর-শাশুড়ী যেদিন হইতে ঘরে কন্যা অথবা বধূ বিধবা হইবে সেইদিন হইতে ভোগ বিলাস পরিত্যাগ করিবেন। এই নিয়ম প্রতিপালিত হইলে বাটীর বিধবা কখনই বিকৃত হইবে না। সম্মুখস্থিত জলন্ত আদর্শ তাহার চিত্তকে কলুষিত হইতে দিবে না।

আর্য্যজাতি।

সমুদ্রযায়িভির্লোকৈঃ সংবিদং সূচ্য নির্গতঃ।
শুকেন সহ সম্প্রাপ্তো মহান্তং লবণার্ণবম্।
পোতারূঢ়াস্ততঃ সর্ব্বে পোতবাহৈরুপোষিতাঃ॥

এই সকল শ্লোকে স্পষ্টরূপে বলা হইয়াছে যে, ভারতীয় বণিকগণ প্রাচীন কালে মুক্তা প্রভৃতি রত্ন লাভ করিবার উদ্দেশে রত্নপরীক্ষক জহরী সঙ্গে লইয়া সমুদ্রপথে বহুদূর গমন করিতেন। কেবল জলপথেই নয়, অধিকন্তু স্থল পথেও প্রাচীন আর্য্যজাতি সমস্ত পৃথিবীর সহিত বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন। চীন, তুর্কিস্থান, পারস্যদেশ, বেবিলোন, মিসর, গ্রীস এবং রোম প্রভৃতি প্রদেশের সহিত আর্য্যজাতির স্থল-বাণিজ্যেরও সম্বন্ধ ছিল। প্রফেসর হীরেন সাহেব বলেন,—"পশ্চিম এশিয়ার পামীরিয়ানদিগের সহিত হিন্দুদের স্থলপথে বাণিজ্য চলিত। এই পামীরের পথে হিন্দুরা রোমে যাতায়াত করিতেন। সেখান হইতে সিরিয়া বন্দর হইয়া পাশ্চাত্য দেশের অনেক মার্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। স্থলপথে বাণিজ্যের আরও একটি রাস্তা ছিল, যথা, হিমালয় পার হইয়া অকসস, তথা হইতে কাস্পিয়ন এবং তথা হইতে ক্রমশঃ ইয়ুরোপের যাবতীয় বাজারে সচরাচর হিন্দুরা বাণিজ্য-ব্যপদেশে গমন করিতেন। এই প্রকার নানা মার্গে হিন্দুজাতির স্থলপথে বাণিজ্য চলিত।"

যদিও আর্য্যজাতির প্রাচীন শাস্ত্রীয় গ্রন্থের অধিকাংশই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, এমন কি উহার সহস্রাংশও আজকাল বিদ্যমান নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না; তথাপি যে সকল গ্রন্থ বিদ্যমান রহিয়াছে তাহাই আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক জগতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্ঞান লাভ করিতে প্রাচীন আর্য্যজাতি এতদূর যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন যে তাহা এখনও পৃথিবীর অন্য কোন জাতি কল্পনা করিতেও সমর্থ হয় নাই। আর্য্যজাতির সপ্তদর্শন বিজ্ঞান, আর্য্যজাতির অবাঙ্মনসোগোচর ঈশ্বর-বিজ্ঞানের অপূর্ব্বতা, আর্য্যজাতির ভগবৎ সম্বন্ধীয় ব্রহ্ম, ঈশ ও বিরাটরূপের অনুভব, আর্য্যজাতির সগুণ ও নির্গুণ উপাসনার পদ্ধতি, আর্য্যজাতির অলৌকিক যোগসাধন প্রণালী, আর্য্যজাতির কর্ম্মবিজ্ঞানের মহত্ত্ব এবং আর্য্যজাতির মুক্তিতত্ত্ব প্রভৃতির রহস্যোদ্‌ঘাটন করা পৃথিবীর কোন জাতিরই সাধ্যায়ত্ত নহে। অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম অধিদৈব রাজ্য সম্বন্ধে আর্য্যজাতি যে সকল মহান্ আবিষ্কার করিয়াছেন তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিবার শক্তি পর্য্যন্ত পৃথিবীর অন্য কোন জাতির নাই। আর্য্যজাতির ঋষি, দেবতা ও পিতৃগণের

অস্তিত্ব ও তাঁহাদের অলৌকিক শক্তি, আর্য্যজাতির দ্বারা আবিষ্কৃত সপ্ত ঊর্দ্ধ্বলোক, সপ্ত অধোলোক, স্বর্গলোক, নরকলোক, পিতৃলোক ও প্রেতলোক প্রভৃতি বিবিধ লোকের বিচিত্রতা, আর্য্যজাতির অবতারতত্ত্ব, আর্য্যজাতির গভীর গবেষণাপূর্ণ ও ভগবৎ-শক্তিময় পীঠস্থান প্রভৃতির মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিবার শক্তি এবং আর্য্যজাতির দেবতাদি সাক্ষাৎকার করিবার প্রণালী প্রভৃতি অনেক বিষয় এই বিজ্ঞানোন্নতির দিনেও ভূগর্ভ-প্রোথিত ধনের ন্যায় অজ্ঞাত রহিয়াছে।

সুতরাং পূর্ব্বাপর সমস্ত ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে পূর্ণপ্রকৃতিময়ী এই ভারত-মাতার পবিত্র অঙ্কে শোভায়মান প্রাচীন আর্য্যজাতি আধিভৌতিক,আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক সমস্ত বিষয়েই উন্নতির পরাকাষ্ঠা সম্পাদন করিয়াছিলেন ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

আর্য্যজাতির লক্ষণ, আদি-নিবাসস্থান এবং গৌরব সম্বন্ধে বিস্তৃতরূপে আলোচনা করা হইল এখন নিম্নে এই জগৎপূজ্য আর্য্যজাতির সহিত অনার্য্যজাতির পার্থক্য প্রদর্শিত হইবে। প্রথমে বলা হইয়াছে যে যাস্ক মুনি আর্য্যজাতির লক্ষণ বর্ণন করিতে সময় উহাদিগকে 'ঈশ্বরপুত্র' বলিয়াছেন। অনার্য্যজাতির সহিত পার্থক্য সম্বন্ধে আর্য্যজাতির ইহা একটি প্রধান লক্ষণ। যে জাতির জীবন-প্রবাহিনী কল্যাণবহা হইয়া অমৃতসিন্ধুর অভিমুখে অবিরাম-গতিতে ধাবমানা, যে জাতির সমস্ত চেষ্টা, আচার ও নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্যকলাপ অধ্যাত্ম-লক্ষ্যে নিবদ্ধ, যে জাতির পান ভোজন হইতে আরম্ভ করিয়া জীবন সংগ্রামের যাবতীয় পুরুষার্থ পারলৌকিক কল্যাণ ও মুক্তিলাভের জন্য অনুষ্ঠিত হয়, গীতার বিজ্ঞান অনুসারে অগ্নির ধূম্রাবরণের ন্যায় সমস্ত কার্য্য দোষযুক্ত হইলেও অমৃতের মধুর ধারায় অভিসিঞ্চিত হইয়া যে জাতির যাবতীয় কার্য্য নির্দ্দোষ ও নিঃশ্রেয়সপ্রদ হইয়া যায় সেই জাতিই প্রকৃত আর্য্যজাতি। পক্ষান্তরে যে জাতির কোন কার্য্যের মূলে অধ্যাত্মলক্ষ্য বিদ্যমান নাই, যে জাতি মুক্তিকে লক্ষ্য করিয়া কার্য্য করে না; পরন্তু স্থূল শরীরের বৈষয়িক বিলাসের জন্যই যাবতীয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করে এবং স্থূল সংসারের উন্নতিতেই যে জাতির পুরুষার্থ আরম্ভ ও পরিসমাপ্ত হয় আর্য্যশাস্ত্র অনুসারে তাহাকেই অনার্য্যজাতি বলা হইয়া থাকে। হিন্দুশাস্ত্রে কেবল শরীরের লক্ষণ দেখিয়া আর্য্য ও অনার্য্যের ভেদ বর্ণন করা হয় নাই। বেদসম্মত শাস্ত্রসমূহে আর্য্য ও অনার্য্যের ভেদ মনুষ্যের ধার্ম্মিক বিচার এবং জীবনের লক্ষ্য অনুসারে

নিরূপণ করা হইয়াছে। এই জন্যই হিন্দুশাস্ত্রের "আর্য্য" শব্দ এবং পাশ্চাত্য সাহিত্যের "এরিয়ান" (Arian) শব্দে আকাশ পাতাল প্রভেদ।

সংসারে কে না জীবন ধারণ করে? পশুও প্রকৃতিদত্ত অন্নে পরিপুষ্ট হইয়া নিজের নির্দ্দিষ্ট আয়ু ভোগ করে। কিন্তু যথার্থ আর্য্যসুলভ জীবন তাহাকেই বলা যাইতে পারে যাহাতে আধ্যাত্মিক পূর্ণতা লাভ করিয়া নিজের এবং জগতের পরম কল্যাণ সাধন করা যায়। নতুবা প্রকৃতিমাতার অন্নধ্বংস করিয়া বিষয়ের পঙ্কিল প্রবাহে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক জীবন অতিবাহিত করাকে অনার্য্যসুলভ জীবন ধারণ বলা হইয়া থাকে। বাল্যজীবনকে সার্থক তখনই বলা যাইতে পারে যখন বাল্যজীবনের সদাচার ও শিক্ষার দ্বারা যৌবনকাল ধর্ম্মময় ও আত্মোন্নতিময় হয়। যৌবনকে তখনই সার্থক বলা যাইতে পারে যখন যৌবনের যথার্থ যাপনে বৃদ্ধাবস্থায় আধ্যাত্মিক শান্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৃদ্ধাবস্থা তখনই সার্থক যখন বার্দ্ধক্যের মুনিবৃত্তি দ্বারা পরজন্ম মধুরিমাময় হইয়া যায়। ইহলোক তখনই সার্থক যখন ইহলোকের ধার্ম্মিক কার্য্যের দ্বারা পরলোক সুখময় হয়। সেই জন্মই সার্থক যদ্দারা দুঃখময় সংসারে জন্মমরণের প্রবাহ রুদ্ধ হইয়া যায়। মৃত্যু তাহারই নাম যদ্দারা অমৃতের অতল সিন্ধুতে স্নান করিয়া পুনরায় মৃত্যুর হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। জীবনের এক মুহূর্ত্ত অথবা অবস্থা যদি পরবর্ত্তী মুহূর্ত্ত বা অবস্থার উন্নতি সাধক হয় তবেই সেই মুহূর্ত্ত ও অবস্থা সার্থক। অন্যথা এই সুখ দুঃখময় সংসারে জনন মরণ কাহার না হয়?

আর্য্য ও অনার্য্যের ভেদ সম্বন্ধে উপরে যে বিচার করা হইল তাহাই যথার্থ আর্য্য জাতীয় ভাব অনুসারে জীবন যাত্রার বিচার। ইহার বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত মাত্রেই অনার্য্য সিদ্ধান্ত। আমরা Spiritual বলিয়াই আমরা আর্য্য। আমাদের জীবনের গতি Materialঐ আরম্ভ হইয়া Spiritualএ যাইয়া সমাপ্ত হয়। আমাদের জন্য material end নহে কিন্তু spiritual end এবং material means to that end. আমাদের নিকট materialএর কোনই মূল্য নাই যদি সে spiritualকে বাধা দেয় অথবা উহার সহায়ক না হয়। তাৎপর্য্য এই যে আর্য্যজাতির সমস্ত শারীরিক ও মানসিক চেষ্টা তাহার আত্মোন্নতির জন্য। যদি তাহার ইহলৌকিক উন্নতির প্রতি অভিলাষও হয় তবে তাহাও তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়ক হওয়া আবশ্যক। আমাদের

ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমকে তখনই যথার্থ ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম বলা যাইবে যখন তাহা দ্বারা গৃহস্থাশ্রমের ধর্ম্মমূলক প্রবৃত্তির শিক্ষা লাভ হইবে। আমাদের গৃহস্থাশ্রমের ধর্ম্মমূলক প্রবৃত্তি তখনই যথার্থ প্রবৃত্তি হইবে যখন তাহা দ্বারা বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসাশ্রমে পূর্ণ নিবৃত্তির সহায়তা হইবে। আমাদের বানপ্রস্থাশ্রম তখনই সার্থক হইবে যখন তাহা দ্বারা যথার্থ সন্ন্যাস লাভ হইবে। আমাদের সন্ন্যাস আশ্রম তখনই যথার্থ সন্ন্যাস হইবে যখন তাহা দ্বারা নিঃশ্রেয়স পদে প্রতিষ্ঠা লাভ হইবে। অন্যথা ব্রহ্মচারী হইয়া কপটাচারী হওয়া, গৃহস্থ হইয়া ঘোর বিষয়ী হওয়া, বানপ্রস্থী হইয়া বাহিরের আড়ম্বর দেখান এবং সন্ন্যাসী হইয়া অসংযমী ও প্রচ্ছন্ন বিষয়সেবী হওয়া আর্য্যবিগর্হিত অনার্য্য ভাব মাত্র। আমাদের হোম যদি স্থূল প্রকৃতির উপর প্রভাব বিস্তার পূর্ব্বক বায়ুশুদ্ধি মাত্র করিয়া শক্তিহীন হইয়া যায় তবে এই প্রকার হোমকে আর্য্য জাতীয় হোম বলা যাইতে পারে না। আর্য্যলক্ষণযুক্ত হোম তাহাকেই বলা যাইতে পারে যখন সেই হোম অগ্নিতে সমর্পিত হইয়া অগ্নিমুখ দেবতাদের সহিত অধিদৈব সম্বন্ধ স্থাপন পূর্ব্বক অধিদৈব শক্তির প্রসন্নতা ও সম্বর্দ্ধনা দ্বারা জগতে ধন, ধান্য, পশু, প্রজা, শক্তি, সুখ ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়। । মনু বলিয়াছেন,—

অগ্নৌ প্রস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে।
আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ॥

অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত আহুতি আদিত্যে উপনীত হয় এবং এইরূপে সমস্ত দৈবী শক্তির মূলরূপ সূর্য্যাত্মা পরিতৃপ্ত হইলে তাঁহারই প্রসাদফলরূপে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে অন্ন এবং অন্ন হইতে প্রজারূপ জীবের উৎপত্তি হয়। ইহাই যথার্থ আর্য্য হোম। জগতে এই দগ্ধোদর পূরণের জন্য কে না ভোজন করে? কিন্তু আর্য্য ভোজন কেবল নিজের উদর পূরণের জন্য নহে পরন্তু বৈশ্বানরে আহুতি প্রদান করিয়া তাঁহার তৃপ্তি সাধন দ্বারা জগতের তৃপ্তি বিধানেই আর্য্য ভোজনের সার্থকতা। যদি আর্য্যজাতি কেবল রসনেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি এবং বিলাসলালসা চরিতার্থ করিবার জন্য ভোজন করে তবে সেই প্রকার ভোজনকে অনার্য্য ভোজন বলা হইবে। আর্য্যজাতির ভোজন কেবল স্থূল শরীরের রক্ষার নিমিত্ত এবং স্থূল শরীরের রক্ষাও কেবল সূক্ষ্ম শরীরের রক্ষার দ্বারা আত্মোদ্ধার করিবার জন্য। ভগবান গীতায় বলিয়াছেন,—

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ॥
যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥

যজ্ঞ দ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া দেবতাগণ ধনাদি ভোগ্য বস্তু প্রদান করিবেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রদত্ত বস্তু তাঁহাদিগকে নিবেদন না করিয়া যে ভোজন করে সে চোর। যজ্ঞাবশিষ্ট অন্ন প্রসাদরূপে ভোজন করিলে জীব সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। কেবল নিজ উদর পূরণের জন্য ভোজন করা পাপ ভোজন মাত্র। এই প্রকার সমস্ত অন্ন ভগবানকে সমর্পণ করিয়া প্রসাদ ভোজন করাই আর্য্যজাতীর ভোজন। যেহেতু ভোজনে প্রসাদ বুদ্ধি উৎপন্ন হইলে ভোগ্যবুদ্ধি নষ্ট হইয়া যায় এবং এই প্রকার ভোজনের প্রতি লোভ উৎপন্ন না হওয়ায় ভোগ্য বস্তু দ্বারা আর বন্ধন প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং প্রসাদবুদ্ধি দ্বারা পাপনাশ, আত্মোন্নতি ও পরম শান্তি লাভ হইয়া থাকে। আর্য্যজাতির ভোজন ইষ্টদেবের সেবার জন্য নিবেদিত হইয়া অতিথি সেবা, পোষ্যবর্গের প্রতিপালন প্রভৃতি দ্বারা পবিত্রতা ধারণ পূর্ব্বক কেবল শরীর রক্ষার নিমিত্ত গৃহীত হয়। ইহাই আর্য্যজাতির ভোজন। যে ভোজনে এই সকল লক্ষণ না পাওয়া যায় তাহা অনার্য্য ভোজন। সংসারে অর্থলালসাপরায়ণ হইয়া সমস্ত পুরুষার্থশক্তি ধনসম্পদ বৃদ্ধির জন্য নিয়োজিত করিয়া তাহাকেই জীবনের লক্ষ্যরূপ স্থির করা আর্য্যভাবসুলভ লক্ষণ নহে। কারণ যেখানে স্থূল শরীরের রক্ষা কেবল আত্মোন্নতি সাধনের নিমিত্ত, স্থূল বৈষয়িক তৃপ্তির জন্য নহে, তথায় ধনসম্পত্তি সংগ্রহ জীবনের লক্ষ্য হইতে পারে না। যে জাতিতে পূজ্যতম ও শ্রেষ্ঠতম তাঁহাদিগকেই বলা হইয়া থাকে যাঁহারা গীতোক্ত 'সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চন' ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং যাঁহাদের নিকট যাবতীয় পার্থিব সম্পদ ধূলিমুষ্টির ন্যায় তুচ্ছ। এই প্রকার ত্যাগের মহিমা যে জাতির মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে কীর্ত্তিত সে জাতির অর্থপ্রিয়তা কি প্রকারে জাতীয় লক্ষ্য হইতে পারে? অতএব আর্য্যজাতির অর্থোপার্জ্জন বিষয়বিলাসের জন্য নহে প্রত্যুত জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ এবং পরোপকার সাধন করিবার জন্য। ইহার বিপরীত যে কিছু আদর্শ সমস্তই অনার্য্যভাবমূলক।

আর্য্যজাতীর জীবনে ভাবের কি অপূর্ব্ব মহিমা প্রাপ্ত হওয়া যায়! আর্য্যজাতি নীচ হইতেও নিম্নতর কার্য্যকে ভাবশুদ্ধিদ্বারা ধর্ম্মময় ও অমৃতময় করিতে সমর্থ। ভাবজগতের এই অপূর্ব্বতা পুণ্যশ্লোক আর্য্যজাতির মধ্যেই প্রাপ্ত হওয়া যায় আর কুত্রাপি এভাব নাই। কামের ন্যায় প্রবল রিপু, কামক্রিয়ার ন্যায় পাশবিক ক্রিয়া জগতে আর কি হইতে পারে? কিন্তু যে কার্য্যের সঙ্গে সৃষ্টিক্রিয়া এবং প্রাকৃতিক প্রেরণার সম্বন্ধ আছে তাহাকে সহজে ত্যাগ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নহে। এই জন্য যে পাশবিক কার্য্য ত্যাগ করা যায় না ভাবশুদ্ধিদ্বারা তাহার মধ্য হইতে পশুভাবের অংশ নষ্ট করিতে বিশেষ যত্ন করা হইয়াছে। ইহাই আর্য্য-জাতীর ভাবশুদ্ধির লক্ষণ। আর্য্যজাতির বিবাহ কামের তরঙ্গে ইন্দ্রিয় ও চিত্তবৃত্তি প্রবাহিত করিয়া পশুত্ব প্রাপ্ত হইবার জন্য নহে প্রত্যুত নৈসর্গিক অনর্গল ভোগ-স্পৃহা এক স্ত্রীতে সীমাবদ্ধ করতঃ ধীরে ধীরে উহাকে নষ্ট করিয়া নিবৃত্তিপরায়ণ হইবার জন্য। আর্য্যজাতির গৃহস্থাশ্রম ভোগ বিলাসে প্রমত্ত হইবার জন্য নহে প্রত্যুত প্রারব্ধ কর্ম্মজনিত ভোগ সংস্কারকে নির্ব্বীজ করিয়া সন্ন্যাস আশ্রমের যোগ্যতা অর্জ্জন করিবার জন্য। আর্য্যজাতির পতি-পত্নীসম্বন্ধ কামের ক্রীতদাস হইবার জন্য নহে পরন্তু গর্ভাধান সংস্কার অনুসারে ধর্ম্মাবিরুদ্ধ কাম দ্বারা সংসারে ধার্ম্মিক পুত্র উৎপাদন করিবার জন্য। ইহাই অনার্য্যজাতি হইতে আর্য্যজাতির বিশেষত্ব। এই প্রকার সমস্ত কার্য্যে আধ্যাত্মিক ভাব পোষণ করিয়া আর্য্যজাতি আপন জীবন উপাসনাময় ও জ্ঞানময় করিয়া লন। তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের গতি অধ্যাত্মসিন্ধুর দিকে এবং বুদ্ধিবৃত্তির গতি জ্ঞানার্ণবের অভিমুখে অবিরাম প্রবাহিত। আর্য্য চক্ষু গঙ্গা যমুনার ধারায় ভগবানের প্রেমধারা নিরীক্ষণ করে, হিমালয়ের বিরাট শরীরে ভগবানের বিরাট মূর্ত্তি দর্শন করে এবং সমুদ্রের অনন্ত বিস্তার ও গভীরতার মধ্যে ভগবানের অসীম উদারতা ও অনাদি অনন্ত শক্তি প্রত্যক্ষ করে। পুষ্পের অবিশ্রান্ত বিকাশে ভগবানের আনন্দসত্তা উপলব্ধি করা, বাসন্তীবিলাস অথবা বর্ষাসুলভ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে চিদানন্দের লহরমালা নিরীক্ষণ করা, তারা-বলী-পরিশোভিত গভীর অমানিশায় আকাশ মণ্ডলে দিব্যজ্যোতির্ম্ময় অক্ষর-সংগ্র-থিত ভগবদ্‌ভজনাবলী পরিদর্শন করা, আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত জগতের অবিরাম গতিকে চিরশান্তিময় সচ্চিদানন্দ সমুদ্রের দিকে উপসনার অনন্ত নদীর গতিরূপে প্রত্যক্ষ করা আর্য্য চক্ষুর যথার্থ দর্শন এবং চরম পরিণাম। আর্য্যজাতির কর্ণ কোলাহল-

ময় সংসারের অনন্ত নাদে ব্যাকুল হইয়া যায় না, কিন্তু সকল নাদের মূলে ওঁকারের অবিচ্ছিন্ন মধুর ও গভীর নিনাদ শ্রবণ করে, জাহ্নবী ও যমুনার তরঙ্গভঙ্গে শ্রুতি-বিমোহন কলগীত শুনিতে পায়, প্রভাতের বিহঙ্গম গানে ও ভ্রমরের গুঞ্জনে ভগবানের স্তুতিগান উপলব্ধি করে---ইহাই আর্য্য কর্ণের বিশেষত্ব। চক্ষে দূরবীক্ষণ অথবা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সংযোগ হউক কিম্বা কর্ণেন্দ্রিয়ের শক্তি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সহায়তায় দূরশ্রবণ করিতে সমর্থ হউক কিন্তু যদি আর্য্যনেত্র সংসারের সমস্ত দৃশ্যাবলীর মধ্যে ভগবল্লীলার মাধুরী নিরীক্ষণ করিতে না পারে অথবা আর্য্য কর্ণ চতুর্দ্দিকে শ্রীকৃষ্ণের মধুর বংশীধ্বনি না শুনিতে পায় তবে ভারতমাতার অঙ্কে এবম্বিধ আর্য্যগুণহীন সন্তানের উৎপত্তিই নিরর্থক। সংসারের সকল ভাবের মূলে ভগবদ্‌-ভাবের স্ফূর্ত্তি অনুভব করাই আর্য্য মনের আর্য্যত্ব। সংসারের সকল সত্তার মধ্যে ব্রহ্মসত্তা উপলব্ধি করাই আর্য্যবুদ্ধির চরিতার্থতা। যখন আর্য্যজাতি আপন জীবন-গতিকে এই প্রকার আদর্শের অনুকূলে গঠন করিতে পারিবে তখনই সে স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে সমর্থ হইবে,—

আত্মা ত্বং গিরিজা মতিঃ সহচরাঃ প্রাণাঃ শরীরং গৃহং
পূজা তে বিষয়োপভোগরচনা নিদ্রা সমাধিস্থিতিঃ।
সঞ্চারঃ পদয়োঃ প্রদক্ষিণবিধিঃ স্তোত্রাণি সর্ব্বা গিরো
যদ্‌ যৎ কর্ম্ম করোমি তত্তদখিলং শম্ভো! তবারাধনম্॥

হে ভগবন্‌, তুমিই আমার আত্মা, জগদম্বা বুদ্ধি, তোমার সহচরগণ প্রাণ এবং এই শরীর গৃহস্বরূপ। সমস্ত বিষয়ভোগ ভোগের জন্য নহে, পরন্তু তোমারই পূজার জন্য। নিদ্রা তমোগুণের পরিণামরূপ নহে প্রত্যুত সমাধির শান্তিতে বিশ্রাম ও আনন্দভোগরূপ। ইতস্ততঃ ভ্রমণ তোমারই অনন্ত মূর্ত্তির প্রদক্ষিণরূপ। সমস্ত কথা-বার্ত্তা তোমার স্তুতিরূপ এবং কর্ম্মসমূহ বিষয় বিলাসময় সংসারে ভোগপ্রবৃত্তির জন্য নহে, পরন্তু তোমারই আরাধনাস্বরূপ। এই প্রকার সমস্ত কার্য্য, সমস্ত চেষ্টা এবং সমস্ত চিত্তবৃত্তি যখন ভগবৎ কার্য্য ও ভগবদ্‌ভাবে ভাবিত হইয়া যায় তখনই আর্য্য-জীবন উপাসনাময় হইয়া আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হয়। ইহাই কল্যাণবাহিনী আর্য্যজীবনতরঙ্গিণীর সচ্চিদানন্দ সমুদ্রের দিকে অবিরাম গতি এবং ইহাই অনার্য্য জাতি হইতে আর্য্যজাতির বিশেষত্বের একটী প্রধান লক্ষণ।

অনার্য্য জাতি হইতে আর্য্যজাতির বিশেষত্বের দ্বিতীয় লক্ষণ, আর্য্যজাতির সদাচার। শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণে যত প্রকার সদাচার বর্ণিত আছে তাহাতে স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরের উন্নতিজনক কিরূপ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে এবং ঐ সকল সদাচার সম্যক রূপে প্রতিপালিত হইলে কি প্রকারে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত হইতে পারে তাহা গ্রন্থান্তরে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইবে। আর্য্যজাতির জীবনে ধর্ম্মের সহিত অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান হেতু প্রথম ধর্ম্মরূপ আচার প্রতিপালনেই আর্য্যের আর্য্যত্ব সংরক্ষিত হয়। বহিঃ-প্রকৃতি অন্তঃপ্রকৃতির ধাত্রী। বহিঃপ্রকৃতিতে আর্য্যভাব না থাকিলে অন্তঃ-প্রকৃতিতেও আর্য্যভাব থাকিতে পারে না। বহিঃপ্রকৃতিকে আর্য্যভাবযুক্ত রাখিবার জন্য যে সকল প্রক্রিয়া ও অনুষ্ঠান করা হয় তাহাই সদাচার নামে অভিহিত। স্থূল পরিদৃশ্যমান জগতের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায় যে এক জাতির সঙ্গে অপর জাতির বৈশিষ্ট্য আচারের পার্থক্য দ্বারাই নির্ণীত হয়। আচারের দ্বারাই এক জাতি অন্যান্য জাতি সমূহের মধ্যে বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে সক্ষম। যে জাতি নিজের পরম্পরাগত আচার পরিত্যাগ করে অথবা অন্য জাতীয় আচার গ্রহণ করিয়া নিজ জাতীয় আচারের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে সে জাতি ধীরে ধীরে স্বীয় স্বতন্ত্র সত্তা হারাইয়া সে যে জাতির অনুকরণ করে সেই জাতির মধ্যে লয় প্রাপ্ত হইয়া যায়। পৃথিবীর ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যায় যে এই প্রকার অনেক বিজিত জাতি নিজের জাতীয় আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া বিজেতা জাতির আচার ব্যবহারের অনুকরণ করিতে করিতে অবশেষে তাহারাই মধ্যে লীন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই আর্য্যজাতির উপরে এতবার বিদেশীয়গণের আক্রমণ হওয়া সত্ত্বেও আজ পর্য্যন্ত যে এই জাতি নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহার সর্ব্বপ্রধান কারণ স্বীয় জাতীয় আচারের যথার্থ পরিপালন। আর্য্যজাতির মধ্যে আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্ণতা হওয়ায় স্থূল আচারের পূর্ণতা হওয়া স্বাভাবিক এবং এই জন্যই সদাচার প্রতিপালন অনার্য্য জাতি হইতে আর্য্যজাতির বিশেষত্বের একটী লক্ষণ।

অনার্য্যজাতি হইতে আর্য্যজাতির বিশেষত্বের তৃতীয় লক্ষণ আর্য্যজাতির বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্ম। আর্য্যজাতির মধ্যে যদি বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রম-ধর্ম্ম না থাকে তবে সে আর্য্যভাবাপন্ন থাকিতে পারে না।

শিব শক্তি

নব পর্য্যায়।
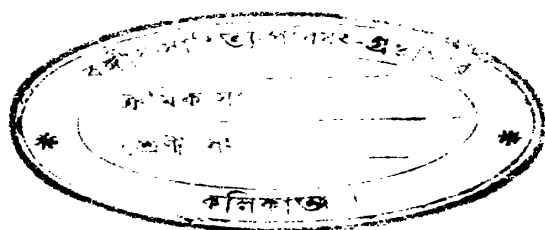
অকুণ্ঠং সর্ব্বকার্য্যেষু ধর্ম্ম-কার্য্যার্থমুদ্যতম্।
বৈকুণ্ঠস্য হি যদ্রূপং তস্মৈ কার্য্যাত্মনে নমঃ॥

২য় ভাগ { মাঘ, ১৩২৭। ইং জানুয়ারী, ১৯২১ } ১০ম সংখ্যা।

বর্ত্তমান শিক্ষা সমস্যা।

[শ্রীরাজেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল এম,এ, বি,এল।]

অধুনা ছাত্রগণ সাময়িক উত্তেজনার বশীভূত হইয়া দলে দলে স্কুল কলেজ পরিত্যাগ করিয়া শিক্ষা বিভ্রাট ঘটাইতে উদ্যত। তাহারা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজকীয় শিক্ষালাভে বিমুখ হইয়া জাতীয় বিদ্যালয়ের দেশীয় শিক্ষালাভের জন্য ব্যগ্র। ইহা কি বর্ত্তমান রাজনৈতিক আন্দোলনের ফল, অথবা ইহার মধ্যে কোন নিগূঢ় কারণ নিহিত আছে?—ইহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য।

কোন শিক্ষাপ্রণালী দেশের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুকূল ও আদর্শ স্থানীয় হইবে, এরূপ আশা করা কষ্ট-কল্পনা মাত্র। বিজ্ঞ জন কখনই এরূপ অসম্ভব আশা পোষণ করেন না। অসম্পূর্ণ মানব কিরূপে সম্পূর্ণতালাভের প্রয়াসী হইতে পারে? বিশেষতঃ আমরা পরাধীন জাতি রাজশক্তির বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আমরা কিরূপে স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারি? হিন্দুজাতির রাজভক্তি চিরপ্রসিদ্ধ—হিন্দু শাস্ত্রে রাজা দিক্‌পালক দেবতাগণের অংশ স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা বিজাতীয় শিক্ষার ফলে আর্য্যজাতির সেই চিরন্তন সংস্কার বিস্মৃত হইতে বসিয়াছি। সম্প্রতি ছাত্রগণের

উচ্ছৃঙ্খল ও অস্বাভাবিক ভাব দর্শনে অনুমিত হয় তাহারা বিজাতীয় শিক্ষার হলাহল পান করিয়াছেন—শুধু রাজা কেন? তাহারা পিতামাতা ও অভিভাবক প্রভৃতি গুরুজনদিগেরও অবাধ্য হইতে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন—তাঁহাদের মর্য্যাদা অতিক্রম করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা তাহাদিগকে সহস্র বিষয়ে উন্নত করিলেও, তাহারা যে নৈতিক রাজ্যে বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই, তাহা তাহাদের পূর্ব্বোক্ত আচরণে স্পষ্ট অনুভূত হয়।

বন্যার প্লাবনে নদীকূল উথলিয়া উঠিলে, দর্শকগণের মনে ভীতির সঞ্চার হয়—গৃহস্থগণ পুত্রকলত্র আত্মীয় স্বজনের পরিণাম চিন্তায় ও গৃহরক্ষায় ব্যস্ত হইয়া পড়ে—আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় দিগ্‌বিদিক নিরীক্ষণে অসমর্থ হয়—কর্ত্তব্য অবধারণে বিমুগ্ধ হয়। সম্প্রতি ছাত্রগণের উদ্‌ভ্রান্ত ও উচ্ছৃঙ্খল ভাব দর্শনে জনসাধারণের হৃদয়ে পূর্ব্বোক্তপ্রকার চিত্তবিকার জন্মিতে পারে—কিন্তু বন্যা যেরূপ চিরস্থায়ী নহে, তদ্রূপ এই আকস্মিক উন্মত্ত ভাব অচিরাৎ তিরোহিত হইবে। তখন আমরা দেশের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিব—শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্যা ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক বিষয়ের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া প্রতিবিধানে সমর্থ হইব, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই অস্বাভাবিক প্লাবনের প্রকৃত কারণ কি এবং ইহার ফলাফল কিরূপ ঘটিতে পারে, অগ্র তাহাই নির্ণয় করা আবশ্যক, কারণ বিপদের সময় প্রতিকার চিন্তা করা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক—রোগের নিদান না জানিলে, তাহার চিকিৎসা করাও দুঃসাধ্য।

ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে নূতন কংগ্রেসের প্রবল বন্যায় ছেলেরা হাবু ডুবু খাইতেছে—Non-co-oparation বা অসহযোগিতার ধ্বজা ধরিয়া তাহারা দেশ উদ্ধারে উন্মত্ত হইয়াছে—বিদেশী রাজার বিনা সংশ্রবে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়াছে। ইহা সম্ভব বা অসম্ভব হউক আমরা ইহার পরিপন্থী হইতে ইচ্ছা করি না, বরং "ভগবান্ তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করুন"—আমরা এইরূপ সদিচ্ছা পোষণ করি। কিন্তু আমাদের ধারণা শিক্ষাবিভাগে হস্তক্ষেপ করিবার ইহা প্রকৃত কারণ নহে—আকস্মিক গৌণ কারণ মাত্র। "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী

দেশের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুকূল নহে"—ইহাই মুখ্য কারণ। এই অভাবনীয় দুর্ঘটনায় এই মূল তথ্যটী লোকচক্ষুর সম্মুখে প্রতিভাত হইয়া পড়িয়াছে। অশিক্ষিত সাধারণ লোকে ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলেও শিক্ষিত ও ভুক্তভোগী যুবকবৃন্দ ইহা সহজেই অনুধাবন করিতে পারেন। আমরা বহুদিন অবধি এই শিক্ষার শোচনীয় পরিণাম চিন্তা করিয়া আসিতেছি, অদ্য স্বচক্ষে দেখিয়া সেই বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইল। বিশ্ব-নিয়ন্তার অচিন্ত্য-পূর্ব্ব বিধানে আমাদের শিক্ষারহস্য উদ্ঘাটিত হইয়া পড়িয়াছে—আবরণ উন্মোচিত হওয়ায় আমরা এই সত্যটী যথার্থভাবে উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। রোগের নিদান জানিতে পারিলে, তাহার প্রতিকার করা তত কঠিন নহে। আশা করি এক্ষণে শিক্ষিত সম্প্রদায় এই বিষম সঙ্কটকালে নির্ব্বিবাদে শিক্ষাসংস্কার কার্য্যে ব্রতী হইয়া জাতীয় অভাব ও দুঃখ দারিদ্র্য মোচন করিবেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে তাহাতে জীবিকার ত্রিবিধ পন্থা দৃষ্টিগোচর হয়—সরকারী চাকুরী, বেসরকারী চাকুরী ও স্বাধীন ব্যবসা। ইহাদের মধ্যে সরকারী চাকুরী অতি অল্পলোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে—বিশেষতঃ যাঁহারা জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি উচ্চ পদ লাভ করেন, তাঁহাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। অধিকাংশ লোকেই মাষ্টারী, কেরাণী-গিরি ও ওকালতী ব্যবসা করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। অবশ্য ডাক্তারী ও ইঞ্জিনিয়ারীও এই শিক্ষার অন্তর্গত, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ব্যবসায়ত্রয়ের তুলনায় ইহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। এই শিক্ষার প্রথম অবস্থায় যখন ছাত্রসংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম ছিল, তখন তাহারা অনায়াসে কাজ কর্ম্মে ঢুকিয়া—উদরান্নের সংস্থান করিতে পারিত। তখন বি,এ, এম্,এ পাশের দর ছিল—বি,এ পাশ করিলে হেড্ মাষ্টারী জুটিত, এম্-এ পাশ একটু ভাল রকম করিতে পারিলে প্রোফেসারী কার্য্য পাওয়া যাইত। যাহারা এণ্ট্রান্স বা এল্-এ পাশ করিতেন তাহারাও স্কুলে কিংবা আফিসের কার্য্যে প্রবেশ করিতে পারিতেন—আর বি,এল্ পাশ করিতে পারিলে ওকালতী ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থাগম হইত—পসার না হইলে অগত্যা মুন্সেফ হইতেন। বাস্তবিক তখন বি,এ, এম্,এ পাশ করা গৌরবের বিষয় ছিল। দশখানি গ্রামের মধ্যে কচিৎ দুই একজন গ্রাজুয়েট্ জন্মিতেন, কাজেই তাঁহাদের আদরের পরিসীমা

ছিল না। সাধারণ লোকে তাঁহাদিগকে 'বিদ্যার জাহাজ' জ্ঞান করিত এবং তাঁহাদের দর্শনলাভে কৃতার্থ হইত।

এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত অবস্থা স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হইবে। বিগত দশ বৎসর হইতে ক্রমান্বয়ে শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জীবিকার উপায় সঙ্কুচিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। শিক্ষাবিভাগের নূতন পদ্ধতি অনুসারে নূতন পরীক্ষা গৃহীত হওয়ায় ছাত্র সংখ্যা ক্রমশঃ বৰ্দ্ধিত হইতেছে বটে, কিন্তু ইহাতে তাহাদের অভাব বিদূরিত না হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। যেমন একদিকে ছাত্রদিগের পড়িবার ব্যয় ভার বৃদ্ধি পাইয়াছে, তেমনই তাহাদের বিদ্যালাভের মূল্য ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। পরীক্ষায় তাহাদের অধিকতর কৃতকার্য্যতা পরিলক্ষিত হইলেও, অনেকে অনুমান করেন তাহাদের শিক্ষা পূর্ব্বাপেক্ষা উৎকর্ষ লাভ করিতেছে না। পাঠ্য পুস্তকের তালিকা বৃদ্ধি পাইলেও, প্রশ্নপত্রগুলি তদনুপাতে উচ্চাঙ্গের হইতেছে না, বরং পূর্ব্বাপেক্ষা সহজ হওয়ায় অধিক সংখ্যক ছাত্র পরীক্ষায় পাশ করিলেও, তাহাদের শিক্ষার উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক, বরং অবনতিই লক্ষিত হইতেছে। বিগত দশ বৎসরের মধ্যে ম্যাট্রিকিউলেশন পরীক্ষার্থী ছাত্রসংখ্যা সাত আট হাজার হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় বিশ হাজারে দাঁড়াইয়াছে—বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে পৃথক্ পরীক্ষা না হইলে, এতদিনে পঁচিশ হাজার ছাপিয়া যাইত। এই ভাবে আরও দশ বছর পরীক্ষা কার্য্য চলিলে, ছাত্রসংখ্যা অন্যূন চল্লিশ হাজার হইবার সম্ভাবনা। এক পক্ষে ইহা দেশের সৌভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাই,—শিক্ষিত লোকের সংখ্যা দেশে যতই বৃদ্ধি হয়, ততই গৌরবের বিষয়। কিন্তু অপরপক্ষে ইহাও দেখা কৰ্ত্তব্য যে ইহাদের শিক্ষার মাপকাঠি ছোট হইতেছে কি না। শিক্ষার আদর্শ (Standard) ছোট করিয়া ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি করা কতদূর সঙ্গত তাহাও বিবেচ্য। কিন্তু ইহাতেও আমাদের তত ক্ষতি ছিল না, যদি আমরা বুঝিতাম যে এইরূপ অধিক সংখ্যক ছাত্র শিক্ষিত হইলে, তাহাদের দারিদ্র্য দুঃখ বিদূরিত হইবে।

যদি শিক্ষিত যুবকগণ ও জনসাধারণ সচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে ঈদৃশী শিক্ষায় হস্তক্ষেপ করিবার কোন বলবৎ কারণ থাকিত না। কিন্তু অধুনা দেশের যেরূপ দৈন্য দশা উপস্থিত হইয়াছে এবং

নিত্য ব্যবহার্য্য ও আহার্য্য দ্রব্যাদির মূল্য যেরূপ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর সংশোধন করা নিতান্ত আবশ্যক। বহুদিন অবধি আমরা এই শিক্ষাপদ্ধতির অসম্পূর্ণতা ও অনুপযুক্ততা অনুভব করিতেছি, কিন্তু এ যাবৎ ইহার প্রতিবিধানের কোন উপায় উদ্ভাবিত হয় নাই। লর্ড কার্জ্জনের আমলে যে শিক্ষাসংস্কার হইয়াছিল, তাহা সন্তোষজনক না হওয়ায়, স্যাড্লার কমিশন (Saddler Commission) বসিয়াছিল এবং তাহার রিপোর্টও প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষগণের বিলম্ব ও উদাসীনতায় এক্ষণে দেশবাসিগণ নিজ স্কন্ধে এই ভার লইতে বাধ্য হইবেন। ছাত্রগণের অস্থির ও চঞ্চল ভাবের ভাবী পরিণাম কি হইবে তাহা বলা কঠিন কিন্তু পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন।

আমরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত শিক্ষা 'সৌখীন' বা 'পোষাকী' শিক্ষা বলিতে বাধ্য হইলাম, কারণ ইহা সৌখীনভাবে জীবন কাটাইবার উপযোগী, কিন্তু ইহা উদরচিন্তার ধার ধারে না। যাঁহারা সঙ্গতিশালী ধনাঢ্য ব্যক্তি, তাঁহারা এই শিক্ষার গুরু ভার বহন করিতে সমর্থ, কিন্তু গরীব লোকের পক্ষে 'আটপৌরে' শিক্ষার প্রয়োজন। বর্ত্তমান শিক্ষাবিপ্লব এই আটপৌরে শিক্ষার সূচনা করিতেছে। সরকার বাহাদুর এইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পরাঙ্মুখ, সুতরাং দেশবাসিগণ এই নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক শিক্ষার প্রবর্ত্তন করুন—দেশের দুঃখ দারিদ্র্য দূর করিবার উপায় উদ্ভাবন করুন—নতুবা 'স্বরাজ' পাইবার আশা কোথায়? এই নূতন শিক্ষা প্রবর্ত্তনই স্বরাজ লাভের প্রথম সোপান। যাঁহারা মনে করেন অগ্রে স্বরাজ লাভ করিয়া পরে জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করিবেন, তাঁহাদের সহিত আমরা একমত হইতে পারি না, কারণ স্বরাজ এমন সুলভ বস্তু নহে, যে ইচ্ছা করিবামাত্র আমাদের হস্তগত হইবে। যে জাতি বহু শতাব্দী কাল অন্য জাতির পরাধীনতাশৃঙ্খলে আবদ্ধ, স্বাধীনতা লাভ তাহার পক্ষে বহু আয়াসসাধ্য। যে ত্যাগ স্বীকার, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়, চিত্তের একাগ্রতা ও জাতীয় একতা স্বাধীনতার মূল মন্ত্র, তাহা শিক্ষা করা অল্পকাল সাপেক্ষ নহে। বহুদিন শিক্ষানবিসী না করিলে, এই সকল সদ্‌গুণ লাভ করা যায় না। অতএব অন্য চিন্তা বর্জ্জন করিয়া সম্প্রতি এই গুরুতর শিক্ষাসমস্যার সমাধান করাই কর্ত্তব্য।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ইংরাজরাজ প্রবর্ত্তিত। ইহা মূলতঃ রাজকীয় শিক্ষা, সুতরাং বিদেশী রাজার রাজ্যশাসনের অনুকূল। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে কোর্ট অব্ ডিরেক্টর্স বিলাত হইতে যে অনুশাসন লিপি (Despatch) প্রেরণ করেন তাহাই এই শিক্ষাপ্রণালীর মূল ভিত্তি স্বরূপ। যাঁহারা এই শিক্ষা স্বরাজলাভের বিরোধী জ্ঞান করেন, তাঁহারা সচ্ছন্দে জাতীয় শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করিতে পারেন। কিন্তু উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার নিকট আমরা যে বহুল পরিমাণে ঋণী, একথা আমাদিগকে অবনত মস্তকে স্বীকার করিতে হইবে। ইহাই আমাদিগের প্রাথমিক শিক্ষা এই শিক্ষার ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়াই আমরা স্বরাজলাভে প্রয়াসী। এই শিক্ষাই আমাদের মনে স্বাধীনতালাভের ইচ্ছা জাগ্রত করিয়াছে। উন্নত জাতির ইতিহাস পাঠ করিয়াই আমরা জাতীয়ত্বের, উচ্চ আদর্শ লাভ করিয়াছি। আমাদের ভাগবত ও পুরাণ হইতে আমরা এই শিক্ষা পাই নাই। সুতরাং জাতীয় শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করিতে হইলে, পূর্ব্বোক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না, বরং পরস্পরের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলাই কর্ত্তব্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা যেমন সৌখীন জাতি, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাও তদ্রূপ হইয়াছে। আমরা ভয়ঙ্কর বিলাসী ও আরামপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছি। আমরা লিখিতে, পড়িতে ও বক্তৃতা করিতে বেশ পটু, কিন্তু শ্রমসহিষ্ণু ও আত্মনির্ভর হইতে শিক্ষালাভ করি নাই। সাধে কি ইংরাজেরা আমাদের 'বাবু' বলে? কবিতা রচনা, সূক্ষ্মশিল্পকলার অনুশীলন, ন্যায়, গণিত ও দর্শনের দুরূহ সমস্যা পূরণ প্রভৃতি বিষয়ে আমাদের নৈপুণ্য আছে, কিন্তু নিত্যব্যবহার্য্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে আমরা একান্ত উদাসীন এ বিষয়ে আমরা পরমুখাপেক্ষী। বিদেশীয় পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিতে আমরা যত্নশীল, কিন্তু দেশীয় শিল্পের উন্নতি সাধনে পরাঙ্মুখ। সংক্ষেপে আমরা লৌহের অনাদর করিয়া স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি মূল্যবান্ ধাতুর প্রতি একান্ত আসক্ত।

পোষাকী শিক্ষায় আমরা বহুকাল অভ্যস্ত হইয়াছি। এক্ষণে আটপৌরে শিক্ষার দিন আসিয়াছে। জাতীয় শিক্ষার ইহাই মূল ভিত্তি হওয়া আবশ্যক। গ্রামে, গ্রামে, নগরে, নগরে, এই শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হউক। এই শিক্ষাই স্বাধীনতার মেরুদণ্ড স্বরূপ। জাপান, আমেরিকা, ইংলণ্ড, জার্ম্মানী প্রভৃতি

স্বাধীন দেশের উন্নতিশীল জাতি এই প্রাথমিক আটপৌরে শিক্ষার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাদের সভ্যতা বিস্তৃত করিয়াছেন। এতদিন আমরা সেক্সপীর, মিল্টন, কালীদাস, ভবভূতি প্রভৃতি কবিকুলের উপাসনায় নিরত ছিলাম, এক্ষণে সে পোষাকী শিক্ষার দিন অস্তমিত ভীষণ জীবন সংগ্রাম আমাদিগকে গ্রাস করিতে উদ্যত। এক্ষণে কাপুরুষের ন্যায় রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করা আমাদের কর্ত্তব্য নহে, আসুন বীরের ন্যায় স্বদেশ সেবায় জীবন উৎসর্গ করি। যদি আমরা একমনে একপ্রাণে এই রূপ দৃঢ় ব্রত ধারণ করি তবেই জাতীয় শিক্ষার সুফল লাভ করিতে পারিব তবেই দেশোদ্ধারের আশা করিতে পারিব তবেই স্বরাজ লাভে সফল হইব, নতুবা সে আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র।

এই আটপৌরে শিক্ষা কিরূপ হওয়া আবশ্যক তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণের এই বিষয়ে আন্দোলন করা একান্ত আবশ্যক। সংক্ষেপে বলিতে গেলে দেশের দারিদ্র দুঃখ দুর করাই এক্ষণে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি সাধন, কৃষি ও গোরক্ষা, বিবিধ বৈজ্ঞানিক চর্চা প্রভৃতি বিষয়ে আমাদের মনোযোগ দিতে হইবে। সুশিক্ষিত বিশেষজ্ঞগণ (Specialists) এই শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করিতে থাকুন। কিন্তু সর্ব্বোপরি ধর্ম্মালোচনা এই শিক্ষার কেন্দ্র স্থানীয় বা মূলীভূত হওয়া বাঞ্ছনীয়, কারণ ধর্ম্ম শিক্ষা ব্যতিরেকে অন্যান্য শিক্ষা নিষ্ফল। বর্ত্তমান ছাত্রমণ্ডলীর উচ্ছৃঙ্খল ভাব দর্শনে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা না থাকায় ছাত্রগণের চরিত্রোন্নতির কিরূপে আশা করা যাইতে পারে? আমরা ধর্ম্মপ্রাণ জাতি, ভারতে ধর্ম্মান্দোলন ও ধর্ম্মসংস্কার হইতেই জাতীয় উন্নতির সম্ভাবনা। ইউরোপের ন্যায় রাজনীতি আমাদের দেশের আদর্শ নহে, এ দেশে চিরকাল রাজনীতি ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে ইহা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই। যদি আমরা ইউরোপীয় সভ্যতার চাক্‌চিক্যে ভুলিয়া বিলাসিতায় গা ঢালিয়া না দিই, তবে আমাদের ভয়ের কোন কারণ নাই। যদি আমরা আত্মস্বার্থে বলিদান দিয়া পরার্থপূতচিত্তে ধর্ম্মে লক্ষ্য রাখিয়া দেশের কল্যাণ কামনায় পরস্পর ভ্রাতৃভাবে সম্মিলিত হইতে শিক্ষা করি তবে দেশে মহাশক্তির আবির্ভাব

হইতে পারে—তাহার তুলনায় ইউরোপীয় আগ্নেয়াস্ত্র, অর্ণবযান ও ব্যোমযান অতি তুচ্ছ। ফলতঃ জাতীয় বিদ্যালয়ে যে কোন শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হউক, সর্ব্বাগ্রে ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে আমরা অনুরোধ করি।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে বর্ত্তমান দেশান্দোলনের ফলে প্রচলিত পোষাকী শিক্ষার সহিত ভবিষ্যৎ আটপৌরে শিক্ষার বিষম দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইবে একটী অপরটীর উচ্ছেদসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইবে—গ্রাম্য দলাদলির ভাব শিক্ষাক্ষেত্রেও প্রবেশ লাভ করিবে। যাঁহারা সরকারী চাকুরী ও সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার পক্ষপাতী, তাঁহারা স্ব স্ব পুত্রকন্যাগণকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজকীয় পোষাকী শিক্ষায় প্রবর্ত্তিত করিতে বাধ্য হইবেন, কিন্তু যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের বিনা সংস্রবে স্বরাজ লাভের প্রয়াসী তাঁহারা জাতীয় আটপৌরে শিক্ষার পোষকতা করিবেন। সম্প্রতি ইঁহাদের মধ্যে ভীষণ বিরোধ উপস্থিত হইলেও, কালে এই ভাব মন্দীভূত হইয়া আসিবে, কারণ এই উভয় শক্তির সমন্বয় ব্যতীত জাতীয়তা রক্ষার গত্যন্তর নাই।

কে তুমি মা।

[শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রত্নতত্ত্ববিশারদ]

হরঙ্গদি পরে কে গো নেংটা মেয়ে।
রসনা লহ লহ রুধির পিয়ে।
নরশির অসি করে কে ওই কপালিনী,
এলোকেশী অট্টহাসি সমর বিহারিণী,
ভূত পেতিনী সনে তাথেই নাচে।
কালো রূপে আলো ক'রে কখন বিমোহিনী,
(কভু) দৈত্যদলনী শ্যামা অসুর বিনাশিনী,
(আবার) বরাভয় দায়িনী দীন তনয়ে।
প্রকৃতি রূপেতে কভু জগত প্রসব করে,
কাল রূপে কাল 'পরে কালেতে সকলি হরে ;
বিধি বিষ্ণু হৃদে ধরে চরণ ল'য়ে। *

* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দিরে সৎসঙ্গ সভার অধিবেশনে শ্রীযুক্ত জীতেন্দ্র নাথ দত্ত শ্রীকণ্ঠ কর্ত্তৃক গীত হইয়াছিল।

নারীধর্ম্ম।

[শ্রীমৎ স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী।]

বিধবাবস্থা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বিধবার পবিত্রতা রক্ষার পঞ্চম উপায় এই যে, গৃহে কেহ বিধবা হইলে অন্যান্য দম্পতী এরূপ সতর্কভাবে দাম্পত্য সম্বন্ধ করিবে যাহাতে বিধবা তাহা জানিতে না পারে। ষষ্ঠ উপায় এক মাত্র সদাচার। সদাচার সম্পন্ন হওয়া বিধবার একান্ত আবশ্যক। পান ভোজনাদি বিষয়েও নিয়ত সাবধান থাকা উচিত। বিধবার শ্বেত বস্ত্র পরিধান করা ও অলঙ্কার ধারণ না করা উচিত কারণ রঞ্জিত বস্ত্র ও ধাতুনির্ম্মিত অলঙ্কার স্নায়বিক উত্তেজনা উৎপন্ন করিয়া বিধবার ব্রহ্মচর্য্যের অনিষ্ট সাধন করিতে পারে। এ বিষয়ে আরও অনেক বৈজ্ঞানিক কারণ আছে। নির্লজ্জ ভাবে ইতস্তত পরিভ্রমণ করা, কুরুচিপূর্ণ অভিনয় প্রভৃতি দেখা, অশ্লীল কথাবার্ত্তা কহা ও অসদ্‌ভাব বিশিষ্ট চিত্র বা পুস্তক দেখা বিধবার পক্ষে সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। বিধবার পানাহারের ব্যবস্থা ঘরের কর্ত্তা স্বয়ংই করিবেন, অন্যের উপর ভার দিবেন না। যেমন দেবতার উদ্দেশে আনীত বস্তু অন্য কেহ খায় না ঠিক তদ্রূপ বিধবার জন্য নির্দ্দিষ্ট দ্রব্য অন্যের লওয়া উচিত নহে। রাত্রিতে দুটি একটি বালক বালিকা সঙ্গে লইয়া বিধবা শয়ন করিবে এবং তাহাকে পিতা মাতা অথবা শ্বশুর শাশুড়ী ভিন্ন অন্য কেহ যেন কোনরূপ আজ্ঞা না করে। বিধবাকে গৃহ-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া অন্য সধবাদিগকে তাহার সহকারিণী ও তাহাদের উপর কৃপা করিতে আদেশ করিবে। বিধবা কোন ব্রত করিতে ইচ্ছুক হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা করাইবে, সে বিষয়ে কৃপণতা করিবে না। অন্যান্য সধবাদের অপেক্ষা তাহার ব্রতে ব্যয়-বাহুল্য হওয়া উচিত। ইহার সপ্তম উপায় এই যে বাল্য-বিবাহ ও বৃদ্ধ বিবাহ বন্ধ করিয়া দেওয়া। কন্যাগণের বিবাহ নিতান্ত বালিকাবস্থায় না দিয়া রজস্বলা হইবার পূর্ব্বে দেওয়া উচিত। এবং পুত্র না হইলেও পুরুষের বৃদ্ধাবস্থায় বিবাহ করা কর্ত্তব্য নহে। অষ্টম উপায় এই যে, ব্রহ্মচর্য্য ও সন্ন্যাস অবস্থায় পুরুষের পক্ষে যে শারীরিক, বাচিক ও মানসিক তপস্যার বিধান আছে এবং সাত্ত্বিক ভোজন, মনঃসংযম, সদাচার-পালন আদি যে সকল নিয়ম বলা হইয়াছে সে সমস্ত বিধবার আচরণ করা একান্ত প্রয়োজন। ইহা ভিন্ন ভগবদ্ ভজন, শাস্ত্রচর্চ্চা, বৈরাগ্য সম্বন্ধীয় গ্রন্থপাঠ, পাতিব্রত্য বিষয়ক গ্রন্থ বিচার ও মনন আধ্যাত্মিক উন্নতিকারী গ্রন্থের শ্রবণ

ও মনন করা উচিত। সধবাবস্থায় পতির সাকার মূর্ত্তির উপাসনা ছিল, এখন সন্ন্যাসীর সদৃশ বৈধব্যাবস্থায় তাহার নিরাকার স্বরূপের উপাসনার অধিকার হইয়াছে, তদ্দ্বারা সে পূর্ণ তন্ময়তা লাভ করিয়া মুক্তি পদ প্রাপ্ত হইবে; এই অবস্থা তুচ্ছ বিষয় সুখ-লিপ্সু গৃহস্থ স্ত্রী-পুরুষ অপেক্ষা অনেক উন্নত ও গৌরবান্বিত, সর্ব্বদা তাহাদের মনে এই ভাব জাগরূক রাখিবার চেষ্টা করা উচিত, যে পরমপতি ভগবানের কৃপায় প্রারব্ধানুসারে এই সমুন্নত সাধনাবস্থা লাভ হইয়াছে তাঁহার চরণ কমলে কৃতজ্ঞতা ও ভক্তির সহিত মন প্রাণ সমর্পন করা ও ত্রিসন্ধ্যায় নিয়মিত ভাবে তাঁহার ধ্যান করা ইত্যাদি অবশ্য শিখান উচিত। এই সকল উপায় অবলম্বন করিলে বিধবাগণ বিবিধ গুণ বিভূষিত ও বিদ্যাভাবযুক্ত হইয়া সাক্ষাৎ জগদম্বিকা স্বরূপ হইবেন এবং তাহাদের অবিদ্যাভাব চিরতরে বিধ্বংস হইয়া যাইবে। এইরূপ বিধবা স্বয়ংই আনন্দের সহিত ভোগবাসনা পরিত্যাগ করেন, বিষয়ের নামে তাহার মনে ঘৃণার উদ্রেক হয়, গৃহ-কার্য্যে তিনি পরম নিপুণা হইয়া থাকেন, অতিথি সৎকার, আগন্তুক কুটুম্ব ও আত্মীয় স্বজনের সম্বর্দ্ধনায় তিনি নিরতিশয় প্রীতি লাভ করেন, তাহার স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ ও শরীর লাবণ্যময় হয়। নারীত্বসুলভ ঈর্ষ্যাদি দোষ পরিহার পূর্ব্বক তিনি সধবাদিগের প্রতি দয়াবতী এবং বালক বালিকাদিগের প্রতি অনুরক্তা ও স্নেহশীলা হন। যে গৃহে এরূপ বিধবা বিদ্যমান থাকেন তথায় এক প্রত্যক্ষ দেবী অধিষ্ঠিতা বলিয়া মনে হয়। সেখানকার জন সমুদায় ঋষি চরিত্রের দ্রষ্টা ও ঋষিদের অসামান্য দূরদর্শীতা ও শান্তি-প্রিয়তার সুমধুর রসাস্বাদনকারী। এবং যেখানে এইরূপ পবিত্রভাব, প্রেম, শান্তি, দয়া প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলীর চিরনিবাস সেখানে প্রাগুক্ত অদূরদর্শী জনগণের ভ্রূণহত্যাদি পাপের শঙ্কা কল্পনায়ও স্থান পায় না। আর্য্যজাতি এক সময় এই ভাবে বিভোর ছিল, আজ যদি আবার ভারতকে যথার্থ উন্নত করিতে হয় তবে উল্লিখিত আদর্শের সম্মুখীন হইতে হইবে। অন্য কোন আদর্শ গ্রহণ করিলে সে আপনার স্বরূপে সংস্থিত হইয়া উন্নত হইতে পারিবে না স্বীয় জাতিগত মৌলিক আদর্শ ত্যাগ করিয়া বিজাতীয় আদর্শ গ্রহণের চেষ্টা করিলে তাহা সংস্কার-বিরুদ্ধ হওয়ায় "ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ" হইয়া আর্য্যজাতি ঘোর অবনতি প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং বর্ত্তমান সময়ের নেতৃবর্গ এই সকল

নারীধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান-রহস্য অবগত হইয়া যথার্থ উন্নতির চেষ্টা করিলে দেশ ও জাতির অশেষ কল্যাণ সংসাধিত হইবে।

পরিশেষে আরও দুই একটী বিষয় বিচারনীয়। পূর্ব্ব কথিত নিয়মানুসারে বিধবার রক্ষা ও শিক্ষা হইলে বিধবা পাতিব্রত্য পূর্ণরূপে পালন করিতে সমর্থ হইবেন ইহাতে সন্দেহ নাই। যদি মন্দ প্রারব্ধবশে শিক্ষা লাভ করিয়াও বিধবা নিজ ধর্ম্ম পালনে বিমুখ হয় ও অজস্র ব্যভিচার দ্বারা কুলে কলঙ্ক আরোপ করিতে থাকে তবে উক্তাবস্থায় অন্ত্যজ জাতি ব্যতীত অন্যবর্ণের পক্ষে এরূপ করা উচিত যে অনেক পুরুষ-সংবাস ও অজস্র ব্যভিচারের সঙ্কোচের নিমিত্ত এক পুরুষের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করাইয়া তাহাকে জাতি হইতে পৃথক করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। এইরূপ পুরুষ-সম্বন্ধ আদর্শ ধর্ম্ম ও বিবাহ পদবাচ্য নহে কিন্তু বহু পুরুষ সঙ্গ-জনিত অমিত ব্যভিচারের কবল হইতে রক্ষার জন্য এক পুরুষ সংগ্রহণ সংজ্ঞায় অভিহিত হইবে। এবং উক্তবিধ পতিতা স্ত্রীকে গৃহস্থ সতী স্ত্রীর সহিত মিশিতে দিবে না কারণ, অসৎ সঙ্গে তাহাদেরও চিত্ত বিকৃত হইতে পারে। অপর কিছু না হইলেও চিত্তগত পাতিব্রত্য ভাবের গাম্ভীর্য্য হ্রাস হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কুলে কলঙ্ক লাগিবে, সংসার নরক হইবে ইত্যাদি অনেক দোষ হেতু ওরূপ হতভাগিনী ও নিন্দনীয়া স্ত্রীকে গৃহ হইতে নিষ্কাশিত করাই যুক্তি ও শাস্ত্র সম্মত।

সতী ও অসতী রমণী গণের মধ্যে উক্তবিধ পার্থক্য ব্যবস্থিত হইলে সতী নারীদিগের অশেষ উপকার হইবে। তাহারা স্বপ্নেও স্বীয় পাতিব্রত্য প্রতিপালনে বীতশ্রদ্ধ হইবে না এবং বিধবা হইলেও কদাপি ব্যভিচারের ইচ্ছা করিবে না। অথবা পূর্ব্ব সংস্কার প্রবুদ্ধ হওয়ায় কদাচিৎ অভিলাষ হইলেও স্থূল দেহ পবিত্র রাখিতে অবশ্য চেষ্টিত হইবে। তাহাতে তাহারা পূর্ব্বোক্ত চারি প্রকার সতীর মধ্যে অধম শ্রেণীর সতী বলিয়াও পরিগণিত হইতে পারিবে। তাহা হইলেও সতীত্ব থাকিবে। বর্ত্তমান সময়ে ভারতের দুর্ভাগ্য হেতু কোন কোন স্থলে যথোক্ত ব্যভিচারিণী বিধবা সমাদৃত হইতেছে এবং কল্পিত-রূপে পর পুরুষ গ্রহণের জন্য উপদেশ ও উত্তেজনা দিয়া আর্য্য বিধবা দিগকে তাহাতে প্রবর্ত্তিত করিয়া ভারতকে অচিরে রসাতলে পাঠাইবার চেষ্টা

চলিতেছে। সুতরাং জাতীয়তাকে লক্ষ্য করিয়া বিচক্ষণ ব্যক্তিদিগের সাবধান হওয়া উচিত; নচেৎ এই কুকর্ম্মের জন্য ভবিষ্যতে ঘোর অনুতাপ ও নরক ভোগ করিতে হইবে। ঐরূপ ব্যভিচারিণী স্ত্রীদিগের অন্য পুরুষ সম্বন্ধ প্রসঙ্গে মহর্ষি পরাশর বলিয়াছেন যে—

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীনাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥

যদি পতি নিরুদ্দিষ্ট, মৃত, সন্ন্যাস্ত, ক্লীব বা পতিত হয় তবে এই পঞ্চবিধ আপদ উপস্থিত হইলে নারীগণ পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারে। পরন্তু পরাশর সংহিতায় যে প্রসঙ্গে এই শ্লোক লেখা আছে তাহা বিচার করিলে বিদিত হওয়া যায় যে ঐরূপ অবস্থায় অজস্র ব্যভিচার সম্ভাবনা হেতু তাহার প্রতিরোধ-কল্পে এই বিধান করা হইয়াছে কারণ, এই শ্লোক লিখিবার পরই মহর্ষি পরাশর তিন শ্লোকের দ্বারা পাতিব্রত্যের শ্রেষ্ঠতা ও উহার মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। যথা—পতি পরলোক বাসী হইলে যে স্ত্রী ব্রহ্মচারিণী থাকে তাহার স্বর্গবাস হয়, যে পতির অনুগমন করে সে অনন্ত কাল পতিলোকে বাস করে এবং পতি নিকৃষ্ট লোক প্রাপ্ত হইলেও স্বীয় পাতিব্রত্যবলে তাহাকে উচ্চ গতি প্রদান করিয়া থাকে ইত্যাদি। অতএব যেখানে পাতিব্রত্যের এত গৌরব বর্ণন করিয়াছেন সেখানে পাঁচ বিপদ আসিলেই সতী স্ত্রী তাহার পবিত্র পাতিব্রত্য-রত্নকে পদ-দলিত করিয়া অন্য পুরুষের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিবে ইহা পরাশরের অভিপ্রেত ও উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ নহে; সুতরাং ঐ শ্লোক অতি অধম কল্পে মন্দভাগিনী ব্যভিচারিণী স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়াই বিহিত হইয়াছে ইহাই প্রকৃত অর্থ; যেহেতু উল্লিখিত শ্লোকের প্রত্যেক শব্দ ও ভাবের উপর বিচার করিলে এই সূক্ষ্মার্থ প্রতিভাত হয়। মহর্ষি কথিত পঞ্চবিধ আপদ অসতীর পক্ষে অসহনীয় হইলেও পতিপরায়ণা সতীর নিকট উহা নিতান্ত নগণ্য কারণ, যে সতী সহাস্যবদনে জ্বলন্ত চিতায় প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া পতির অনুগামিনী হইয়া থাকে এবং যে নিজ হৃদয় মন্দিরে প্রিয়তমের নিরাকার স্মৃতি চিহ্ন সংস্থাপন করিয়া চতুর্দ্দশ ভুবনের যে কোন স্থানে পতি থাকুন না কেন তারহীন টেলিগ্রাফের মত পতির আত্মার সহিত মানসিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে তাহার পক্ষে পতি নিরুদ্দিষ্ট বা গতাসু হওয়া

বিশেষ বি..জনক বলিয়া কদাচ গ্রাহ্য নহে। এই প্রকার তৃতীয় আপদকে ত আপদই বলা যাইতে পারে না যেহেতু পতি সন্ন্যাসী হইলে যে স্ত্রী আপদ বিবেচনা করে তাহার অপেক্ষা দুশ্চরিত্রা ও পাপীয়সী সংসারে কে আছে? পতি ঐহিকসুখ অত্যন্ত অপকৃষ্ট জ্ঞানে নিবৃত্তিসেবী জিতেন্দ্রিয় ও আত্মারাম হইয়াছেন বলিয়া যদি তাহার প্রাণবল্লভা প্রিয়তমা পত্নী পতির এই আধ্যাত্মিক উন্নতিতে আপনাকে আপদগ্রস্তা ভাবিয়া অন্য পুরুষ-সঙ্গতা হয় তবে ইহা অপেক্ষা আর অধিক ঘৃণাজনক লজ্জার বিষয় কি হইতে পারে? বস্তুতঃ ব্যভিচারিণী স্ত্রীর নিকটই পতি সন্ন্যাসী হইলে তাহা বিপদ রূপে গণ্য হয়, কিন্তু সতীর পক্ষে বিপদ কখনই নহে। পতির এবম্বিধ উন্নতিতে সে নিজকে পরম সৌভাগ্যবতী ও চিরকৃতার্থ বোধে উল্লসিত হইয়া থাকে। এইরূপ, পতি ক্লীব, পতিত অথবা ব্যাধিযুক্ত হইলে, সতীর বিপদ হয় না কিন্তু ব্যভিচারিণীর ঘোরতর আপদ, কেন না, তাহার প্রীতি স্থূলকে লক্ষ্য করিয়া। সতীর ঠিক ইহার বিপরীত। সুতরাং সতীধর্ম্ম তপোমূলক ও সংযম প্রধান, বিষয়লালসার লেশ মাত্র তাহাতে নাই—তাই তাহার এত অসাধারণ শক্তি যে, সে পতিত পতিকে অধোগতি হইতে পরিত্রাণ করিয়া স্বর্গে লইয়া যাইতে সমর্থ হয়। এখন বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ অবহিত হইয়া বিচার করিলে বুঝিতে পারিবেন যে পতি পতিত অথবা ক্লীব হইলেও সতী নিজকে বিপন্ন মনে করেন না। অতএব মহর্ষি পরাশর কেবল মাত্র ব্যভিচারিণীদিগকে অধিকতর ব্যভিচার হইতে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে ঐরূপ আদেশ করিয়াছেন। ইহার ভাবার্থ ইদানীন্তন সাধারণ বুদ্ধিমানগণ সম্যক উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হইয়া কদর্থ করিয়া বসেন এবং জগতে অনর্থ ঘটাইয়া স্বার্থ-সিদ্ধি বিষয়ে চরিতার্থ হন।

বেদের মধ্যেও ঐরূপ অনেক মন্ত্র পাওয়া যায় যাহা গূঢ়ার্থ বিশিষ্ট। সে সকলের কোন একটিরও তাৎপর্য্য বিধবা বিবাহ বিষয়ক নহে কারণ, মনু বলিয়াছেন বেদে বিধবা বিবাহের মন্ত্র নাই কিন্তু নব্য বিদ্বৎপ্রবরগণ বিলক্ষণ বুদ্ধির বলে সেই সমুদায় মন্ত্রেরও বিপরীত ব্যাখ্যা করিতে ছাড়েন নাই। বাহুল্য প্রযুক্ত এখানে আর সে সকলের উল্লেখ করা গেল না অপিচ শুদ্ধান্তঃকরণে তাবৎ মন্ত্র সমূহকে বিচার করিলে অবশ্য এক অভিনব

তত্ত্ব অনুভূত হইবে যদ্দ্বারা সতী ধর্ম্মের গৌরব সমধিক বর্দ্ধিত হইবে। ভগবান পরাশর কথিত বচনের "পতৌ" এই সপ্তম্যন্ত পদকে লক্ষ্য করিয়া কেহ কেহ ঐ বচনের আশয় বাগ্‌দত্তা কন্যা বিষয়ে বলিয়া থাকেন কিন্তু মনু বাগ্‌দত্তাকন্যার বিবাহকে অপ্রশস্থ বলিয়াছেন। সন্তান কামনায় দেবরের সহিত বাগ্‌দত্তার সম্বন্ধ বিহিত হইলেও উহাকে বিবাহ বিধি বলিয়া তিনি স্বীকার করেন না।

এই প্রকার, অক্ষতযোনি বিধবার পুরুষান্তর গ্রহণের বিধি কোন মন্ত্রে বা শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যাইলে বুঝিতে হইবে যে উহাও দুষ্টা স্ত্রী বিষয়ক, যেহেতু যদি কোন অক্ষত-যোনি বিধবার স্বভাব, শারীরিক গঠন, হাবভাব ও অন্যান্য লক্ষণ নিচয় এবম্বিধ পরিলক্ষিত হয় যে সে ভবিষ্যতে ঘোর ব্যভিচারিণী হইয়া কুলে কলঙ্ক আরোপ ও সংসারে পাপের বীজ বপন করিবে তবে ওরূপ অক্ষতযোনি বিধবাকে ভাবি অজস্র ব্যভিচার হইতে সংযত করিবার জন্য কোন এক পুরুষের সহিত সম্বন্ধ করাইয়া জাতি হইতে পৃথক করিয়া দেওয়াই অন্তিম উপায়। এস্থলে ইহাকে আদর্শ ধর্ম্ম বা বিবাহ বলিয়া কেহ যেন ভ্রমে পতিত না হন এবং স্মরণ রাখা উচিত যে উহা ভাবি অধিক ব্যভিচার প্রতিরোধের শেষ উপায় মাত্র। মনু সংহিতায় উক্তবিধ পুনর্ভূসংস্কারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

যা পত্যা বা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়া।
উৎপাদয়েৎ পুনর্ভূত্বা স পৌনর্ভব উচ্যতে॥
সা চেদক্ষত-যোনিঃ স্যাদ্ গতপ্রত্যাগতাপি বা।
পৌনর্ভবেন ভর্ত্রা সা পুনঃসংস্কারমর্হতি॥

কোন বিশেষ দোষ হওয়ায় পতিকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত অথবা বিধবা হইয়া যে স্ত্রী স্বেচ্ছায় অন্য পুরুষকে পতিত্বে বরণ করে তাহাকে পুনর্ভূ এবং ঐ পুরুষের ঔরসে উহার গর্ভজাত সন্তানকে পৌনর্ভব কহে। অন্য কোন অক্ষতযোনি বিধবা অথবা সধবা স্বাধীন ভাবে গৃহ হইতে পলায়ন করিয়া আবার ফিরিয়া আসিলে উক্ত পৌনর্ভবের সহিত সেই স্ত্রীর পুনর্ভূ সংস্কার হইতে পারে। এই শ্লোক-প্রতিপাদ্য পৌনর্ভব পতি সাধারণ পুরুষ নহে কিন্তু পরিত্যক্তা, বিধবা অথবা পলায়িতা স্ত্রীর উপপতি মাত্র এবং

এখানে যে বিধবার উল্লেখ করা গিয়াছে সেও সাধারণ পতিব্রতা বিধবা নহে কারণ, দ্বিতীয় শ্লোকের 'সা' শব্দ দ্বারা প্রথম শ্লোক-কথিত লক্ষণ যুক্ত বিধবাকে বলা হইয়াছে, যে স্বয়ং অন্য পুরুষ হইতে পৌনর্ভব পুত্র উৎপাদন করিয়া থাকে। এই প্রকারে অক্ষতযোনি দুষ্ট লক্ষণযুক্ত বিধবার সম্বন্ধ পুনর্ভূ সংস্কার দ্বারা উপরিলিখিত পৌনর্ভব পুরুষের সহিত হইতে পারে এবং পুনরাগতা ক্ষত বা অক্ষত যোনি স্ত্রীর পুনর্ভূ সংস্কার (পৌনর্ভব নামে প্রসিদ্ধ হইতে বাঞ্ছা থাকিলে) উহার পূর্ব্ব পতির সহিতও হইতে পারে। উক্ত দুইটি বচনে অক্ষত-যোনি বিধবার বিবাহের কোন কথা নাই কিন্তু, অধিকতর ব্যভিচারকে বাধা দিবার জন্য ব্যভিচারোৎপন্ন পৌনর্ভবের সহিত সম্বন্ধ মাত্র বলা হইয়াছে। এখানে পুনঃ সংস্কার সাধারণ বৈদিক সংস্কার নহে জঘন্য পুনর্ভূসংস্কার মাত্র। সুতরাং সাধারণ বিবাহরূপে ইহাকে গণনা করা যাইতে পারে না। এই প্রকার অক্ষতযোনি বিধবার বিবাহ বিষয়ে অন্য কোন শাস্ত্রে প্রমাণ থাকিলে বুঝিতে হইবে যে, তাহাও এই উদ্দেশ্যে লিখিত হইয়াছে কারণ, এক বার বিবাহিতা স্ত্রীর দ্বিতীয় বিবাহের মন্ত্রই যখন বেদে দেখিতে পাওয়া যায় না তখন ক্ষত বা অক্ষত যোনি যাহাই হউক না কেন তাহার বিবাহ কিরূপে হইবে? পূর্ব্বোল্লিখিত বচন সমূহ দ্বারা ভগবান মনু ইহা পূর্ণরূপে নিষেধ করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ কেবল বেদে মন্ত্র নাই ইহাই কারণ নহে কিন্তু ইহা বিচারেরও বিরুদ্ধ; যখন বিবাহ কালীন সপ্তপদীগমনের পরে স্ত্রী পতির গোত্র প্রাপ্ত হইয়া থাকে তখন তাহার আর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না অতএব গোত্র পরিবর্ত্তন করিয়া পুনরায় বিবাহ কিরূপে হওয়া সম্ভব বা যুক্তিযুক্ত? মহর্ষি লিখিত বলিয়াছেন যে—

স্বগোত্রাদ্ ভ্রশ্যতে নারী উদ্বাহাৎ সপ্তমে পদে।
ভর্ত্তৃগোত্রেণ কর্ত্তব্যং দানপিণ্ডোদকক্রিয়ে॥

সপ্তপদীগমনের পরে স্ত্রী স্বগোত্রচ্যুত ও পতিগোত্র প্রাপ্ত হয় বলিয়া সেই সময় হইতে তাহার দান, শ্রাদ্ধ, তর্পণাদি ক্রিয়া পতিগোত্রোল্লেখ পুরঃসর হওয়া উচিত। এই সকল প্রমাণ ব্যতীত অক্ষতযোনি বিধবার বিবাহ বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগের নিকটে যুক্তি-বিরুদ্ধরূপে প্রতীয়মান হইবে। যখন ইহা অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত বলিয়া শাস্ত্র-যুক্তি দ্বারা সম্যক্ প্রতিপন্ন হইয়াছে যে,

এক মাত্র পতিতে তন্ময় হইয়াই স্ত্রী উন্নতি ও মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ তদ্‌ভিন্ন তাহার উদ্ধারের আর কোন উপায় নাই তখন যে বিধি উহার বিরুদ্ধ মার্গ প্রদর্শন করাইবে তাহাই স্ত্রীলোকের উন্নতির পরিপন্থী। দুরদৃষ্ট বশতঃ স্বাভাবিক দুশ্চরিত্রা অথবা সম্ভাবিত দুশ্চরিত্রা ক্ষত বা অক্ষত যোনি স্ত্রীকে কোন এক পুরুষের সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত করতঃ জাতি হইতে পৃথক করিয়া দেওয়াই তাহাকে অধিক পাপ হইতে রক্ষা করিবার এক মাত্র উপায়। ইহা আদর্শ ধর্ম্ম নহে। অক্ষতযোনির জন্য উক্ত উপায় তখনই অবলম্বন করিবে যখন তাহার শারীরিক লক্ষণাদি দ্বারা ইহা নিঃসংশয় রূপে অবধারিত হইবে যে কোন এক পুরুষের সহিত উহার সম্বন্ধ স্থাপন না করাইলে সে ভবিষ্যতে অজস্র ব্যভিচার করিবে; কিন্তু যে স্থলে ঐরূপ সম্ভাবনার সন্দেহ নাই সেখানে হঠ-কারিতার বশবর্ত্তী হইয়া উক্ত কল্প অবম্বলন করা মহাপাপ, কারণ, অক্ষতযোনি বিধবা প্রাপ্ত-বয়স্কা হইয়া যদি একপতিব্রত পালন করিতে এবং ব্রহ্মচারিণী হইয়া পতিলোক প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হয় তবে পূর্ব্ব হইতেই তাহাকে পাতিব্রত্যচ্যুত করতঃ পুরুষ সম্বন্ধ করাইতে কাহার অধিকার আছে? নিজ কপোল-কল্পনা, অভিমান বা ভ্রান্তবুদ্ধি দ্বারা অন্যকে ধর্ম্মচ্যুত করা সর্ব্বদাই বিগর্হিত এবং ধর্ম্ম ও বিচার বিরুদ্ধ। অতএব বিধবা মাত্রেরই পাতিব্রত্য এক মাত্র আদর্শ।

যেরূপ একপতিব্রতা স্ত্রী প্রশংসনীয় তেমনি একপত্নীব্রত পুরুষও প্রশংসার্হ। কিন্তু স্ত্রী-প্রকৃতির সহিত পুরুষ-প্রকৃতির বিভিন্নতা হেতু এক-পতিব্রত যেমন স্ত্রীলোকের পক্ষে এক মাত্র ধর্ম্ম ও মুক্তির কারণ, পুরুষের পক্ষে একপত্নীব্রত তাদৃশ নহে। উদ্বাহের উদ্দেশ্য উল্লেখ প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে রমণীর বিবাহ সৃষ্টিবিস্তার পূর্ব্বক পতিতে তন্ময় হইয়া মুক্তিপদ প্রাপ্তির জন্য এবং পুরুষের পানিগ্রহণ সৃষ্টিবিস্তারের সাহায্য করতঃ প্রকৃতিকে অবলোকন করিয়া স্বরূপে সংস্থিত হইবার অভিপ্রায়ে। স্ত্রীর মুক্তি পুরুষে তন্ময়তা দ্বারাই হওয়া সম্ভব বলিয়া তাহার সৃষ্টিবিস্তার উক্ত তন্ময়তাকে লক্ষ্য করিয়া হওয়া উচিত। উহার বিরুদ্ধ হওয়া বিধেয় নহে কারণ, এরূপ সৃষ্টিবিস্তার মুক্তি বিরোধী হইলে তাহা স্ত্রীলোকের পক্ষে অধর্ম্ম।

আর্য্যজাতি।

আর্য্যজাতির মধ্যে প্রকৃতির পূর্ণতা বিদ্যমান থাকায় ত্রিগুণানুসারে চতুর্ব্বর্ণের ব্যবস্থা যথাযথরূপে থাকা স্বাভাবিক। এই স্বভাবসিদ্ধ নিয়মানুসারে অনাদি কাল হইতে এই জাতি স্বীয় আর্য্যভাবমূলক জাতীয়তা অটল রাখিতে সমর্থ হইয়াছে এবং আজ এই ঘোর দুর্দ্দিনের সময়েও চাতুর্ব্বর্ণ্যের বীজ রক্ষা দ্বারা আপন সনাতন আর্য্যত্বের বীজ রক্ষা করিতেছে। জাতিতত্ত্বের রহস্য সম্বন্ধে বিচার করিলে বুঝিতে পারা যায় যে প্রাকৃতিক বর্ণব্যবস্থা ব্যতিরেকে কোন জাতিই দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পারে না এবং বর্ণব্যবস্থা-হীন জাতি অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া অন্য কোন জাতির মধ্যে লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে আর্য্যজাতিও যদি বর্ণ-ধর্ম্মের পালন না করে তবে সেও ক্রমশঃ আর্য্যভাব হইতে চ্যুত হইয়া অনার্য্যভাবাপন্ন হইয়া যাইবে এবং আরও অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে একেবারে বিনষ্ট হইয়া যাইবে। যদিও ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির পূর্ণ বিকাশ স্থল এই ভারতবর্ষে পূর্ণপ্রকৃতি-যুক্ত আর্য্যজাতির একেবারে বিনাশ হওয়া অসম্ভব ও বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ, কারণ এখানে স্বভাবতই ত্রিগুণের বিকাশ রহিয়াছে বলিয়া প্রবল তমোগুণের প্রাদুর্ভাবের সময়েও বর্ণধর্ম্মের বীজরক্ষা হইবে, তথাপি বর্ণব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত হইলে আর্য্যজাতি অতীব হীন অবস্থা প্রাপ্ত হইবে এবং উহার মধ্যে অনেক লোক অনার্য্য হইয়া যাইবে তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। একথা পূর্ব্বেই মনুসংহিতা ও মহাভারতের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বলা হইয়াছে যে ক্রিয়ালোপ হেতু বহু আর্য্যসন্তান অনার্য্যজাতিতে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। এখন নিম্নে বর্ণব্যবস্থার সঙ্গে আর্য্যজাতির অস্তিত্বের কি প্রকার সম্বন্ধ তাহা বলা হইতেছে। সৃষ্টির ধারা দ্বিবিধ—সমষ্টি ধারা এবং ব্যষ্টি ধারা। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে এই উভয় ধারাই নিম্নাভিমুখিনী। সমষ্টি সৃষ্টির ধারা নিম্নগামিনী বলিয়াই জগতে প্রথম সত্যযুগের পরে ত্রেতাযুগ, তদনন্তর দ্বাপর যুগ এবং সর্ব্বশেষে কলিযুগের আবির্ভাব হইয়া থাকে। এই নিয়মানুসারে সমষ্টি সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় সনকাদি পূর্ণ পুরুষ কেবল ব্রাহ্মণ মাত্র উৎপন্ন হইয়া পরে অন্যান্য জাতি উৎপন্ন হইয়াছিল। ব্যষ্টি সৃষ্টিতে জীব প্রকৃতির অধীন থাকিয়া প্রথমতঃ উদ্ভিদ্ হইতে পশুযোনি পর্য্যন্ত ক্রমোন্নতি প্রাপ্ত হইলেও মনুষ্য যোনিতে স্বতন্ত্রতা লাভ করায় তাহার সে উন্নতি রুদ্ধ হইয়া যায় এবং তাহার প্রবৃত্তি ইন্দ্রিয়ের দিকে হওয়ায় পুনরায়

নিম্নাভিমুখিনী হইতে থাকে। বর্ণধর্ম্ম সমষ্টি সৃষ্টি ও ব্যষ্টি সৃষ্টির এই উভয় নিম্নাভিমুখিনী ধারার গতি বন্ধ করে। এই জন্যই

"প্রবৃত্তিরোধকো বর্ণধর্ম্মঃ"

বর্ণধর্ম্ম প্রবৃত্তির রোধক—এইরূপ কর্ম্ম মীমাংসা দর্শনে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। বর্ণব্যবস্থা দ্বারা সৃষ্টির অধোমুখিনী ধারা দুইটী ঊর্দ্ধমুখিনী হয়। যেমন কৌশলে বাঁধ দিলে প্রবহমান নদীর গতি নিয়মিত করিয়া সমুদ্রাভিমুখিনী রাখা যায় সেই প্রকার চতুর্ব্বর্ণরূপী বাঁধের দ্বারা জীবের পাশবিক প্রবৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়া যায়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে সৃষ্টির প্রারম্ভে যদিও সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং সত্ত্বগুণের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল তথাপি পরবর্ত্তী কালে সৃষ্টির ধারা নিচের দিকে অগ্রসর হওয়ায় রজোগুণ ও তমোগুণের প্রভাবে জীবের গতি পাপের দিকে হইতে লাগিল। সেই সময় সেই পাপপ্রবণতার গতি রুদ্ধ করা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িল। যদি সৃষ্টির সেই পাপ-প্রবণ নিম্নাভিমুখিনী ধারার গতি রুদ্ধ করা না হইত তবে সমস্ত জীবই নানাপ্রকার পাপানুষ্ঠানের দ্বারা আর্য্যগুণ ভ্রষ্ট হইয়া অনার্য্যজাতিরূপে পরিণত হইয়া যাইত এবং ভারতবর্ষের এই চিরন্তন মর্য্যাদা নষ্ট হইয়া যাইত। এই জন্য সৃষ্টির সেই বিষম ধারা রুদ্ধ করিয়া জীবের ক্রমোন্নতিকে বাধারহিত করিবার উদ্দেশ্যে মহর্ষি মনু চতুর্ব্বর্ণরূপী চারিটী বাঁধ বাঁধিয়া দিয়াছেন। মনুষ্যের স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া মনু ঐ সময় বর্ণধর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বর্ণধর্ম্ম নামক গ্রন্থে এই বিষয়টী বিস্তৃতরূপে বর্ণন করা হইবে। এখন এই সকল বিচার দ্বারা ইহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, যখন সমষ্টি সৃষ্টির ধারা স্বভাবতই নিম্নগামিনী এবং বর্ণব্যবস্থা দ্বারা উহা বাধা প্রাপ্ত হইয়া থাকে তখন যে জাতির মধ্যে বর্ণব্যবস্থা নাই সেই জাতি ক্রমশঃ প্রকৃতির নিম্নগামিনী ধারার প্রবাহে পড়িয়া অধোগতি প্রাপ্ত হইবে এবং অন্তে অধোগতির পরাকাষ্ঠা হইলে সেই জাতি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়া যাইবে অথবা অন্য কোন উন্নত জাতির মধ্যে লয় প্রাপ্ত হইবে। পৃথিবীর ইতিহাস পাঠ করিলে বর্ণব্যবস্থাহীন বহুজাতির এই প্রকার পরিণাম অবগত হওয়া যায়। যে সময় প্রাচীন রোমের নাশের সময় আসিয়াছিল সেই সময় তথায় ভীষণ পাপের প্রবাহ বহিতেছিল। তাহারই ফলে রোমক জাতি অধোগতির পরাকাষ্ঠায় পঁহুছিয়া বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। এইরূপ গ্রীস, মিশর ও ব্রিটনের

কয়েকটী জাতির পরিণাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। ঐতিহাসিক বিদ্বানগণ পৃথিবীর ইতিহাস পাঠ করিয়া আজকাল একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন যে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-যুক্ত আর্য্যজাতি ব্যতীত আর কোন প্রাচীন জাতি বর্ত্তমান সময়ে নিজ স্বরূপে বিদ্যমান নাই। রোম, গ্রীস, মিশর প্রভৃতি বহু জাতির নাম ইতিহাসে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ঐ সকল জাতির অস্তিত্ব সম্বন্ধে সাক্ষী দিতে এক ব্যক্তিও আজ পৃথিবীর পৃষ্ঠে বিদ্যমান নাই। পক্ষান্তরে বর্ণধর্ম্মাবলম্বী আর্য্যজাতি আজিও আপন স্বরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। অতএব উপর্য্যুক্ত সিদ্ধান্ত হইতে ইহাই নিশ্চিত হয় যে বর্ণব্যবস্থার প্রবৃত্তি-রোধক বাঁধ ব্যতীত জগতে কোন জাতিই চিরস্থায়ী হইতে পারে না। বর্ণব্যবস্থাহীন জাতি প্রবৃত্তির প্রবাহে প্রবাহিত হইয়া আপন জাতীয়তা নষ্ট করিয়া ফেলে। ব্যষ্টি সৃষ্টিতে উদ্ভিদ হইতে পশুযোনি পর্য্যন্ত জীবের ক্রমোন্নতি বাধারহিত হইলেও যখন মনুষ্য যোনিতে আসিলে ইন্দ্রিয়াশক্তি ও স্বেচ্ছাচার প্রবৃত্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় জীবের গতি পুনরায় নিম্নাভিমুখী হইতে থাকে, তখন বর্ণব্যবস্থার বন্ধনই জীবের এই অবনতির সম্ভাবনা দূর করিয়া তাহাকে প্রকৃতির উন্নতিশীল ধারায় প্রবাহিত করিয়া ধীরে ধীরে শূদ্র যোনি হইতে ব্রাহ্মণ যোনি পর্য্যন্ত পঁহুছাইয়া দেয় এবং অবশেষে সত্ত্বগুণের পূর্ণতা দ্বারা নিঃশ্রেয়স মুক্তিপদে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করে। যদি বর্ণ ব্যবস্থার প্রবৃত্তিরোধক বাঁধ না থাকিত তবে জীব মনুষ্যযোনিতে আসিয়া পুনরায় নীচের দিকে যাইতে আরম্ভ করিত। তাহার উন্নতি না হইয়া পুনরায় পশ্বাদি যোনি প্রাপ্তি হইত, জীব মনুষ্যপদবী চ্যুত হইয়া ঘোর তমোময় মূঢ়যোনি প্রাপ্ত হইত। অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে, সমষ্টি সৃষ্টির ন্যায় ব্যষ্টি সৃষ্টিতেও বর্ণব্যবস্থা না থাকিলে কোন মনুষ্যজাতি চিরস্থায়ী হইতে পারে না। নিবৃত্তির কথা দূরে থাক, যে জাতির মধ্যে বর্ণব্যবস্থা নাই সে জাতিতে প্রবৃত্তির অনর্গল প্রবাহ রুদ্ধ করিবার কোনই উপায় না থাকায় জীবন প্রবৃত্তিময় হইয়া যায়। সে জাতির আধ্যাত্মিক উন্নতি বা মুক্তির প্রতি জীবনের লক্ষ্য থাকে না, কেবল স্থূল শরীরের ভোগমাত্র লক্ষ্য হইয়া যায়। তাহার পরিণামে সেই জাতি আর্য্যত্বের লক্ষণ হইতে চ্যুত হইয়া অনার্য্য ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে। সুতরাং অনার্য্য হইতে আর্য্যের বিশিষ্টতার যতপ্রকার লক্ষণ আছে তন্মধ্যে বর্ণ-ব্যবস্থাও একটী প্রধানতম লক্ষণ। বর্ণ ব্যবস্থা না থাকিলে প্রত্যেক জাতি আধ্যাত্মিক অবনতি

প্রাপ্ত হইয়া পশুর ন্যায় প্রকৃতি বিশিষ্ট হইয়া ত যাইবেই অধিকন্তু আরও গভীর ভাবে চিন্তা করিলে ইহাই স্থির হইবে যে, বর্ণ ব্যবস্থা না থাকিলে কোন জাতিই জগতে অধিক দিন জীবিত থাকিতে পারে না। নিম্নে এই সিদ্ধান্তের কারণ বর্ণন করা যাইতেছে।

প্রকৃতি-রাজ্যে প্রত্যেক বস্তুর অস্তিত্ব দীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত তখনই থাকিতে পারে যখন ব্যাপক প্রকৃতির সহিত তাহার সম সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকে। যে বস্তুর সহিত ব্যাপক প্রকৃতির সম সম্বন্ধ নাই পক্ষান্তরে বিপরীত বিষম সম্বন্ধ বিদ্যমান সে বস্তু অধিক দিন প্রকৃতি রাজ্যে বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। তাহার হয় সমূলে নাশ হইবে নতুবা অপর কোন সম প্রকৃতিযুক্ত বস্তুতে লয় হইয়া যাইবে। ব্যাপক প্রকৃতির ইহা একটী অলঙ্ঘনীয় স্থির নিয়ম। এই নিয়ম অনুসারে বিচার করিলে ইহাই সিদ্ধান্ত হইবে যে উদ্ভিদ হইতে আরম্ভ করিয়া মনুষ্য পর্য্যন্ত সমস্ত জাতিতে সম-প্রকৃতিক জাতিই জগতে জীবিত থাকিবে, বিষম প্রকৃতিযুক্ত জাতি কিছু কাল পরে বিনষ্ট হইয়া যাইবে অথবা অন্য কোন সম প্রকৃতিযুক্ত জাতির মধ্যে লয় প্রাপ্ত হইয়া যাইবে। ঘোড়া ও গাধার সংযোগে যে অশ্বতর (খচ্চর) জাতি উৎপন্ন হয় ঘোড়া বা গাধার প্রকৃতির সহিত তাহার সম্বন্ধ না থাকায় সে এক বিষম প্রকৃতির পশু, তাহার সহিত প্রকৃতির সম ধারার মিল নাই এবং এই নিমিত্তই উপর্য্যুক্ত বিজ্ঞান অনুসারে অশ্বতর জাতি জীবিত থাকিতে পারে না। একথা সকলেই জানেন যে, অশ্বতরের বংশ চলে না। এক জন্মের পরেই ঐ বংশ লুপ্ত হইয়া যায়। ইহা উপর্য্যুক্ত বিজ্ঞান অনুসারে বিষম প্রকৃতিরই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। পশুজাতির ন্যায় উদ্ভিদ ও অণ্ডজেও এই প্রাকৃতিক নিয়ম দৃষ্টি গোচর হয়। দুইটী বিভিন্ন জাতির উদ্ভিদের সংসর্গে যে বৃক্ষ নির্ম্মিত হয় অথবা দুইটী বিভিন্ন জাতীয় পক্ষীর মিলনে যে পক্ষী-জাতি উৎপন্ন হয় তাহার বংশ রক্ষা হয় না। ইহা প্রকৃতির বিষম ধারায় উৎপন্ন হওয়ার প্রাকৃতিক পরিণাম। এই দৃষ্টান্ত ও বিজ্ঞান অনুসারে মনুষ্যজাতি সম্বন্ধে বিচার করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইবে যে দুইটী বিভিন্ন বর্ণের মিলনে যে বর্ণসঙ্কর জাতি উৎপন্ন হয় তাহা প্রকৃতির সমধারায় অবস্থিত না হওয়ায় অধিক দিন জীবিত থাকিতে পারে না, উহা কিছুদিন পরেই নষ্ট হইবে অথবা অন্য ধারাস্থিত জাতির মধ্যে লয় প্রাপ্ত হইয়া যাইবে। আর্য্যজাতির বর্ণব্যবস্থা

নষ্ট হইলে এক বর্ণের সঙ্গে অপর বর্ণের সম্বন্ধ অবশ্যই হইবে এবং অনেক বর্ণসঙ্কর জাতি উৎপন্ন হইবে। কিন্তু এই প্রকার বর্ণসঙ্কর জাতি প্রকৃতির সমধারার বিরুদ্ধ হওয়ায় কিছুদিন পরে নাশ প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষে যখন হইতে বর্ণব্যবস্থা শিথিল হইতে আরম্ভ হইয়াছে তখন হইতে বহুতর বর্ণসঙ্কর জাতি এইরূপে উৎপন্ন হইয়া কিছুদিন পরে নষ্ট হইয়া গিয়াছে অথবা অন্য কোন জাতিতে লয় প্রাপ্ত হইয়াছে। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, প্রায়শঃ উচ্চবর্ণের বর্ণসঙ্কর পুরুষ অথবা স্ত্রীর সন্তান হয় না এবং লোক প্রায় নির্ব্বংশ হইয়া থাকে। প্রকৃতির বিষম ধারারই এই সকল পরিণাম। অতএব আর্য্যজাতির মধ্যে বর্ণব্যবস্থা নষ্ট হইলে কেবল যে আর্য্যজাতি অনার্য্যজাতিতে পরিণত হইবে তাহা নহে, অধিকন্তু ব্যাপক প্রকৃতিতে অনেক বিষম ধারা উৎপন্ন করিয়া কিছুকাল পরে তাহারই অতল গর্ভে ডুবিয়া যাইবে। অতএব এই সিদ্ধান্তই স্থিরীকৃত হইল যে, আর্য্যজাতির মধ্যে বর্ণব্যবস্থা বিদ্যমান থাকা এই জাতির জীবিত ও আর্য্যভাবযুক্ত থাকিবার পক্ষে পরম হিতকর। এই প্রকার বিচার অনুসারে অন্যান্য জাতি সম্বন্ধেও সিদ্ধান্ত হইবে যে, বর্ণব্যবস্থা ব্যতীত কোন জাতিই চিরস্থায়ী হইতে পারে না। অগস্ত কোমটী গভীর গবেষণা দ্বারা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছিলেন।

মনুষ্যেতর জীবের মধ্যেও এই বর্ণব্যবস্থার শৃঙ্খলা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। প্রকৃতির তমঃ-প্রধান রাজ্যে বাস নিবন্ধন যদিও উহাদের মধ্যে স্পষ্টরূপে বর্ণব্যবস্থা উপলব্ধি হয় না তথাপি উহাদের মধ্যে চাতুর্ব্বর্ণ্য রহিয়াছে। প্রকৃতির সর্ব্বাবয়বেই ত্রিগুণ ব্যাপ্ত। ত্রিগুণের দ্বারা চারিবর্ণ গঠিত হওয়া স্বাভাবিক যথা, সত্ত্বগুণে ব্রাহ্মণ, সত্ত্বরজোগুণে ক্ষত্রিয়, রজস্তমোগুণে বৈশ্য এবং তমোগুণে শূদ্র। পশ্বাদি জীবও যখন প্রকৃতি রাজ্যের অন্তর্গত তখন তাহাদের মধ্যেও এই চারি বর্ণের চারি শ্রেণী থাকা স্বাভাবিক। এই বিষয়টী বর্ণধর্ম্মনামক গ্রন্থে বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইবে। যখন মনুষ্যেতর প্রাণীর মধ্যেও চারি বর্ণ বিদ্যমান তখন আর্য্যই হউক কিম্বা অনার্য্যই হউক মনুষ্য মাত্রের মধ্যেই এই চারি বর্ণ অবশ্য থাকিবে। কেবল পার্থক্য এই যে আর্য্যজাতির মধ্যে ত্রিগুণের পূর্ণ বিকাশ থাকায়, ইহাদের মধ্যে কাল প্রভাবে বর্ণসঙ্কর সন্তান উৎপন্ন হইলেও চাতুর্ব্বর্ণ্যের বীজনাশ কদাপি হইবে না। কিন্তু অন্যান্য জাতিতে ত্রিগুণের পূর্ণবিকাশ না থাকায় তথায় বর্ণব্যবস্থা পূর্ণরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হয় না এবং এই জন্যই তথায় বর্ণসঙ্কর সন্তান উৎপন্ন হইয়া কিছুকাল পরে ঐ

সকল জাতি সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া যায়। বর্ণব্যবস্থার সহিত প্রত্যেক জাতির অস্তিত্বের এইপ্রকার অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্ত্তমান এবং অনার্য্য জাতি হইতে আর্য্য-জাতির বিশেষত্ব বিষয়ে এই বর্ণব্যবস্থার আবশ্যকতা একটী প্রবলতর প্রমাণ।

মীমাংসা শাস্ত্র রচয়িতা আচার্য্যগণ কোন মনুষ্যজাতির চিরস্থায়ীত্ব সম্বন্ধে অসবর্ণ বিবাহ, স্বগোত্র বিবাহ এবং অযোগ্যবয়স্ক বিবাহ এই তিন প্রকার বিবাহকে বাধকরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। নিজ নিজ বর্ণের মধ্যে বিবাহ না করিয়া যদি অসবর্ণ বিবাহ প্রচার করা যায় তবে মনুষ্যজাতি কি প্রকারে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে তাহা উপরে দেখান হইয়াছে। স্বগোত্র বিবাহেও জাতি নষ্ট হইয়া যায়। এ বিষয়ে মীমাংসা দর্শনশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, পুরুষের বীর্য্যের ধারা এবং স্ত্রীর রজের ধারা এই উভয় যদি পৃথক পৃথক এবং পরস্পর অমিশ্রিত থাকে তবেই ইহাদের শক্তি যথাবৎ বিদ্যমান থাকে, স্ত্রী যদি পুরুষের কাজ ও পুরুষ যদি স্ত্রীর কার্য্য করিতে আরম্ভ করে এবং স্ত্রী যদি পুরুষের প্রকৃতির এবং পুরুষ যদি স্ত্রীর প্রকৃতির অনুকরণে প্রবৃত্ত হয় তাহা হইলে যেরূপ উভয়ই আপন আপন স্বরূপ হইতে চ্যুত হইয়া যায় সেই প্রকার কোন মনুষ্য জাতিতে যদি বীর্য্যের ধারা এবং রজের ধারাকে অমিশ্রিতভাবে রক্ষা না করা যায় তবে উভয় ধারাই দুর্ব্বল হইয়া অবশেষে ঐ মনুষ্যজাতি সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়। এই বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের উপর স্থিত থাকিয়া আর্য্যমহর্ষিগণ স্বগোত্রা কন্যার সহিত বিবাহ করিতে বার বার নিষেধ করিয়াছেন এবং স্বগোত্রা কন্যা গমনকে মাতৃগমনের তুল্য বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। আর্য্য-জাতিতে ইহা একটী সাধারণ নিয়ম যে, যে গোত্রের পুরুষ হইবে সেই গোত্রের কন্যার সহিত তাহার বিবাহ হইতে পারে না। অর্থাৎ বীর্য্যের ধারাকে রজের ধারার সহিত মিলিত হইতে দেওয়া তাঁহাদের সিদ্ধান্ত অনুসারে অধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত। এই প্রকার পুরুষ অপেক্ষা কন্যার বয়স কম না হওয়াও আর্য্যজাতিতে ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া মানা হইয়াছে। সৃষ্টি প্রবাহে পুরুষ প্রধান ও স্ত্রী অপ্রধান। নারীধর্ম্ম নামক পুস্তকে এই বিজ্ঞানটী বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। যতদিন আমরা প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম পালন করিয়া চলিব ততদিনই এই প্রকৃতরাজ্যে জীবিত থাকিতে সমর্থ হইব। প্রাকৃতিক নিয়মের উপর বলাৎকার করিলে এবং প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতিকূলে চলিলে আমরা অল্পায়ু হইব ইহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। এই জন্যই বিবাহ পদ্ধতিতে পুরুষের প্রাধান্য এবং স্ত্রীর

গৌণত্ব রক্ষিত হইয়াছে। যে মনুষ্যজাতির বিবাহ পদ্ধতিতে পুরুষের অধিক বয়স এবং স্ত্রীর কম বয়স রাখিবার আদেশ থাকিবে সেই মনুষ্যজাতিই প্রকৃতির সাধারণ নিয়ম পালন করা হেতু অধিক দিন জীবিত থাকিতে পারিবে। এই প্রকার বৈজ্ঞানিক রহস্যপূর্ণ এবং জাতিকে দীর্ঘায়ু করিবার উপযোগী সদাচার যুক্ত নিয়ম আর্য্যজাতির মধ্যে বিদ্যমান থাকায় আর্য্যজাতি এত দীর্ঘ কাল জীবিত থাকিতে সমর্থ হইয়াছে। এবং এই সকল সিদ্ধান্তই অনার্য্য জাতি হইতে আর্য্য জাতির বিশেষত্ব প্রমাণিত করে।

এইরূপ আশ্রম ধর্ম্মও অনার্য্য হইতে আর্য্যের বিশেষত্বের অন্যতম লক্ষণ। কর্ম্ম মীমাংসা দর্শনে লিখিত আছে যে,—

প্রবৃত্তিরোধকো বর্ণধর্ম্মঃ।
নিবৃত্তিপোষকশ্চাপরঃ।
উভয়োপেতার্য্যজাতিঃ।
তদ্বিপরীতানার্য্যাঃ।

বর্ণধর্ম্ম প্রবৃত্তিরোধক এবং আশ্রম ধর্ম্ম নিবৃত্তির পোষক। যে জাতি বর্ণ ও আশ্রম এই উভয় ধর্ম্মের সহিত যুক্ত উহাই আর্য্যজাতি এবং ইহার বিপরীত অর্থাৎ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মবিহীন জাতি অনার্য্যজাতি। যে প্রকার প্রবৃত্তির নিরোধ করিয়া বর্ণ ধর্ম্ম মানুষকে অধোগতি হইতে রক্ষা করে সেই রূপ আশ্রম ধর্ম্মও নিবৃত্তি ভাব বৃদ্ধি করিয়া জীবকে আধ্যাত্মিক উন্নতির পরাকাষ্ঠায় পঁহুছাইয়া অন্তে মুক্তিপদ প্রদান করে। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে সংযমের সহিত ধর্ম্মমূলক প্রবৃত্তিব পালনের দ্বারা শরীর ও মন শুদ্ধ করিয়া নিবৃত্তি অভ্যাস পরিপক্ব হইলে মনুষ্য নিবৃত্তির চরম অবস্থা সন্ন্যাস আশ্রম লাভ করিতে সমর্থ হয়। এইরূপে পূর্ণ নিবৃত্তির প্রাপ্তি হইলে জীব নিঃশ্রেয়স মোক্ষপদ লাভে সমর্থ হয়। উপনিষদে লিখিত আছে,—

ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানশুঃ।

সকাম কর্ম্ম, সন্তানোৎপাদন অথবা ধনের দ্বারা অমৃতত্ব লাভ হয় না, কিন্তু একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ করা যায়। যে জাতিতে আশ্রম ধর্ম্ম যথাযথ প্রতিপালিত হয় সে জাতি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বাধা দূর করিয়া অবশ্যই নিবৃত্তির পূর্ণতায় মুক্তিপদ লাভে সমর্থ হইবে। কিন্তু যে জাতিতে আশ্রম ধর্ম্মের প্রচার নাই নিবৃত্তিভাবের পোষণ না হওয়ায় সে জাতি প্রবৃত্তির

অন্ধকূপে নিপতিত হয় তাহাতে তাহার জাতীয়তার নাশ, অধঃপতন এবং অবশেষে তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া যায়। যে জাতিতে আশ্রমধর্ম্ম নাই সে জাতি কখন আধ্যাত্মিক মার্গে উন্নতি করিতে পারে না এবং নিবৃত্তিমূলক আর্য্য ভাবও রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। আশ্রমধর্ম্ম দুর্ব্বল হওয়াতেই আজ আর্য্যজাতি এই প্রকার হীনদশা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং ইহার মধ্য হইতে নিবৃত্তি ভাব দূর হইয়া দিন দিন বিলাস বৃদ্ধি ও পাশবিক ভাব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। আশ্রম ধর্ম্ম যদি নষ্ট হইয়া যায় তবে এই জাতি আর্য্যত্ব ভ্রষ্ট হইয়া অনার্য্য জাতিতে পরিণত হইয়া যাইবে। সুতরাং আর্য্যজাতির রক্ষার নিমিত্ত আশ্রম ধর্ম্ম প্রতিপালন করা অত্যন্ত আবশ্যক এবং ইহাই অনার্য্যজাতি হইতে আর্য্যজাতির বিশেষত্বের অন্যতম লক্ষণ।

এইরূপ যে জাতিতে পাতিব্রত্য ধর্ম্মের পালন হয় না সে জাতি স্বীয় আর্য্যভাব রক্ষা করিতে সক্ষম হয় না এবং তাহার অস্তিত্বও দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত জগতে থাকা সম্ভবপর নহে। নারীধর্ম্ম নামক পুস্তকে বলা হইয়াছে যে, যে জাতি স্থূল শরীরের ভোগ বিলাসকেই জীবনের লক্ষ্য বলিয়া মনে করে এবং সূক্ষ্ম শরীর ও আত্মার আনন্দকে গৌণ মনে করে সে জাতির স্ত্রীলোকের মধ্যে কখন একপতিব্রত ধর্ম্মের পালন হইতে পারে না, তাহাদের এক পতির মৃত্যু হইলে পুরুষান্তর গ্রহণ করা স্থূল শরীরের ভোগ বিলাসের জন্য আবশ্যক হয়। যেখানে জীবনের আদর্শই এই প্রকার ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা তথায় অন্তঃকরণের হীনতা এবং উন্নত চরিত্রের অভাব হওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং এই প্রকার জাতির মধ্যে পূর্ণপুরুষ ও আর্য্যগুণসম্পন্ন পুরুষ কখনও উৎপন্ন হইতে পারে না। যে জাতির পিতামাতার মধ্যে এবং পূর্ব্ব পুরুষের অন্তঃকরণে যে সংস্কারের অভাব থাকে সেই জাতিতে সেই সংস্কার সম্পন্ন সন্তান কখন উৎপন্ন হইতে পারে না। আর্য্য পতিব্রতা স্ত্রীই জানেন যে, পতির স্থূল শরীর নষ্ট হইলে তাঁহার আত্মার সহিত আধ্যাত্মিক আনন্দ এবং সংযম-জনিত আনন্দের উপভোগ কি প্রকারে হইতে পারে। আর্য্য মাতাই জানেন যে, স্ত্রীর শরীর যখন পতিদেবতার পূজার নৈবেদ্য স্বরূপ, নিজের ভোগবিলাসের জন্য নহে তখন যেরূপ দেবতার অন্তর্ধান হইলে নৈবেদ্যের কোন প্রয়োজন থাকে না সেই প্রকার পতিদেবতার পরলোকবাস হইলে ইহলোকে স্ত্রীশরীর রাখিবার কোনই প্রয়োজন নাই।

নাড়ু
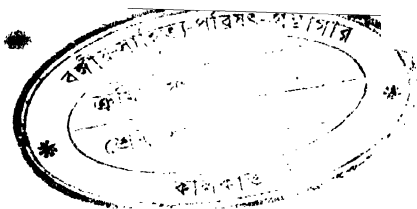
অকুণ্ঠং সর্ব্বকার্য্যেষু ধর্ম্ম-কার্য্যার্থমুদ্যতম্।
বৈকুণ্ঠস্য হি যদ্রূপং তস্মৈ কার্য্যাত্মনে নমঃ॥

২য় ভাগ] ফাল্গুন, সন ১৩২৭। ইং ফেব্রুয়ারী ১৯২১। [১১শ সংখ্যা।

নির্ব্বেদ।

[শ্রীজীবেন্দ্র কুমার দত্ত।]

(১)

বাহিরের কোলাহলে কাটাইয়ে দিনমান,
নিশীথে অন্তরে পশি' কেঁদে উঠে সারা প্রাণ!
অবোধ পাগল প্রায়
কত আশা ছলনায়,
আপনি করেছি হায়,
আপনারি অপমান!

ভেবে যারে আপনার
মাগিয়াছি অনিবার,
চরণে দলিয়ে তার
সে দিয়েছে প্রতিদান!

(২)

তবু হায়, একি মোহ! বার বার গেছি ছুটে,
আলেয়ার আলোটুকু সবটুকু নিতে লুটে!
সে কেবলি দূরে দূরে
জ্বলিয়াছে মায়াপুরে,
আমি শুধু ঘুরে ঘুরে
মরিয়াছি কাঁটা ফুটে!
চাহি এবে আঁখি তুলি'
কোথা এনু পথ ভুলি'!
হিয়ার বাঁধন গুলি
একে একে গেছে টুটে!

(৩)

বাহিরের কোলাহল ভাল আর নাহি লাগে,
গোপন প্রাণের মাঝে হাহাকার শুধু জাগে!
নীরব নিবিড় নিশি,
মেঘে ঢাকা দশ দিশি,
তা'রি সনে যেতে মিশি'
সকল হৃদয় মাগে!
নিঝুম নিজন ঘরে
বসে আছি কার তরে,—
কে নিবে বেদনা হরে,
চুমি' গাঢ় অনুরাগে!

শ্রীভারত-ধর্ম্ম-মহামণ্ডল ।

শ্রীভারত-ধর্ম্ম মহামণ্ডলের কাশীস্থ প্রধান কার্য্যালয় হইতে একখানি ইংরাজী ও একখানি হিন্দী মাসিক পত্র নিয়মিত প্রাকাশিত হয়। এবং মহামণ্ডলের অন্যান্য প্রান্তীয় কার্য্যালয় সমূহ হইতে অন্যান্য ভাষার মাসিক মুখপত্র বাহির হইয়া থাকে, যেমন—কলিকাতা কার্য্যালয় হইতে বাঙ্গলা ভাষার মুখপত্র, ফিরোজপুর—(পাঞ্জাব) কার্য্যালয় হইতে উর্দ্দু ভাষার মুখপত্র এবং মিরাট ও কানপুর কার্য্যালয় হইতে হিন্দী ভাষার মুখপত্র ।

শ্রীমহামণ্ডলের পাঁচ শ্রেণীর সভ্য হইয়া থাকেন। স্বাধীন নরপতি ও প্রধান প্রধান ধর্ম্মাচার্য্যগণ সংরক্ষক হন, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের বড় বড় জমিদার, ধনীব্যক্তি ও সামাজিক নেতাগণ সেই সেই প্রদেশের প্রতিনিধি মনোনীত হন, প্রত্যেক প্রান্তের অধ্যাপক ব্রাহ্মণমণ্ডলী সেই সেই প্রান্তীয় মণ্ডলের দ্বারা মনোনীত হইয়া ধর্ম্মব্যবস্থাপক সভ্য হইয়া থাকেন, ভারতবর্ষের সকল প্রান্ত হইতেই পাঁচ প্রকার সহায়ক সভ্য গৃহীত হন যথা—বিদ্যা-সম্বন্ধীয় কার্য্যকর্ত্তা সহায়ক সভ্য, ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কার্য্যকর্ত্তা সহায়ক সভ্য, মহামণ্ডল, প্রান্তীয় মণ্ডলী অথবা শাখাসভাসমূহে আর্থিক সহায়তাকারী সহায়ক সভ্য, বিদ্যাদানকারী বিদ্বান ব্রাহ্মণ সহায়ক সভ্য এবং ধর্ম্মপ্রচারকারী সাধুসন্ন্যাসী সহায়ক সভ্য, পঞ্চম শ্রেণীর সাধারণ সভ্য হিন্দুমাত্রই হইতে পারেন। হিন্দু-মহিলাগণ কেবল প্রথম তিন শ্রেণীর সহায়ক সভ্যা এবং সাধারণ সভ্যা হইতে পারেন । সকল প্রকার সভ্যগণকে এবং প্রান্তীয় মণ্ডল, শাখা সভা ও সংযুক্ত সভা সমূহকে শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল হইতে প্রকাশিত হিন্দী বা ইংরাজী ভাষার মাসিক পত্র বিনামূল্যে প্রদত্ত হইয়া থাকে । নিয়মিতরূপে বার্ষিক চাঁদা ২৲ দুই টাকা প্রদান করিলে হিন্দুনরনারী মাত্রেই মহামণ্ডলের সাধারণ সভ্য-শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন । সাধারণ সভ্যগণকে বিনামূল্যে মাসিক পত্রিকা দেওয়া ব্যতীত তাঁহাদিগের উত্তরাধিকারীগণ মহামণ্ডলের সমাজ-হিতকারী কোষ হইতে বিশেষ সহায়তা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ।

পত্র ব্যবহারের ঠিকানা :—

প্রধানাধ্যক্ষ, শ্রীভারত-ধর্ম্ম-মহামণ্ডল,
প্রধান কার্য্যালয়, জগতগঞ্জ, বেনারস ।

ধর্ম্ম-প্রচারের সুলভ সাধন।

বর্ত্তমান সময়ে কোন্ কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে দেশের যথার্থ উন্নতি হইতে পারে ? পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যে কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যাইবে সর্ব্বত্র এই একই উত্তর পাওয়া যাইবে যে একমাত্র ধর্ম্মভাবের বৃদ্ধি দ্বারাই দেশের এবং জাতির যথার্থ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। কারণ প্রকৃতির ক্রমোন্নতিশীল মার্গে সংসারকে ধারণ করিয়া রাখাই ধর্ম্মের ধারিকা শক্তির লক্ষণ। এক সময় ভারতবর্ষ জগতের গুরু ছিল, আজ কেন তাহার এই দীন হীন দশা উপস্থিত হইয়াছে ? এই প্রশ্নেরও ঐ একই উত্তর আসিবে যে একমাত্র ধর্ম্মভাবের হ্রাস হওয়াই ইহার কারণ। জগতে যে সকল ব্যক্তি কোন সৎকার্য্য করিতে উদ্যত হইয়াছেন তাঁহারাই অনুভব করিয়াছেন যে এইরূপ কার্য্যে কত প্রকার বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হয়। যদিও ধীর ব্যক্তি ঐ সকল বাধাবিঘ্নের প্রতি ভ্রূক্ষেপে না করিয়া বরং ঐ সকলের মধ্য দিয়াই স্বীয় অভীষ্ট মার্গে অগ্রসর হন তথাপি একথা অস্বীকার করা যায় না যে তাঁহাদের কার্য্যে বাধাবিঘ্ন দ্বারা যথেষ্ট প্রতিবন্ধক উৎপন্ন হইয়া থাকে। শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের ধর্ম্মকার্য্যে এই প্রকার অনেক বিঘ্ন উপস্থিত হইলেও এখন শ্রীভগবানের কৃপায় মহামণ্ডল জন সাধারণের হিত সাধন করিতে সু-অবসর প্রাপ্ত হইয়াছে। ভারত অধার্ম্মিক নহে, হিন্দুজাতি ধর্ম্ম-প্রাণ জাতি, উহার প্রতি লোমকূপে ধর্ম্ম-সংস্কার ওতপ্রোত, কেবল সে তাহার নিজের স্বরূপ বিস্মৃত হইয়াছে মাত্র। তাহাকে তাহার স্বরূপ জানাইয়া দেওয়া এবং তাহাকে তাহার পূর্ব্ব গৌরবান্বিত পদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা শ্রীভারত-ধর্ম্ম মহামণ্ডলের একটী পবিত্র এবং প্রধান উদ্দেশ্য। এই কার্য্য মহামণ্ডল ২০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং এখন ক্রমশই উহার ক্ষেত্র প্রসারিত হইতেছে।

এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দুইটীই মাত্র উপায় আছে,—

(১) উপদেশক বা ধর্ম্ম-বক্তাগণের দ্বারা ধর্ম্মপ্রচার করা এবং—

(২) ধর্ম্ম-রহস্য সম্বন্ধীয় মৌলিক পুস্তক সমূহ উদ্ধার ও প্রকাশ করা।

মহামণ্ডল প্রথম উপায় প্রথম হইতেই অবলম্বন করিয়াছে এবং এখন এই কয়েক বৎসর হইতে উপদেশক মহাবিদ্যালয় স্থাপন করিয়া এই পন্থা সুগম ও

পরিষ্কৃত করিয়া লইয়াছে। দ্বিতীয় পন্থা সম্বন্ধেও প্রথম হইতেই যথাযোগ্য উদ্যোগ আরম্ভ হইয়াছে। নানা প্রকার ধর্ম্মগ্রন্থ সংগ্রহ করা এবং স্বতন্ত্ররূপে লেখা, মাসিক পত্রিকা সম্পাদন করা এবং শাস্ত্রীয় গ্রন্থ আবিষ্কার করা-এই প্রকার উদ্যোগ মহামণ্ডল হইতে করা হইতেছে এবং উহাতে কথঞ্চিৎ সকলতাও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। কিন্তু এখনও এই কার্য্য সন্তোষজনক হয় নাই। শ্রীমহামণ্ডল এখন এই বিভাগকে বিশেষরূপে উন্নত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। উপদেশকদিগের দ্বারা যে ধর্ম্মপ্রচার হয় তাহার প্রভাব চিরস্থায়ী করিবার জন্য ঐ বিষয়ের পুস্তক প্রণয়ন ও প্রচার করা একান্ত আবশ্যক। কারণ বক্তা যে সকল কথা ২।১ বার শুনাইয়া দিবেন পুস্তকাদি ভিন্ন ঐ সকল বিষয় মনন করা যাইতে পারে না। তদ্ভিন্ন একজন বক্তা সকল প্রকার অধিকারীর কল্যাণ সাধন করিতে সমর্থ নহেন। বিভিন্ন শ্রেণীর পুস্তক প্রচারিত হইলে এই কার্য্য সহজসাধ্য হইয়া যায়। যিনি যে শ্রেণীর অধিকারী তিনি সেই অধিকারের পুস্তক পড়িবেন এবং মহামণ্ডলও সকল প্রকার অধিকারীগণের উপযোগী পুস্তক প্রণয়ন করিবেন। সংক্ষেপতঃ, দেশের উন্নতির জন্য, ভারতের গৌরব রক্ষার নিমিত্ত এবং মনুষ্যের মধ্যে যথার্থ মনুষ্যত্ব উৎপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে মহামণ্ডল এখন পুস্তক প্রকাশ বিভাগকে সমুন্নত করিতে যত্নবান হইয়াছেন। সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রার্থনা, তাঁহারা সকলে এই মহৎ কার্য্যে সহযোগিতা করুন এবং সেই সহায়তা দ্বারা নিজেদের ধর্ম্মমার্গে সমুন্নত করিতে প্রস্তুত হউন।

শ্রীভারত ধর্ম্ম-মহামণ্ডলের ব্যবস্থাপক পূজ্যপাদ শ্রী১০৮ স্বামী জ্ঞানানন্দজী মহারাজের সহায়তায় কাশীর প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ দ্বারা সম্পাদিত হইয়া এই গ্রন্থমালা প্রামাণিক, সরল ও সুদৃশ্যরূপে প্রকাশিত হইতেছে। এই গ্রন্থমালায় যে সকল গ্রন্থ অদ্য পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে তাহাদের নাম ও মূল্য নিম্নে লিখিত হইল।

পুস্তকের নাম		মূল্য
মন্ত্রযোগ সংহিতা (হিন্দী অনুবাদ সহিত)	...	১৲
ভক্তি দর্শন (হিন্দী ভাষ্য সহিত) ...	...	১৲
যোগদর্শন (হিন্দী ভাষ্য সহিত, নূতন সংস্করণ)	...	২৲

নবীন দৃষ্টিতে প্রবীণ ভারত (হিন্দী)	...	...	১৲
দৈবীমীমাংসা দর্শন প্রথম ভাগ (হিন্দী ভাষ্য সহিত)			১॥৹
কল্কিপুরাণ (হিন্দী অনুবাদ সহিত)	...	...	১৲
উপদেশ পারিজাত (সংস্কৃত)	...	...	॥৹
গীতাবলী (হিন্দী গান)	...	...	॥৹
ভারতধর্ম্মমহামণ্ডল রহস্য (হিন্দী)	...	...	১৲
সন্ন্যাস গীতা (হিন্দী অনুবাদ সহিত)	...	...	৸৵
গুরুগীতা (ঐ)	...	...	।৹
ধর্ম্ম-কল্পদ্রুম (হিন্দী) প্রথম খণ্ড	...	...	২৲
,, দ্বিতীয় খণ্ড	...	...	১॥৹
,, তৃতীয় খণ্ড	...	...	২৲
,, চতুর্থ খণ্ড	...	...	২৲
,, পঞ্চম খণ্ড	...	...	২৲
,, ষষ্ঠ খণ্ড	...	...	১॥৹
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রথম খণ্ড (হিন্দী ভাষ্য সহিত)		...	১৲
সূর্য্যগীতা (হিন্দী অনুবাদ সহিত)	...	...	॥৹
শম্ভুগীতা (ঐ)	...	...	৸৵
শক্তিগীতা (ঐ)	...	...	৸৹
ধীশগীতা (ঐ)	...	...	॥৹
বিষ্ণুগীতা (ঐ)	...	...	৸৹

এই সকল পুস্তকের মধ্যে যিনি ন্যূন পক্ষে ৪৲ চারি টাকা মূল্যের পুস্তক পূর্ণ-মূল্যে ক্রয় করিবেন অথবা স্থায়ী গ্রাহক হইবার চাঁদা ১৲ টাকা অগ্রিম প্রদান করিবেন তাঁহাকে ঐ সকল পুস্তক এবং ভবিষ্যতে যে সকল পুস্তক প্রকাশিত হইবে সমস্ত টাকায় বার আনা মূল্যে দেওয়া হইবে।

এই গ্রন্থমালায় ভবিষ্যতে যে সকল পুস্তক প্রকাশিত হইবে তাহার একখানি করিয়া প্রত্যেক স্থায়ী গ্রাহককে ক্রয় করিতে হইবে। যে সকল পুস্তক এই বিভাগ দ্বারা প্রকাশ করা হইবে তাহা এক বিদ্বৎ পরিষদ কর্ত্তৃক পূর্ব্বেই মনোনীত করাইয়া লওয়া হইবে। প্রত্যেক গ্রাহক নিজ নম্বর প্রদর্শন

করাইয়া প্রধান কার্য্যালয় হইতে অথবা তিনি যেখানে থাকেন তথায় আমাদের শাখা সভা থাকিলে তথা হইতে উক্ত কম মূল্যে পুস্তক ক্রয় করিতে পারিবেন। যে সকল ধর্ম্ম-সভা এই ধর্ম্মকার্য্যে সহায়তা করিতে ইচ্ছুক এবং যে সকল ব্যক্তি এই গ্রন্থমালার স্থায়ী গ্রাহক হইতে চান তাঁহারা আমার সহিত পত্র ব্যবহার করিবেন।

নিবেদক—শ্রীগোবিন্দ শাস্ত্রী দুগবেকর
অধ্যক্ষ, শাস্ত্রপ্রকাশ বিভাগ
শ্রীভারত-ধর্ম্ম-মহামণ্ডল, প্রধান কার্য্যালয়,
জগৎগঞ্জ, বেনারস।

সপ্ত গীতা।

পঞ্চোপাসনা অনুসারে পাঁচ প্রকার উপাসকদিগের নিমিত্ত পাঁচ গীতা—শ্রীবিষ্ণুগীতা, শ্রীসূর্য্যগীতা, শ্রীশক্তিগীতা, শ্রীধীশগীতা, ও শম্ভুগীতা, সন্ন্যাসীগণের জন্য সন্ন্যাস গীতা এবং সাধকগণের জন্য গুরুগীতা হিন্দী অনুবাদ সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল এই সাতখানি গীতা নিম্নলিখিত কয়েকটী উদ্দেশ্য সাধনের উদ্দেশে প্রকাশিত করিয়াছেন। যথা - যে সাম্প্রদায়িক বিরোধ উপাসকগণকে ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম সঞ্চয় করিবার সুযোগ প্রদান করিতেছে, যে সাম্প্রদায়িক বিরোধ উপাসকগণকে অহঙ্কারত্যাগী হওয়ার পরিবর্ত্তে ঘোর সাম্প্রদায়িক অহঙ্কার সম্পন্ন করিয়াছে, ভারতের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা যে সাম্প্রদায়িক বিরোধের জাজ্জ্বল্যমান প্রত্যক্ষ ফল এবং যে সাম্প্রদায়িক বিরোধ সাকার উপাসকগণের মধ্যে ঘোর বিদ্বেষানল প্রজ্জ্বলিত করিয়াছে সেই সর্ব্বানর্থকরী সকল উন্নতির পরিপন্থী সাম্প্রদায়িক বিরোধ সমূলে উন্মুলিত করা; উপাসনার নামে যে প্রবল ইন্দ্রিয়াশক্তির চরিতার্থতা সাধিত হইয়া থাকে সমাজে তাহার অস্তিত্ব থাকিতে না দেওয়া এবং সমাজে যথার্থ ভগবদ্ভক্তির প্রচার দ্বারা সাধকগণের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক অভ্যুদয় এবং নিঃশ্রেয়স পদ প্রাপ্তির সুবিধা করিয়া দেওয়া।

এই সপ্তগীতায় অনেক দার্শনিক তত্ত্ব, উপসনাকাণ্ডের অনেক রহস্য এবং

প্রত্যেক উপাস্য দেবের সহিত সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয় প্রাঞ্জল ও বিস্তৃতরূপে বর্ণন করা হইয়াছে। এই সপ্ত গীতা উপনিষৎ স্বরূপ। প্রত্যেক উপাসক স্বীয় উপাস্য দেবের গীতা হইতে ত লাভবান হইবেনই অধিকন্তু অন্য চারি গীতা হইতেও উপাসনার অনেক তত্ত্ব ও অনেক বৈজ্ঞানিক রহস্য সম্বন্ধে প্রচুর জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন। সাধকের অন্তঃকরণে প্রচলিত সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ সমূহ দ্বারা যেরূপ বিরোধ উৎপন্ন হয় এই সকল গীতা পাঠ করিলে আর সেরূপ হইবে না এবং তিনি পরম শান্তির অধিকারী হইতে পারিবেন। সন্ন্যাস গীতায় সকল সম্প্রদায়ের সাধু ও সন্ন্যাসীদিগের জন্য আবশ্যকীয় সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সন্ন্যাসীগণ এই গীতা পাঠ করিলে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন। গৃহস্থের জন্যও এই গ্রন্থ বিশেষ জ্ঞানের ভাণ্ডার স্বরূপ। শ্রীমহামণ্ডল হইতে প্রকাশিত গুরুগীতার ন্যায় গ্রন্থ আজ পর্য্যন্ত কোন ভাষায়ই প্রকাশিত হয় নাই।* ইহাতে গুরু লক্ষণ, উপাসনার রহস্য ও ভেদ, মন্ত্র, হঠ, লয় ও রাজ যোগিগণের লক্ষণ, গুরু মাহাত্ম্য, শিষ্যকর্ত্তব্য, পরম তত্ত্বের স্বরূপ এবং গুরুশব্দের অর্থ প্রভৃতি বিষয় সুন্দর রূপে বর্ণিত হইয়াছে। মূল সরল সংস্কৃত কবিতায়, সরল হিন্দী অনুবাদ এবং বৈজ্ঞানিক টিপ্পণী সহিত এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থ গুরু ও শিষ্য উভয়েরই সমানরূপে উপকারক। পঞ্চোপাসনার পাঁচ গীতায় প্রত্যেক উপাস্য দেবের সুন্দর ত্রিবর্ণ চিত্র সংযোজিত হইয়াছে। মূল্য পূর্ব্বোক্ত তালিকায় দ্রষ্টব্য।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার, নিগমাগম বুক ডিপো,
মহামণ্ডল ভবন, জগৎগঞ্জ, বেনারস।

ধার্ম্মিক বিশ্বকোষ।

(শ্রীধর্ম্মকল্পদ্রুম)

ইহা হিন্দুধর্ম্মের অদ্বিতীয় ও পরমাশ্চক গ্রন্থ। হিন্দুজাতির পুনরুন্নতির জন্য যে সকল বিষয় অত্যন্ত আবশ্যক তন্মধ্যে এইরূপ একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর

---

*শ্রীবঙ্গধর্ম্মমণ্ডল হইতে এই গ্রন্থ বঙ্গাক্ষরে বঙ্গানুবাদ সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ।০ চারি আনা।

ধর্ম্মগ্রন্থের প্রয়োজন ছিল যাহার অধ্যয়ন অধ্যাপনায় সনাতন ধর্ম্মের রহস্য ও বিস্তৃত স্বরূপ এবং উহার অঙ্গ উপাঙ্গ সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান লাভ করা যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্র সমূহের মর্ম্ম উপলব্ধি করা যায়। এই গুরুতর অভাব দূর করিবার জন্য ভারতের প্রসিদ্ধ ধর্ম্মবক্তা এবং ভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের উপদেশক মহাবিদ্যালয়ের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীমৎ স্বামী দয়ানন্দজী মহারাজ এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাতে বর্ত্তমান সময়ের আলোচ্য সকল বিষয়ই বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইবে। আজ পর্য্যন্ত ইহার ছয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে।* উক্ত ছয় খণ্ডের বিষয় সূচী এইরূপ—ধর্ম্ম, দান ধর্ম্ম, তপোধর্ম্ম, কর্ম্মযজ্ঞ, উপাসনাযজ্ঞ, জ্ঞানযজ্ঞ, মহাযজ্ঞ, বেদ, বেদাঙ্গ, দর্শন শাস্ত্র (বেদোপাঙ্গ), স্মৃতিশাস্ত্র, পুরাণশাস্ত্র, তন্ত্রশাস্ত্র, উপবেদ, ঋষি ও পুস্তক, সাধারণ ধর্ম্ম ও বিশেষ ধর্ম্ম, বর্ণধর্ম্ম, আশ্রম ধর্ম্ম, নারীধর্ম্ম, আর্য্যজাতি, সমাজ ও নেতা, রাজা ও প্রজা ধর্ম্ম, প্রবৃত্তি ধর্ম্ম ও নিবৃত্তি ধর্ম্ম, আপদ্ধর্ম্ম, ভক্তি ও যোগ, মন্ত্রযোগ, হঠযোগ, লয়যোগ রাজযোগ, গুরু ও দীক্ষা, বৈরাগ্য ও সাধন, আত্মতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, প্রাণ ও পীঠতত্ত্ব, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তত্ত্ব ঋষি দেবতা ও পিতৃতত্ত্ব, অবতার তত্ত্ব, মায়াতত্ত্ব, ত্রিগুণ তত্ত্ব, ত্রিভাব তত্ত্ব, কর্ম্ম তত্ত্ব, মুক্তি তত্ত্ব, পুরুষার্থ ও বর্ণাশ্রমসমীক্ষা, দর্শন সমীক্ষা, ধর্ম্ম সম্প্রদায় সমীক্ষা এবং ধর্ম্ম পন্থ সমীক্ষা। পরবর্ত্তী খণ্ড সমূহে নিম্নলিখিত বিষয় সকল বর্ণিত হইবে। সাধন সমীক্ষা, চতুর্দ্দশ লোক সমীক্ষা, কাল সমীক্ষা, জীবন্মুক্তি সমীক্ষা, সদাচার, পঞ্চমহাযজ্ঞ, আহ্নিক কৃত্য, ষোড়শ সংস্কার, শ্রাদ্ধ, প্রেততত্ত্ব ও পরলোক, সন্ধ্যাতর্পণ, ওঁকার মাহাত্ম্য ও গায়ত্রী, ভগবন্নাম মাহাত্ম্য, বৈদিক মন্ত্র ও শাস্ত্রের অপলাপ, তীর্থমহিমা, সূর্য্যাদি-গ্রহপূজা, গোসেবা, সঙ্গীত শাস্ত্র, দেশ ও ধর্ম্ম-সেবা ইত্যাদি। আজকাল অশাস্ত্রীয় ও যুক্তিহীন ধর্ম্মগ্রন্থ ও ধর্ম্মপ্রচার দ্বারা দেশের যে অনিষ্ট হইতেছে এই গ্রন্থদ্বারা সেই সমস্ত দূর হইয়া যথার্থ সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের প্রচার হইবে। এই গ্রন্থে সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতের লেশ মাত্র নাই এবং সকল প্রকার অধিকারীর কল্যাণের নিমিত্ত নিরপেক্ষভাবে সমস্ত বিষয় প্রতিপাদিত

*বাঙ্গলায় ৪ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। আর ২ খণ্ডও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

শ্রীভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডলে নিয়মিত শাস্ত্রচর্চ্চা।

শ্রীভারত-ধর্ম্ম মহামণ্ডল ধর্ম্ম-প্রচার কল্পে অনেক প্রকার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন—হিন্দু-সাধারণের তাহা অবিদিত নাই। মহামণ্ডলের বিবিধ ধার্ম্মিক অনুষ্ঠানের মধ্যে উপদেশক মহাবিদ্যালয় সংস্থাপনও একটী বিশিষ্ট অনুষ্ঠানরূপে গণ্য। উত্তম উত্তম ধর্ম্ম-বক্তা ইহাতে প্রস্তুত হইয়াছেন, হইতেছেন এবং ভবিষ্যতে হইবেন এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কাশীধামের বিবিধ বিষয়ের বিশিষ্ট পণ্ডিত ও সন্ন্যাসীগণকে ইহার অধ্যাপক নিযুক্ত করা হইয়াছে। ইহার নিয়মিত পাঠক্রমের অতিরিক্ত বর্ত্তমানে এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে মাসের মধ্যে ১০ দিন বক্তৃতা শিক্ষা, ১০ দিন শাস্ত্রীয় বিচার শিক্ষা এবং ১০ দিন সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া যাইবে। বক্তৃতায় সঙ্গীতের সাধারণ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এই বিশুদ্ধ সঙ্গীতরূপ পঞ্চম বেদ দেশ হইতে লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। এই জন্য বক্তৃতা ও শাস্ত্রীয় বিচার শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গীত শিক্ষারও সমাবেশ করা হইয়াছে। সর্ব্ব-সাধারণ এই ধর্ম্মচর্চ্চার সময় যোগ দান করিতে পারেন।

শ্রীবিশ্বনাথঅন্নপূর্ণা দানভাণ্ডার।

দীন-দরিদ্র-গণের সাহায্যতার জন্য মহামণ্ডলে এই সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। এই সভা দ্বারা অতি বিস্তৃতরূপে শাস্ত্রপ্রকাশ কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে। এই সভা দ্বারা ধর্ম্ম-পুস্তক প্রকাশিত করিয়া বিনামূল্যে বিতরণেরও ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। এই ভাণ্ডার দ্বারা মহামণ্ডলের প্রকাশিত তত্ত্ববোধ, সাধুগণের কর্ত্তব্য, ধর্ম্ম ও ধর্ম্মাঙ্গ, দান-ধর্ম্ম, নারীধর্ম্ম, মহামণ্ডলের অবশ্যকতা প্রভৃতি কতকগুলি হিন্দী পুস্তিকা এবং ইংরাজী ভাষার কয়েকখানি ট্র্যাক্ট যোগ্য পাত্রগণের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। পত্র ব্যবহার করিলে বিস্তৃত বিবরণ জানিতে পারা যায়। শাস্ত্র-প্রকাশ বিভাগের সমস্ত আয় এই দান ভাণ্ডারে দীন-দুঃখীদের সহায়তার জন্য ব্যয়িত হয়। এই সভায় যিনি দান করিতে চান অথবা কোন প্রকার সংবাদ জানিতে ইচ্ছা করেন তিনি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিবেন।

সেক্রেটারী, শ্রীবিশ্বনাথঅন্নপূর্ণা দানভাণ্ডার।
শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল, প্রধান কার্য্যালয়,
জগতগঞ্জ, বেনারস।

হইয়াছে। ইহাতে আরও একটি বিশিষ্টতা আছে যে হিন্দুধর্ম্মের যাবতীয় বিষয় শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তি ব্যতীত আজকালকার পদার্থ বিদ্যা (Science) দ্বারাও প্রতিপাদিত হইয়াছে তাহাতে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষিত ব্যক্তিরাও বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হইবেন। ইহার ভাষা সরল মধুর ও গাম্ভীর্য্য পূর্ণ। এই গ্রন্থ ৬৪ অধ্যায়ে এবং ৮ সমুল্লাসে সম্পূর্ণ হইবে, এই বৃহৎ গ্রন্থে রয়াল সাইজের চারি হাজারেরও অধিক পৃষ্ঠা থাকিবে এবং ১২ খণ্ডে প্রকাশিত হইবে। ইহার শেষভাগে আধ্যাত্মিক শব্দকোষ প্রকাশিত করিবার সঙ্কল্প রহিয়াছে। ইহার ছয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। সপ্তম খণ্ড যন্ত্রস্থ। মূল্যাদি পূর্ব্বোক্ত তালিকায় দ্রষ্টব্য। ইহার প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড এক সঙ্গে উত্তম কাগজে ছাপা এবং কাপড়ে বাঁধা রাজ সংস্করণ মূল্য ৫৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার, নিগমাগম বুক ডিপো,
মহামণ্ডল ভবন, জগৎগঞ্জ, বেনারস।

শাস্ত্রপ্রকাশ বিভাগ

মহামণ্ডলের এই বিভাগ বহু বিস্তৃত। অপূর্ব্ব সংস্কৃত, হিন্দী, বাঙ্গলা ও ইংরাজী ধর্ম্মপুস্তক কাশী প্রধান কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়। বাঙ্গলা গ্রন্থমালা কলিকাতা কার্য্যালয় ৯২নং বহুবাজার ষ্ট্রীটে এবং উর্দ্দু গ্রন্থমালা ফিরোজপুর (পাঞ্জাব) কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়। এইরূপ অন্যান্য প্রান্তীয় কার্য্যালয় হইতে অন্যান্য ভাষার গ্রন্থমালা প্রকাশের ব্যবস্থা হইতেছে।

উপদেশক মহাবিদ্যালয়।

সাধু এবং গৃহস্থ ধর্ম্মবক্তা প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে কাশীধামে শ্রীমহামণ্ডল-উপদেশক-মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। যে সকল সাধু দার্শনিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ করিয়া স্বীয় সাধুজীবন কৃতকৃত্য করিতে চান এবং যে সকল বিদ্বান গৃহস্থ ধার্ম্মিক শিক্ষা লাভ করিয়া ধর্ম্মপ্রচার দ্বারা দেশ সেবার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের জীবন নির্ব্বাহ করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করুন।

পদাধ্যক্ষ, শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়,
জগৎগঞ্জ, বেনারস।

"আর্য্যমহিলার" নিয়ম।

১। শ্রীআর্য্যমহিলা হিতকারিণী মহাপরিষদের মুখপত্রিকা রূপে হিন্দী ত্রৈমাসিক আর্য্যমহিলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হয়। খৈরিগড় রাজ্যেশ্বরী ভারত-ধর্ম্ম-লক্ষ্মী মহারাজ্ঞী শ্রীমতী সুরথকুমারী দেবী মহোদয়া এই পত্রিকার সম্পাদিকা।

২। মহাপরিষদের সকল প্রকার সভ্য মহোদয় ও সভ্যা মহোদয়াগণকে এই পত্রিকা বিনামূল্যে দেওয়া হয়। অন্য গ্রাহকগণ বার্ষিক ৬৲ টাকা প্রদান করিলে এই পত্রিকা পাইতে পারেন। প্রতি সংখ্যার মূল্য ১৷৹ টাকা।

৩। সাধরণ পাঠাগার (Public Library) এবং বালিকা বিদ্যালয়ে এই পত্রিকা ৩৲ টাকা বার্ষিক মূল্যে দেওয়া হইয়া থাকে।

৪। কোন প্রবন্ধ ন্যূনাধিক করিতে কিম্বা ছাপাইতে না ছাপাইতে সম্পাদিকার সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

৫। সুযোগ্য লেখক ও লেখিকাগণকে নিয়মিত পরিতোষিক দেওয়া হয় এবং যাঁহারা লেখায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন তাঁহাদিগকে অন্য প্রকারেও সম্মানিত করা হয়।

৬। যাঁহারা হিন্দী লিখিতে অসমর্থ তাঁহাদের প্রবন্ধ বা পুস্তকাদি মনোনীত হইলে কার্য্যালয় হইতে অনুবাদ করিয়া ছাপান হয়।

৭। মাননীয়া সম্পাদিকা মহোদয়া কাশীতে পণ্ডিতগণের একটী সমিতি স্থাপন করিয়াছেন। যে সকল পুস্তক সমালোচনার জন্য কার্য্যালয়ে আসিবে উক্ত সমিতি তদ্বিষয়ে বিচার করিবেন যে সকল পুস্তক বিশেষ যোগ্য বিবেচিত হইবে তাহার নাম ঠিকানা ও বিবরণ আর্য্যমহিলায় প্রকাশিত হইবে।

৮। সমালোচনার্থ পুস্তক, প্রবন্ধ, পরিবর্ত্তনের পত্রিকা, ছাপাইবার বিজ্ঞাপন, টাকা এবং এই কার্য্যালয় সম্বন্ধীয় যাবতীয় পত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরণ করিতে হইবে।

কার্য্যাধ্যক্ষ, আর্য্যমহিলা ও মহাপরিষদ কার্য্যালয়,
মহামণ্ডল ভবন, জগৎ-গঞ্জ, বেনারস।

আর্য্যমহিলা মহাবিদ্যালয়।

এই নামে এক মহাবিদ্যালয় (কলেজ) শ্রীআর্য্যমহিলা হিতকারিণী মহাপরিষদ কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছে। এই মহাবিদ্যালয়ের অন্তর্গত একটী বিধবা আশ্রম থাকিবে। এই মহাবিদ্যালয় সৎকুলোদ্ভব উচ্চ জাতীয় বিধবাগণকে মাসিক ১৫৲ হইতে ২০৲ টাকা বৃত্তি দিয়া ভর্ত্তি করা হয় এবং তাঁহাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করিয়া হিন্দু-ধর্ম্মের উপদেশিকা, শিক্ষয়িত্রী প্রভৃতিরূপে প্রস্তুত করা হয়। তাঁহাদের জন্য ভবিষ্যৎ জীবিকা নির্ব্বাহের উপযুক্ত ব্যবস্থাও করা হইয়া থাকে। এবিষয়ে অন্যান্য সংবাদ জানিতে হইলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করুন।

প্রধানাধ্যাপক, আর্য্য-মহিলা মহা-বিদ্যালয়,
মহামণ্ডলভবন, জগতগঞ্জ, বেনারস।

শ্রীআর্য্য-মহিলা হিতকারিণী মহাপরিষদ্।

কার্য্যসম্পাদিকা—ভারত-ধর্ম্মলক্ষ্মী গৈরিগড় রাজ্যেশ্বরী মহারাজ্ঞী শ্রীমতী স্বরথকুমারী দেবী O. B. E., K. H. Gold Medalist এবং হার হাইনেস্ ধর্ম্ম-সাবিত্রী মহারাণী শ্রীমতী শিবাকুমারী দেবী, নরসিংহগড়, রাজপুতনা।

ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠিত রাণী মহারাণী এবং বিদুষী ভদ্র-মহিলাগণ কর্ত্তৃক শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের সংরক্ষকতায় আর্য্য মাতাগণের উন্নতির সদিচ্ছায় এই মহাপরিষদ্ শ্রীকাশীধামে স্থাপিত হইয়াছে। এই পরিষদের উদ্দেশ্য এই:—

(ক) আর্য্য-মহিলাগণের উন্নতির জন্য নিয়মিত কার্য্যব্যবস্থা সংস্থাপন, (খ) শ্রুতি-স্মৃতি-প্রতিপাদিত পবিত্র নারীধর্ম্মের প্রচার, (গ) স্বধর্ম্মানুকূল স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার, (ঘ) পারিস্পারিক সৌহার্দ্দ উৎপন্ন করিয়া হিন্দু সতীগণের মধ্যে একতা সংস্থাপন, (ঙ) সামাজিক কুরীতি সমূহ সংশোধন, (চ) হিন্দী-ভাষার উন্নতি এবং (ছ) এই সকল উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অন্যান্য আবশ্যক অনুষ্ঠান।

পরিষদের বিশেষ নিয়ম—(১) এই সভায় সকল প্রকার সভ্যাগণকে ইহার মুখপত্রিকা আর্য্যমহিলা বিনামূল্যে দেওয়া হইবে। (২) স্ত্রীলোকই সভ্যা হইতে পারিবেন। (৩) যদি কোন পুরুষ এই পরিষদে কোন প্রকার

সহায়তা প্রদান করেন তবে তিনি পৃষ্ঠপোষকরূপে গণ্য হইতে পারিবেন এবং তাঁহাকেও পত্রিকা বিনামূল্যে দেওয়া হইবে। (৪) পরিষদের চারি প্রকার সভ্যার নিয়ম এই :—

(ক) যে কোন হিন্দু-মহিলা ন্যূনপক্ষে ১৫০৲ টাকা একবার প্রদান করিলে "আজীবন সভ্যা," (খ) একবার ১০০০৲ টাকা অথবা প্রতিমাসে ১০৲ টাকা প্রদান করিলে "সংরক্ষক সভ্যা", (গ) বর্ষিক ১২৲ টাকা দিলে "সহায়ক সভ্যা" এবং (ঘ) বার্ষিক ৫৲ টাকা অথবা অসমর্থ পক্ষে ৩৲ টাকা দিলে "সহযোগী সভ্যা" হইতে পারেন।

পত্র ব্যবহারের ঠিকানা :—

কার্য্যাধ্যক্ষ, আর্য্যমহিলা মহাপরিষদ্ কার্য্যালয়,

মহামণ্ডল ভবন, জগৎগঞ্জ, বেনারস।

THE ARYAN BUREAU OF SEERS & SAVANTS.

Established under the distinguished patronage of the leaders of

SRI BHARAT DHARMA MAHAMANDAL.

A Committee (Bureau) of this name has been started with the object, amongst others, of establishing a connecting link, through the vehicle of correspondence, with those Scholars and Literary Societies that take an interest in questions of Theology, Hindu Philosophy and Sanskrit Literature all over the civilised world.

To fulfil the above objects the Bureau intends to take up the following :—

1. To receive and answer questions through *bona fide* correspondence regarding Hindu Religion and Science, Codes, Practical Yoga, Vaidic Philosophy and General Sanskrit Literature.

2. To exhibit to the enlightened world the catholicity of the Vaidic doctrines, and its fostering agency as universal helper towards moral and spiritual amelioration of nations.

3 To render mutual help as regards comparative researches in Science, Philosophy and Literatures both Oriental and Occidental.

4. To welcome such suggestions as may emanate from learned source & all over the world conducive to the improvement and benefit of humanity.

5. And to do such other things may lead to the fulfilment of the above objects or any of them.

Rules of the Society.

1. There are to be two classes of Members, General & Special.

2. The Memberships are to be all honorary.

3. Those who will sympathise with the object and enlist their names and addresses in the Register of the Bureau as Co-operators will be considered as General Members.

4. Special members are to be those who shall be qualified to answer points of their respective religions.

5. The Membership of the Bureau will be irrespective of caste, creed and nationality.

6. The spiritual questions will be responded to through correspondence as well as in Debate Meetings held in the office of the Bureau on dates fixed for the purpose.

7. There is to be a Secretary and an Assistant Secretary to be appointed by the Founder of the Bareau (both posts honorary)

8. All the books tracts and leaflets that will be published concerning the Bureau will be forwarded free to all the Members of the Bureau.

All correspondence to be addressed to—

SWAMI DAYANAND, Secretary,
ARYAN BUREAU OF SEERS & SAVANTS,
C/o Sri Mahamandal Office, Benares.

N. B.—Oriental scholars, all over the world, are invited to send their names and addresses to facilitate mutual communications and despatch of necessary Papers.

হিরাক লিটাস।

[শ্রীপ্রভাত চন্দ্র কাব্যতীর্থ এম, এ,]

সভ্যতার হিসাবে মিশর বা চীন প্রাচীন বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, কিন্তু সত্যকথা বলিতে গেলে প্রাচীন গ্রীক জাতির ন্যায় কোন জাতিই অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, গণিত, সাহিত্য ও দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রে এতদূর চিন্তাশীলতা এবং প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতে পারে নাই। পাশ্চাত্য জগতে গ্রীস দেশেই আমরা প্রাকৃত বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মবিদ্যার প্রথম আভাস পাই। দুঃখের বিষয় এই যে, যে ভূখণ্ডে স্মরণাতীত যুগে জ্ঞানের প্রথম কিরণপাত হইয়াছিল, যে জ্ঞানসাধনার সিদ্ধ-পীঠে বেদের অপূর্ব্ব পুণ্যগীতি ঋষিকণ্ঠে উদ্ঘোষিত হইয়া দিগন্ত মুখরিত করিয়াছিল, যে দেশের জ্ঞানবিজ্ঞানের মন্দাকিনী ধারা শতমুখে প্রবাহিত হইয়াছিল,—সেই শিক্ষাদীক্ষায় জগতের গুরুস্থানীয় ভারতবর্ষের সভ্যতার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে বৈদেশিক পণ্ডিতগণের মধ্যে বিষম সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। যাহাহউক, ভারতীয় সভ্যতা প্রাচীন কি অর্ব্বাচীন তাহা প্রতিপন্ন করা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। পুণ্যভূমি ভারতের দার্শনিক চিন্তাপ্রবাহের নিকট গ্রীসের দার্শনিক চিন্তাপদ্ধতিকে ঋণী বলিয়া গ্রহণ করিতে অনেকে কুণ্ঠা বোধ করিলেও, উভয়ের মধ্যে যে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। প্রাচীন গ্রীসের ঋষিকল্প দার্শনিক হিরাক লিটাসের সৃষ্টিতত্ত্ব ও জ্ঞানবাদ সম্বন্ধে যৎ কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া আমরা দেখিব যে, ভাব ও চিন্তাপ্রণালীতে ভারত ও গ্রীস কতদূর অভিন্ন।

খৃষ্টের পূর্ব্বে পঞ্চম শতাব্দীতে গ্রীসদেশে দার্শনিকপ্রবর হিরাক লিটাস জন্মগ্রহণ করেন। দার্শনিক জগতে তিনি একজন সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক পণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। দর্শনাচার্য্য প্ল্যাটো অতিশয় যত্নের সহিত হিরাক লিটাস প্রণীত দর্শনগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এবং স্বীয় গ্রন্থের অনেক স্থলে তাঁহার মতের উল্লেখ করিয়াছেন। এইজন্য প্ল্যাটোকে হিরাকলিটাসের শিষ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। হিরাকলিটাসের রচনাপ্রণালী এত অস্পষ্ট ও জটিল যে তাঁহার গ্রন্থ সাধারণের নিকট "দুর্ব্বোধ্য" বলিয়া পরিচিত। কথিত আছে

যে তিনি "প্রকৃতি" নামে কেবলমাত্র একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন; ইহারও সামান্য অংশই লোকলোচনের গোচরে আসিয়াছে। হিরাকলিটাসের উক্তি বলিয়া যাহা পণ্ডিত সামাজে আদৃত হইয়া থাকে তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে তিনি প্রাকৃত-বিজ্ঞানেরই সমধিক চর্চ্চা করিয়াছিলেন। প্ল্যাটো, আরিষ্টটাল প্রভৃতি পরবর্ত্তী দার্শনিকগণের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ হইতে হিরাকলিটাসের দার্শনিক সিদ্ধান্ত যতদূর অবগত হইতে পারা যায় আমরা তাহাই সংক্ষেপে আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব। জাগতিক পদার্থনিচয়ের নিয়ত পরিবর্ত্তনশীলতা ও নশ্বরস্বভাব অবলোকন করিয়া পারমিনিডস্ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের অসারতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। তাঁহার মতে উৎপত্তির পরক্ষণেই পদার্থ বিনষ্ট হয়; একভাবে কোন পদার্থই দুই মুহূর্ত্ত অবস্থান করে না। এই পরিবর্ত্তনের জগতে সকল পদার্থ পরিণমনশীল হইলেও পারমিনিডস্ সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিয়া নিত্য ও চিরস্থায়ী মহাসত্যের আভাস পাইতে বঞ্চিত হন নাই। তিনি জ্ঞান নেত্রে দেখিয়াছেন যে এই অনন্ত পরিবর্ত্তনের মধ্যে একমাত্র "ভাব" বা "সত্তা"ই অপরিণামী ও কল্পান্তস্থায়ী। থেলস্ ও পিথাগোরাস যাহাকে যথাক্রমে জল বা সংখ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, পারমিনিডিস্ এখন জগতের সেই আদিভূত পদার্থকে অপরিণামী "ভাব" (being) বলিয়া স্বীকার করিলেন। এই "ভাবকে" তিনি বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মের ন্যায় স্বরূপলক্ষণান্বিত করিয়া কেবল মাত্র নিষেধমুখেই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। মোটকথা গীতায় যাহাকে "ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ" এবং "অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণঃ" বলা হইয়াছে, তাহাকেই আমরা "ভাব" শব্দের বাচ্য বলিয়া এখানে গ্রহণ করিলাম। এখানে মনে রাখিতে হইবে যে পারমিনিডসের মতে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও অভাব সকলই অলীক, কেবলমাত্র "সত্তা"ই অব্যাকৃত বিশ্ব-প্রকৃতি। এখানেই পারমিনিডসের মতের সহিত হিরাকলিটাসের বিরোধ। বিশ্ব প্রপঞ্চের নিয়ত-পরিবর্ত্তনশীলতা তুল্যরূপে স্বীকার করিলেও হিরাকলিটাস ভাব ও অভাবকে একপদার্থ বলিয়া নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করিয়াছেন। আরিষ্টটাল বলেন যে, চিরন্তন নিয়মের কথা বলিতে গিয়া হিরাকলিটাসের মুখ হইতেই এই মহাবাক্য প্রথম উদ্ঘোষিত হইয়াছিল—"ভাব ও অভাব

অভিন্ন," "অস্তি ও নাস্তি একই পদার্থ" । প্রথমে উৎপত্তি পরে নাশ এইরূপে ভাব ও অভাবের সাময়িক পৌর্ব্বাপর্য্য তিনি স্বীকার করেন নাই, কিন্তু অস্তি ও নাস্তি কিংবা আবির্ভাব ও তিরোভাব পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও উভয় ধর্ম্মই যে এক পদার্থে যুগপৎ অবস্থান করে এই কথা মুক্তকণ্ঠে বার বার বলিয়াছেন। পারমিনিডস্ সকল পদার্থকে ভাব ও অভাব ভেদে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন, এবং কেবলমাত্র ভাবকে (being)ই নিত্য ও সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া অভাব, নাশ বা রূপান্তরতা প্রাপ্তিকে অলীক অপদার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। পক্ষান্তরে হিরাকলিটাস উৎপত্তি ও বিনাশ বা ভাব ও অভাব উভয়কেই তুল্যরূপে সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিতে গেলে আবির্ভাব ও তিরোভাব একই পদার্থের অবস্থান্তর মাত্র। অভাবের ভাবরূপতা প্রাপ্তিকে আমরা লৌকিক ভাষায় উৎপত্তি এবং ভাবের অভাবে পরিণতিকে নাশ বলিয়া থাকি। হিরাকলিটাস বলেন যে এই প্রকার অবস্থান্তর প্রাপ্তি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে হয় না, কিন্তু একই মুহূর্ত্তে একই পদার্থে ভাব ও অভাব যুগপৎ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

হিরাকলিটাস বলেন যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল পদার্থই পরিবর্ত্তনশীল;— সকলই পরিণামী এবং ক্ষণভঙ্গুর। জলপ্রবাহের সহিত পদার্থের সাদৃশ্য দেখাইয়া তিনি প্রত্যেক বস্তুরই অস্থায়িত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ক্ষণিকবাদী বৌদ্ধদার্শনিকগণও বিশ্বের নিরন্তর পরিবর্ত্তন স্বভাব উপলব্ধি করিতে পারিয়া বাস্তব জগৎকে নিতান্ত অসার বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সত্যকথা বলিতে গেলে প্রতিক্ষণে পদার্থের এই প্রকার বিকার, রূপান্তরতাপ্রাপ্তি বা পরিবর্ত্তনশীলতাই সকল দেশের দার্শনিক চিন্তার বীজমন্ত্র। প্রাচীন ভারতের ঋষি বার্ষ্যায়ণি বলিয়াছেন, উৎপত্তি, সত্ত্বা, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, ক্ষয় ও নাশ—এই বিকারগুলি পর্য্যায়ক্রমে আসিয়া থাকে। বিশ্বের এই নিয়ত পরিবর্ত্তনের মধ্যেই আমরা সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের আভাস পাই। যেমন অন্তর্জগতেও প্রতিমুহূর্ত্তে নূতন নূতন ভাব উদিত হইয়া বিলীন হইতেছে সেই প্রকার বহির্জগতেও উৎপত্তি, বৃদ্ধি, ও নাশের সহিত সকল পদার্থই পরিবর্ত্তিত ও রূপান্তরিত হইতেছে। এইরূপ নিরবচ্ছিন্ন বিকারের জগতে দাড়াইয়া সাহস করিয়া কে বলিতে পারে যে উদীয়মান, মাধ্যন্দিন ও অস্তগামী সূর্য্যে কোনও

পার্থক্য নাই? অথবা আজ যে বালারুণ দীপ্তিচ্ছটায় দিগন্ত আলোকিত করিয়া উদয়লাভ করিতেছে, আগামী প্রভাতে সেই অবিকৃত সূর্য্য দেবই পূর্ব্বগগনে উদিত হইবে? আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই প্রকার অনন্ত পরিবর্ত্তনের মধ্যেও মনীষিগণ অপরিণামী, অনপায় এবং নিয়ত একরূপে অবস্থিত মহাসত্যের সন্ধান করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে পরিবর্ত্তনের জগতেও পারমিনিডস নিত্য ও সত্যভূত পরমসত্ত্বা (being) বা ভাবের আভাস পাইয়াছিলেন। বেদান্তের দিক দিয়া দেখিতে গেলে মায়াকল্পিত সৃষ্টি ও নাশের মধ্যে একমাত্র সার্ব্বভৌম আত্মাই অপরিণামী এবং নিয়ত স্থিতিশীল; সাংখ্যের মতে সর্ব্বথা নিষ্ক্রিয় পুরুষই বিকারের অতীত। তাহা হইলে বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম, সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত পুরুষ এবং পারমিনিডসের স্থাণু ও অপরিণামী সত্ত্বা (being) কি এক? ভাব ও অভাবের একত্ব প্রতিপাদন করিতে গিয়া হিরাকলিটাস বলিয়াছেন যে প্রত্যেক পদার্থেই বিরুদ্ধ ধর্ম্ম অবস্থান করে। পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সংযোগে গঠিত হইলেও প্রত্যেক পদার্থের একত্ব ও সাম্য অব্যাহত থাকে। যাহাকে আমরা স্থূল দৃষ্টিতে স্থির পদার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকি, তাহার মধ্যেও নিরন্তর আকর্ষণী ও বিকর্ষণী ক্রিয়া সূক্ষ্ম ভাবে চলিতেছে। চির চঞ্চল প্রকৃতি বিদ্যুতের Positive ও Negative কিংবা উত্তেজক ও প্রতিরোধক শক্তিও এই উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণ করিতেছে। হিরাকলিটাস আরও বলেন যে এই প্রকার বিষম শক্তির ক্রিয়া যুগপৎ সকল পদার্থে বিদ্যমান আছে বলিয়াই জগতের সত্ত্বা উপলব্ধির বিষয়ীভূত হইতেছে, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে এই ক্রিয়া শেষ হইবে তখনই বিশ্বপ্রকৃতি সর্ব্বথা বিনষ্ট হইবে।

সৃষ্টির ক্রম নির্দ্দেশ করিতে গিয়া হিরাকলিটাস্ প্রকৃতি বিজ্ঞানের মূল সূত্রের সন্ধান পাইয়াছেন। থেলস্ প্রভৃতির ন্যায় তিনি জল বা বায়ুকে নিখিলবিশ্বপ্রসূ অনাদি পদার্থ স্বীকার না করিয়া অগ্নিকে স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগতের মূলকারণ রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, বিশ্ব জগৎ কোনও অনৈসর্গিক শক্তি-শালী দেবতা বিশেষ বা মনুষ্য দ্বারা সৃষ্টি হয় নাই, শাশ্বত জ্যোতির স্ফূর্ত্তিরূপে পৃথিবী অনাদিনিধন। এই চৈতন্যরূপী তেজ হইতেই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে এবং এই নিত্য ও বিশ্বব্যাপক তেজেই সকল পদার্থের পরিণতি

সংঘটিত হইয়া থাকে। তাহা হইলে তেজই জগতের উপাদান কারণ; দৃশ্যমান পৃথিবী এই অনাদি ও অনন্ত তেজের বিকার মাত্র। জাগতিক সৃষ্টি প্রসঙ্গে হিরাকলিটাস্ এই তেজঃ পদার্থের ঊর্দ্ধ ও অধোগতি নির্ণয় করিয়াছেন। তিনি বলেন যে এই অনন্ত জ্যোতি বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া জলরাশির সৃষ্টি করে, জল আবার গাঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবীর আকার ধারণ করে। সৃষ্টিকল্পে ইহাই নিম্নগতি। পক্ষান্তরে পৃথিবীর তরলাবস্থা, তরলতা হইতে জলোৎপত্তি, জল হইতে বাষ্পোদ্গম এবং বাষ্পের তেজে পরিণতিই সৃষ্টির ঊর্দ্ধতন ক্রম বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই তেজের দীপ্যমান অংশই উল্কা, গ্রহ ও উজ্জ্বল নক্ষত্রমণ্ডিত সৌরজগৎ। এখন দেখিতে গেলে এই বিশ্বমণ্ডল তেজের রূপান্তর ভিন্ন আর কিছুই নয়। হিরাক লিটাস এই তেজকেই সর্ব্বভূতে অবস্থিত আত্মা বলিয়া মনে করিতেন। গীতায় যাহাকে নিত্য সর্ব্বগত স্থাণু বলা হইয়াছে তাহা ও হিরাক লিটাসের বিশ্বপ্রসূ তেজঃ যে একই পদার্থ তাহা বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। তেজঃ হইতে সলিল এবং সলিল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তিই মনুষ্য-লোকে সৃষ্টি বলিয়া কথিত হয়; আবার পৃথিবীর জলরূপতাপ্রাপ্তি এবং জলের তেজে পরিণতিই প্রলয় বা কারণে কার্য্যের লয় বলিয়া শাস্ত্রকারগণ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। ভারতীয় দর্শনের দিক দিয়া দেখিতে গেলে "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি শ্রুতি ও বাদরায়ণের 'জন্মাদ্যস্য যতঃ" যাহাকে বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের একমাত্র কারণ সার্ব্বভৌম ব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। হিরাকলিটাস তাহাকেই পরম জ্যোতি বা অনাদিনিধন তেজঃ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং ইহাও ধারণা করিতে সমর্থ হইয়াছেন যে এই তেজ হইতেই জগৎ উৎপন্ন হয় এবং কালক্রমে তাহাতেই প্রতিসংহৃত হয়। দৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চের অনাদিনিধন জ্যোতি হইতে উৎপত্তি, ভাব ও অভাবের একত্র বিশ্বের চিরন্তন পরিবর্ত্তন এবং চৈতন্যরূপে এই অনন্ত জ্যোতির সর্ব্বত্র অবস্থিতি হিরাক লিটাস যে ভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীতি হয় না কি যে ভারতীয় দার্শনিক চিন্তা পদ্ধতি ও প্রাচীন গ্রীসের দার্শনিক চর্চ্চা একই ভাবপ্রবাহের অনুবর্ত্তিনী হইয়া চলিয়াছিল?

শ্রীশ্রীশঙ্করনাথ

পরাপরতরাতীত উৎপত্তি-স্থিতিকারকঃ।
সর্ব্বার্থ-সাধনোপয়ো বিশ্বেশ্বর নমোঽস্তু তে ॥

নিবেদন।

মহাত্মন্।

বর্ত্তমানযুগে বঙ্গের সর্ব্বত্র যে হিন্দুসমাজে একপ্রকার ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে, তাহা বোধ হয় কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ছাত্রজীবনে ব্রহ্মচর্য্য ও গুরুভক্তির অভাব, যৌবনে গুরুজনে অনাদর ও উচ্ছৃঙ্খলতা, সাংসারিক জীবনে ধর্ম্মানুষ্ঠানে অশ্রদ্ধা আজকাল সমাজ ও গৃহস্থালীকে অশান্তিময় করিয়া তুলিতেছে ; এমন কি, ধর্ম্মের যে সার মর্ম্ম কোথায়ও আশ্রয় না পাইয়া আমাদের গৃহলক্ষ্মীদিগের দ্বারা সুরক্ষিত হইতেছিল, তাঁহারাও আজকাল স্বামিপুত্রের সহিত দেশে বিদেশে ঘুরিয়া, সমাজ-প্রথা ও শাস্ত্রকথা শিখিবার সুযোগ না পাইয়া সদাচারে বিমুখ এবং দেবদ্বিজ ও অতিথির সেবায় শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়িতেছেন; এমন কি, লোকে ৫০।৬০ বৎসর বয়স হইলেও সময়ের অভাব, গুরুর অভাব, অর্থের অভাব প্রভৃতি শত অভাবের প্রসঙ্গ তুলিয়া দীক্ষা গ্রহণে বঞ্চিত থাকেন এবং অনেকের বেলা দীক্ষা হইতে না হইতেই জীবন-লীলা শেষ হইয়া যায়। প্রকৃত প্রস্তাবে হিন্দুর ধর্ম্ম আচারের ধর্ম্ম, পিতা মাতা বা গুরুজনের নিকট সদাচারের দৃষ্টান্ত না দেখিলে পুত্র যে অনাচারী হইবে, ইহা বিচিত্র কি? পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবল পবনে আমাদের অনেক প্রাচীন অনুষ্ঠানের ভস্মরাশিও উড়িয়া যাইতেছে। গৃহে গৃহে দেবসেবা হয় না; গ্রামে গ্রামে ধর্ম্মসভা নাই; মন্দিরে মন্দিরে সকাল সন্ধ্যা শঙ্খ ঘণ্টা বাজে না; যাত্রা, কথকতা, চণ্ডীর পাঁচালী বা রামায়ণগানে লোকশিক্ষার প্রথা উঠিয়া যাইতেছে; মন্দিরপ্রাঙ্গণ, তরুচ্ছায়া প্রভৃতি যে সকল স্থানে বসিয়া গ্রাম্যবৃদ্ধগণ শাস্ত্রচর্চ্চা করিতেন, পরনিন্দা ও মোকদ্দমার পরামর্শই এখন সেই সকল স্থান অধিকার করিয়াছে। ধর্ম্মভাবের অভাবে দেশময় নানাভাবে বিলাসে বিবাদে যে অনর্থক অর্থব্যয় হইতেছে, তাহাতে আমরা ক্রমেই জীর্ণ শীর্ণ মুমূর্ষু হইয়া পড়িতেছি। পরন্তু ধর্ম্মের গ্লানি হইতে জাতীয়তার গ্লানি, সমাজের গ্লানি এবং

ব্যক্তিগত জীবনে চরিত্রের গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে। সেনহাটী খুলনা জেলার মধ্যে একটী প্রকাণ্ড জনবহুল গ্রাম; আধুনিক সভ্যতা ও জ্ঞানচর্চ্চায় এ গ্রাম বিশেষ সমুন্নত, এখানে নানাসম্প্রদায়ভুক্ত বহুসংখ্যক হিন্দুসন্তানের বাস। প্রাচীন অনুষ্ঠানে তাহারা প্রকৃতপক্ষে যে আস্থা শূন্য, তাহা নহে, তবে ধর্ম্মচর্চ্চার সুযোগ ও অবসর নাই বলিয়া সমাজের একটা শোচনীয় দশা উপস্থিত হইয়াছে। এই অবস্থার একটা প্রতিকারের চিন্তা ও কল্পনা যে সময়ে সময়ে অনেকের মনে জাগে না, তাহা নহে। তবে জীবিকার্জ্জনের কঠোরতায় সে কল্পনা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। সচ্চিন্তা কিন্তু বিলুপ্ত হইলেও বিনষ্ট হয় না; উহা সময়ের অপেক্ষা করে এবং অপ্রত্যাশিত সূত্রে স্বতঃই উদ্বুদ্ধ হয়। প্রারম্ভ দেখিয়াই শেষ-ফল জানা যায় না বটে, কিন্তু উহাতেই উচ্চ আদর্শের মূলভিত্তি নিহিত থাকিতে পারে। শ্রীভগবান মুখ তুলিয়া চাহিলে, সকল সদিচ্ছাই সফলতা লাভ করে। বহুদিন হইতে সেনহাটীতে "বান্ধব সমিতি" নামে একটি সভা ছিল, উহার সভ্যগণ বহুবিধ লোকহিতকর সদনুষ্ঠানে আত্মনিয়োগ করিয়া আসিতেছিলেন। একটি ধর্ম্মসভা স্থাপনের কল্পনা তাঁহাদিগেরই মনে জাগিয়াছিল। অবশেষে জনৈক ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তির উৎসাহ পাইয়া উহাদের কতিপয় সভ্য গতবৎসর রাস-পূর্ণিমার দিন "সেনহাটী ধর্ম্মসভা"র প্রথম অধিবেশন সম্পন্ন করেন। আধুনিক স্কুল কলেজে হিন্দুদিগের জাতীয় ভাবে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার বিশেষ ব্যবস্থা নাই। ছাত্রজীবনে ব্রহ্মচর্য্য ব্যতীত কাহারও ধর্ম্মজীবন বা কর্ম্মজীবন গঠিত হইতে পারে না। ইহাই উদীয়মান যুবকদিগের মনে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করিয়া দিয়া হিন্দু শাস্ত্রের অলৌকিক সদুপদেশের সাহায্যে তাহাদিগকে ক্রমে ধর্ম্মপথে প্রবর্ত্তিত করাই এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য। ইহারই উপর লক্ষ্য রাখিয়া ধর্ম্ম সভার কার্য্য চলিতেছে। প্রতি রবিবারে উহার কার্য্য চলে এবং প্রতিমাসে এক একটী বিশেষ অধিবেশনও হয়। সদ্‌গ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা, উপস্থিত সভ্যগণের ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ক সন্দেহের যথাসাধ্য নিরসন—এই সকল অধিবেশনের প্রধান কার্য্য। অশীতিপর বৃদ্ধ হইতে বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ সকলেই এই সভায় যোগদান করিয়া থাকেন। সভার বয়স অল্প হইলেও, সে অল্পপাতে ইহার যাহা সুফল হইয়াছে, তাহা বিশেষ আশাপ্রদ। দৃষ্টান্ত নিষ্প্রয়োজন। তবে মোটের উপর ইহা দ্বারা কতকগুলি যুবকের

যে ভাবে নৈতিক উন্নতি সাধিত হইয়াছে এবং যে ভাবে অনেকে সন্ধ্যা বন্দনা ও আচারপালনে নিষ্ঠাবান হইয়াছেন তাহা স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের অনেকেই অবগত আছেন। কার্য্যের পথ যে ক্রমে, উন্মুক্ত হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহ। অল্পদিনেই ধর্ম্মসভা গ্রামস্থ ও নিকটস্থ বহুজনের পরম প্রিয় হইয়া পড়িয়াছে। উৎসাহ পাইয়া সেনহাটি ধর্ম্মসভার উদ্যোক্তৃগণ আরও গভীর ও ঐকান্তিক-ভাবে কার্য্যে প্রবেশ করিয়াছেন। আমাদের দেশে দেবায়তনই ধর্ম্মচর্চ্চার উপযুক্ত কেন্দ্র। চিরদিনই এদেশে দেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহারই সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের কথা লোক-সমাজকে শিক্ষা দেওয়া হয়। এই চিরন্তনী হিন্দুপ্রথার অনুসরণ করিয়া ধর্ম্ম-সভার উদ্যোক্তৃগণের মনে দেবগ্রিহ প্রতিষ্ঠার বাসনা জাগে। সার্ব্ব-জনীন ভক্তিপ্রীতি আকর্ষণ করিতে ৺শিবলিঙ্গই হিন্দুর বড় পরম বস্তু। সেই জন্য সর্ব্বমঙ্গলময় শিবলিঙ্গেরই সন্ধানের চেষ্টা হয়। কয়েকজনের আন্তরিক প্রার্থনায়, জনৈক ভক্তের একান্ত চেষ্টায় এবং সর্ব্বোপরি শ্রীভগবানের স্বকৃপায় একটি সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত অপূর্ব্ব বিরাট শিবলিঙ্গ দূরদেশ হইতে সেনহাটিতে আনীত হইয়াছেন। গত ৩২শে আষাঢ় তারিখে তিনি শুভমুহূর্ত্তে "শঙ্কর নাথ" নামে প্রসন্নসলিল ভৈরব নদের তটে ক্ষুদ্র পর্ণশালায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ৺বাবার কৃপায় প্রয়োজনমত উপযুক্ত পূজক ও কতক পূজোপকরণের সুব্যবস্থা হইয়াছে। যিনি একবার আসিয়া বাবা সঙ্কর নাথের স্বর্ণপ্রভাসমম্বিত দিব্যলিঙ্গ দর্শন করিবেন, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস তিনি তৎক্ষণাৎ যুগপৎ মুগ্ধ ও আনন্দিত হইবেন।

শুভকার্য্যের সূচনামাত্র হইয়াছে, উপযুক্ত বিধিব্যবস্থা হয় নাই। অর্থের অভাবই তাহার কারণ। আমরা যাহা করিয়াছি বা ঘটনাচক্রে হইয়াছে, তাহার পরিরোধের সম্ভাবনা দেখি না। তাই নিরুপায় হইয়া আজ আমরা অকিঞ্চন ভাবে আপনার দ্বারস্থ হইতেছি। আমাদের অভাব অনেক। ধর্ম্মসভার স্থান নাই গৃহ নাই; বাবার মন্দির বা সেবার স্থায়ী ব্যবস্থা হয় নাই; পূজকের বাসগৃহ ও বৃত্তির ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজনীয়; ধর্ম্ম-সভার কার্য্য-সৌকার্য্যার্থে একটি চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা ও ধর্ম্মগ্রন্থসমূহ সংগ্রহ করা আবশ্যক মনে করি। দীনভাবে কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, তাহার ক্ষেত্র যে বিস্তৃত এবং আদর্শ উচ্চ, তাহা সহজে অনুমেয়। কার্য্য যত অগ্রসর হইবে,

ততই বহু অর্থের প্রয়োজন হইতেপারে। যখন যেমন অর্থ সংগ্রহ হয়, তদনুরূপ কার্য্যব্যবস্থা করা হইবে।

যে ভাবে বাবা শঙ্কর নাথের শুভাগমন হইয়াছে, তাহা অসাধারণ। বাবা যেন আপনি আসিয়াছেন, আপনি বসিয়াছেন। স্বয়ম্ভু নিজের সেবার ব্যবস্থা স্বয়ং করিবেন। তবে তিনি তাহা করিবেন –আপনাদেরই মত স্বধর্ম্মরত সদাশয় ব্যক্তিবর্গের দ্বারা। নিমিত্ত মাত্র হইবার সৌভাগ্য আপনাদেরই হইবে। বাবার সেবা-ব্যবস্থার জন্য আপাততঃ একটী সেবা-সমিতি গঠিত হইয়াছে। ধর্ম্মসভার কাগ্য ঐ সেবারই অঙ্গীভূত থাকিবে। যিনি প্রাণের সহিত সেবার কার্য্যে যোগ দিতে চান, স্বধর্ম্ম নিরত তেমন ব্যক্তিকে সেবাসমিতি আপনার বলিয়া গ্রহণ করিবেন। সামান্যভাবে কার্য্য যতটুকু অগ্রসর হইয়াছে তাহার পরিচয় এবং বাবার শুভাগমনের সুসংবাদ লইয়া অদ্য আমরা আপনার সমীপ-বর্ত্তী হইতেছি। আশা করি ৺শঙ্কর নাথের নামে, আমাদের সাগ্রহ প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইবে না।

সেনহাটী বড় প্রাচীন স্থান; ইহাকে একপক্ষে তীর্থক্ষেত্র বলা যাইতে পারে। এই স্থানে সর্ব্ববিদ্যাবংশের বীজপুরুষ ঠাকুর সর্ব্বানন্দ সিদ্ধিলাভের পর ৺মায়ের মন্দির ও আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন; এইস্থান কাঙ্গারী, সিদ্ধান্ত প্রভৃতি সিদ্ধবংশের কত সাধক, ভক্ত ও পণ্ডিতের আবির্ভাবে পবিত্র হইয়াছে; এইস্থানে জন্ম গ্রহণ করিয়া কত শত অশেষশাস্ত্রপারদর্শী পণ্ডিত, কবিরাজ ও স্বভাব কবি দেশে বিদেশে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন; তাঁহাদের বংশধারা, কীর্ত্তিচিহ্ন ও গৌরব-কাহিনী এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই স্থানে রাজা রাজবল্লভের ৺ সিদ্ধিশ্বরী কালিকামূর্ত্তি এখন দীনহীনভাবে পূজিত হইতেছেন। অতীত গৌরবের সে কাহিনী এখন অনেকেই ভুলিয়া গিয়াছেন; আবার যে তাহা জাগিবে, বাবার আগমনে এই বিশ্বাস দৃঢ় হইতেছে। আশা করি, ৺শঙ্কর নাথের পাদস্পর্শে আবার সেনহাটি তীর্থস্থান হইবে। আসিবে, আবার সেদিন আসিবে। আপনারা তাহার সহায় হউন। মাতৃভূমির পারমার্থিক উন্নতির জন্য আপনারা ভক্তিমান হইয়া অর্থের সদ্ব্যবহার করিয়া ধন্য হউন।*

শ্রীইন্দুভূষণ চক্রবর্ত্তী।

*যিনি দয়া করিয়া যাহা দিবেন, তাহাই সাদরে গৃহীত ও নিয়মিত ভাবে প্রকাশ্যে স্বীকৃত হইবে। অর্থ কড়ি সমস্তই "শঙ্কর নাথ সেবা সমিতির" সম্পাদক বা ধনরক্ষকের নামে সেনহাটি পোঃ (খুলনা) ঠীকানায় পাঠাইবেন।

নারীধর্ম্ম।

[শ্রীমৎ স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী।]

বিধবাবস্থা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তন্ময়তা একপতিতেই সম্ভব, অনেক পতিতে নহে সুতরাং একপতিব্রতে দৃঢ় থাকিয়া স্ত্রী সৃষ্টিবিস্তার করিলে পর অন্তে পতিতে তন্ময় হইয়া মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়। এতদ্ব্যতীত গোত্রাদি পরিবর্ত্তন হওয়ায় স্ত্রী স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিহীন হইয়া সম্পূর্ণরূপে পতির অধীন হয় বলিয়া তদ্‌গর্ভজাত পুত্র কন্যা পতির সম্বন্ধই প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহার কোন পৃথক সম্বন্ধ থাকে না। অতএব ব্যবহারিক জগতে স্বতন্ত্র সৃষ্টিবিস্তার করা তাহার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু পুরুষের ধর্ম্ম ও মুক্তির উপায় অন্য প্রকার; তাহার মুক্তি, সৃষ্টিবিস্তার পূর্ব্বক প্রকৃতি হইতে পৃথক হইয়া স্বরূপে স্থিত হইলে হয়। যদি এক পত্নী দ্বারা উভয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়,তবে আর তাহাকে দ্বিতীয় বিবাহ করিতে হয় না, কিন্তু কথিত উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হইলে সে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিতে পারে। বেদে আছে যে—

তস্মাদেকো বহ্বী বিন্দেত।
তস্মাদেকস্য বহ্ব্যো জায়া ভবন্তি।

এই বাক্য দ্বারা শ্রুতিও প্রয়োজন প্রখ্যাপিত করিয়াছেন। এখন দার পরিগ্রহ বিষয়ে—'সৃষ্টিবিস্তার' ও 'প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক স্বরূপে সংস্থিতি' এই দুইটী উদ্দেশ্য কোন অবস্থায় কার্য্যে পরিণত হওয়া সম্ভব তাহা বলা যাইতেছে। সৃষ্টি বিস্তার অর্থাৎ সন্তান উৎপাদন করিয়া বংশ রক্ষা ও পিতৃ ঋণ পরিশোধ লৌকিক প্রবৃত্তি মার্গের ধর্ম্ম, নিবৃত্তি মার্গের নহে। নিবৃত্তি পক্ষে প্রবৃত্তির দায়িত্ব বা কর্ত্তব্য কিছুই থাকে না, তাই সন্তান উৎপত্তির পূর্ব্বে স্ত্রীর মৃত্যু হইলে অথবা প্রথমা স্ত্রী পুত্রবতী না হইলে দ্বিতীয় বিবাহের প্রয়োজন সেই পর্য্যন্ত যতদিন প্রবৃত্তি মার্গীয় সৃষ্টিবিস্তারে পুরুষের হার্দ্দিক অভিলাষ বিদ্যমান থাকে, অন্যথা অজাতাপত্যা স্ত্রী বর্ত্তমানেও যদি পুরুষ নিবৃত্তি পরায়ণ হয়, অথবা প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পরে পুরুষ নিবৃত্তি-সেবী হইয়া নিজের ও জগতের কল্যাণ কামনায় রত হয় তবে তাহার পক্ষে দ্বিতীয় বিবাহ করা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন। পুত্রোৎপাদনের দ্বারা তাহাকে আর পিতৃঋণ পরিশোধ করিতে হয় না, তাহার আধ্যাত্মিক বলে চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত উদ্ধার হইয়া যায়। অতএব সৃষ্টিবিস্তার কল্পে নিঃসন্তানা পত্নী জীবিত থাকিতেও অথবা নিঃসন্তান অবস্থায় স্ত্রীর মৃত্যু হইলে, দ্বিতীয় বিবাহের

আবশ্যকতা লৌকিক প্রবৃত্তি অবস্থাতেই হয়, নিবৃত্তি অবস্থায় হয় না ; ইহা স্থির সিদ্ধান্ত। ভগবান, মনু এবং অন্যান্য স্মৃতিকারগণও উক্ত অবস্থায় দারপরিগ্রহ করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন। যথা—

ভার্য্যায়ৈ পূর্ব্বমারিণ্যৈ দত্ত্বাগ্নীনন্ত্যকর্ম্মণি।
পুনর্দারক্রিয়াং কুর্য্যাৎ পুনরাধানমেব চ॥
বন্ধ্যাষ্টমেঽধিবেদ্যাব্দে দশমে তু মৃতপ্রজা।
একাদশে স্ত্রীজননী সদ্যস্ত্বপ্রিয়বাদিনী॥

পত্নী প্রথমে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে তাহার দাহাদি অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাপনানন্তর পুনরায় দারপরিগ্রহ ও অগ্নি পরিচর্য্যা করিবে। স্ত্রী যদি বন্ধ্যা হয় তবে প্রথম ঋতু হইতে অষ্টমবর্ষে, মৃতবৎসা হইলে দশমবর্ষে এবং কেবল কন্যা প্রসব করিলে একাদশবর্ষে দ্বিতীয় বিবাহ করিবে কিন্তু অপ্রিয়বাদিনী হইলে শীঘ্রই দ্বিতীয় বিবাহ করিবে। এই প্রকার দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ সাধারণতঃ সৃষ্টি বিস্তার কল্পে হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতিরিক্ত ব্যসনগ্রস্তা ও দুশ্চরিত্রা স্ত্রী থাকিতেও মনু দ্বিতীয় বিবাহের আদেশ দিয়াছেন। যথা—

মদ্যপাসাধুবৃত্তা বা প্রতিকূলা চ যা ভবেৎ।
ব্যাধিতা বাধিবেত্তব্যা হিংস্রার্থঘ্নী চ সর্ব্বদা॥

মদ্যপায়িনী, দুশ্চরিত্রা, পতিপ্রতিকূলবর্ত্তিনী, ব্যাধিযুক্তা, ধনক্ষয়কারিণী ও হিংস্রস্বভাবা স্ত্রী থাকিতেও দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করিবে। স্ত্রী রোগান্বিতা হইলে বিবাহ করা সাধারণতঃ মনুষ্যত্ব-বিরুদ্ধ কার্য্য বলিয়া প্রতিভাত হয় কিন্তু কঠিন রোগের ফলে যদি সন্তান জন্মিবার সম্ভাবনা না থাকে তবে সন্তানহেতু পুনর্বিবাহ করা আবশ্যক। এই উভয় বিষয়ের সামঞ্জস্য সংরক্ষণের জন্য মনু বলিয়াছেন যে—

যা রোগিণী স্যাত্তু হিতা সম্পন্না চৈব শীলতঃ।
সানুজ্ঞাপ্যাধিবেত্তব্যা নাবমান্যা চ কর্হিচিৎ॥

অসাধ্য রোগ গ্রস্তা কিন্তু পতিপ্রাণা ও সুশীলা এরূপ স্ত্রীর অনুমতি লইয়া তবে দ্বিতীয় বিবাহ করিবে। কদাপি তাহার অবমাননা করা কর্ত্তব্য নহে। এইরূপে মনু প্রমুখ যাবতীয় স্মৃতিকারগণ কুলরক্ষা ও পিতৃপিণ্ডদান

উদ্দেশ্যে প্রবৃত্তিমার্গ-প্রবৃত্ত গৃহস্থগণকে দ্বিতীয় দার পরিগ্রহের আজ্ঞা দিয়াছেন। কিন্তু স্ত্রীর পক্ষে এইরূপ আজ্ঞা সম্ভব নহে—কেন না, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে অপরাপর কারণ ব্যতীত ইহাও এক বিশেষ কারণ যে স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র পুরুষ সম্বন্ধীয় হয়, তাহার গোত্র পুরুষের গোত্র হয়, তদ্দ্বারা পুরুষের বংশরক্ষা ও পিণ্ডদান কার্য্য হইয়া থাকে স্ত্রীর পিতৃকুলের সহিত উক্তরূপ সম্বন্ধ থাকে না। অতএব বংশরক্ষা ও পিণ্ডদানের জন্য স্ত্রীর দ্বিতীয় বিবাহের কোন হেতু বা যুক্তি নাই। উপর্য্যুক্ত যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা এই নিষ্কর্ষার্থ লাভ হইল যে একটী পুত্র উৎপন্ন হইলে বংশরক্ষার জন্য দ্বিতীয় বিবাহের কোন প্রয়োজন নাই। মহর্ষি আপস্তম্ব এ বিষয়ে বলিয়াছেন যে—

ধর্ম্মপ্রজাসম্পন্নে দারে নান্যাং কুর্ব্বীতান্যতরাপায়ে তু কুর্ব্বীত।

সন্তান হইলে এবং পতিব্রতা স্ত্রী থাকিলে দ্বিতীয় বিবাহ করা উচিত নহে। যদি সন্তান না হয় অথবা স্ত্রী মন্বুর উপদেশানুরূপ অনুকূল না হয় তবে আবার বিবাহ করিবে।

পুরুষের দ্বিতীয় পরিণয়ের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য প্রকৃতিকে দেখিয়া মুক্তি লাভ করা। বিবাহের উদ্দেশ্য বর্ণন কালে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে নৈসর্গিকী বহু স্ত্রী সম্ভোগলালসা দমন করিয়া এক স্ত্রীতে কেন্দ্রীভূত করতঃ ক্রমে তাহা হইতে পৃথক হইয়া মুক্তি লাভ করাই পুরুষের বিবাহের মুখ্য লক্ষ্য। প্রবৃত্তির স্বভাব এইরূপ যে মুক্তিকে লক্ষ্য করিয়া ভাবশুদ্ধি পূর্ব্বক কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলে কিয়ৎ কাল মধ্যে তাহার নাশ ও নিবৃত্তির উদয় হইয়া থাকে। কিন্তু ভাবশুদ্ধি ও মুক্তি লক্ষ্য না হইলে প্রবৃত্তির ধারা ঘৃতাহুত বহ্নির ন্যায় ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়, এই জন্য গৃহস্থাশ্রমীয় প্রবৃত্তি স্বতন্ত্রতা ও মলিনতা পরিশূন্য বলিয়া বাস্তবিক উদ্দাম প্রবৃত্তি নহে, কিন্তু শুদ্ধভাব-মূলক ও নিয়মিত প্রবৃত্তি, উহার অবসানে নিবৃত্তির উদয় হইয়া থাকে। এবম্বিধ প্রবৃত্তিমার্গের একটা সীমা আছে, যেখানে নিবৃত্তির উন্মেষ হয় এবং পুরুষ প্রকৃতিকে পরিহার করিয়া মুক্ত হইয়া যায়। সেই সীমায় পঁহুছিবার জন্য ভাবশুদ্ধিযুক্ত সুশৃঙ্খল নিয়মিত প্রবৃত্তির আবশ্যকতা আছে, কারণ এই পরিশুদ্ধ প্রবৃত্তিই অল্প সময়ের মধ্যে উক্ত সীমায় পঁহুছাইয়া গৃহস্থকে নিবৃত্তির নিরুপম আনন্দ লাভের

অধিকারী করে। কিন্তু যদি ঘটনাচক্রে পুরুষের উক্ত সীমায় পঁহুছিবার পূর্ব্বেই ভাবশুদ্ধি পূর্ব্বক প্রবৃত্তি-চরিতার্থতার কেন্দ্ররূপী স্ত্রীর বিয়োগ হয় তবে তদবস্থায় প্রবৃত্তির অন্তিম অবধি প্রাপ্তির নিমিত্ত দুইটী উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে। প্রথম, প্রবৃত্তির বেগকে সংসারের দিক হইতে পরিবর্ত্তন করিয়া সমস্ত রসের আধারভূত ভগবানের অভিমুখে প্রবর্ত্তিত করা এবং দ্বিতীয়, আবার বিবাহ করিয়া ভাবশুদ্ধি মূলক প্রবৃত্তির পূর্ণতার জন্য দ্বিতীয় স্ত্রীকে কেন্দ্রস্বরূপ করা। প্রথম উপায় অবলম্বনক্ষম পুরুষ মহাপুরুষরূপে পরিগণিত এবং তাহার জীবন ধন্য ও আর্য্যজাতির অনুকরনীয়। শ্রীভগবান রামচন্দ্র প্রভৃতির জীবন জগতের জীবগণের সমক্ষে এই আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছে। অতএব এক-পত্নীব্রতের এই মহান আদর্শ পালন করিতে পারিলে অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। ঐরূপ মহাত্মা ব্যক্তি নিজের ও সংসারের সমধিক কল্যাণ সাধন করিতে সমর্থ হন। কিন্তু যদি পুরুষের অধিকার ঐরূপ সমুন্নত না হয় তবে দ্বিতীয় উপায় ব্যতীত প্রকৃতি হইতে পৃথক হইবার আর কোন যুক্তি নাই, কেন না, লক্ষ্যহীন প্রবৃত্তি অন্তরে বিদ্যমান থাকিলে কোন না কোন সময় প্রচণ্ড বেগে বিষয়াভিমুখে বিনিঃসৃত হইয়া পুরুষকে ঘোরতর পাপপঙ্কে ও দুর্দ্দমনীয় বীভৎস ভোগ বাসনায় নিমগ্ন করিতে পারে। এই কারণে ঐ অবস্থায় উদ্দাম প্রবৃত্তিকে এক স্ত্রীরূপ কেন্দ্রে সংযমিত করা একান্ত আবশ্যক ও যুক্তিযুক্ত। ইহা অবশ্য স্মরণ রাখা উচিত যে ঐরূপ কেন্দ্র-সম্বন্ধ করার উদ্দেশ্য প্রবৃত্তিকে প্রবৃদ্ধ হইতে দেওয়া নহে, কিন্তু উহাকে হ্রাস করাই মুখ্য লক্ষ্য—অর্থাৎ পূর্ব্ব প্রথানুসারে মুক্তিপদ প্রাপ্তিকল্পে প্রবৃত্তিকে প্রনষ্ট করিবার জন্য যে ভাবশুদ্ধি পূর্ব্বক ভোগের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, অন্তিম অবধিতে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই কেন্দ্র বিনষ্ট হওয়ায় যথোক্ত ভাবশুদ্ধির সহিত সেই সীমায় উপস্থিত হইবার জন্য নবীন কেন্দ্র সংগ্রহ করা এই বিবাহের এক মাত্র উদ্দেশ্য। নিবৃত্তি লাভের জন্য প্রবৃত্তি হইলে তাহার অবধি হওয়া সম্ভব কিন্তু প্রবৃত্তিই মুখ্য লক্ষ্য হইলে নিবৃত্তি কখনও সম্ভবপর নহে। এই জন্য নিবৃত্তি ও মুক্তিকে লক্ষ্য করিয়া ভাবশুদ্ধি পূর্ব্বক দ্বিতীয় বিবাহ করিলে তাহা পুরুষের পক্ষে অবশ্য সুফলপ্রদ হইবে, অন্যথা কেবল মাত্র কামোপভোগের জন্য

দ্বিতীয় বিবাহ মনুষ্যের ভোগ-বুদ্ধিকে অধিকতর সম্বর্দ্ধিত করিয়া তাহাকে অচিরে অধোগতি প্রাপ্ত করাইবে ইহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। মহাভারতে আছে যে—

একস্য বহ্ব্যো বিহিতা মহিষ্যঃ কুরুনন্দন।
নৈকস্যা বহবঃ পুংসঃ শ্রূয়ন্তে পতয়ঃ ক্বচিৎ॥

এক পুরুষের অনেক স্ত্রী হইতে পারে কিন্তু এক স্ত্রীর অনেক পতি কখনও হইতে পারে না। এই প্রমাণ অনুসরণ করিয়া উপরি লিখিত দ্বিতীয় উপায় অনুসারে ভাবশুদ্ধিযুক্ত প্রবৃত্তি-সেবা দ্বারা নিবৃত্তির জন্য বহু পত্নী সম্বন্ধ করা যাইতে পারে, যদি ভাবশুদ্ধি ও নিবৃত্তি লক্ষ্য না হয় তবে কখনও উন্নতি ও প্রকৃতি দর্শন করিয়া মুক্তি হইতে পারে না। দ্বিতীয় বিবাহ বিষয়ে পূর্ব্বে যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করা হইয়াছে তাহা প্রথম পরিণীতা স্ত্রীর মৃত্যুর অনন্তর দ্বিতীয় বিবাহের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় কল্পে এবং মহাভারতের উক্ত শ্লোকে যে এক কালীন অনেক স্ত্রী গ্রহণ করিতে বলা হইয়াছে তাহা বিচার করিলে জানা যায় যে, মহাভারতের উক্ত বচন অত্যন্ত নিম্ন শ্রেণীর পুরুষের প্রবৃত্তি পরিত্যাগ কল্পে অভিহিত হইয়াছে—অর্থাৎ অসংখ্য স্ত্রীগত ভোগ পরায়ণ প্রবৃত্তিকে স্বল্প সংখ্যক বিবাহিতা স্ত্রীতে নিবদ্ধ করিয়া শনৈঃ শনৈঃ নিবৃত্তিপথের দিকে অগ্রসর হওয়ার যুক্তি মাত্র। এই প্রথা প্রশংসনীয় নহে। ইহার ফলে কোন কোন স্থলে ঘোর অনর্থ সংঘটিত হইয়াছে। এখানে ইহা বিশেষ বক্তব্য যে এক স্ত্রীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ হউক অথবা যুগপৎ নিম্নশ্রেণী-বিহিত বহুদার গ্রহণ হউক ভাবশুদ্ধি যুক্ত প্রবৃত্তি পূর্ব্বক নিবৃত্তি লক্ষ্যীভূত না হইয়া যদি কামভোগ করাই এক মাত্র উদ্দেশ্য হয় তবে উক্ত উভয় বিবাহ দ্বারাই ঘোর অবনতি হইবে এবিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে ঐ প্রকার পশু ভাবের বশবর্ত্তী বহু-বিবাহ-কারী ব্যক্তি অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদিগের কৃত বিবাহের লক্ষ্য কামোপভোগ বলিয়া, উহাকে পাশবিক বিবাহ বলা যায়; আদর্শ বিবাহ কদাপি বলা যাইতে পারে না। অতএব যেমন ব্যভিচারিণী বিধবা রমণীকে অধিক ব্যভিচার হইতে রক্ষার করিবার জন্য এক পুরুষের সহিত সম্বন্ধ যুক্ত করাইয়া সমাজ,

কুল ও সতীধর্ম্মের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে জাতি হইতে পৃথক করিয়া দেওয়াই যুক্তিযুক্ত; তদ্রূপ আর্য্যজাতির বিবাহ ও আর্য্য গৌরবের আদর্শ চিরস্থায়ী করিবার জন্য এইরূপ পশু-প্রকৃতি ও কামোন্মত্ত ব্যক্তিগণকে জাতিচ্যুত করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

যে সকল কারণে পুরুষের জন্য দ্বিতীয় বিবাহ দ্বারা প্রকৃতি হইতে পৃথক হইয়া নিবৃত্তি ও মুক্তির উপায় কথিত হইয়াছে তাহা স্ত্রীলোকের দ্বিতীয় বিবাহের প্রতি কারণ হইতে পারে না যেহেতু স্ত্রী প্রকৃতি ও পুরুষ প্রকৃতি অত্যন্ত বিভিন্ন। পুরুষের ভোগের সীমা থাকায় ভাবশুদ্ধি পূর্ব্বক ভোগ দ্বারা পুরুষ প্রবৃত্তির চরম সীমায় উপস্থিত হইয়া মুক্তি লাভ করিতে পারে কিন্তু স্ত্রীর ভোগের সীমা না থাকায় তাহার ভাবশুদ্ধি কখনও সম্ভব নহে; অপিচ নবীন পুরুষ প্রাপ্ত হইলে নবীন নবীন কামভোগস্পৃহা সমুদিত হইবে, কারণ তথায় ভোগশক্তি অসীম। যেখানে ভোগশক্তির সীমা আছে সেখানে ভাবশুদ্ধি দ্বারা ভোগ-প্রবৃত্তি ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া নিবৃত্তি আসিতে পারে কিন্তু যেখানে ভোগশক্তির সীমা নাই সেখানে ভাবশুদ্ধির চেষ্টা না করিয়া ভোগশক্তিকে বাড়িবার সুযোগ না দেওয়াই ধর্ম্ম ও বিচারের কার্য্য। একপতিব্রত ধর্ম্ম দ্বারা ভোগশক্তি বাড়িবার সুযোগ পায় না কিন্তু সংযমশক্তি, ধৈর্য্যশক্তি ও বিদ্যা-প্রকৃতি বাড়িবার অবসর পাইয়া থাকে তদ্দ্বারা সতী স্ত্রী অবিদ্যা-মূলক কামপ্রবৃত্তিকে পরিত্যাগ করিয়া পতিতে তন্ময় হইয়া স্বীয় যোনি হইতে মুক্ত হইয়া যায়। বহু পুরুষ সঙ্গ হইতে এরূপ কদাচ হইতে পারে না। এই কারণে স্ত্রী ও পুরুষের ধর্ম্মে এবং উঁহাদের উন্নতি ও মুক্তি মার্গে আকাশ পাতালের ভেদ রহিয়াছে। নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসারে সাধন করিয়া উন্নত ও মুক্ত হওয়া সুখ-সাধ্য ও ধর্ম্মানুকূল। প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কার্য্য করিলে উন্নতির পরিবর্ত্তে অবনতি অবশ্যম্ভাবী সুতরাং আর্য্য নেতৃগণের এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া স্ত্রী ও পুরুষের ধর্ম্ম নির্ণয় করা কর্ত্তব্য। নারীধর্ম্ম, পুরুষধর্ম্ম এবং উঁহাদের বিশেষত্ব সম্পূর্ণ প্রতিপাদন করা হইল। এখন এই সকল বিষয়ে বিচার করিয়া চলিলে আর্য্যজাতি পরম কল্যাণ ও উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

পুরুষধর্ম্ম অপেক্ষা নারীধর্ম্ম কিরূপ স্বতন্ত্র ও বিলক্ষণ তাহাই এই গ্রন্থে বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন করা হইয়াছে। পুরুষধর্ম্ম যজ্ঞ-প্রধান এবং নারীধর্ম্ম তপঃপ্রধান। সৃষ্টি কার্য্যে পুরুষ গৌণ এবং নারী মুখ্য হওয়ায় নারী জাতির বিশেষত্ব, নারী জাতির মহত্ব, নারী জাতির সুরক্ষা, নারীজাতির পবিত্রতা, নারীজাতির অস্বতন্ত্রতা এবং নারীজাতির বিশেষ শিক্ষার উপযোগিতা প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ নারীধর্ম্ম প্রতিপাদন করিয়াছেন। নারীধর্ম্ম পাতিব্রত্য-মূলক কারণ, পুরুষে তন্ময়তা ব্যতীত নারী জাতি কখনও নারীযোনি হইতে পুরুষত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয় না। এই জন্য নারী জাতির শিক্ষা, নারী জাতির বিবাহ, নারী জাতির গৃহিণী ধর্ম্ম এবং নারী জাতির বৈধব্যধর্ম্ম সমস্তই পাতিব্রত্য মূলক হওয়া উচিত। আর্য্য মাতৃগণের মধ্যে আদর্শ সতী-ধর্ম্মের বীজ সুরক্ষিত না হইলে আর্য্য জাতির আর্য্যত্ব কখনও স্থায়ী হওয়া সম্ভব নহে। আর্য্য জাতির পুরুষের বিবাহ অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া ধর্ম্ম মার্গে সমুন্নত হইবার জন্য এবং নারীর বিবাহ পুরুষে অনন্যভাবে তন্ময়তা লাভ করিয়া স্ত্রীযোনি হইতে মুক্তিলাভ করিবার নিমিত্ত, অতএব আর্য্যজাতির বৈবাহিক বিজ্ঞান অনুসারে আর্য্য নারীগণ স্বতন্ত্র হইতে পারেন না, তাহাদের জীবনে বিধবা বিবাহের কলঙ্কও লাগিতে পারে না। আর্য্য রমণী পৃথিবীর মধ্যে আদর্শ রমণী। আর্য্যজাতির বিধবা নারী ঘৃণা অথবা উপেক্ষার পাত্রী নহেন, মহর্ষিগণের বিজ্ঞান ও আর্য্য শাস্ত্র সমূহের সিদ্ধান্ত অনুসারে তাহারা ত্যাগের প্রতিমূর্ত্তি ও পবিত্রস্বভাবযুক্তা প্রত্যক্ষ দেবী সদৃশ জগন্মান্যা এবং আশ্রম ধর্ম্মে সন্ন্যাস ধর্ম্মের আদর্শস্বরূপা। আর্য্য বিধবাদিগের মহত্ত্ব সর্ব্ববাদী সম্মত ও সমস্ত সংসারে বিখ্যাত।

সম্পূর্ণ

কে তুমি মা।

[শ্রীপ্রভাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রত্নতত্ত্ববিশারদ M.R.A.S.]

কেরে সীমন্তিনী অসিত বরণী
উলঙ্গিত অঙ্গে সমরে নাচিছে।
এলায়িত কেশে বিভীষণ বেশে,
রুধিরের ধারা অধরে ঝরিছে।

দশনে রঞ্জিত অলক্তিম আভা,
সিন্দুরে শোধিতে মুকুতার বিভা,
লোল রসনা শোভিতেছে কিবা,
লোহিত পিশিত পোষিত করিছে।

পরিহিত গলে নরশির মালা,
কটিতটে শোভে নৃকর মেখলা,
অসুরের মুণ্ড অসি করে বালা,
ডাকিনী যোগিনী সবেশে ফিরিছে।

পদভরে ক'রে মেদিনী কম্পিত,
দনুজ নিচয়ে করিছে দলিত,
হুঙ্কারে ভীষণ অশনি নিনাদ,
বিজলি উজলি বিকট হাসিছে।

চারিদিক আলো রূপের আভায়,
রণে মেতে বামা চেতনা হারায়,
কত কাল কাল সমরে কাটায়,
তবু না রুধির পিপাসা মিটিছে।

কেমনে চিনিবে বল সে বামারে
বিধি বিষ্ণু ধ্যানে চিনিতে না পারে,
কোটি রবি শশী বিরাজে নখরে,
আদি দেব যাঁর চরণে লুটিছে।

জন্ম হ'তে ধরমের পথে, একনিষ্ঠ পুণ্যের জীবন।
শিশু ধ্রুব ভকত মূরতি, ধ্যানে পায় দিব্য দরশন॥

নব পর্য্যায়।

অকুণ্ঠং সর্ব্বকার্য্যেষু ধর্ম্ম-কার্য্যার্থমুদ্যতম্।
বৈকুণ্ঠস্য হি যদ্রূপং তস্মৈ কার্য্যাত্মনে নমঃ

২য় ভাগ] চৈত্র, সন ১৩২৭। ইং মার্চ্চ ১৯২১। [১২শ সংখ্যা

দয়াল বীর।

অন্নপূর্ণার অঙ্গনে আজি
কনক পাত্র পড়িয়া রয়।
বিজলি রেখায় অঙ্কিত তাহে
"প্রেমিকের শুধু পরশ সয়।"
কনক বার্ত্তা হইল প্রচার
প্রেমিকের তরে দেবের দান।
আসিতে লাগিল স্রোতের আকার
যতেক আছিল ধরম-প্রাণ।
পণ্ডিত যত বসিল সভায়
দেখিতে ধরায় দয়াল বীর।
কনক পাত্র চিনি দিবে আজ
পর দুখে দুখী নয়ননীর!
যত নর নারী আসিল, ফিরিল,
জটাজুটধারী ফিরিল যোগী।
ফিরিল ভিক্ষুক, ফিরিল কাঙ্গাল,
ফিরিল রাজন, ফিরিল ত্যাগী।
আসিল তাপস, ভাসিল তাপস
কনক পাত্র পড়িয়া রয়।

জনেক উদাসী আসি অবশেষে,
আপন পুণ্য কাহিনী কয়—
" রাজার কুমার পথের ভিখারি,
দিয়াছি সকলি দুখের করে।
কাঁদিয়া ফিরেছি পরের লাগিয়া,
রাখি নাই কিছু আপন তরে।
পণ্ডিত যত গাহিল ধন্য,
কনক পাত্র সঁপিল তায়।
নরনারী যত লুটিল ধরায়,
হইল ধন্য ধরণী গায়।
মহান ভিখারি চলে ধীরি ধীরি,
লভিতে পাত্র দেবের দান।
কনক পাত্র বিকল ধূসর
উঠিল শিহরি জানত। প্রাণ।
লাজে অপমানে ফিরিল রাজন,
কহিল ডাকিয়া জগত জনে
বৃথা অহঙ্কার করো না মানব,
সাধি যাও কাজ আপনমনে।"
দলে দলে দলে আসিল ভিক্ষুক
লভিবারে দান প্রেমিক করে।
দানের বরষা ডাকিল সেথায়,
রতন মাণিক মুকুতা ঝরে।
দাতা দান করে, ফিরি নাহি চায়,
কি ব্যথায় কার জ্বলিছে প্রাণ।
নয়নের নীর না পড়ে নয়নে
শ্রবণে না বাজে হুতাশ গান।
বরষের পর বরষ ভাসিছে,
দিবসের পর দিবস বয়,

অন্নপূর্ণা অঙ্গন মাঝে
কনক পাত্র পড়িয়া রয়।
অবশেষে সেথা আসিল জনেক
কৃষক বৃদ্ধ দীনের সাজ।
পূজিতে জননী চরণ যুগল
সাধিতে ধরায় আপন কাজ।
ধীরি ধীরি ধীরি চলিছে দেউলে,
পড়িল নয়নে কাঙ্গাল দল।
ব্যথিত মথিত আকুল হৃদয়ে
উথলি উঠিল নয়নে জল।
দেখিল জনেক অন্ধ খঞ্জ,
কুষ্ঠগলিত পলিত দেহ।
কাতর কণ্ঠে করিছে রোদন,
ভুলেও ফিরিয়া না চাহে কেহ।
আকুল ব্যাকুল দুই হাত মেলি
দৃঢ় আলিঙ্গনে বেড়িল তায়।
কহিল কাতঙ্গরে ডাক বিধাতায়,
লভিবে রাতুল চরণ ছায়।
এমর পৃথিবী রহিবে পড়িয়া,
লয়ে পাপ তাপ করম ফল।
অমর আলোক দিবে সব মুছি
মরমের ব্যথা নয়ন জল।
এতেক বলিয়া চলিল বৃদ্ধ,
তিতিছে হৃদয় নয়ন জলে।
আসিল সেথায় জনতার মাঝে
বরেণ্য সভার আসন তলে।
শুনিল নীরবে যত দাতা মিলি
গাহিছে আপন কীর্ত্তিগান।

উঠিল শিহরি কৃষক বৃদ্ধ
ধিক্কারে তার পূরিল প্রাণ।
সভাপতি আঁখি কি যেন হেরিল,
সবিনয়ে আসি ধরিল কর।
আদরে সাদরে লইল বৃদ্ধে
আপনার সাথে বেদিকা পর
কনক পাত্র উজলি উঠিল
নরনারী যত চকিত চায়।
হলের চালক দেবতার দান
দেবতার মাঝে কাড়িয়া লয়।
জয়ধ্বনি এবে ছাইল জগত
কনক পাত্র তপন প্রায়
শোভিতে লাগিল কৃষকের করে
নয়নের জলে ভাসিয়া যায়।
কনক পাত্র চিনি দিল আজ
পর দুখে দুখী নয়ননীর।
জীর্ণ শীর্ণ ছিন্ন বসন
দেখিল অবনী দয়াল বীর।

শ্রীজীতেন্দ্র নাথ মিত্র.

হরিদাসের পরীক্ষা।

[শ্রীরাধিকা প্রসাদ বেদান্তশাস্ত্রী]

বঙ্গের নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে যে সময়ে বিজেতা যবন জাতির অক্ষুন্ন প্রভাব বিরাজিত, হিন্দু-শাস্ত্রানভিজ্ঞ হিন্দুধর্ম্ম-দ্বেষী কাজিগণ শত শত সিপাহী পরিবেষ্টিত হইয়া যে সময়ে হিন্দু সমাজের বিচার পতির আসনে সমাসীন; পদপ্রতিপত্তি কিম্বা সম্পত্তির লোভে অথবা প্রাণের ভয়ে ঘোর অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া সহস্র সহস্র হিন্দু যে সময়ে জাতীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কলমা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল, গার্হস্থ্য জীবনের উৎসবে ও বিপদ সময়ে

পাঁচপীরের সিন্নী দিতে আরম্ভ করিয়াছিল; হিন্দুকুললনাগণ যে সময়ে সীতা সাবিত্রীর সুপবিত্র চরিত্রের সঙ্গে লয়লা ও মজনুর চরিত্র অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিতেছিল; ঠিক সেই সময়েই হিন্দুধর্ম্মের উজ্জ্বলতম রত্ন ভক্ত-শ্রেষ্ঠ সাধক-প্রবর হরিদাস যবন কুলে জন্ম পরিগ্রহণ পূর্ব্বক মহিমময় সনাতন হিন্দুধর্ম্মের বিজয় বৈজয়ন্তী পতাকা ভারতগগনে উড্ডীয়মান করিয়া জগতে এক অতুলনীয় কীর্ত্তিস্তম্ভ রচনা করিয়া গিয়াছিলেন। ভারতের ইতিহাসে বাস্তবিকই ইহা এক অভিনব ব্যাপার। একদিকে যবন সম্রাট ও যবনরাজাদিগের উন্মুক্ত তরবারি হিন্দুধর্ম্মের মূলোচ্ছেদ করিবার জন্য প্রসারিত—অপরদিকে হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র যবনাদি জাতির অনধিকার-প্রবেশের সুকঠিন শাসন; একদিকে যবনের শাণিত কৃপাণ—অপরদিকে হিন্দুর চিরসম্মানিত ধর্ম্মশাস্ত্র; একদিকে যবনের দুরন্ত অপমান—অপরদিকে হিন্দুর চির আশঙ্কিত সামাজিক সম্মান; এক-দিকে যবনের ভীষণ প্রজ্বলিত দুর্ব্বিষহ ক্রোধাগ্নি অন্যদিকে হিন্দুর জন্মজন্মার্জ্জিত চিরসঞ্চিত কঠোর সংস্কার। হরিদাস যখন এই উভয় বিরুদ্ধ স্রোতের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া সর্ব্বজীবহিতকর হরিনাম কীর্ত্তনের অতুলিত মহিমান্বিত প্রভাবে শত শত ঝঞ্ঝাবাত শত শত বাধা বিপত্তি অবহেলে সহ্য করিয়া প্রেমের বন্যায় অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া বিশ্ব প্রেমিকের উদার সার্ব্বভৌমিক দৃষ্টিতে উভয়ের সমতা বিধান করিলেন; বিদ্বেষ ভাবাপন্ন দুই বিরুদ্ধ জাতিকে ভবিষ্যতে এক মঙ্গলময় প্রেমসূত্রে গ্রথিত করিবার জন্য উভয়ের দম্ভ, দর্প, অভিমান চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া উভয়ের হৃদয় ক্ষেত্রে মহামন্ত্রে অভিমন্ত্রিত প্রেমবীজ রোপন করিলেন সে দৃশ্য দর্শন করিয়া কাহার হৃদয় পুলকিত, রোমাঞ্চিত বা স্তম্ভিত না হয়? আজ যে হিন্দুমুসলমানের একতাধ্বনি চতুর্দ্দিকে শ্রুত হইতেছে ইহাও সেই সাধু-শ্রেষ্ঠ মহাত্মার অনুকম্পা এবং তাঁহারই রোপিত বীজের অপূর্ব্ব পরিণতির অত্যল্প নিদর্শন মাত্র।

হরিদাস বাল্যকাল হইতেই জন্ম-সিদ্ধ ভক্ত। যশোহর জেলার অন্তঃপাতী বূঢ়ন গ্রামে তাঁহার জন্ম। তাঁহার পিতামাতার বিশেষ পরিচয় কোথাও কিছু পাওয়া যায় না। কোনও কোনও গ্রন্থকার তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বা ভাট-বংশীয় বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন কিন্তু তাহা বৈষ্ণব কবিগণের মতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। চৈতন্যভাগবত রচয়িতা বৈষ্ণব কবি বৃন্দাবন দাস হরিদাসের চরিত্র বর্ণন প্রসঙ্গে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে—

"জাতিকুল সব নিরর্থক বুঝাইতে
জন্মিলেন নীচ কুলে প্রভুর আজ্ঞাতে।"

এই বাক্যের দ্বারা তিনি যে উচ্চ বংশে জন্ম গ্রহণ না করিয়া কোনও নীচকুলে জন্মিয়াছিলেন ইহা বেশ প্রমাণিত হইতেছে। বস্তুতঃ তিনি মানব সমাজের যে জাতিতেই জন্ম গ্রহণ করুন, বাল্যকাল হইতেই তিনি নিজ সদাচার ও সাধুতার জন্য আচণ্ডাল ব্রাহ্মণের শ্রদ্ধাভাজন হইতে অসমর্থ হইয়াছিলেন। শৈশবকাল হইতেই তাঁহার ঈশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ বিদ্যমান ছিল। জন্ম জন্মান্তরীন সুকৃতিবলে যিনি একবার ঈশ্বর প্রেমে মজিয়াছেন, প্রেমের অমৃতময় রসাস্বাদে যাঁহার মনঃপ্রাণ ভিজিয়াছে, অশান্তিপূর্ণ সংসারের কুহকজড়িত প্রহেলিকার খেলা বিবেক দৃষ্টিতে যিনি একবার অবলোকন করিতে সমর্থ হইয়াছেন তিনি কি.আর গৃহস্থের সামান্য শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে পারেন? প্রেমিক সাধু হরিদাস প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া নশ্বর গৃহবন্ধনের মায়াপাশ অবহেলে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া গ্রামের অনতি দূরে বেনাপোল নামক বনভূমির মধ্যে তৃণলতাচ্ছাদিত বিজনকুটীরে পরমানন্দে পরমানন্দময় পরমেশ্বরের সাধনায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সাধনার বিশেষত্ব এই যে তিনি সুমধুর ধ্বনিতে এরূপ ভাবে নাম কীর্ত্তন করিতেন যে তাহা শ্রবণ করিবার জন্য বহুদেশ দেশান্তর হইতে লোকসমাগম হইত। অল্পদিনের মধ্যেই সেই বিজনারণ্য জনকোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিল। আশ্রমের চতুর্দ্দিকে সর্ব্বদা সহস্র সহস্র লোক সমবেত হইয়া অমৃতনিন্দিত সুমধুর হরিনাম সুধা পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে লাগিলেন। যাঁহারা একবার সে মধুর কীর্ত্তন শ্রবণ করিলেন তাঁহারা আর ভুলিতে পারিলেন না। ক্ষুধানিদ্রা ভুলিয়া নিজ নিজ কাজ কর্ম্ম ফেলিয়া সেই মধুর নাম শ্রবণের জন্য সমুৎসুক হইয়া রহিলেন। এইরূপে সমস্ত দিবস নাম জপের নির্ম্মল আনন্দোপভোগে অতিবাহিত করিয়া সাধক হরিদাস সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে নিকটবর্ত্তী গ্রামে গিয়া মুষ্টিমিত অন্ন ভিক্ষা করিয়া আনিতেন। তিনি প্রতিদিন তিন লক্ষেরও উপর অর্থাৎ প্রতিমাসে এক কোটী নাম জপ করিতেন। দিবাভাগে জপ সংখ্যা পূর্ণ হইত না বলিয়া সমস্ত রাত্রি অবিশ্রান্ত অবিচলিত ভাবে পূর্ব্বোক্তরূপ কীর্ত্তনানন্দ উপভোগ করিতেন। বৈষ্ণব কবি তাহাই বর্ণন করিয়াছেন—

"নির্জ্জন বনে কুটীর করি তুলসী সেবন,
রাত্রিদিনে তিন লক্ষ নাম সঙ্কীর্ত্তন,
ব্রাহ্মণের ঘরে করে ভিক্ষা নির্ব্বাহন
প্রতাপে সকল লোক করয়ে পূজন।"

দৈবী এবং আসুরী শক্তির সমাবেশেই এই বিশ্বসংসার রচিত। যেখানে দৈবী শক্তির সামান্যমাত্র প্রাধান্য—সামান্যমাত্র প্রতিপত্তির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, ঠিক তাহারই পাশে প্রতিকূল ভাবে দাঁড়াইয়া আসুরীশক্তি যেন উঁকি মারিতেছে। আবার আসুরী শক্তির প্রাধান্য হইবামাত্র দৈবশক্তি নিজ পরাক্রম প্রকাশ করিয়া তাহাকে দমিত করিবার জন্য প্রবল প্রয়াস করিয়া থাকে। এই উভয় শক্তির সামঞ্জস্যেই জগতের সমতা রক্ষিত হয়। কিন্তু বিশ্বরচয়িতার এমনি নিয়ম যে উভয় শক্তিই পরস্পর বিজিগিষু হইয়া পরস্পরকে অতিক্রম করিবার জন্য যেন সর্ব্বদা ব্যস্ত। এই নিমিত্ত কি ব্যষ্টি জগতে কি সমষ্টি জগতে সর্ব্বত্রই দেবাসুর সংগ্রাম প্রতিনিয়তই সম্পাদিত হইতেছে। সাধক যখন সাধনা প্রভাবে নিজ আসুরী শক্তিকে দমিত করিয়া দৈব শক্তির আনুকূল্য লাভের জন্য সচেষ্ট হ'ন ঠিক সেই সময়েই আসুরী শক্তি নিজ বিক্রম প্রকাশ করিয়া দৈবশক্তিকে পরাজিত করিবার জন্য সাধককে নানারূপে উৎপীড়িত করিয়া থাকে। এই স্থলেই সাধকের পরীক্ষা আরম্ভ হয় এবং এই যুদ্ধে জয়ী হইতে পারিলেই সাধক বিশ্বজয়ী হইয়া উঠিতে পারেন। ইহাই চির-প্রচলিত রীতি। সৃষ্টির আবহমান কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত যে সমস্ত সাধক সাধন রাজ্যে সমুন্নত হইয়াছেন, তাঁহাদের সকলকেই অল্পাধিক পরিমাণে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছে। সাধক হরিদাসের পক্ষেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। তাঁহার সাধন রাজ্যে এই নূতন পরীক্ষা আরম্ভ হইল। সাধকের সুবিমল যশোরাশি দিগন্ত বিস্তৃত হইয়া লোকমুখে যতই প্রচারিত হইতে লাগিল, আপন প্রেমে মজিয়া সাধক যখন প্রেমের হিল্লোলে দেশ শুদ্ধ সমস্ত নরনারীকে মজাইয়া তাঁহাদের উপর যতই কর্ত্তৃত্ব প্রভুত্ব করিতে লাগিলেন; সেই দেশের রাজা বৈষ্ণববিদ্বেষী রামচন্দ্র খানের হৃদয়ে বিদ্বেষবহ্নি ততই প্রজ্জলিত হইয়া উঠিতে লাগিল। একজন নীচ জাতীয় ভিক্ষুক তাঁহার রাজ্যে প্রভুত্ব করিবে ইহা তাঁহার প্রাণে অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি সাধককে নির্য্যাতিত, অপমানিত

এবং দেশ হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সাধকের সমক্ষে প্রত্যক্ষ ভাবে কোনরূপ অনিষ্ট করিতে না পারিয়া তিনি কূট নীতিপূর্ণ কৌশল উদ্ভাবনের জন্য প্রযত্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অধিকারে কতকগুলি বারাঙ্গনা বাস করিত। তিনি তাহাদিগকে গোপনে ডাকাইয়া নিজ মনোভাব সমস্ত ব্যক্ত করিলেন এবং বলিয়া দিলেন যে, যে ঐ ভণ্ড সাধুকে কুপথে আনিতে পারিবে অথবা তাহার নামে কলঙ্ক রটাইতে পারিবে; তাহাকে তিনি যথেষ্ট পুরস্কৃত করিবেন। বারাঙ্গনাগণ যদিও স্বভাবতই অর্থলুব্ধা, কামুকী এবং রূপব্যবসায়িনী তথাপি এই দুষ্কর্ম্ম করিতে অনেকেই সাহস করিতে পারিল না। তাহারই মধ্যে একজন যৌবন-মদগর্ব্বিত সৌন্দর্য্যাভিমানিন রমণী রাজার চিত্তরঞ্জনের জন্য এবং ধনলোভে অন্ধ হইয়া এই দুঃসাহসিক কর্ম্মে সম্মতি জ্ঞাপন করিল। দাম্ভিকা রমণী গর্ব্বসহকারে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে লাগিল যে, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একজন ভিক্ষুকের চিত্তহরণ করিবার জন্য বিশেষ কোন উদ্যোগের প্রয়োজন নাই; আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে তিন দিনের মধ্যে তাহাকে নিশ্চয়ই এই পথের পথিক করিব। হা হত-ভাগিনি! সাংসারিক নশ্বর ক্ষণিক সুখের মোহে মুগ্ধ হইয়া যে গর্হিত কর্ম্মে অগ্রসর হইতেছ- তুমি বুঝিতে পারিতেছ না তাহা কত দুঃসাধ্য! যাঁহার স্বল্প-মাত্র কুটিল কটাক্ষ বিক্ষেপে দৃশ্যমান বিশ্ব সংসারের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় সাধিত হয়, যাঁহার বিন্দুমাত্র রূপকণিকা লাভে তুমি নিজেকে পরমসুন্দরী বলিয়া গর্ব্বানুভব করিতেছ, যিনি মহতো মহীয়ান অণোরণীয়ান যিনি ভক্তের হৃদয় কন্দরে ভাব ডোরে চিরতরে আবদ্ধ হইয়া প্রতি পদে পদে বিপদে সম্পদে ভক্তকে রক্ষা করি-বার জন্য ব্যাকুল হইয়া ফিরিতেছেন, ভক্ত হরিদাস যে তাঁহারই আশ্রিত। তিনি যে ধন, জন, স্বজন, পরিত্যাগ করিয়া যে সাংসারিক সুখমদিরায় বিশ্বসংসার উন্মত্ত, উদ্ভ্রান্ত—সেই সাংসারিক সুখে জলাঞ্জলি দিয়া একমাত্র ভবভয়হারী হরির চরণে শরণ গ্রহণ করিয়াছেন। তোমার মত শত শত কামিনীর সাধ্য কি যে তাঁহার কেশাগ্র স্পর্শ করিতে পারে? সে যাহাই হোক, মানব যখন বিদ্যামদে, ধনমদে অথবা যৌবনমদে উন্মত্ত হইয়া কোন কার্য্য করিতে থাকে তখন নিজ শক্তির বিচার করিবার ক্ষমতা তাহার থাকে না। এ ক্ষেত্রেও দর্পিতা রমণী নিজ সামর্থ্যের বিষয় চিন্তা না করিয়া মোহে অন্ধ হইয়াই কার্য্যে প্রবৃত্ত

হইল । সুসময় বুঝিয়া একদিন সন্ধ্যাকালে সে বিবিধ বেশ বিন্যাসে সুসজ্জিত হইয়া হরিদাস ঠাকুরের কুটীর দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইল। নিশাকালে নির্জ্জন প্রদেশে একাকিনী সুসজ্জিতা রমণীকে সমাগত দেখিয়া সাধক একটু হাসিলেন। পরে "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা" এই মহামন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে মাতৃভাবে বিভোর হইয়া গেলেন, তাঁহার বাহ্যস্ফূর্ত্তি তিরোহিত হইয়া উঠিল. বহুকষ্টে তিনি আত্মভাব সংবরণ করিয়া স্বভাবসিদ্ধ মধুর ভাষায় তাহাকে দ্বারদেশে বসিতে অনুরোধ করিলেন। রমণী উপবিষ্ট হইলে তিনি প্রেমগদগদ কণ্ঠে স্নেহমাখা মধুরস্বরে তাহাকে আপ্যায়িত করিয়া বলিলেন—আমি প্রতিদিন নিয়মিত সংখ্যায় জপ করিয়া থাকি যতক্ষণ না সে সংখ্যা পূর্ণ হয় ততক্ষণ তুমি ঐ স্থানে বসিয়া হরিনাম কীর্ত্তন শুনিতে থাক। নাম সমাপ্ত হইলে তোমার সহিত আলাপ করিব। বেশ্যা বসিয়া রহিল সাধক কীর্ত্তন করিতে করিতে আত্ম বিস্মৃত হইয়া একভাবে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। উষা সমাগম অনুভব করিয়া বেশ্যা যেন লজ্জায় একটু অপ্রতিভ হইয়া ধীরে ধীরে বাড়ী চলিয়া গেল; যাইবার সময় বলিয়া গেল যে কল্য আবার সাক্ষাৎ করিব। সাধুও তাহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

পরদিন যথা সময়ে বেশ্যা মহা আড়ম্বরের সহিত বিবিধ সাজে সজ্জিত হইয়া স্বীয় অঙ্গকান্তিচ্ছটায় পর্ণকুটীর উদ্ভাসিত করিয়া কুটীল কটাক্ষ বিক্ষেপ করিতে করিতে যথা স্থানে উপবেশন করিল। সাধক হরিদাসও ভক্তি গদগদ চিত্তে সুমধুর হরিনাম কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। প্রেমাবতার গৌরহরি ভবের তুফানে যে নামতরি ভাসাইয়া শত শত পাপী তাপীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, যে নামের গুণে গহনবনে মৃততরু মঞ্জরিত হইয়াছিল; বেশ্যার দুষ্প্রবৃত্তি দমন করিয়া তাহাকে সৎপথে আনয়নের জন্য পরদুঃখকাতর সাধু হরিদাসও উচ্চৈঃস্বরে পঞ্চমতানে দশদিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া সেই মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। একদিকে বেশ্যার দুর্ব্বার কাম প্রবৃত্তির বিশ্ব-গ্রাসিনী লেলিহান শিখা আর একদিকে পাপতাপ বিনাশক ভবারাধ্য ভগবানের সাধু-বদনোচ্চারিত সুমধুর সুমঙ্গল হরিনাম। একদিকে কুটীল কালসর্প—অন্যদিকে কালিয়-দমন নন্দনন্দনের উদ্দণ্ড তাণ্ডব নৃত্য। একদিকে অজ্ঞানের ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন অন্ধকার অপরদিকেপ্রকাশ স্বভাব উজ্জ্বল জ্ঞানের সুপ্রকাশ।

একদিকে তামসিক আসুরী শক্তির মোহময় ভাব অপরদিকে সাত্তিক দৈবশক্তির প্রবল প্রভাব। যুদ্ধ তুমুল বাধিল। সাধকই এযুদ্ধে জয়ী হইলেন। হরিনাম শ্রবণ করিতে করিতে বেশ্যা হরি হরি বলিয়া নাচিতে লাগিল। সাধকের করুণকণ্ঠের করুণ আর্ত্তনাদ করুণা-সিন্ধুর নিকট পৌঁছিল। পাপীয়সীর পাপ প্রবৃত্তি তিরোহিত হইয়া গেল। সে ভাবাবেশে বিহ্বল হইয়া সজল নয়নে কাঁদিতে কাঁদিতে হরিদাসের চরণ প্রান্তে ধূলায় লুটাইয়া পড়িয়া আর্ত্তস্বরে প্রার্থনা করিতে লাগিল।

"বেশ্যা হৈয়া মুই পাপ করিয়াছি অপার
কৃপা করি কর মুই অধমে নিস্তার।"

সাধুর উদার হৃদয় সর্ব্বদাই সুপ্রসন্ন। বেশ্যার এই অপূর্ব্ব বিচিত্র পরিবর্ত্তনে প্রেমপাগল প্রেমিকবর প্রেমময়ের অপার করুণার কথা স্মরণ করিয়া প্রেমাশ্রু পূর্ণ নয়নে ভাবাবেশে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার দয়ার হৃদয় বেশ্যার কাতর বিলাপে বিগলিত হইয়া চক্ষু দিয়া প্রেমাশ্রুরূপে দর দর ধারায় প্রবাহিত হইতে লাগিল। প্রেমিক হৃদয়ের উথলিত আনন্দোচ্ছ্বাসে বেশ্যার সমস্ত কুপ্রবৃত্তি দমিত শমিত হইয়া গেল তিনি সযত্নে বেশ্যাকে উঠাইয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে সুমধুর ভাষায় বলিতে লাগিলেন—মা! এ জগতে সকলেই নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে। দোষ কাহারও নয় মা! সমস্তই লীলাময় বিশ্বনাটক-রচয়িতার লীলা-খেলা। তোমার কোন চিন্তা নাই। আজ হইতে তুমি ভব-ভয়হারী হরির চরণ চিন্তায় চিত্তকে নিযুক্ত কর। সমস্ত পাপ তাপ বিদূরিত হইয়া যাইবে চিত্ত নির্ম্মল হইয়া সদানন্দময় সচ্চিদানন্দের ভাবে আনন্দময় হইয়া উঠিবে। শাস্ত্রে কথিত আছে যে,—

না চিন্তা ভুবি পুত্রপৌত্রভরণব্যাপারসম্ভাষণে
যা চিন্তা ধনধান্যভোগযশসাং লাভে সদা জায়তে
সা চিন্তা যদি নন্দনন্দনপদদ্বন্দ্বারবিন্দে ক্ষণং
কা চিন্তা যমরাজভীমসদনদ্বারপ্রয়াণে প্রভো!

সংসারে জীবগণ পুত্র পৌত্রাদির ভরণপোষণাদি ব্যাপারে যে চিন্তা করিয়া থাকে, ধনধান্য, ভোগ এবং যশো-লাভের জন্য যে চিন্তা করিয়া থাকে

অল্প সময়ের জন্যও যদি সেই চিন্তা নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দে নিযুক্ত করিতে পারে তাহা হইলে তাহাকে যমরাজের জন্য কোন ভয় করিতে হয় না। অতএব মা! তুমি অদ্য হইতে তুলসী সেবন, বৈষ্ণব সেবন এবং ভগবন্নাম কীর্ত্তনে কাল যাপন করিতে থাক, নিশ্চয়ই ভগবানের অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হইবে। সাধু সঙ্গের কি অপূর্ব্ব শক্তি, কি অপার মহিমা! সেই দিবস হইতে সেই পাপাচারিণী গণিকা গলায় তুলসীর মালা পরিয়া সর্ব্বাঙ্গে হরিনামের ছাপ লাগাইয়া পরমবৈষ্ণবী বলিয়া বৈষ্ণব সমাজে সমাদৃত হইতে লাগিলেন। বৈষ্ণব কবি তাহাই বর্ণন করিয়াছেন—

তবে সেই বেশ্যা গুরুর আজ্ঞা লইল
গৃহবৃত্তি যেবা ছিল ব্রাহ্মণেরে দিল।
মাথা মুড়ি এক বস্ত্রে রহিল সেই ঘরে,
রাত্রিদিনে তিন লক্ষ নাম গ্রহণ করে।
তুলসী সেবন করে চর্ব্বণ উপবাস,
ইন্দ্রিয় দমন হইল প্রেমের প্রকাশ,
প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হইল পরম মহান্তী,
বড় বড় বৈষ্ণব তার দর্শনেতে যান্তি।
বেশ্যার চরিত্র দেখি লোকে চমৎকার,
হরিদাসের মহিমা কহে করি নমস্কার।

এইরূপে লীলাময় ভগবানের একই খেলায় দুইটী কার্য্য সাধিত হইল সাধুসঙ্গের অপার মহিমা-গুণে স্বভাব-দয়াল সাধুর দয়ালেশে অস্পৃশ্যা নীচ-জাতীয়া বেশ্যাও জগদ্বরণ্যা মান্যা ও ধন্যা হইয়া গেল। সাধুও ভগবানের অনুকাম্পায় স্বীয় সাধন জীবনের প্রথম পরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ হইয়া, দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে দ্বিগুণ উৎসাহে ধন, মান, যৌবন, কুল, অভিমান সমস্তই ভগবৎ পদে উৎসর্গীকৃত করিয়া আনন্দোৎফুল্ল মনে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন—

সমাশ্রিতা যে পদপল্লবপ্লবং,
মহৎপদং পুণ্যযশো মুরারেঃ।
ভবাম্বুধিবৎসপদং পরং পদং
পদং পদং যৎ বিপদাং ন তেষাং॥

যাঁহারা পুণ্যশ্লোক মুরারির চরণ পল্লব আশ্রয় করিয়াছেন, ভবসমুদ্র তাঁহাদিগের নিকট বৎস পদের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। তাঁহারা কোনও রূপ বিপদে মুহ্যমান হন না।

ধর্ম্মই সকল উন্নতির মূলভিত্তি।

(চতুর্থ প্রস্তাব)

ধর্ম্ম শিক্ষা বিস্তারের উপায়।

[শ্রীবিজয় লাল দত্ত

পরম মঙ্গলময় ভাগ্য-বিধাতার বিচিত্র বিধানে শত শত বর্ষের অধীনতায় জর্জ্জরিত অধঃপতিত, অন্তঃসারশূন্য, মরণোন্মুখ ভারতের নবজীবনের লক্ষণ কিছুকাল হইতে দৃষ্টিগোচর হইতেছে। আজি ভারত-ভূমির এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সকল স্থানের অসংখ্য নরনারীর নব জাগরণের বার্ত্তা চারিদিকে বিঘোষিত ও প্রতিধ্বনিত হইতেছে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রাণহীন বিশুষ্ক কঙ্কাল-রাশি কিছুদিন হইতে এক অপূর্ব্ব সঞ্জীবনী শক্তি প্রভাবে নূতন প্রাণে স্পন্দিত হইতেছে। সুবিশাল ভারতের গগণ-পবন আজি নবজীবনের গানে মুখরিত। দেশের সর্ব্বত্র এক মহাশ্চর্য্য অভিনব ভাবের বিপুল বন্যা প্রবল বেগে খরতর প্রভাবে প্রবাহিত হইতেছে। ভারতের যে সকল অশেষ কল্যাণকামী পবিত্রাত্মা সাধু-সন্ন্যাসী সুদীর্ঘকাল নির্জ্জনে লোক লোচনের অন্তরালে একাগ্রচিত্তে কঠোর সাধনা করিয়াছিলেন এবং যে সকল এক-নিষ্ঠ সুকৃতিশালী সাধক সন্তান দেশমাতৃকার হিতসাধনে গভীর অনুরাগ ও প্রগাঢ় ভক্তিভরে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাঁহার ভবিষ্যৎ অভ্যুদয়ের আশার অরুণ আলোকে আজি তাঁহাদের সকলের মনঃপ্রাণ উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। দেশজননীর উত্তপ্ত হৃদয়ে সুশীতল শান্তি-বারি বর্ষণ ও তাঁহার পবিত্র ললাট হইতে কলঙ্কের কালিমা প্রক্ষালনে তাঁহার বিলুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার সাধনের বর্ত্তমান মাহেন্দ্র মুহূর্ত্তে তাঁহার অযুত সুসন্তান নিঃস্বার্থভাবে মহোৎসাহে কায়মনোবাক্যে ব্রতী হইয়াছেন। এই শুভক্ষণে স্বদেশ প্রেমের মধুর স্ফূরণে সমগ্র দেশের চতুর্দ্দিকে জাতীয় জীবন সংগঠনের

এক বিপুল সাড়া ও উদ্যোগ পড়িয়াছে। সুষুপ্ত জাতীয় শক্তির বর্ত্তমান উদ্বোধনের দিনে দেশব্যাপী বিরাট আন্দোলনের সময় প্রত্যেক সুশিক্ষিত ও সহৃদয় নরনারীর ধীর ভাবে পর্য্যালোচনা করা একান্ত কর্ত্তব্য, কি উপায়ে দেশের প্রকৃত স্থায়ী কল্যাণ সংসাধিত হইতে পারে।

এক সময় যে পুণ্যভূমির প্রাতঃ স্মরণীয় বিশুদ্ধাত্মা সুসন্তানগণের অন্তর-নিহিত উদার কামনা প্রতিদিন প্রথম প্রভাতে প্রজ্জ্বলিত পবিত্র হোমাগ্নি-শিখার সহিত গগন-পবন ভেদ করিয়া উর্দ্ধে পরমাত্মা দেবের চরণারবিন্দে উপস্থিত হইত, তাঁহাদের বংশধরগণের দেশ-জননীর কল্যাণ জন্য কি কর্ত্তব্য তাহা আজি নূতন ভাবে আলোচনার আবশ্যকতা জন্মিয়াছে; একথা মনে হইলেও অন্তঃকরণ ঘোর বিষাদে আকুল হইয়া উঠে! যে দেবতুল্য আর্য্য-জাতির জীবন-সঙ্গীত এক সময় কমনীয় ছন্দ বন্দনায় প্রাণারাম ভাবে দেশ দেশান্তরে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল, সমস্ত জগতকে পুলকিত ও আশ্বস্ত করিয়াছিল, যে পরম সৌভাগ্যশালী জাতির আবাল-বৃদ্ধ বনিতা এক সময় বিশ্ব-জননীর চরণে আত্ম-নিবেদন পূর্ব্বক মুক্ত কণ্ঠে প্রাণ ভরিয়া গাইতেন—

"প্রাতরুত্থায় সায়াহ্নং সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ।
যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম্।"

অর্থাৎ প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত, এবং সন্ধ্যা হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত আমি যাহা কিছু করি, জগতজননি! তৎসমস্ত তোমারই পূজা ভিন্ন আর কিছুই নহে, সেই বিশ্ব বিশ্রুত ধর্ম্ম-প্রাণ সুকৃতিশালী জাতির বংশধরগণের ধর্ম্মভাব যুগ-ধর্ম্ম প্রভাবে এক্ষণে কেন এত মলিন ও বিকৃত ভাবাপন্ন হইয়াছে তাহা চিন্তা করিলে হৃদয় বিষম দুঃখ ও ক্ষোভে অভিভূত ও অবসন্ন হইয়া পড়ে। এক সময়ে যে ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ স্বর্গের দেবত্ব লাভ অপেক্ষাও গৌরবজনক ও শ্লাঘনীয় বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছিল, কারণ সমস্ত অবনীর ললাট-মণি দেবজনস্পৃহনীয় এই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ভূভাগে সুকৃতিশালী ব্যক্তিগণ জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক স্ব স্ব সাধনা ও পুণ্য-প্রভাবে স্বর্গাপবর্গ লাভ করিতেন, তাহার দীর্ঘকাল হইতে একি মর্ম্মভেদী শোচনীয় দুর্দ্দশা ভোগ হইতেছে!

গায়ন্তি দেবাঃ কিল গীতকানি,
ধন্যাস্ত তে ভারত-ভূমি-ভাগে।

স্বর্গাপবর্গাস্পদমার্গভূতে
ভবন্তি ভূয়ঃ পুরুষাঃ সুরত্বাৎ॥

উল্লিখিত মধুময় বাক্য-নিচয় ত কবি-কল্পনা অথবা পৌরাণিকী গাথামাত্র নহে—উহা যে শাস্ত্রীয় অমৃতময়ী বাণী। সেই একদিন আর এই একদিন! অহহ! নিয়তির নিষ্ঠুর বিধানে কাল-বশে উপযুক্ত শিক্ষা, দীক্ষা ও সাধনা অভাবে সেই পুণ্যভূমি হইতে সংযম, সদাচার, ব্রহ্মচর্য্য, সত্য-নিষ্ঠা, ধর্ম্মানুরাগ, সরলতা ও তপশ্চর্য্যা যেন চির বিদায় লইয়া উহাকে অপকৃষ্ট প্রেতভূমিতে পরিণত করিবার উপক্রম করিয়াছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষা, সভ্যতা, রীতিনীতি ও আচার ব্যবহারের মোহময় আকর্ষণে অধিকাংশ ভারত-সন্তান স্বধর্ম্মানুরাগে বীতশ্রদ্ধ হইয়া স্বজাতীয় বিশেষত্ব ভুলিয়া অবনতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। সেই মোহান্ধকার ও ঘৃণিত অনুকরণস্পৃহা এক্ষণে শ্রীভগবানের কৃপায় ধীরে ধীরে অপসারিত হইবার সূচনা হইতেছে। ধর্ম্মভাব বিহীন বিজাতীয় শিক্ষা ও সভ্যতার চাকচিক্যময় আপাতশোভন অসার ভাগ গ্রহণের অশুভ ফল ভারতসন্তানগণ এক্ষণে অনুতপ্ত-হৃদয়ে উপভোগ করিতেছে এবং তাহার প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া দেশ-জননীর বিলুপ্ত-প্রায় ধর্ম্মভাব ও মহত্ত্ব-গৌরব পুনরুদ্ধার করিবার জন্য যত্নবান হইতেছে। জাতীয় জীব পুনঃ সংগঠনের এইত প্রকৃত মাহেন্দ্রযোগ। এই সময় সমগ্র দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার সুসংযত, সমাহিত, সুপ্রশান্ত ও সুপবিত্র অন্তরে সকল উন্নতির নিদান মঙ্গলময় বিভূতি-ভূষণের পবিত্র চরণে সর্ব্বান্তঃকরণে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক দেশ-মাতৃকার প্রকৃত কল্যাণ ও উন্নতির উপায়-বিধানে একাগ্রচিত্তে প্রবৃত্ত হওয়া একান্ত আবশ্যক। কি উপায় অবলম্বনে উক্ত কার্য্যে সফলতা লাভ করা যাইতে পারে অতঃপর আমরা সংক্ষেপে তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

(ক) প্রাচীন ভারতের সুখশান্তির দিনে ভারতসন্তানগণের সুশিক্ষা লাভ ও চরিত্র সংগঠনের অতি সুন্দর প্রথা বিদ্যমান ছিল। বাল্যকালে গুরুগৃহে বাস এবং ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে সংযম, সদাচার ও সুশিক্ষা লাভ এবং কৌমার ও যৌবনে উপযুক্ত গুরু অথবা আচার্য্যের নিকট হইতে দীক্ষাগ্রহণে ধর্ম্ম শিক্ষা লাভে ভারত সন্তানগণ মনুষ্যত্বের পথে অগ্রসর হইয়া যেরূপ

সুপবিত্রভাবে জীবন-যজ্ঞ সুসম্পন্ন করিতে পারিতেন বর্ত্তমান সময়ে সে সুন্দর প্রণালী বিলুপ্ত হইয়া অতীত কাহিনীতে পরিণত হইয়াছে। তখনকার দিনে জনসমাজে বিলাসিতা প্রবেশ করিতে পারিত না; জীবন-সংগ্রাম কঠিন ছিল না, জন সাধারণের অল্পই অভাব ছিল এবং সহজেই তাহা নিবারিত হইত। সরল ও সহজ পথ ধরিয়া সকলেই জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের ব্যবস্থা করিয়া পরিমিত ও সহজ-সাধ্য উন্নতির অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকিতেন। তখন তাঁহাদের জীবন সন্তুষ্ট অবস্থায় ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া পরম শান্তিতে অতিবাহিত হইত। তৎকালে প্রতিগৃহে—

সন্তোষামৃততৃপ্তানাং যৎসুখং শান্তচেতসাম্,
কুতস্তদ্ধনলুব্ধানামিতশ্চেতশ্চ ধাবতাম্।

এই মহাবাক্যের প্রকৃত মর্য্যাদা রক্ষিত হইত। সমাজ-বন্ধন ও শৃঙ্খলা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। দীর্ঘকাল হইতে বিভিন্ন রাজ শক্তির শাসনাধীনে চরিত্র সংগঠন ও মনুষ্যত্ব লাভে জাতীয় জীবনের উন্নতি সাধনের সুন্দর প্রণালী এক্ষণে বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে এবং কোন প্রদেশে যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাহাও বর্ত্তমান ধর্ম্মহীন শিক্ষার প্রবলস্রোতে কোথায় ভাসিয়া যাইতেছে। উপযুক্ত শিক্ষা, ব্রহ্মচর্য্য, সংযম ও ধর্ম্মানুরাগ অভাবে দেশ দিন দিন বিলাসিতায় ডুবিতেছে; অভাব ও অশান্তি দিনদিন পরিবর্দ্ধিত এবং জীবনসংগ্রাম কঠোর হইতে কঠোরতর হইতেছে। আমরাই অনুকরণ-প্রবৃত্তি পরিহার করিতে অক্ষম হইয়া দিনদিন আপন আপন অভাব বাড়াইয়া তুলিতেছি; আমাদের সমাজ-বন্ধন দিন দিন শিথিল ও ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে এবং দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সকল স্থানেই অভাব ও অশান্তি জনিত বিষম হাহাকার ধ্বনি উত্থিত ও অসন্তোষ উচ্ছৃঙ্খলতা পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিত হইতেছে। কুৎসিৎ ধর্ম্মভাববিহীন শিক্ষার পরিবর্ত্তন সাধন ও সুসংস্কার বিধান জন্য বর্ত্তমান সময়ে কোন কোন মহান মনীষী মনস্বী, ও ক্ষমতাশালী সন্তান উদ্বুদ্ধ হইয়া কার্য্য-ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন বর্ত্তমান যুগে পূর্ব্বের ন্যায় ছাত্রগণের গুরুগৃহে বাস, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে সদাচার, সুসংযম অর্জ্জন এবং উপযুক্ত আচার্য্যের নিকট ধর্ম্মশিক্ষা লাভ সহজ-সাধ্য না হইলেও তাহাদের মনুষ্যত্বলাভ ও জীবনের প্রকৃত উন্নতি

সাধনের নিশ্চয়ই সুব্যবস্থা হইতে পারে। যে পাশ্চাত্য শিক্ষার মধ্য হইতে বঙ্গজননীর সুসন্তান ভূদেব, চন্দ্র, মহাপ্রাণ বিদ্যাসাগর, মহানুভব প্যারীচাঁদ স্বধর্ম্মানুরাগী স্যার গুরুদাস ও স্বদেশ ভক্ত পণ্ডিত অযোধ্যানাথ প্রভৃতি অসাধারণ শক্তিশালী ব্যক্তিগণ স্ব স্ব ধর্ম্মভাব ও সদাচার অক্ষুণ্ণ রাখিয়া স্বদেশবাসী পাশ্চাত্য-শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিগণের সম্মুখে মনীষা ও মনস্বীতার দিব্যত্যুতি প্রকাশপূর্ব্বক বিপুল ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভে বরেণ্য ও সম্পূজ্য হইয়াছিলেন সেই শিক্ষার স্রোত সুসংযত ও তাহার প্রণালী সুসংস্কৃত করিয়া উপযুক্ত ভাবে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষাদান এবং চরিত্র সংগঠনের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে পারিলে সমগ্র ভারতের চারিদিকে উল্লিখিত মহাত্মাগণের ন্যায় আবার কত উজ্জ্বল রত্ন-তুল্য সুসন্তান ফুটিয়া উঠিবে। বর্ত্তমানে এদেশবাসীর জীবন-সংগ্রামের কঠোরতা নিবারণ জন্য অনেকে অনেকরূপ উপায় চিন্তা করিতেছেন—অনেকে শিল্প ও বাণিজ্য শিক্ষা প্রবর্ত্তনে দেশের দুরবস্থা মোচনের বিধান দিতেছেন—অনেকে বিজ্ঞান সম্মত শিক্ষা প্রণালী প্রবর্ত্তনে দেশের অর্থাভাব মোচন ও দুরবস্থা নিবারণের উপদেশ দিতেছেন। এই সকল জড় বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন থাকিলেও দেশের বর্ত্তমান অবস্থার পক্ষে কোন শিক্ষাই সুশোভন ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইবে না যতক্ষণ সেই সকল শিক্ষা অঙ্গাঙ্গীভাবে বিশুদ্ধ ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার সহিত মিশ্রিত না হইবে। এজন্য সর্ব্বাগ্রে ভারতভূমির সমস্ত বিদ্যালয়ে জাতীয় বিশেষত্ব রক্ষা ও উন্নতি সাধন জন্য সর্ব্বাগ্রে ধর্ম্মশিক্ষা দানের কোনরূপ সহজ প্রণালী প্রবর্ত্তিত হওয়া আবশ্যক। পুণ্যতীর্থ বারাণসীর ভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডলের ঋষি-কল্প পরিচালক বর্গ এবং সহৃদয় পৃষ্ঠপোষকগণ এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কিছুকাল হইতে বিশেষ যত্ন ও উদ্যোগ করিতেছেন; কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় এই যে সাধারণের, বিশেষত ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতাশালী কর্ত্তৃপক্ষগণের আস্থা, উৎসাহ ও সহায়তার অভাবে তাঁহারা তাঁহাদের উদ্দেশ্যানুরূপ কার্য্য সংসাধনে সক্ষম হন নাই। ধর্ম্মহীন শিক্ষার প্রভাবে প্রতিবর্ষে কত সহস্র সহস্র বিদ্যালয় হইতে কত অসংখ্য ব্রহ্মচর্য্যবিহীন, অসংযত, ধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত, দুর্নীতি-পরায়ণ, উদ্ধত-প্রকৃতি-সম্পন্ন, বৃথাভিমানী ও পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি ভক্তিহীন যুবক ও বালক বাহির হইয়া কঠোর জীবন সংগ্রামে পরাজিত ও ক্ষত বিক্ষত

হইতেছে, কে তাহার সংখ্যা করিতে সক্ষম? যাঁহারা প্রকৃত স্বদেশভক্ত জন-নায়ক তাঁহাদের সর্ব্বাগ্রে জাতীয়-ভাব-পরিপুষ্ট বিদ্যালয়ে জাতীয় প্রথানুরূপ ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা দানের সুব্যবস্থা প্রণয়ণে মনোনিবেশ করা একান্ত প্রার্থনীয়। একবার তাঁহারা ক্ষণকালের জন্য ধীর ভাবে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিবেন কত অসংখ্য পরিবারে কত সহস্র সহস্র স্নেহের দুলাল ধর্ম্মহীন পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে পিতা মাতা ও গুরুজনের অবাধ্য হইয়া স্বেচ্ছাচার সমর্থন ও অন্যায় ও অপ্রীতিকর কার্য্যের অনুষ্ঠানে স্ব স্ব উন্নতি রোধ এবং আপন আপন পরিবারবর্গ, সমাজ ও দেশ-জননীর কত অকল্যাণ সাধন করিতেছে। ধর্ম্ম শিক্ষা জাতীয় শিক্ষার শীর্ষ স্থান অধিকার করিলে দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হইবে।

(খ) হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজ-শৃঙ্খলার প্রতি যাঁহারা যথার্থ অনুরাগী এবং হিন্দু সমাজের পবিত্রতা সংরক্ষণ ও উৎকর্ষ সাধনে সক্ষম, হিন্দুধর্ম্ম প্রচারে লোক শিক্ষার ব্যবস্থা তাঁহারা অতি সুন্দর ভাবে করিতে পারেন, তাঁহাদের যত্নে ও উৎসাহে দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ও সনাতন হিন্দুধর্ম্ম শিক্ষা দানের জন্য উপযুক্ত আদর্শে বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইলে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। অসাধারণ প্রতিভা ও সৌভাগ্যশালী স্বনামধন্য স্বদেশ-প্রেমিক কবি রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মচর্য্য, সংযম ও ধর্ম্ম শিক্ষার জন্য দীর্ঘকাল হইল বোলপুরে যে একটী ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ও বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন তাহার দৃষ্টান্ত অনুসারে বঙ্গজননীর সুকৃতিশালী স্বধর্ম্মানুরাগী সুসন্তান দানবীর মহারাজা স্যার মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী মহাশয়ের উদ্যোগে এবং কতিপয় হিন্দু ধর্ম্মানুরাগী মহাত্মার যত্নে ও উৎসাহে রাঁচীতে একটী সনাতন হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উপযুক্ত শিক্ষক ও সাধুসন্ন্যাসীগণের তত্ত্বাবধানে উহার কার্য্য সুন্দর ভাবে পরিচালিত হইলে উহার প্রভাব দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়িবে এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে ঐরূপ আদর্শ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ও বিদ্যালয় দেশের নানাস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া জনসাধারণের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিবে।

কিছুদিন হইল সধর্ম্মানুরাগী, সদাচার-সম্পন্ন, সহৃদয়, কর্ত্তব্য-পরায়ণ ব্যবহারাজীব (Solicitor) শ্রদ্ধাপদ শ্রীযুক্ত কুমার কৃষ্ণ দত্ত মহাশয়ের উদ্যোগে

এবং তাঁহার সহৃদয় স্বধর্ম্মানুরাগী বন্ধুগণের যত্নে দেবঘরের অন্তর্গত রিখিয়া নামক স্থানে রাঁচী ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের ন্যায় সমুন্নত প্রণালীতে একটী আচার্য্যাশ্রম সংস্থাপিত হইয়াছে। আমরা উহার অনুষ্ঠান পত্র পাঠে অতীব আনন্দলাভ করিয়াছি। উক্ত আশ্রমে ব্রহ্মচর্য্য, সংযম, সদাচার ও ধর্ম্মশিক্ষা এবং তৎসঙ্গে কৃষি শিল্প প্রভৃতি অন্যান্য কল্যাণকর বিষয়ের শিক্ষা দানের সুব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এইরূপ আদর্শ আশ্রম ও বিদ্যালয়ের সংখ্যা যতই বড়িবে, ততই অধিক পরিমাণে দেশ জননীর প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে। শ্রীভগবানের কৃপা ও আশীর্ব্বাদ এই সকল আশ্রম ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি অজস্রধারে বর্ষিত হউক, ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা। দেশের ধনশালী ধর্ম্মানুরাগী সহৃদয় মহাত্মাগণের আনুকূল্য ও উদ্যোগে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নিষ্ঠাবান, সংসারবিরাগী ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ শাস্ত্রজ্ঞ সর্ব্বত্যাগী পবিত্র-হৃদয় সাধু সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক পরিচালিত এই রূপ আশ্রম ও বিদ্যালয় বহুল পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত হইলে দেশের বিলুপ্ত প্রায় পরিম্লান ধর্ম্মভাব অচিরে পুনরুজ্জীবিত হইবে। যুগ যুগান্তর হইতে ভারতবর্ষে পবিত্রাত্মা মহাশক্তিশালী সাধু-সন্ন্যাসিগণের প্রভাব ও প্রতিপত্তি পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান রহিয়াছে। তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের সংরক্ষক ও হিন্দু সমাজের প্রাণ স্বরূপ। প্রাচীন ভারতের খ্যাতনামা হিন্দুনরপতিগণ ইঁহাদের আদেশে পরিচালিত হইয়া হিন্দুধর্ম্মের গৌরববর্দ্ধন ও প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হইতেন। বিশাল ভারতের বিপুল জন-সঙ্ঘ বর্ত্তমান ঘোর অধঃপতনের দিনেও প্রগাঢ় ভক্তিভরে, সসম্ভ্রমে তাঁহাদের শ্রীমুখনিঃসৃত পবিত্রবাণী শ্রবণ করিয়া থাকেন। কৌপীন ও কমণ্ডলুধারী বিশুদ্ধ হৃদয় সন্ন্যাসীর পুণ্য-প্রভাবে অনেক অসাধ্য বিষয় সুসাধ্য হইয়া থাকে। এই সকল করুণ হৃদয় সাধু মহাত্মাগণের সহায়তায় দেশের চারিদিকে ধর্ম্ম শিক্ষা প্রচারের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে পারিলে বিলুপ্ত প্রায় ধর্ম্মভাব অচিরে পুনরায় নবীন তেজে উদ্দীপ্ত হইয়া সমগ্র ভারত ভূমিকে আলোকিত ও আশ্বস্ত করিবে।

(গ) সহজে ধর্ম্ম শিক্ষা প্রচারের জন্য কতকগুলি প্রধান প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থের সার সঙ্কলন পূর্ব্বক সরলভাবে ব্যাখার সহিত বহুল প্রচার আবশ্যক। খ্রীষ্টীয় মিসনরি সম্প্রদায় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত Bible Tract Society অতি অল্প মূল্যে

অথবা বিনামূল্যে যেরূপ বিস্তর খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম-গ্রন্থ এবং তৎসম্বন্ধীয় উপদেশ পূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা জনসাধারণের নিকট বিতরণ করিয়া থাকেন, সনাতন ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা বিস্তারের জন্য এদেশেও সেইরূপ প্রথার প্রবর্ত্তন আবশ্যক। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশ, বারাণসী, বোম্বাই, পুনা ও মান্দ্রাজ প্রভৃতি স্থান হইতে যে সকল শাস্ত্রীয় গ্রন্থ ও ধর্ম্মোপদেশ পূর্ণ পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে তৎসমস্ত গ্রন্থের মূল্য অনেক স্থানে অধিক হওয়ায় অন্ন-বস্ত্রের অভাবে ক্লিষ্ট জনসাধারণের মধ্যে অনেকের ঐ সকল পুস্তক ক্রয় করিয়া পাঠ করিবার ক্ষমতা নাই। ঐ সকল ধর্ম্ম পুস্তকের অত্যন্ত সুলভ সংস্করণ প্রকাশের ব্যবস্থায় দেশের দানশীল ধর্ম্মানুরাগী মহাত্মাগণের মনোযোগী হওয়া একান্ত আবশ্যক। দরিদ্র নারায়ণের সেবা ও উন্নতি কল্পে প্রতিষ্ঠিত পুণ্যময় শ্রীরাম-কৃষ্ণ মিশনের ত্যাগ-ব্রত-পরায়ণ সাধু মহাত্মাগণের এ বিষয়ের পথ প্রদর্শক হওয়া উচিত আমরা শুনিয়া আশ্বস্ত হইয়াছি যে ভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের ধর্ম্ম-প্রাণ কর্ম্মবীর সাধু মহাত্মাগণ এবিষয়ের জন্য সত্বর আশানুরূপ সুব্যবস্থা করিবেন। তাঁহাদের সাধুসঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইলে একটী মহৎ অভাব বিমোচিত হইবে।

(ঘ) প্রাচীন প্রথানুসারে কথকতার দ্বারা পুর-মহিলাগণের মধ্যে ধর্ম্ম শিক্ষা ও ধর্ম্ম-ভাব বিস্তারের ব্যবস্থা করিতে পারিলে সমাজের অশেষ কল্যাণ সংসাধিত হইতে পারে। শক্তিরূপা রমণীগণ প্রকৃত লক্ষ্মী স্বরূপিণী দেবীরূপে এক সময়ে হিন্দুগৃহের ধর্ম্মভাব ও পবিত্রতা রক্ষা করিয়া বিপুল শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান ঘোর অধঃপতনের দিনে ইহাদের মধ্যে অনেকেই কঠোর সাধনা প্রভাবে হিন্দু সমাজে ধর্ম্মভাব ও পবিত্রতা অনেক পরিমাণে রক্ষা করিতেছেন। প্রেমের প্রতিমা, স্নেহের সাগর, করুণার মন্দাকিনী অমৃতের নির্ঝরিণী, পুণ্যময়ী নিষ্ঠাবতী, মহাশক্তিরূপা ধর্ম্মানুরাগিণী হিন্দুরমণীগণ সর্ব্ব প্রযত্নে হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব, মর্য্যাদা ও গৌরব রক্ষা না করিলে এতদিন হিন্দুসমাজ প্রেতের সমাজ ও হিন্দুগৃহ শ্মশানে পরিণত হইত; অতএব উপযুক্ত বিশুদ্ধচরিত্র, নিষ্ঠাবান, সুপণ্ডিত ধর্ম্মপরায়ণ উপদেশকগণ দ্বারা হিন্দুসমাজে কথাকতার প্রভাব বিস্তারে ধর্ম্ম-শিক্ষা প্রচারের ব্যবস্থা করিতে পারিলে তদ্দ্বারা অন্তঃপুরবাসিনী রমণীগণ ও বালক বালিকাগণের ধর্ম্মোন্নতি

সাধনের পথ সুন্দর ভাবে প্রসারিত এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে হিন্দু গৃহের, সৌন্দর্য্য ও পবিত্রতা মনোজ্ঞভাবে বিকশিত হইয়া উঠিবে।

(ঙ) বিশুদ্ধ স্বভাব-বিশিষ্ট নিষ্ঠাবান সংসার-বিরাগী ধর্ম্ম-শিক্ষক ও উপদেশক উপযুক্ত পরিমাণে প্রস্তুত করিয়া তুলিতে পারিলে তাঁহাদের দ্বারা ধর্ম্ম শিক্ষা ও ধর্ম্মপ্রচার কার্য্য সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রূপে সংসাধিত হইতে পারে। খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচারকগণের ন্যায় ইঁহারা ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ ও প্রদেশের প্রত্যেক জনাকীর্ণ স্থানে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখান ও প্রচার-কার্য্যে ব্রতী হইলে দেশের বর্ত্তমান ধর্ম্মহীন শিক্ষা, কদাচার, কুরীতি ও জঘন্য অনুকরণ প্রবৃত্তির স্রোত পরিবর্ত্তিত হইয়া সমগ্র দেশে অচিরে এক অপূর্ব্ব নবশক্তি ও নবভাবের মাধুরী বিকাশ করিবে। আমাদের পাঠদ্দশায় কিছুকাল হিন্দুধর্ম্ম শিক্ষা বিস্তারের জন্য স্বর্গীয় পরিব্রাজক ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন, সুপণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি মহাত্মাগণ দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যে তুমুল অন্দোলন করিয়াছিলেন তাহার প্রভাবে ধর্ম্মভাব অতি সুন্দর ভাবে জাগিয়াছিল। বর্ত্তমান সময় ধারা-বাহিক ভাবে পুনরায় সেইরূপ ধর্ম্মান্দোলন আবশ্যক।

(চ) উল্লিখিত কল্যাণকর কার্য্যগুলি সংসাধন করিতে হইলে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ, অনুষ্ঠান সমিতি সংগঠন ও উদ্যোগ আবশ্যক। অর্থ ও উপযুক্ত শৃঙ্খলাগঠন (organisation) ভিন্ন জগতের কোন মহৎ কার্য্য সুসিদ্ধ হইতে পারে না। একাল পর্য্যন্ত উপযুক্ত পরিমাণে যত্ন ও উদ্যম অভাবে ধর্ম্ম শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রচুর অর্থ সংগৃহীত হয় নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষার নানা বিভাগের উন্নতি সাধন জন্য অনেক দানশীল মহাত্মা অকাতরে বিস্তর অর্থদান পূর্ব্বক বিশ্ব বিদ্যালয়ের অঙ্গ-পুষ্টি সাধনে যথেষ্ট সহায়তা দান করিয়াছেন। বাঙ্গলার শিক্ষিত সমাজের শিরোমণি পাশ্চাত্য শিক্ষায় সমুজ্জল রত্ন প্রভূত শক্তিশালী স্বনামধন্য, দানবীর স্বর্গীয় ডাক্তার স্যার রাস বিহারী ঘোষ শিক্ষার উন্নতির জন্য স্বীয় উপার্জ্জনের অধিকাংশ অর্থ যেরূপ অকাতরে মুক্ত হস্তে দান করিয়া অমরতা লাভ করিয়াছেন, সেরূপ দান, ইতঃপূর্ব্বে বাঙ্গলা দেশের অল্প লোকেই করিয়াছেন। এই মহাত্মার পরলোক গমনের কিছুকাল পূর্ব্বে স্বর্গীয় মহাত্মা স্যার তারকনাথ পালিত মহাশয়ও তাঁহার উপার্জ্জনের বিস্তর অর্থ ব্যবহারিক বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ে দান করিয়া

গিয়াছেন। উপযুক্ত ভাবে যত্ন ও অনুষ্ঠান আরম্ভ হইলে উল্লিখিত মহাত্মাগণের সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত অনুসরণে ধর্ম্ম শিক্ষা বিস্তারে দেশের বর্ত্তমান ঘোর দুর্গতি ও অবনতি নিবারণ জন্য অনেক সুকৃতিশালী দানশীল ধনাঢ্য ব্যক্তি অকাতরে তাঁহার সর্ব্বস্ব দান করিয়া মাতৃভূমির মুখ চির উজ্জ্বল করিতে পারেন। স্যার রাস বিহারীর ন্যায় পাশ্চাত্য শিক্ষানুরাগী মহাত্মাও তাঁহার মৃত্যুর কিছু কাল পূর্ব্বে তাঁহার স্বর্গীয়া পুণ্যবতী মাতৃদেবীর পবিত্র স্মৃতি চিরদিনের জন্য অক্ষুণ্ণভাবে সমুজ্জ্বল রাখিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার প্রতিশ্রুত শিবমন্দির রক্ষা ও মহাদেবের পূজা এবং সাধু সন্ন্যাসী ও অতিথি অভ্যাগতগণের সেবা আদি সদনুষ্ঠান সুশৃঙ্খল ভাবে পরিচালন জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং বিস্তর টাকার ভূ-সম্পত্তি এককালীন দানের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। সংপ্রতি ভবানীপুর নিবাসী সহৃদয় ধনশালী শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র সিংহ মহাশয় তাঁহার কতিপয় ধর্ম্মানুরাগী বন্ধুর সুপরামর্শে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনে ধর্ম্ম শিক্ষা ও তৎসঙ্গে অন্যান্য কল্যাণকর শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য উপযুক্ত ধর্ম্মপরায়ণ ট্রষ্টিগণের হস্তে লক্ষাধিক টাকা দান করিয়া স্বদেশ-সেবক মণ্ডলীর এবং তাঁহার প্রকৃত হিতৈষী বন্ধুগণের অশেষ শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন। কে বলে সৎকার্য্যে এদেশে অর্থের অভাব হইতে পারে? এ যে ত্যাগের দেশ—এ যে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ! এই পবিত্র দেশে ধর্ম্মানুষ্ঠান ও ধর্ম্মোন্নতির জন্য কত নরনারী অকাতরে মুক্ত হস্তে নিঃস্বার্থ ভাবে সর্ব্বস্ব দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মহত্ত্ব ও ত্যাগের মহিমায় উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হইয়া বর্ত্তমান জড়বাদ প্লাবিত যুগে অনেক সৌভাগ্যশালী নরনারী প্রকৃত ধর্ম্মানুষ্ঠান ও সৎকার্য্যের সহায়তার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছেন! স্বর্গাদপি গরীয়সী মাতৃভূমির কল্যাণ জন্য অনেক সহৃদয় ধনশালী ব্যক্তি লোক-চক্ষুর অগোচরে এখনও তপস্যা করিতেছেন। তাঁহারা দেশের কল্যাণ জন্য কোন প্রকৃত সদনুষ্ঠানের আবশ্যকতা ও উপযোগিতা বুঝিতে পারিলে তাঁহাদের দান প্রবৃত্তি আপনা হইতেই বিকশিত হইবে। তখন আর অর্থের অভাব থাকিবে না। প্রকৃত মঙ্গলানুষ্ঠানের সমস্ত বিঘ্নবাধা পরম দেবতার কৃপায় সহজেই অপসারিত হইয়া যাইবে।

নবভারতের সমুজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায় যখন ভারতের লক্ষ লক্ষ সহৃদয়

ও স্বদেশানুরাগী নরনারীর হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়াছে, তখন জাতীয় জীবনের গঠন কার্য্যের বর্ত্তমান এই বিরাট আন্দোলনের দিনে প্রত্যেক সুশিক্ষিত ও স্বদেশ প্রেমিক ভারতবাসীর সুসংযত ও সমাহিত চিত্তে ধর্ম্মভাব বিস্তার ও ধর্ম্মোন্নতি সাধনের সহিত দেশের অন্যান্য সকল অভাব বিমোচনে সর্ব্বান্তঃকরণে যত্নবান হওয়া একান্ত প্রার্থনীয়। প্রকৃত সাধনা অভাবে আর্য্যজাতির মনীষা ও ধর্ম্মভাবের দিব্যস্ফুর্তির অস্তগমণের সঙ্গে সঙ্গে যে সংযম, সরলতা, সদাচার, সত্যানুরাগ ও পবিত্রভাব কালসাগরে ভাসিয়া গিয়া দেশের দারুণ অবনতির পথ প্রসারিত করিয়াছিল সেই কঠোর সাধনা প্রভাবে আবার সেই অদ্ভুত মনীষা ও ধর্ম্মভাবের অপূর্ব্ব মাধুরী ভারত সন্তানগণকে প্রকৃত সুখশান্তি ও স্বচ্ছন্দতার অভিনব জীবনে সঞ্জীবিত করিয়া দেশ মাতৃকার পবিত্র চরণে আত্মোৎসর্গ করিতে উত্তেজিত ও উদ্বুদ্ধ করিবে।

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

মরণ মঙ্গল।

(শিল্পবিশারদ শ্রীযুক্ত শ্যামলাল চক্রবর্ত্তী)

অনন্ত নদীর গতি অনন্ত সাগরে
মিশে যায় ঘুচাইয়া যত রেখাপাত,
সংখ্যাতীত তারামালা অসীম আকাশে
আলোকে মিলায়ে যায় হইলে প্রভাত।

২

পলে পলে দিবাশেষে দীপ্ত দিনমণি
হীন তেজ হ'য়ে পড়ে অস্তাচল গায়
অমন উজ্জল সেই রাঙ্গা মুখখানি
বিলীন হইয়া যায় সান্ধ্য তমসায়।

সিন্ধু উছলিয়া, শত তুফানের ধারা
উলটি পালটি, কত আপনার বলে
আছাড়িয়া পড়ি' সেই বালু তটোপরি
পুনঃ মিলাইয়া যায় সাগরের তলে।

৪

যুগ যুগান্তর আগে কত বীর গাথা
পুরাণে কাহিনী মত রহি'ছে বিদিত
তিলমাত্র চিহ্ন তার মিলিবে না কভু
বিস্মৃতির গর্ভে যেন সব লুক্কায়িত।

যাহা আজ আছে তাহা রহিবে না কাল
যদি থাকে ধ্রুব তাহা দুদিনের পরে
সলিল লেখার মত অস্তিত্ব লইয়া
কোন মহাপথে লুপ্ত হবে চিরতরে।

৬

জীবের জীবন সেই অনন্তের কোলে,
আসে আর চলে যায় স্থায়ী কিছু নয়
রোগ, শোক, দুঃখ তাপে অধীর হইয়া
অন্তিমের মুখ পানে শুধু চেয়ে রয়।

৭

সুখ ও শান্তি—আছে বুঝি নাম মাত্র তার
সেই মোহ ঘোরে পড়ি আমার জীবন,
আশা ও কল্পনা সাথে থাকিয়া নিয়ত
অসার সংসারে মজি' রহে অনুক্ষণ।

৮

নিশ্বাসে হারায়ে ফেলি জীবনের দিন,
ভ্রমেও কভু না ভাবি এই দেহ খানি
নিশ্চয় হইবে লয় মরণের পথে ;
সহসা সে কোন দিন—নাহি তাহা জানি !

৯

পার্থিব সে সুখ সাথে দুখ খুঁজে লই
এক পূর্ণ না হইতে, অপর বাসনা
হৃদয়ে জাগিয়া উঠে, নূতন অভাব
অপূর্ণ করিয়া দেয় জীবন সাধনা।

১০

সারা দিবসের শেষে শ্রান্ত কলেবর
নিদ্রার ক্রোড়েতে যবে রহে নিমগন ;
দুঃখ দৈন্য পাপতাপে অধীর হইয়া
ক্ষুদ্র হিয়া মাঝে নাহি করে জ্বালাতন।

১১

হইলে জাগ্রত মন আবার তখনি
ক্ষণিক শান্তির সুখে হইয়া বঞ্চিত
ক্রীতদাস সমপ্রায় অধীনের মত
সংসার বন্ধনে পুনঃ হয় বিজড়িত।

১২

অযুত বাসনা সহ অনিত্য সংসারে
যা কিছু স্বজন যদি ধ্বংস হয়ে যায়
অনিত্য এ সুখে দুখে কেন অকারণ
অনন্ত চিন্তায় শুধু যাতনা বাড়ায়।

১৩

অনাদি অনন্ত দেব কাতর প্রার্থনা
নিদ্রা,—চির নিদ্রা যেন আসে গো আমার
মরণ হইলে ঘুচে সংসার যাতনা
মরণ মঙ্গল বুঝি শান্তির আধার।

——:০:——

আর্য্যজাতি।

অতএব পতির সহিত সহমৃতা হওয়া অথবা কেবল পতির কল্যাণার্থ নিবৃত্তি ধর্ম্মের পালন করিতে জীবিত থাকা পতিপ্রাণা সতীর পক্ষে পরম ধর্ম্ম। যে জাতির মধ্যে এই প্রকার আদর্শ জাজ্জ্বল্যমান সেই জাতিই আত্মার সুখের জন্য স্থূল শরীরের সুখ পরিত্যাগ করিতে পারে। এবং আত্মানন্দকে মুখ্য মনে করিয়া জগতে শরীরের ব্যবহার সেই পরমানন্দের লক্ষ্যেই সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়। ইহাই প্রকৃত আর্য্যভাব। যে জাতির মধ্যে দাম্পত্য প্রেম এইরূপ উচ্চ আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত সেই জাতিতেই আর্য্যগুণ-সম্পন্ন সন্তান উৎপন্ন হইতে পারে, অন্য জাতিতে কদাপি হইতে পারে না। সুতরাং যদি আর্য্যজাতির মধ্য হইতে পাতিব্রত্য ধর্ম্মের এই প্রকার সর্ব্বোচ্চ আদর্শ নষ্ট হইয়া যায় তবে আর্য্যজাতি অধঃ-পতিত হইয়া অচিরে অনার্য্যজাতিতে পরিণত হইয়া যাইবে তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। ইহাই অনার্য্যজাতি হইতে আর্য্যজাতির বিশেষত্বের একটী প্রধানতম লক্ষণ। পাতিব্রত্য ধর্ম্ম নষ্ট হইলে কেবল যে অনার্য্যত্ব প্রাপ্তি হইবে তাহা নহে সে জাতি জগতে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পারে না। জগতে ভোগের দ্বারা বাসনা ক্ষয় হয় না, বরং ঘৃতাহুত বহ্নির ন্যায় বাসনা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া মানুষকে প্রবৃত্তির অধস্তম অন্ধকূপে নিপাতিত করে। সতীধর্ম্ম ত্যাগ ও তপস্যামূলক। উহা যথাযথ প্রতিপালিত হইলে জাতির মধ্যে অজস্র প্রবৃত্তি-পরায়ণতা রুদ্ধ হয় এবং সেই জাতি আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে সমর্থ হয়। যে স্থানে প্রবৃত্তিকে নিয়মিত ও অর্গলাবদ্ধ করিবার নিয়ম নাই তথায় প্রবৃত্তি ভোগ দ্বারা ক্রমশ বলবতী হইয়া জাতিকে অধঃপাতিত করে। এবং এই প্রকার অধোগতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলে সে জাতি নষ্ট হইয়া যায় ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। ফলকথা, পাতিব্রত ধর্ম্ম নষ্ট হইলে কোন জাতিই জগতে চিরস্থায়ী হইতে পারে না। এতদ্ভিন্ন আরও একটী কারণ আছে যাহাতে প্রমাণিত হয় যে সতী-ধর্ম্মহীন জাতি জগতে চিরস্থায়ী হইতে পারে না। নারীধর্ম্ম নামক গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, স্ত্রীজাতি প্রকৃতির রূপ হওয়ায় তাঁহাদের মধ্যে বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয় ভাবেরই সমাবেশ থাকে। বিদ্যাভাবের দ্বারা স্ত্রী পাতিব্রত্যের পূর্ণতায় জগদম্বা হইতে পারেন এবং স্বীয় স্ত্রীযোনি হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন। কিন্তু তামসিক অবিদ্যা ভাবের বৃদ্ধি হইলে পাতিব্রত্য ধর্ম্মের নাশ হওয়ায় স্ত্রী পিশাচিনী হইয়া পড়ে এবং অবিদ্যার করাল কবলে পতিত হইয়া

অনেক পুরুষ-সংসর্গ দ্বারা ইন্দ্রিয় বৃত্তির চরিতার্থতা ও বর্ণসঙ্কর সন্তান উৎপাদন করিয়া থাকে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর ভোগশক্তি প্রবল হইয়া থাকে। এই জন্যই স্ত্রীর নিমিত্ত ত্যাগ ও তপোমূলক পাতিব্রত্য ধর্ম্মের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, যদ্দ্বারা স্ত্রী নিজ প্রবৃত্তিকে নিয়মিত করিয়া দেবীভাব প্রাপ্ত হইতে পারেন এবং সুসন্তান উৎপাদন করিয়া সংসার পবিত্র করিতে সমর্থ হন।

পাতিব্রত্য ধর্ম্ম নষ্ট হইলে স্ত্রীর প্রবৃত্তি নিয়মিত না হইয়া অনর্গল এবং নিত্য নূতনাভিলাষী হইয়া পড়িবে, পুরুষ অপেক্ষা তাহার ভোগপরায়ণতা অনন্ত গুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে এবং সে এই অবস্থায় উপনীত হইলে অবশ্যই উপপতির সংসর্গ দ্বারা বর্ণসঙ্কর সন্তান উৎপন্ন করিবে। যে জাতির মধ্যে পাতিব্রত্য ধর্ম্মের পূর্ণ আদর্শ বিদ্যমান নাই তথায় এই প্রকার বর্ণসঙ্করতার বিস্তার হওয়া স্বাভাবিক। বর্ণসঙ্করতার বিস্তার হইলে সৃষ্টির সমধারার মধ্যে অনেক বিষম ধারা উৎপন্ন হইবে। প্রকৃতি রাজ্যে ঐরূপ বিষম ধারার অস্তিত্ব থাকা প্রাকৃতিক নিয়মবিরুদ্ধ। সুতরাং এই প্রকার বর্ণসঙ্কর সৃষ্টি প্রকৃতির নিয়মানুসারে অচিরে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে অথবা অন্য কোন জাতিতে লয় প্রাপ্ত হইয়া যাইবে। অতএব সিদ্ধান্ত এই হইল যে, যে জাতির স্ত্রীর মধ্যে সতীধর্ম্মের আদর্শ বিদ্যমান নাই, যে জাতির স্ত্রী ইহপরলোকে পতির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া এক-পতিব্রত ধারণ করিতে জানে না, যে জাতির বিধবা স্ত্রী স্বাভাবতই সন্ন্যাসব্রত ধারণ করিয়া তপস্বিনী হইতে পারে না এবং যে জাতির মধ্যে যথার্থ পাতিব্রত্য ধর্ম্মের পালন হয় না সে জাতি জগতে চিরস্থায়ী হইতে পারে না। আর্য্যজাতি পাতিব্রত্য ধর্ম্মের পালন দ্বারা স্বীয় অস্তিত্ব এবং আর্য্যভাব চিরস্থায়ী রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং ভবিষ্যতে হইবেন· ইহাই অনার্য্যজাতি হইতে আর্য্যজাতির একটী প্রধান বিশেষত্ব।

পূর্ব্বোক্ত বিচার সমূহের সারাংশ এই যে, যে জাতির মধ্যে জ্ঞান বিকাশের পূর্ণতায় আত্মতত্ত্বজ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হইয়াছে অর্থাৎ যে মনুষ্য জাতি স্বীয় আধ্যাত্মশুদ্ধি দ্বারা জগতে তত্ত্বজ্ঞানের বিচারে জগদ্‌গুরু, তাহাই আর্যজ্যাতি। যে জাতিতে তাহার আধিভৌতিক পবিত্রতা সৃষ্টির আদি কাল হইতে বিদ্যমান অর্থাৎ যে জাতির মধ্যে তাহার রজ ও বীর্য্যের বিশুদ্ধতা সৃষ্টির আদিকাল হইতে অব্যাহত

রহিয়াছে হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে তাহাই আর্য্যজাতি। এবং যে জাতির মধ্যে জ্ঞান ও কর্ম্ম বিজ্ঞানের পূর্ণতা হওয়ায় তাহার অধিদৈব শুদ্ধি চিরস্থায়ী থাকে সেই জাতিই বেদানুসারে আর্য্যপদবাচ্য।

এইপ্রকার ত্রিবিধ লক্ষণের পূর্ণতা বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়াই আর্য্যজাতির মধ্যে ধর্ম্মের পূর্ণ বিকাশ সাধিত হইয়াছিল। ধর্ম্মের সার্ব্বভৌম ও সর্ব্বশক্তিময় পূর্ণস্বরূপ এই জন্যই আর্য্যজাতি দেখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই জন্যই আর্য্য-জাতি আচারকে প্রথম এবং প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করেন। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিজ্ঞান পূর্ণ অদ্বৈতবাদের ধর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া স্থূল হইতে অতিস্থূল আচার-ধর্ম্ম পর্য্যন্ত আর্য্যজাতি প্রতিপালন করিয়া থাকেন—এই জন্যই তাহাকে আর্য্য-জাতি বলা হইয়া থাকে। ক্ষুদ্রতম বস্তুকেও পূর্ণরূপে দেখিতে শিক্ষা করিলেই দৃষ্টিশক্তির পূর্ণতা সম্পাদিত হয়। শরীরের স্থূলতম চেষ্টার সহিতও ধর্ম্মের সম্বন্ধ স্বীকার করাকেই আচার বলে। এই জাতি পূর্ণরূপে আচারধর্ম্ম প্রতিপালন করেন—ইহাও অনার্য্যজাতি হইতে আর্য্যজাতির একটী প্রধান বিশেষত্ব।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে কেবল সংখ্যাবৃদ্ধি দ্বারা কোন জাতি উন্নত হইতে পারে না, স্বীয় জাতীয়তার বিশেষ বিশেষ ভাব সমূহকে পরিপুষ্ট করিয়াই জাতি আপন অভ্যুন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হয়। জাতীয়তার বৃদ্ধিতেই জাতীয় উন্নতি সাধিত হয়, কেবল সংখ্যাবৃদ্ধিতে হয় না। পূর্ব্বোল্লিখিত যে সকল অসা-ধারণ বিষয়ের বিদ্যমানতায় আর্য্যজাতি পৃথিবীর অন্যান্য মনুষ্যজাতি সমূহ হইতে অধিক দিন জীবিত থাকিতে সমর্থ হইয়াছে সে সকল বিষয় বর্জ্জন করিলে আর্য্য-জাতির উন্নতি হইতে পারে না। বরং সেই সকল বিষয় বিদ্যমান থাকিলেই আর্য্য-জাতির উন্নতি সাধিত হইবে। ভিন্ন জাতি হইতে বিশেষত্বই জাতীয় অস্তিত্বের রক্ষক। বিশেষত্ব নষ্ট হইলে জাতির পৃথক অস্তিত্বও নষ্ট হইয়া যায় এবং সে অন্য জাতিতে লয়প্রাপ্ত হইয়া যায়। অতএব অনার্য্যজাতি হইতে আর্য্যজাতির বিশেষত্বের যে সমস্ত লক্ষণ উপরে বর্ণন করা হইয়াছে সেই সকল লক্ষণ যতদিন আর্য্যজাতির মধ্যে বিদ্যমান থাকিবে ততদিন জগতে আর্য্যজাতির অস্তিত্ব অব্যাহত থাকিবে এবং অন্তে সে উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিতে সমর্থ হইবে। যদি কোন জাতিতে তাহার বিশেষ বিশেষ লক্ষণ অক্ষুণ্ণ থাকে তাহা হইলে সেই জাতির উপর যতই কেন বাধাবিঘ্ন আসুক না, সে জাতি কখনই জগত হইতে বিলুপ্ত হইবে না

অধিকন্তু সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া পুনরায় সে স্বীয় উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হইবে। পক্ষান্তরে যদি কোন জাতির জাতীয়তার বিশেষ বিশেষ ভাবই নষ্ট হইয়া যায় তবে তাহার ব্যবহারিক উন্নতি এবং সংখ্যাবৃদ্ধি যতই কেন না হয় সে জাতি স্বীয় বিশেষত্ব হইতে ভ্রষ্ট হওয়ায় আপন অস্তিত্ব হারাইয়া অন্য জাতিরূপে পরিণত হইয়া যাইবে, তখন তাহার সেই উন্নতি তাহার জাতীয় উন্নতি বলা যাইতে পারে না। জাতীয়তাই জাতির প্রাণ-স্বরূপ। সেই প্রাণশক্তি নষ্ট হইয়া গেলে জাতি নিৰ্জ্জীব ও মৃতকল্প হইয়া পড়ে এবং সেই বিকৃত অবস্থায় তাহার কোন প্রকার উন্নতিই উন্নতিপদবাচ্য হইতে পারে না।

বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্রের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, যে জাতির মধ্যে বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্ম বিদ্যমান রহিয়াছে, যে জাতিতে প্রত্যেক কার্য্য, ভাব ও চিন্তায় অধ্যাত্মলক্ষ্যকে সর্ব্বপ্রধান স্থান দেওয়া হয়, যে জাতিতে আচার-ধর্ম্ম প্রতিপালন করা সর্ব্বপ্রধান কার্য্যরূপে পরিগণিত এবং যে জাতির নারীবৃন্দের মধ্যে পাতিব্রত্য ধর্ম্মের পূর্ণ আদর্শ বর্ত্তমান তাহাকেই আর্য্যজাতি বলা হইয়া থাকে। এবং যে সমস্ত জাতির মধ্যে এই সকল ধর্ম্মলক্ষণ পাওয়া যায় না তাহা-দিগকে অনার্য্যজাতি বলে। বস্তুত কেবল মুখনাসিকাদি স্থূল শরীরের লক্ষণ দেখিয়া আর্য্য ও অনার্য্য জাতি নির্দ্ধারণ করা সনাতন ধর্ম্মদ্বারা অনুমোদিত হইতে পারে না। যে জাতিতে রজ ও বীর্য্যের বিশুদ্ধি রক্ষা করিয়া জন্ম, কর্ম্ম ও জ্ঞান এই ত্রিবিধ প্রকারে বর্ণধর্ম্মের শৃঙ্খলা বিদ্যমান রহিয়াছে তাহাই আর্য্যজাতি। যে জাতিতে সেই শৃঙ্খলা বর্ত্তমান নাই সে জাতি সনাতন ধর্ম্ম অনুসারে অনার্য্য জাতিরূপে গণ্য। যে জাতিতে ব্রহ্মচারীগণ ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণ পূর্ব্বক আত্মো-ন্নতিকে প্রধান লক্ষ্য রাখিয়া বিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্ত থাকেন এবং বিদ্যাদাতা আচার্য্যকে পরম দেবতা মনে করিয়া অতিশয় ভক্তি সহকারে তাঁহার সেবা-পরিচর্য্যায় নিরত থাকেন সেই জাতিকেই যথার্থ আর্য্যজাতি বলা যায়। যে জাতির বিদ্যার্থীদের মধ্যে এইপ্রকার লক্ষণ একেবারেই দৃষ্টিগোচর হয় না সনাতন ধর্ম্ম অনুসারে সে জাতি অনার্য্যরূপে পরিগণিত। যে জাতিতে স্ত্রীসংসর্গ, ধনসংগ্রহ প্রভৃতি প্রবৃত্তি-দায়ক বিষয়, ভোগবাসনানিবৃত্তির উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হয়, যে জাতির দম্পতি ইন্দ্রিয় দমনের জন্যই শাস্ত্রীয় নিয়ম অনুসারে ইন্দ্রিয় ভোগ করিয়া থাকেন সেই জাতিকেই আর্য্যজাতি বলা হইয়া থাকে। এবং যে জাতির মধ্যে এই লক্ষণ

পাওয়া যায় না সে জাতিকে সনাতন ধর্ম্মের বিজ্ঞান অনুসারে অনার্য্যজাতি বলা হইয়া থাকে। যে জাতিতে মনুষ্য আপন জীবনকে কেবল বিষয় ভোগের জন্য মনে না করিয়া নিবৃত্তিকেই জীবনের চরম লক্ষ্য মনে করে এবং জীবনের নিয়মিত সময়ে একেবারেই বিষয় সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হয় এবং অন্তে পূর্ণ নিবৃত্তির অধিকার লাভে সমর্থ হয় সেই জাতিকেই আর্য্যজাতি বলা যাইতে পারে। আর যে মনুষ্য জাতির মধ্যে এসকল দেখিতে পাওয়া যায় না সনাতন ধর্ম্মানুসারে তাহা অনার্য্যজাতি। যে মনুষ্যজাতির উঠিতে, বসিতে, চলিতে, ফিরিতে, সমস্ত কার্য্যে, ভাবে ও চিন্তায়, ভোজন আচ্ছাদনে, যাবতীয় শারীরিক ও মানসিক চেষ্টায় কেবল আত্মসাক্ষাৎকার প্রাপ্তি বা আধ্যাত্মিক লক্ষ্যই প্রধানরূপে গৃহীত হয় সেই জাতিই হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে আর্য্যজাতি বলিয়া গণ্য এবং যে জাতিতে এই লক্ষণ না পাওয়া যায় সে জাতি বৈদিক দর্শনের সিদ্ধান্ত অনুসারে অনার্য্যজাতি মধ্যে পরিগণিত। যে জাতিতে ধর্ম্মের এত সূক্ষ্ম রহস্য উপলব্ধ হইয়াছে যে, সকল প্রকার শারীরিক ও মানসিক চেষ্টা ধর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং আচার ও ধর্ম্মরূপে পরিগণিত সেই জাতিই বৈদিক সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রকৃত আর্য্যজাতি। এবং যে জাতিতে বাহ্য আচারের সঙ্গে ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ স্বীকার করা হয় না সনাতন ধর্ম্ম অনুসারে তাহা অনার্য্যজাতি। যে জাতিতে পাতিব্রত্য ধর্ম্মের আদর্শ বিদ্যমান, যে জাতির রমণীগণ মনে মনেও পরপুরুষচিন্তা করাকে পাপ মনে করেন, যে জাতির কুলললনাগণ ইহলোক ও পরলোকে সমানরূপে পতির অনুগমনকেই পরম ধর্ম্ম মনে করেন সেই জাতিই আর্য্যজাতি। আর যে জাতিতে ত্রিলোক পবিত্রকর এই প্রকার পাতিব্রত্য ধর্ম্মের আদর্শ বিদ্যমান নাই সনাতন ধর্ম্মের সিদ্ধান্তানুসারে তাহা অনার্য্য জাতি। এই সমস্ত বিচারের সারাংশ এই যে, বৈদিক দর্শন শাস্ত্র অনুসারে আর্য্য ও অনার্য্য জাতির পার্থক্য মনুষ্যের বাহ্য লক্ষণ দেখিয়া নিরূপণ করা হয় নাই। বৈদিক শাস্ত্রে আর্য্য ও অনার্য্যজাতির ভেদ অন্তর্লক্ষণ দেখিয়া নির্ণয় করা হইয়াছে- একথা আর্য্য ও অনার্য্যের বিচার করিতে সময় সকলের সর্ব্বদা মনে রাখা কর্ত্তব্য।

আজকাল ভারতবর্ষে এরূপ কয়েকটী সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে যাহারা আর্য্যজাতির উপরোক্ত মৌলিক বিশেষত্ব উপলব্ধি করিতে না পারিয়া ঐ সকল বিশেষত্ব নষ্ট করা এবং অন্য জাতীয়দের আপনাদের মধ্যে মিলাইয়া লইয়া কেবল সংখ্যা

বৃদ্ধি করাকেই আর্য্যজাতির উন্নতি মনে করেন এবং তদনুসারে কার্য্য করিয়া দিন দিন অনার্য্যজাতি হইতে আর্য্যজাতির উপর্য্যুক্ত বিশেষত্ব সম্বন্ধীয় নিয়ম সমূহকে নষ্ট করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। এই প্রকার প্রযত্ন নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক এবং আর্য্যজাতিকে অনার্য্যজাতিতে পরিণত করিবার সহায়ক। আর্য্যজাতি যদি আর্য্য ভাবকে পরিপুষ্ট রাখিয়া অল্প সংখ্যাতেও অবশিষ্ট থাকে তবে তাহাতে কোনই ক্ষতি নাই, যেহেতু তাহাতে আর্য্যজাতির বীজ রক্ষা হইবে, পরে অনুকূল কাল প্রাপ্ত হইলে সেই বীজ বৃদ্ধি লাভ করিয়া পুনরায় এই জাতির সেই প্রাচীন সংখ্যা পূর্ণ করিয়া দিবে। কিন্তু যদি এই নবীন সংস্কারে আর্য্যজাতির বীজই নষ্ট হইয়া যায় সংখ্যায় যতই কেন না সে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক জাতীয়তা হইতে ভ্রষ্ট হওয়ায় সেই সংখ্যা বৃদ্ধি তাহার পক্ষে মৃত্যুরই নামান্তর মাত্র। যদি আর্য্য অনার্য্য হইয়া সংখ্যা বৃদ্ধি করে, হিন্দু অহিন্দু হইয়া সংখ্যায় অগণিত হয় তবে এই প্রকার সংখ্যা বৃদ্ধিতে কি ফল? ইহাই আধুনিক সমাজ-সংস্কার ও প্রাচীন সনাতন সমাজ সংস্কার বিধির পার্থক্য। সনাতন সমাজ সংস্কার জাতীয়তার বীজ রক্ষার উপরে অবস্থিত আর আধুনিক সমাজ সংস্কার আর্য্যজাতির বীজ নষ্ট করিয়া কেবল সংখ্যা বাড়াইতেই তৎপর। বিচার করিলে সিদ্ধান্ত হইবে যে সনাতন সমাজ সংস্কারের বিধিই যথার্থ ও দূরদর্শিতা পূর্ণ এবং ইহারই দ্বারা আর্য্যজাতি চিরকাল পৃথিবীর পৃষ্ঠে বিদ্যমান থাকিতে সমর্থ হইবে। পক্ষান্তরে আধুনিক সমাজ সংস্কার প্রথায় আর্য্যজাতি নিজ গৌরবময় পদ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অন্য জাতিতে পরিণত হইবে। অতএব প্রত্যেক সমাজ সংস্কারকের দৃষ্টি আর্য্যজাতির বিশেষত্বের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া উচিত এবং উহাকে দৃঢ় রাখিয়া সকল প্রকার সংস্কার-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত।

যদি একটী মাত্র যথার্থ ব্রাহ্মণের বীজ ভারতে থাকিয়া যায় তবে উহা অনুকূল কাল প্রাপ্ত হইলে সহস্র সহস্র সৎকর্ম্মান্বিত ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু অসংখ্য অব্রাহ্মণ বিদ্যমান থাকিলে আর্য্যজাতি উন্নত হইতে পারিবে না। যদি একটী মাত্র যথার্থ ক্ষত্রিয় থাকিয়া যায় তবে পুনরায় আর্য্যজাতির মধ্যে সেই ক্ষত্রিয় তেজ উৎপন্ন হইতে পারিবে। কিন্তু ক্ষত্রিয় তেজহীন অসংখ্য ব্যক্তি দ্বারা কোনই লাভ নাই। যদি একটী মাত্র আর্য্যভাবাপন্ন পরিবার বিদ্যমান থাকে তবে আর্য্যজাতি পুনরায় আপন অতীত গৌরব প্রাপ্ত হইতে পারিবে। কিন্তু

অসংখ্য অনার্য্যভাবাপন্ন পারিবার আর্য্যজাতির অস্তিত্বই লোপ করিয়া দিবে। একটী মাত্র সাবিত্রী বিদ্যমান থাকিলে দেশে পুনরায় সহস্র সাবিত্রী মাতার উৎপত্তি সম্ভব হইবে। কিন্তু লক্ষ লক্ষ অবিদ্যাময়ী রমণীর আবির্ভাবে দেশ রসাতলে যাইবে। শুকদেবের ন্যায় একটী পবিত্র ব্রহ্মচারী জীবিত থাকিলে সহস্র শুকদেব উৎপন্ন হইতে পারিবে। কিন্তু অসংখ্য ব্যভিচারীর প্রাদুর্ভাব হইলে দেশ উচ্ছন্ন যাইবে। এক ভীম কিম্বা অর্জ্জুনের ন্যায় বীর বিদ্যমান থাকিলে দেশে সহস্র ভীমার্জ্জুন জন্মগ্রহণ করিবে। কিন্তু অসংখ্য কাপুরুষ পঙ্গপালের দ্বারা দেশের কোনই মঙ্গল সাধিত হইতে পারে না। যদি বশিষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য বেদব্যাসের ন্যায় ঋষির বীজ আর্য্যজাতির মধ্যে বিদ্যমান থাকে তবে কালান্তরে অনেক নিবৃত্তি পরায়ণ জগদ্‌গুরু বিদ্বান ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসী পুনরায় উৎপন্ন হইয়া জগতকে জ্ঞানজ্যোতিতে আলোকিত করিতে সমর্থ হইবেন। নতুবা নাস্তিক ও কদাচারী মনুষ্যের সংখ্যা বাড়িলে এই ত্রিলোক পবিত্রকর আর্য্যজাতি নষ্ট ভ্রষ্ট হইয়া যাইবে। এইরূপ জাতীয় বীজরক্ষার ভিত্তির উপর আর্য্যজাতির সংস্কার হওয়া উচিত। অন্যান্য জাতি হইতে আর্য্যজাতির বিশেষত্বের বিষয় সমূহকে দৃঢ় রাখিয়া তাহারই উপর জাতীয় জীবনের প্রতিষ্ঠা হওয়া কর্ত্তব্য, তাহা হইলেই আর্য্যজাতির যথার্থ কল্যাণ সাধিত হইবে।

সম্পূর্ণ।

শিব কীর্ত্তন।

ঝিঁঝিট—একতালা।

[সুর—"কেশব কুরু করুণা দীনে" ইত্যাদি]

শঙ্কর-নাথ চরণ-মূলে পূজিবে যদি যতনে।
বনজ-কুসুমে অঞ্জলি ভরিয়া চল সবে চল সঘনে।
ভোলা যে পাগল, প্রেমেতে বিহ্বল,
আশুতোষ তুষ্ট স্বল্পে চিরকাল,
ফুল বিল্ব জলে পূজিলে সকলে, ধন্য হইবে জীবনে॥
বিষয়-বিষেতে বিষম মগন
বাসন-বিশেষে আছ অচেতন,
শেষের সে দিনে, সে চারু চরণে, শরণ মিলিবে কেমনে॥
শিব-চতুর্দ্দশী পুণ্য-তিথি পেয়ে,
ব্রতের বিধানে উপবাসী হ'য়ে,
ত্রিদশ-বন্দিত শ্রীপদ বন্দিতে বঞ্চিত রহিবে কোন্ প্রাণে॥
ভৈরব-তীরে পূজিলে ভৈরবে
জীবন ভরিবে পরম গৌরবে,
রৌরব নরকে নিস্তার পাইবে, ভ্রমিবে আনন্দ-কাননে॥
মন্ত্র তন্ত্র দিয়া কিবা প্রয়োজন,
নৈবেদ্যের নাই বা হোক আয়োজন,
ধেয়ানে মননে আত্ম-নিবেদনে শিব শিব বল বদনে।

শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র।

---

* খুলনা সেনহাটি শ্রীশ্রীশঙ্করনাথের মন্দিরে গত শিবরাত্রি উৎসব উপলক্ষে স্থানীয় ধর্ম্ম-সভার সভাগণ কর্ত্তৃক গীত।